অদ্রীশ বর্ধন

অসহ্য সাসপেন্স ২

কল্পবিজ্ঞান-অ্যাডভেঞ্চার-রহস্য নিয়ে যে লেখক চারদশকব্যাপী জনপ্রিয়তার শিখরে, তাঁরই কলমে বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট দেশি-বিদেশি-রোমাঞ্চ-রহস্য কাহিনিগুলিকে একত্রিত করে সুবিশাল বই 'অসহ্য সাসপেন্স ২'।

লেখকের কথায় ঃ 'জীবনটাই যার সাসপেন্স-ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় নেচে-নেচে চলে এসেছে, সে মানুষটা কলম চালাতে লেগেই সাসপেন্সের ঝড় বইয়ে দেওয়ার চেষ্টা তো করবেই!...হৃদযন্ত্র যাদের দুর্বল, এই কেতাব তাদের জন্য নয়।'

অসহ্য সাসপেন্স ২

অদ্রীশ বর্ধন

অ দ্রী শ ব র্ধ ন

অসহ্য সাসপেন্স ২

পত্র ভারতী

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ **ফেব্রুয়ারি** ২০০৯
তৃতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১১

ASAJHYA SUSPENSE 2
by
Adrish Bardhan

ISBN 81-8374-041-3

প্রচ্ছদ
সৌরীশ মিত্র

মূল্য
১৫০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
e-mail : patrabharati@gmail.com website : bookspatrabharati.com
Price Rs. 150.00

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

জীবনটাই যার সাসপেন্স ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় নেচে-নেচে চলে এসেছে, সে মানুষটা কলম চালাতে গেলেই অসহ্য সাসপেন্সের ঝড় বইয়ে দেওয়ার চেষ্টা তো করবেই!

তাই ঘুম ছুটিয়ে দেওয়ার মতো সাসপেন্স রইল এই বইয়ের পাতায়-পাতায়। রহস্য আর রোমাঞ্চ, উৎকট শিহরণ আর ভিরমি যাওয়ার মতো ভয়!

হৃদযন্ত্র যাদের দুর্বল, এই কেতাব তাদের জন্যে নয়!

অদ্রীশ বর্ধন

ডিসেম্বর ২০০৬
কলকাতা

সাসপেন্স! রহস্য! থ্রিলার!

পত্র ভারতী প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

সেরা কল্পবিজ্ঞান অমনিবাস

পাঁচটি রহস্য উপন্যাস

অসহ্য সাসপেন্স

অসহ্য সাসপেন্স ৩

মাকড়সা আতঙ্ক

সুপারম্যান বিক্রমজিৎ

রাতের আতঙ্ক

রবিবার সকাল। দূরদর্শনে মহাভারতের পাট চুকে গেছে। সাপ্তাহিক আড্ডা মারতে বন্ধুবান্ধব আসবে এখন। আমি কলম মুড়ে রাখলাম। কবিতা আঁচলে মুখ মুছতে-মুছতে এসে বসল আমার পাশের চেয়ারে।

বললাম, 'গিন্নি, তোমার গা থেকে পাঁঠা-পাঁঠা গন্ধ বেরোচ্ছে।'

কবিতা বললে, 'ওটা সঙ্গ দোষের গন্ধ। বিয়ের আগে যখন আধপাগল হয়েছিলে, তখন পেতে আতরের গন্ধ—এখন পাচ্ছ পাঁঠার গন্ধ। সুতরাং গন্ধটা কোত্থেকে অর্জন করেছি, তা কি বলে দিতে হবে?'

আমি বললাম, 'বুঝলাম। আমি পাঁঠা। কিন্তু তুমি পাঁঠার ঝোল খেতে চেয়েছিলে বলে পাঁঠা কিনে আনলাম। পাঁঠাতে তোমার রুচি আছে বলেই পাঁঠার মালা গলায় পরেছ। তবে, পাঁঠার ঝোল তোমার এত প্রিয় জানলে তোমার ছায়া মাড়াতাম না।'

'তোমাকে রেঁধে খেয়ে ফেলব, সে আশায় থেকো না। তুমি একটা অখাদ্য।'

'অখাদ্য!'

'এক্কেবারে। নইলে কোনকালে চেখে দেখতাম।'

'রোজই তো সে কর্মটা করছ। করে-করে বুঝে গেছ, আমি একটা অখাদ্য।'

'মরণ।'

এই বলে রূপসী ভার্যা আরও একটু গা-ঘেঁষে বসল। অমনি দোরগোড়ায় শোনা গেল অতি পরিচিত বিষম-খাওয়ার শব্দ।

ঠোঁট বেঁকিয়ে চোখ পাকিয়ে কবিতা বললে, 'আপদ! সাতসকালে গলায় কাঁটা ঢুকিয়ে বসে আছে।'

চৌকাঠ পেরিয়ে এসে উত্তমকুমার ঢঙে ইন্দ্রনাথ বললে, 'হে মোর বন্ধুপত্নী, এ কাঁটা প্রেমালাপের কাঁটা। তোমাদের কাছে যা মধুময়, আমার কাছে তা কণ্টক।'

বিষদৃষ্টিতে সুদর্শন বন্ধুবরের আসন গ্রহণ নিরীক্ষণ করতে-করতে কবিতা বললে, 'তোমার মতো সুপুরুষ আইবুড়োদের এই ধরনের সেক্সুয়াল অ্যাভারসন থাকলেই ধরে নিতে হবে তোমরা প্রত্যেকেই এক-একটা ক্রিমিন্যাল।'

'খুনে ক্রিমিন্যাল', হৃষ্ট কণ্ঠে বললে ইন্দ্রনাথ, 'যেমন ছিল জন জর্জ হেগ। ১২৩ বছর আগে বেচারা ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে। খুন করে গলা কেটে গেলাস ভরে রক্ত নিয়ে পান করত ঢকঢক করে। ভারি সুন্দর চেহারা, মেয়েবন্ধু ছিল অনেক, কিন্তু প্রেম করত না কারুর সঙ্গে—বিয়ের কথাও ভাবত না। খুন করে আর কাঁচা রক্ত খেয়েই তার যত আনন্দ। সেক্সপীয়রের কথা ভুল বলে প্রমাণ করে দিয়েছিল। প্রচণ্ডভাবে সঙ্গীতপ্রিয় ছিল—গানবাজনা

ওকে নিয়ে যেত সুরলোকে—এই লোকই আবার অসুর হয়ে যেত, অনর্গল মিষ্টি মিথ্যে বলে যেত, পাকা শিল্পীর মতো সই জাল করত, হাতের লেখা নকল করত। খুন-টুন করে লাশগুলোকে সালফিউরিক অ্যাসিডে নিশ্চিহ্ন করে দিত। রির্মাকেব্‌ল্‌!'

'রিমার্কেব্‌ল্‌!' শিউরে উঠল কবিতা।

ইন্দ্রনাথ সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'হেগ নাকি সিজোফ্রেনিয়া রোগে ভুগত। মনের রোগ। আমার কিন্তু সে রোগ নেই, বউদি। সুতরাং নির্ভয়ে থেকো।'

এইবার আর-একটা অতি-পরিচিত কৃত্রিম কাশির আওয়াজ ভেসে এল দোরগোড়া থেকে। কাশতে-কাশতেই ভেতরে এসে ইন্দ্রনাথের পাশে এসে বললে পুলিশবন্ধু জয়ন্ত, 'মাই ডিয়ার টিকটিকি এইসব ব্যাপারই এখন আমার মাথায় ঘুরছে।'

'রক্তৃষ্ণা জাগছে বুঝি?' সকৌতুকে বললে ইন্দ্রনাথ।

'অতীতে এ-রোগ কাদের হয়েছিল, সেই খোঁজ নিচ্ছি। হেগ রক্ত খেতে শিখেছিল 'ডাবল লাইফ' বইটা পড়ে—তাই না?'

গম্ভীর হয়ে গিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, 'খবর রাখিস তাহলে। গুড। 'ডাবল লাইফ' এক কশাই-এর গল্প। মানুষ মেরে তাদের রক্ত খেত, মাংস বেচে খদ্দেরদের খাওয়াত। এর বেশি আর কিছু জানিস?'

জয়ন্ত বললে, 'আরও আছে?'

'আছে। 'ডাবল লাইফ' উপন্যাসের নায়ক মনগড়া নয়। হ্যানোভারে তার নিবাস। নাম, ফ্রিজ হারম্যান। চব্বিশটা ছেলেকে খুন করে তাদের মাংস বেচেছে আর রক্ত খেয়েছে।'

'মাই গড!' বললে জয়ন্ত।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'হেগ-এর রক্তৃষ্ণা জেগেছিল আরও একজন নরপিশাচের কীর্তিকাহিনি পড়ে। নাম তার সিলভেস্টার মাটুস্কা। ১৯৩১ সালে বুদাপেস্তে ইচ্ছে করে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে বাইশটা নরহত্যা ঘটিয়ে অসীম তৃপ্তি পেয়েছিল। মানুষ মেরেই আনন্দ পেত সিলভেস্টার। হেগ আর সিলভেস্টারের মধ্যে এক জায়গায় অমিল আছে—মিল আছে অনেক জায়গায়।'

'অমিলটা কী?' জয়ন্তর প্রশ্ন।

'হেগ পাগলামির ভান করেছিল বাঁচবার জন্যে—সিলভেস্টার তা করেনি। সাফ বলেছিল, মানুষকে মরতে দেখলে আনন্দ পাই বলেই ট্রেন ধ্বংস করি।'

'মিলগুলো কোথায়?' জয়ন্ত ঝুঁকে বসেছে।

'একটাই এখন শোন। দুজনেই মনে করত, একটা অদৃশ্য অশরীরী সত্তার হিপনোটিক হুকুমে এ-কাজ তাদের করতে হয়।'

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল কবিতা, 'প্লীজ। বিকট এই আলোচনা আর ভালো লাগছে না।'

তর্জনী তুলে ইন্দ্রনাথ বললে, 'তাহলে বলো আর কক্ষনও আমাকে ক্রিমিন্যাল বলবে না।'

'তুমি স্যাডিস্ট। মানুষকে দগ্ধে মেরে আহ্লাদে আটখানা হও।'

'তাহলে তো তোমাকে ডক্টর নক্স-এর গল্প শুনতে হয়।'

'ডক্টর নক্স।'

'এডিনবরার ডাক্তার। থাকতেন দশ নম্বর সার্জন স্কোয়ারে। লাশ কাটাকুটি করার

জন্যে মানুষ মারিয়ে আনতেন খুনে দালাল লাগিয়ে। শেষকালে তিলোত্তমা এক বারবনিতার মড়া দেখে এমনই মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে তাকে তিনমাস ধরে ডুবিয়ে রাখলেন হুইস্কির চৌবাচ্চায়। তিনমাস ধরে রূপসুধা পান করেছেন—শিল্পীদের ডেকে এনে সুন্দরীর ছবি আঁকিয়েছেন।'

জয়ন্ত বললে, 'ইন্দ্র, রক্ত আর রূপের তেষ্টা নিবারণের গল্প শুনে মোহিত হলাম। কিন্তু এখন যে জঘন্য খুনগুলো হয়ে চলেছে এই শহরে সেগুলোর মূলে কী ধরনের তেষ্টা আছে বলে তোর মনে হয়?'

ইন্দ্রনাথ পোড়া সিগারেট ফেলে দিয়ে নস্যির ডিবে খুলতে-খুলতে মঞ্চ-নায়কের পোজে আড়চোখে কবিতার দিকে চেয়ে বললে, 'সরি বউদি...খুবই নোংরা অভ্যেস—কিন্তু ভিখিরি জেমি উইলসনের পকেটে তামার নস্যির ডিবে আর পিতলের নস্যির চামচ ছিল বলেই ডক্টর নক্সের ল্যাবোরেটরিতে তার লাশ কাটাকুটি হয়ে যাওয়ার পরেও ধরা গেছিল খুনিকে—ডিবে আর চামচ পাওয়া গেছিল খুনে দালালের পকেটে।'

'ঠাকুরপো! ফের!'

জয়ন্ত বললে, 'আমার প্রশ্নটার জবাব জানা নেই মনে হচ্ছে?'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'সত্যিই জানা নেই, জয়ন্ত। থাকলে এই নারকীয় কাণ্ড বন্ধ করতে আগে কোমর বেঁধে লাগতাম আমি। আবার কার মাথা ছাতু হল?'

এমন সময়ে ঘরে ঢুকল লোকনাথ পাল। ট্রাফিক পুলিশের ও-সি। যেমন টল, তেমনি হ্যান্ডসাম। যেন পাথরের গ্রীকমূর্তি হঠাৎ প্রাণ পেয়েছে। দুই চোখ আশ্চর্য শান্ত। ঠোঁটের কোণে-কোণে হাসির ঝিলমিল। ঈর্ষাকাতর মহলে শোনা যাচ্ছে, ডি-সি ট্রাফিক তাকে আরও ওপরে তুলবেন ঠিক করে রেখেছেন।

লোকনাথ বললে, 'হ্যালো বউদি, জয়ন্তদা এখানে কফি খেতে এসেছে শুনেই ভটভটি নিয়ে চলে এলাম।—ইন্দ্রদা, এবার মাথা গুঁড়োল যার, সে নিজেই পাগল। বয়স তিরিশও ছাড়ায়নি। নার্সিংহোম থেকে পালিয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল ফুটপাতে। রাতের আতঙ্ক যথারীতি তার মাথার ঘিলু বের করে নিয়ে গেছে।'

'কোথায়?' নস্যি নেওয়া শেষ করে বললে ইন্দ্রনাথ।

'এখান থেকে মিনিট দশেকের পথ। যাবেন? ডেডবডি এখনও পড়ে রয়েছে।'

উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। সেইসঙ্গে আমি আর জয়ন্ত। ফ্যাকাশে মুখে বসে রইল কবিতা।

কিন্তু অতবেলা পর্যন্ত মড়া ফেলে রাখে না পুলিশ। ফটোগ্রাফাররা এসে পড়ার আগে লাশ পাচার হয়ে গেছে।

পুলিশের লাল মোটর সাইকেল দেখে ভিড় যেন আরও বাড়ল। ইঞ্জিন চালু রেখেই লোকনাথ বললে, 'মর্গে যাবেন?'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'তাই চল।

আমি বললাম, 'তাহলে আমি বাড়ি যাই।'

'গিয়ে পাঁঠার ঝোল খা আর বউ-এর মুখনাড়া,' বলে আমাকে ঠেলে বাইক থেকে নামিয়ে দিল ইন্দ্র।

লাশকাটা টেবিলে শোয়ানো মড়াটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, 'হাঘরের ছেলে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

সত্যিই তাই। করোটি গুঁড়িয়ে ঘিলু বেরিয়ে গেলেও চোখ-মুখের গড়নে শিক্ষাদীক্ষার ছাপ রয়েছে। গায়ের রং ময়লা হলেও চামড়ার কোথাও ময়লা নেই। গালে সামান্য দাড়ি—দিন কয়েক না কামানোর জন্যে। ঠোঁটের আর নাকের ধারে বুদ্ধির ছাপ রয়েছে।

লোকনাথ বলেছিল, 'কেয়াতলার তপোবন নার্সিংহোমে ছিল। মেন্টালি ডিরেঞ্জড। পকেটে কার্ড দেখে বুঝলাম।

'প্রথম তুই-ই দেখেছিলি।'

'হ্যাঁ। রাত দুটো নাগাদ। ঘণ্টা দুই আগেও পাক দিয়ে গেছি। একেও ঘুমোতে দেখেছি।'

'একা?'

'হ্যাঁ। ল্যাম্পপোস্টের তলায়। ও অঞ্চলে ফুটপাতের বাসিন্দা তেমন নেই।'

ইন্দ্রনাথ আর কথা না বাড়িয়ে থেঁতলানো করোটিটা খুঁটিয়ে দেখেছিল। এক ঘায়েই খুলি গুঁড়িয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে। মগজের গ্রে-ম্যাটার আর হোয়াইট ম্যাটার লাল রক্তের সঙ্গে মিশে বেরিয়ে এসেছে।

ইন্দ্রনাথ বলেছিল, 'পাথরটা?'

'পড়েছিল ডেডবডির পাশে।'

'তুই যখন প্রথম দেখেছিলি, তখন ছিল না নিশ্চয়।'

'মনে তো পড়ে না। রানিং বাইক থেকে অত দেখা যায় না।'

'দুটো নাগাদ চোখে পড়েছিল?'

'ডেডবডির বুকের ওপরেই ছিল যে।'

'সে পাথর এখন কোথায়?'

'চল, নিজে দেখবে।'

'যাচ্ছি।' বলে, মৃতদেহের ডানহাতটা তুলে নিয়ে কনুইয়ের ভেতর দিকে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। চেয়ে থেকেই বললে, 'খুনিকে আটকাতে গেছিল ভিকটিম।'

'কী করে বুঝলে?'

'পাথরের চোটে থেঁতলে গেছে শিরা-টিরাগুলো। মাথায় পাথর পড়েছে বুঝেই নিশ্চয় রুখতে গেছিল। হাত জখম হওয়ার পরেই মাথা গুঁড়িয়েছে।—আগের পোস্টমর্টেম রিপোর্টগুলো দেখা যাবে?'

'দেখবে? চলে এসো।'

একটার পর একটা রিপোর্ট পড়ে নিয়ে ফাইল নামিয়ে রাখল ইন্দ্রনাথ।

লোকনাথ বললে, 'কী বুঝলে?'

'নিহত হওয়ার আগে প্রত্যেকেই পাথর আটকানোর চেষ্টা করেছিল। কখনও বাঁ-হাত দিয়ে, কখনও ডান হাত দিয়ে।'

'অনুমানের কারণ থেঁতলানো কনুই?'

'কনুইয়ের ভেতর দিক।'—অর্থাৎ প্রত্যেকেই দেখেছে পাথর নেমে আসছে মাথার ওপর। রুখেছে। তবুও মরেছে। আশ্চর্য!'

'কেন?'

'একটা পাথর দেখাবি?'

'একটা কেন—সবক'টা দেখাব। খুনে পাথরের মিউজিয়াম তৈরি হচ্ছে বলেই তো

আমি পাগল হতে বসেছি, ইন্দ্রদা।'

'আমি এখনও হইনি।—চ।'

পাথরের মিউজিয়ামই বটে। তাকের ওপর সারি-সারি সাজানো পাথর। প্রত্যেকটার তলায় একটা কাগজ। তাতে লেখা কবে কোথায় কার ডেডবডির কাছে পাওয়া গেছে রক্তপিপাসু প্রস্তরকে। বেশির ভাগই মধ্য কলকাতায়। দুটি নর্থে। একটি সাউথে। এবং শেষেরটাই কাল রাতে উড়িয়েছে পাগলের প্রাণপাখি।

'ফিতে আছে?' বললে ইন্দ্রনাথ।

'ফিতে? কীসের ফিতে?' লোকনাথের প্রশ্ন।

'মাপবার ফিতে।'

মিউজিয়ামের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। টেবিলের সামনে গিয়ে ড্রয়ার টেনে ফিতে বের করে এনে দিলেন ইন্দ্রনাথের হাতে।

প্রতিটি পাথর মাপল ইন্দ্রনাথ।

বললে, 'কোনওটাই দেড়ফুটের বেশি লম্বা নয়, এক ফুটের বেশি চওড়া নয়, আড়াই ইঞ্চির বেশি পুরু নয়।—নিন, আপনার ফিতে। চলো হে লোকনাথ, বড় খিদে পেয়েছে।'

'তাহলে আমার ডেরাতেই খেয়ে নেবেন চলুন। আপনিও একা, আমিও একা।'

ঘর থেকে বেরোতে-বেরোতে মুচকি হেসে ইন্দ্রনাথ বললে, 'তুমি একা থাকতে যাবে কোন দুঃখে? কত প্রজাপতি উড়ছে তোমাকে ঘিরে।'

সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে হাসতে-হাসতে লোকনাথ বললে, 'ভালো চাকরি আর ভালো চেহারা থাকলে বিয়ে পাগলীদের অভাব হয় না, ইন্দ্রনাথদা। আপনি নিজেও তা জানেন।'

'জানি,' কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইন্দ্রনাথ, 'কিন্তু আমার মতো ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা তো তোমার নেই। গুজব যা শুনছি—'

'গুজব?' ঘাড় ফেরায় লোকনাথ। এখন তার চোখেও হাসি।

'তুমি নাকি ভীমরুলকে বিয়ে করবেই ঠিক করে ফেলেছ।'

প্রাণখোলা হাসি হেসে লোকনাথ বললে, 'ভোমরার নাম শেষপর্যন্ত ভীমরুল হয়ে দাঁড়াল আপনার কাছে?'

'কথা তো নয়—কটাস-কটাস হুল ফোটানো। ও মেয়েকে বিয়ে করলে পস্তাবে, লোকনাথ।'

'করছে কে?'

'তার মানে?' বাইকের সামনে থমকে গেল ইন্দ্রনাথ, 'কটাস-কটাস কপচানি মিঠে-মিঠে বুলির চেয়ে অনেক ভালো? সাচবাত কোনকালে মিঠে হয়? ভোমরা ভালো মেয়ে।'

কিক দিয়ে লোকনাথ বললে, 'নিঃসন্দেহে। কিন্তু বিয়ের বাঁধন এখন নয়।'

'তবে কখন?'

'খুনে পাথরের মালিককে ধরবার পর। আমার ইজ্জত ঢিলে করে ছেড়েছে হারামজাদা।'

ভোমরা কিন্তু সশরীরে হাজির ছিল লোকনাথের নিরালা আলয়ে। কালো কুচকুচে মেয়ে—একেবারে কালনাগিনী চেহারা। চোখমুখ যেন কাটারি দিয়ে তৈরি। তেমনি জিভের

ধার। জীনস-এর দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছোটবড় কোঁকড়ানো চুল ঝাঁকিয়ে বললে, 'স্বাগতম ভ্যামপায়ার!'

হেসে ফেলে বললে ইন্দ্রনাথ, 'দরজা বন্ধ অথচ ভেতরে তুমি, ব্যাপারটা কী কটকটি?'

'কটকটি কাকে বলছেন?'

'তোমাকে। তোমার নাম ভীমরুল, তোমার নাম কটকটি, তোমার নাম তেড়িমেড়ি—কালকুটি তো বলিনি।'

'কালকুটি!' সঙ্গে-সঙ্গে ফণা তুলে ফেলল কালনাগিনী।

'আহা! আহা! লোকনাথ তোমাকে আদর করে কালকুটি বলে ডাকতে পারে—কিন্তু আমি তো জানি কালো হিরে যদি কোথাও থাকে—তবে সে তুমি।'

'কালো হিরে তো কয়লা! আমি কয়লা?'

'কয়লাই তো সব গুণের আকর। কয়লার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে গোটা পৃথিবীর মোটা-মোটা ইনডাস্ট্রি!'

'কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না,' টিপ্পনী কাটল লোকনাথ।

আর যায় কোথায়! তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল ভোমরা। 'তুমি কী? তুমি তো রকবাজ, রিপ্টুবাজ, ভ্যানতারা ভ্যামপায়ার!'

কানে দু-আঙুল গুঁজে ইন্দ্রনাথ, 'মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে! একী গরম-গরম গালাগাল রে বাবা। মানেও তো জানি না। ভ্যানতারা ভ্যামপায়ার কেন হবে লোকনাথ?'

'সারারাত তো বৈঠকবাজি করে বেড়ায়! কাজের নামে অষ্টরম্ভা। ফেরেববাজ কোথাকার!'

'কিন্তু রকবাজি লাইফে করিনি,' হাসি-হাসি মুখে বললে লোকনাথ। বলতে-বলতে কোমরের রিভলভার সমেত বেল্ট-টেল্ট খুলে রাখল টেবিলে। 'কোনও বন্ধুই ছিল না ছেলেবেলায়, বাবা-মা মিশতেই দেয়নি।'

'এখন তো লুসিমিসিবাবারা লাইন দিয়ে আছে পেছনে,' কালনাগিনীর গলায় সত্যিই যেন এখন হিসহিসানি শোনা যাচ্ছে।

'যেমন তুই দিয়ে আছিস,' চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে-বসতে বললে ইন্দ্রনাথ, 'কিন্তু কুকুরের ল্যাজে যতই তেল দিয়ে মলো না কেন—ও ল্যাজ সিধে হবে না।—তাই না লোকনাথ? বিয়ে তো তুমি করবে না?'

'যাও বা করব-করব ইচ্ছে করেছিল, এইরকম ক্যাটক্যাটানি শুনে মন এখন পালাই-পালাই করছে।' শার্টের বোতামে হাত দিল লোকনাথ, 'রান্নাঘরে যাও না কালকুটি, দেখছ না জামা খুলছি?'

'ওরকম বুকের লোম অনেক দেখেছি!...ইস কী বলতে কী বলে ফেললাম।'

অট্টহেসে ঘর ফাটিয়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, 'এই জন্যেই তো তোর ভাবী স্বামী বলে, তোকে বিয়েই করবে না।'

'ইস! আমি ছাড়া ওর গতি-ই নেই। জানেন না তো মেয়ে মহলে ওর কি নাম।'

'কী নাম রে?'

'রূপকুমার দ্য ইমপোটেন্ট।'

'ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ? তা তুই-ই গণ্ডাখানেকের মা হয়ে দুর্নামটা ঘুচিয়ে দিস।'

'দেবই তো। সেই জন্যেই তো ঘুরঘুর করছি। রূপকুমার অবশ্য বস্তা-বস্তা চিঠি লিখেই যাচ্ছে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গর সই জাল করে—'

'মানে?'

'অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গকে চেনেন না? আপনি আর কী করে চিনবেন। আমার তিন স্তাবক—লাভারও বলতে পারেন—যদিও আমি লাভ-টাভ করি না—শুধু মিশি।'

'শুধু—মিশিস?'

'পারমিসিভ সোসাইটি না? সবার সঙ্গে মিশতে হয়—সবার সঙ্গে ঘুরতে হয়—কিন্তু কারও কোলে ধরা দিতে নেই।'

'শুধু রূপকুমার ছাড়া—'

'ইয়েস, স্যার। তারপর শুনুন—অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গকে খুব নাচিয়ে চলেছি—আর নিজে নেচে চলেছি এই কলির কেষ্টটার সঙ্গে—ইনি কী করেন জানেন? শুনলে ফের কানে আঙুল দেবেন...অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গর নামে বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি চিঠি লেখে আমার কাছে—আমি তো চিঠি পেয়েই তেড়ে গিয়ে ধরেছিলাম তিনজনকে। তিনজনেই বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদেরই হাতের লেখা, সইগুলোও হুবহু এক—তবে মা কালীর দিব্যি—আমরা লিখিনি। তবে কে লিখেছে? ওরা ফের মা কালীর দিব্যি গেলে বললে, 'রূপকুমার। রূপকুমার! জালিয়াতি নম্বর ওয়ান! তাই তো এসেছিলাম হেস্তনেস্ত করতে। এসব কী হচ্ছে—হ্যাঁ-কী হচ্ছে?'

লুঙ্গি পরতে-পরতে লোকনাথ বললে, 'ওরা বলল আমি জালিয়াত?'

'তবে না তো কি ভগবান? তুমিই বলোনি আমাকে ছেলেবেলায় বাবার সই জাল করে মাস্টারদের ধোঁকা দিয়েছ?'

'বেশ করেছি।'

'কোনটা বেশ করেছ? অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গকে ভড়কি দেওয়া, না, বাবার নাম ডুবোনো?'

'বাবার নাম ডুবোব কোন দুঃখে? অঙ্কের ক্লাসের চাইতে গানের ক্লাস ভালো লাগত বলেই সই জাল করেছি।'

মিটিমিটি হাসতে-হাসতে ইন্দ্রনাথ বললে, 'কালকুটি, থুড়ি, কটকটি, তুই-ই বা অত খাপ্পা হয়ে যাচ্ছিস কেন? কোন পুলিশের লোক এরকম গান-পাগল হয় রে? ও হে লোকনাথ, মোজার্ট শোনাও, বিঠোফেন রবিশঙ্কর শোনাও, বিসমিল্লা শোনাও—যা হয় একটা কিছু শোনাও—নইলে কালনাগিনী তোমাকে ছোবল মেরেই যাবে।'

'ঢোঁড়া সাপের বিষে আমার কচু হবে,' বলে একটা ক্যাসেট বেছে নিয়ে স্টিরিওতে ঢুকিয়ে দিল লোকনাথ। ঘর গমগম করে উঠল পাগল-করা সুরের ইন্দ্রজালে। সঙ্গে-সঙ্গে চোখের তারা ছোট হয়ে এল ভোমরার।

বললে অন্য সুরে, 'এই সুরটাই সেদিন তুমি অর্গ্যানে তুলছিলে না?'

লোকনাথের চোখেও যেন ঘোর লেগেছে। গলার স্বরে তার রেশ ভেসে ওঠে, 'হ্যাঁ, মোজার্টের সব চাইতে ফেমাস সুর। যতবার শুনি মনে হয় আমি এ জগতে আর নেই।'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'আপাতত এই জগতেই থাকো—কেন না আমার খিদে পেয়েছে।'

'তাই তো...তাই তো...খিদে নিয়েই তো আপনি এসেছেন...ভোমরা, ও ভোমরা...দুটো ভাত ফুটিয়ে দেবে...মাংস করাই আছে ফ্রিজে।'

'আমি পারব না।'

'তবে আমার গিন্নি হবে কী করে?'

'ওঃ! গিন্নি হব কি তোমার রাঁধুনিগিরি করবার জন্যে! সিলি! তোমাকে চোখে-চোখে রাখতে হবে না?'

'ঠিক যেমন এখন রেখেছিস, বলে ইন্দ্রনাথ, 'এখনও কিন্তু বলিসনি—ঘরে ঢুকলি কী করে? নাইটল্যাচের চাবি নিশ্চয় কাছে রাখিস?'

ঠোঁট উলটে ভোমরা বললে, 'রাখতে হয় বইকি। নাইট বার্ডকে ফলো করার জন্যে অনেক কিছুই করতে হয়।'

'বেশ...বেশ...সেই জন্যেই রূপকুমারের বুকের লোম পর্যন্ত চেনা হয়ে গেছে।'

'অসভ্য!' ঠিকরে গিয়ে ফ্রিজ খুলল ভোমরা এক ঝটকায়, 'এই তো রয়েছে ব্রেড, এই তো রয়েছে মুরগির কারি—আর কী চাই? এসো, বোসো হে রূপকুমার।'

লোকনাথ বললে, 'আগে গেস্ট দুজনের উদর ঠান্ডা হোক—আমি আসছি টয়লেট ঘুরে। হোল নাইট—'

'লাম্পট্য করে এসেছ, এই তো? নিশাচর বাদুড় কোথাকার।' বলে ঘটাং-ঘটাং করে টেবিল সাজাতে শুরু করল ভোমরা।

ইন্দ্রনাথ নস্যির ডিবে খুলতে-খুলতে ঘরের জিনিসপত্র দেখতে লাগল। পুলিশম্যানের ন্যাড়া ঘর। দেওয়ালের তাকে খানকতক বই আর ম্যাগাজিন, একটা ইংরেজি বই হেগ-এর জীবন-কাহিনি। একটা কালো ট্রাঙ্ক—কাঠের টেবিলের ওপর। সিঙ্গল খাটের সাদা চাদর লাটঘাট হয়ে রয়েছে। ঘরের কোণে টানা দড়িতে ঝুলছে পুলিশি জামাপ্যান্ট। নিচে একটা টুল। টুলের তলায় একটা বড় মুখ কাচের জার, তার মধ্যে তরল পদার্থে চর্বির মতো কী যেন ভাসছে। হেঁট হয়ে জারটা টেনে নিয়ে গন্ধ শুঁকে ইন্দ্রনাথ বললে, 'অ্যাসিড।'

ভোমরা বলে উঠল, 'কলতলার জিনিস, কলতলায় রাখলেই হয়। এত অগোছালো ইন্দ্রদা, কী আর বলব, এ লোককে কে বিয়ে করবে?'

'কেউ নেই বুঝি?'

'আমি তো আছি। কিন্তু খালি ল্যাজে খেলছে। আপনিই বলুন, জোয়ান মানুষের জোয়ানী না থাকলে মানায়?'

খাটের ওপর বসতে-বসতে ইন্দ্রনাথ বললে, 'তোদের মধ্যে মিল আছে একটা জায়গায়।'

'কোন জায়গাটায়?' পাউরুটি কাটতে-কাটতে বললে ভোমরা।

'তোরা দুজনেই পাগল।'

'আমার চোদ্দোপুরুষ পাগল নয়।'

'কিন্তু তুই বদ্ধ পাগল। পয়লা নম্বর বিয়ে-পাগল, আর তোর ভাবীবর গান-পাগল।'

অমনি চোখে ঘোর এসে গেল ভোমরার, 'তা যা বলেছেন দাদা—এই কাঠখোট্টা বেটনবাবু—খোদ রবিশঙ্কর হয়ে যায় ক্লাসিক্যাল মিউজিক শুনলেই। আমারও অবশ্য তাই হয়।'

'সুতরাং পাগলে-পাগলে মিলবে ভালো।'

বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে-মুছতে লোকনাথ বললে, 'আপনার পাগলি বোনকে বলে দিন খাওয়া-দাওয়ার পর যেন কেটে পড়ে—টেনে ঘুম দিতে হবে।'

সটাৎ করে ফণা তুলে ফেলল কালনাগিনী, 'বয়ে গেছে তোমার সঙ্গে দুপুর কাটাতে।'

খাওয়ার টেবিলের চেয়ার টানতে-টানতে ইন্দ্রনাথ শুধু বলল—'নারদ! নারদ!'

গভীর রাত। শহরের পথগুলো এখন খাঁ-খাঁ করছে বললেই চলে। মাঝেমধ্যে একটা করে ট্যাক্সি উড়ে যাচ্ছে। তারপরেই আবার নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে চারদিক।

নৈঃশব্দ্য ভাঙল একটা মোটর সাইকেলের আওয়াজে।

ধীর গতিতে রাস্তা কামড়ে ধরে গড়িয়ে যাচ্ছে চাকাদুটো। একচক্ষু দানবের চোখ জ্বলছে—অমাবস্যার রাতে আরও ধকধকে মনে হচ্ছে সেই চোখকে। মোড় ঘুরে দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল দ্বিচক্রযান।

প্রায় নিঃশব্দে গড়িয়ে আসা মারুতিটাকেই দেখা গেল এরপরেই। হেডলাইট জ্বলছে না। টিমটিমে সাইডলাইট দুটো কোনওরকমে নিয়মরক্ষে করে চলেছে।

আচমকা ব্রেক কষেই বাঁয়ের গলিতে ঢুকে গেল ডিপ গ্রিন কালারের মারুতি।

মোটর সাইকেলের আওয়াজটা শোনা গেল তারপরেই। একটু আগেই যেদিকে অদৃশ্য হয়েছিল একচক্ষু ধীরগতি দ্বিচক্র দানব—এখন সেইদিক থেকেই উল্কাবেগে ধেয়ে আসছে এই মোটর সাইকেল। আওয়াজের গভীরতা একই। থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হর্সপাওয়ারের এ মডেল একটা কোম্পানিই তৈরি করে ইন্ডিয়ায়।

মোড় ঘুরেই গতি কমে এল মোটর সাইকেলের। আস্তে ব্রেক কষল ল্যাম্পপোস্টের পাশে। চালক নেমে দাঁড়িয়ে স্ট্যান্ডে তুলে দিল ভারি যন্ত্রযান। পেছনের চাকার পাশের বাক্সে লাগাল চাবি।

ল্যাম্পপোস্টের অত্যাধুনিক আলোয় বড় লোলুপ, বড় তৃষিত মনে হচ্ছে লোকটার দুই চক্ষু। চোখের পাতা তার পড়ছে না। শিকারি শ্বাপদের মতোই অনিমেষে চেয়ে রয়েছে ফুটপাতে নিদ্রিত বাসিন্দাটির দিকে। বয়স তার অনেক, এক মুখ দাড়িগোঁফ—সবই সাদা। ময়লায় জট পাকানো চুলও সাদা। সুতো দিয়ে বাঁধা পুরু লেন্সের চশমাটা সযত্নে রেখেছে একরাশ বইয়ের পাশে। এই সেই পণ্ডিত পথের পাগল যার ছবি কিছুদিন আগে বেরিয়েছিল খবরের কাগজে। সারাদিন রোদে বই মেলে পড়ে হেঁট হয়ে—রাতে ল্যাম্পপোস্টের আলোয় —তারপর ঘুমোয় ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত। অজাতশত্রু এই গ্রন্থকীটের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে যমালয়ের দূত....

বাক্স খুলে গেছে। ঘুমন্ত উন্মাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বাক্সের মধ্যে থেকে একটা পাথর টেনে বের করল নিশাচর পিশাচ। এখন জ্বলছে তার চোখ—দুর্নিবার আকাঙক্ষা উদগ্র হয়ে উঠেছে শিরায় উপশিরায়।

পাথরটা লম্বায় দেড় ফুটের বেশি নয়, চওড়ায় এক ফুটের বেশি নয়, আড়াই ইঞ্চির বেশি পুরু নয়। বলিষ্ঠ দুই লোমশ হাতে পাথর ধরে মোটর সাইকেলকে পাক দিয়ে ঘুমন্ত বৃদ্ধের দিকে এগোল রাতের আতঙ্ক...

আচমকা দুটো বলিষ্ঠতর হাত ছোঁ মারল পেছন থেকে।

ছিনিয়ে নিল পাথর। একই সঙ্গে আগন্তুকের চামড়ার হোলস্টার থেকে ছিনতাই হয়ে গেল রিভলভার।

নল ঠেকল তারই পিঠে।

পাথর কঠিন কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল কানের কাছে, 'ঢের হয়েছে ভ্যামপায়ার—সিরিঞ্জটা এবার দাও।'

কবিতা বললে, 'আঁচ করলে কী করে?'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'ক্যালকুলেশন করে।'

'ধুত্তোর তোমার ক্যালকুলেশন। ঝেড়ে কাশো, ঠাকুরপো।'

'আর্থার লা বার্ন-এর লেখা 'হেগ—দ্য মাইন্ড অফ -এ মার্ডারার' বইখানা তাকে যখন দেখালাম, কাচের জারে যখন অ্যাসিডে চর্বি ভাসতে দেখলাম—তখনি আমার সন্দেহের প্রমাণ পেয়ে গেলাম।'

'আরে গেল যা। সন্দেহটা তোমার মাথায় এল কী করে?'

'বউদি, এই জন্যেই বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন, মেয়েদের মগজের ওজন পুরুষদের চেয়ে কম।...হ্যাঁ, হ্যাঁ, বডি ওয়েটের সঙ্গে রেসিও-টা ঠিকই আছে...কী বলছিলাম? সন্দেহ...হেগ একখানা উপন্যাস পড়ে আর জনাকয়েকের জীবনী জেনে ঠিক সেইরকমই হতে চেয়েছিল। হেগ-এর মতোই হাতের লেখা নকল করতে পোক্ত ছিল রাতের আতঙ্ক, হেগ-এর মতোই ছেলেবেলায় তার বাবা-মা সমবয়সিদের সঙ্গে তাকে মিশতে দেয়নি। হেগ-এর মতোই সে সঙ্গীতপাগল, সুদর্শন, রমণীপ্রিয় অথচ বিবাহে নারাজ। সুতরাং হেগ তাকে ইন্সপায়ার করেনি তো? বাড়িতে দেখলাম হেগ-এর চাঞ্চল্যকর জীবন-কাহিনি, দেখলাম কাচের জারে সালফিউরিক অ্যাসিডে ইঁদুর গলানোর চিহ্ন—হেগও এইভাবে প্র্যাকটিস করেছিল...ঠিক এইভাবে সালফিউরিক অ্যাসিডে ইঁদুর ফেলে দিয়ে দেখত গলে যায় কীভাবে...শুধু একটা ব্যাপারে মোডাস অপারেন্ডি-তে ইমপ্রুভমেন্ট দেখিয়েছিল রাতের আতঙ্ক...হেগ রক্ততৃষ্ণা মেটাত শিরা কেটে গেলাস ভরে রক্ত নিয়ে...আমাদের এই রক্তলোলুপের তৃষ্ণা মিটত সিরিঞ্জ ভর্তি রক্ত টেনে নিয়ে—কনুইয়ের কাছে শিরা থেকে—তারপর পাথর দিয়ে থেঁতো করে দিত ছুঁচ ফোটানোর চিহ্ন।'

নিরক্ত মুখে কবিতা বললে, 'কিন্তু ওকেই ঠিক সন্দেহ করলে কেন? কেন রাতের-পর-রাত মারুতি নিয়ে পেছনে লেগেছিলে?'

'কী বুদ্ধি! এখনও ধরতে পারলে না? সর্ষের মধ্যে ভূত থাকলে সেই সর্ষে পোড়ায় ভূত পালায় কি? রক্ষক যদি ভক্ষক হয়—আইন কি রক্ষে পায়? ভারি পাথর নিয়ে কোনও খুনি কি আজ সেন্ট্রাল, কাল নর্থ, পরশু সাউথে খুন করে বেড়াতে পারে? পাথরগুলো মাথায় বয়ে নিয়ে গেলেও তো টহলদার ট্রাফিক সার্জেন্টদের চোখে পড়বে? তবে কী করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মারণ প্রস্তর হাতিয়ার? রক্ষকদের বাহনে নয় তো? কিন্তু এক এরিয়ার ট্রাফিক সার্জেন্ট অন্য এরিয়ায় যায় কী করে? আজ মধ্য, কাল উত্তর, পরশু দক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে কী করে? সারা শহরে টহল দিয়ে বেড়ানোর এমন অবাধ অধিকার থাকে কার? এমন একজন অফিসারের যার কাজের পরিধি সারা শহর জুড়ে। খোঁজ নিয়ে জেনে গেলাম, ঠিক যে-যে রাতে পাথর নেমে এসেছে পথের ঘুমন্ত মানুষের মাথায়—ঠিক সেই-সেই রাতে নাইট ডিউটি নিয়ে শহর তোলপাড় করেছে আমাদের এই রাতের আতঙ্ক...রক্ততৃষ্ণায় গলা টা-টা করলেই সে বুকপকেটে সিরিঞ্জটা আর মোটর সাইকেলের মেট্যাল বক্সে পাথর ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত মনের মতো শিকারের খোঁজে...প্রথমে দেখে যেত...তারপর ফিরে আসত...মনের মতো পাথরগুলো পেত কোথা থেকে? একটাই জায়গা থেকে...ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাশের পাশে নতুন বাড়িঘরদোরের জন্য এনে রাখা পাথরের গাদা থেকে...ভোমরা কি জানে? নিশ্চয় জানে...বিষে বিষক্ষয় হয়েছে...ভাবী বরের

বিকট পাগলামির খবর পেয়ে ওর উৎকট বিয়ের পাগলামি সেরে গেছে....এখন চলি, বউদি...ফির মিলেঙ্গে।*

কাহিনি-কল্পনার মূলে আছে যে অব্যাখ্যাত রহস্য, সবাই তা জানেন। তথ্য বর্ণনা এবং চরিত্র-চিত্রায়ণ একেবারেই মনগড়া নিছক গল্পের খাতিরে। কোনও ব্যক্তি বা দপ্তরের প্রতি তির্যক শর নিক্ষেপের তিলমাত্র অভিলাষ নেই। উদ্দেশ্য একটাই—পাঠকের চিত্ত বিনোদন।

**'কোলফিল্ড টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত (শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯৭)*

পাঁচ তারার প্যাঁচ

॥ মাধুরী ॥

কবিতা বললে, 'ঠাকুরপো কী ভাবছ?'

দোরগোড়া থেকেই দেখছিলাম, শিবনেত্র হয়ে রয়েছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। কড়িকাঠের দিকে চেয়ে রয়েছে। চাহনি কড়িকাঠ ভেদ করে ঊর্ধ্বলোকে প্রস্থান করেছে।

অর্থাৎ ও ভাবছে। বড় সোফায় আড় হয়ে শুয়ে, কনুইয়ের ওপর চিবুক ন্যস্ত করে, চিন্তালোকে অবস্থান করছে।

ভাবমগ্ন ইন্দ্রনাথকে আমি কখনও ঘাঁটাই না। কবিতা কিন্তু অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। ঠিক এই মুহূর্তগুলোর মওকা পেলে ও কখনও ছাড়ে না। খোঁচা মারবেই। দেওর-বউদির এহেন সম্পর্ক ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে বঙ্গ যুবসমাজে। রাজনীতির উত্তাপে বোধহয় সব শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে।

ঊর্ধ্বলোক থেকে নেত্রযুগলের দৃষ্টিকে মর্ত্যে টেনে নিয়ে এল ইন্দ্রনাথ। ধড়মড় করে উঠে বসল। আকর্ণ হেসে বললে, 'কি সৌভাগ্য! একেবারে হরগৌরী যে।'

আমরা যেখানেই যাই, দুজনে মিলেই যাই। আমি বউকে ছেড়ে থাকতে পারি না, আবার বউও আমায় ছেড়ে থাকতে পারে না। এটা এখন বিশ্ববিদিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্ত্রৈণ বদনামও জুটেছে। জুটুক।

ইন্দ্রনাথের এই সুভাষ সরোবরের গাছপালায় ঘেবা নিবিড় নিকুঞ্জে ফি হপ্তায় দুজনে আসি। ব্যাচেলর বন্ধুকে সঙ্গে নিই, জানলা খুলে লেকের জল দেখি, মোলায়েম হাওয়া ভক্ষণ করি, কবিতা সেই ফাঁকে ব্যাচেলরের ঘরদোর গুছিয়ে দেয়, রান্নাঘরের অবস্থা দেখে নেয়, ভালোমন্দ রেঁধেও দেয়। কোথায় বালিগঞ্জ, আর কোথায় বেলেঘাটা—ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস হয়ে যাওয়ার পর যাতায়াতের অসুবিধেটা ঘুচেছে।

প্রতি সপ্তাহে চৌকাঠ পেরোনোর পরেই ইন্দ্র ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টিটকিরিটা ছুঁড়ে মারে আমাদের লক্ষ্য করে। কিন্তু তখন যে হাসিটা ওর চোখমুখকে ভাসিয়ে দেয়, তা আনন্দের হাসি, ওর হীরে-চোখ ঝিকমিক করে ওঠে, গলার আওয়াজে খুশি উপচে পড়ে। ওর নিঃসঙ্গ

ঊষর জীবনে আমরা দুজনে যে দু-ফোঁটা বৃষ্টির জল।

সেই রবিবারের সকালেও আমি ওর টিটকিরি শুনলাম—এ কান দিয়ে ঢোকালাম, ও কান দিয়ে বের করে দিলাম।

কবিতা কিন্তু পায়ে-পায়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। চোখে চোখ রেখে বললে, 'বুঝেছি, পরীর ধ্যান করা হচ্ছে।'

কপট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ইন্দ্রনাথ বললে, 'নিখাদ উক্তি। হ্যাঁ, আমি একটা পরীর কথা ভাবছি।'

'মানুষ পরী?' ওর পাশে বসে বললে কবিতা।

'হ্যাঁ। দুটো ডানা কেবল নেই। কিন্তু কী রূপ, কী রূপ বউদি, দেখলে তোমার হিংসে হত।'

রূপসী কবিতা তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। বললে 'সে কোথায় থাকে?'

'ব্যারাকপুরে।'

'কী করে?'

'টিউশানি।'

'কত বয়স?'

'চব্বিশ।'

'সে কেন তোমার কাছে আছে?'

'তার একটা প্রবলেম নিয়ে।'

'কী প্রবলেম?'

'বিয়ের।'

'কাকে বিয়ে করতে চায়?'

'ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে।'

'ম্যানেজারের মতলবটা কী?'

'সেইটাই ধোঁয়াটে।'

'মেয়েটিকে সে ভালোবাসে?'

'প্রাণ দিয়ে।'

'তবে আর প্রবলেমটা কোথায়?'

'সে আরও একটা মেয়ের সঙ্গে ঘোরাফেরা করছে।'

'সেকী! ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মার অমন ম্যানেজারকে। এনে দাও আমার সামনে—খেংড়ে বিষ ঝেড়ে দিচ্ছি।'

'ঝাঁটা চালানোর অস্ত্রবিদ্যা লুপ্ত হতে চলেছে বঙ্গদেশ থেকে। তোমার যদি এখনও জানা থাকে, তাহলে মেয়ে পুলিশদের শিখিয়ে দিও বউদি। কিন্তু এটা ঝাঁটার কেস নয়।'

'তবে?'

ঘড়ি দেখল ইন্দ্রনাথ। সমকোণে কাঁটা দুটো দাঁড়িয়ে আছে নয় আর বারোর ঘরে।

বললে, 'এ কাহিনী রূপসি নায়িকাকে আসতে বলেছিলাম ঠিক ন'টায়। টাটকা রিপোর্ট নেওয়ার জন্যে। তোমাদের দেখানোর জন্যে। ত্রিভুজ প্রেমের গোলমালে মাথা গলাতে আমার ইচ্ছে নেই। তুমি গোয়েন্দা লেখকের বউ। অতএব, নিজেও গোয়েন্দানি। তাই তোমরা যখন আসবে, তাকে আসতে বলেছি। ইচ্ছে হলে, কেসটা তুমি টেক-আপ করতে পারো। আমি

টায়ার্ড। কোনও পুরুষ যদি দুটো গার্ল ফ্রেন্ডকে খেলিয়ে যায়, তাতে আমার কী? বাজার যাচাই করে নেওয়ার অধিকার সবার আছে।'

'ছিঃ। নারী জাগরণের যুগে তুমি মেয়েদের পণ্যদ্রব্য মনে করতে পারলে? মেয়েরা কি আলু-পটল মাছ-মাংস? যাচাই যে করতে চায়, খেঁংড়ে তার—'

'বউদি সে এসেছে।'

লোহার গেট খোলার আওয়াজ শুনলাম। চটির চটাস-চটাস শব্দ হল। একটা সময় ছিল যখন, দূরায়ত নূপুরনিক্কণ শুনে চিত্ত চঞ্চল হত। মেয়েরাও জানত, সলাজ চরণধ্বনি শুনিয়ে বুক দুলিয়ে দেওয়ার কৌশল। জানত, অপাঙ্গ চাহনির ম্যাজিক। আজকালকার মেয়েরা বড্ড পুরুষালি হয়ে গেছে। ফুল আছে, ফুলের সুবাস নেই। এটা ওয়েস্টার্ন কালচারের প্রভাব। হিন্দি ফিল্মের ধাক্কা।

উঠোন পেরিয়ে, সিঁড়ির ওপর দিয়ে, চটাস-চটাস শব্দ এসে পৌঁছল দরজার সামনে। বুঝি এক টুকরো জ্যোৎস্নার আবির্ভাব ঘটল সেই মিষ্টি সকালে।

বাংলার মেয়েদের সম্বন্ধে একটু আগে আমি যা ভাবছিলাম, তার সংশোধন দরকার হয়ে পড়ল মেয়েটিকে দেখে। টাকাপয়সার চিন্তা নিয়ে যেদিন থেকে মেয়েরা পথে বেরিয়েছে —সেদিন থেকেই পুরুষের সঙ্গে তাদের টক্কর লেগেছে। ফলে, নমনীয়তা কমনীয়তা লাবণ্য লজ্জা ইত্যাদি ভালো-ভালো বিশেষণগুলো যেন মেয়েদের চেহারা থেকে উবে যাচ্ছে। রুক্ষ বাস্তব উবিয়ে দিচ্ছে Essential Essence গুলো।

কিন্তু এই মেয়েটি তার ব্যতিক্রম।

এর সারা শরীরের স্নিগ্ধতা যেন আরকের মতোই তাজা রয়েছে। পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকালে মন যেমন জুড়িয়ে যায়, এর নরম চোখ দুটোর দিকে তাকালেও সেই রকম একটা আবেশ শরীরে মনে জড়িয়ে যায়। রং ফরসা হলেই সব মেয়ে সুন্দরী হয় না, কিন্তু এ মেয়েটি ফরসা বটে, সুন্দরীও বটে। অথচ প্রসাধনের বাহুল্য নেই। এমনকি কানে দুল পর্যন্ত নেই। কব্জিতে শুধু একটা সরু ঘড়ি। পরনে হালকা গোলাপি রঙের তাঁতের শাড়ি। ব্লাউজও সেই রঙের। কিন্তু কাটছাঁটের মধ্যে দরজির আধুনিকতা দেখা দেয়নি। পায়ে রবারের হাওয়াই স্লিপার—তাই এত চটাস-চটাস আওয়াজ হচ্ছিল।

সে নিশ্চয় আশা করেছিল, ঘরের মধ্যে শুধু ইন্দ্রনাথ থাকবে। তাই আরও দুটি প্রাণী তার দিকে ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে রয়েছে দেখে একটু থতমত খেয়ে গেল।

আকৃতিতে কিছুটা পল্লীবালার মতো হলেও আচরণে সে তা নয়। মুহূর্তেই দ্বিধা খসিয়ে ফেলে দুহাত তুলে নমস্কার করল আমাদের তিনজনকেই।

বললে নরম গলায়, 'আসব?'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'আসবেন না তো কি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন? আপনার কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ। বসুন ওইখানে। বউদি, এঁর কথাই তোমাকে বলছিলাম। মাধুরী ঘোষদস্তিদার। আর এই যে দুটি মূর্তিকে দেখছেন মিস ঘোষদস্তিদার, এঁদের একজন আমার সাহিত্যিক বন্ধু মৃগাঙ্ক রায়—আর একজন তাঁর সারাজীবনের অপধর্মের সঙ্গিনী—ম্যাডাম কবিতা রায়।'

কবিতা বললে, 'আহা কথার কী ছিরি। বসো ভাই, তোমার নামটা এক্ষুনি শুনলাম। বেশ নাম। এ নাম তোমাকে মানায়। তোমার প্রাইভেট লাইফের প্রবলেম একটু জেনে ফেলেছি বলে লজ্জায় পড়ে যেও না। আমাদের এই তিনজনের মধ্যে কোনও কথাই চাপা থাকে না। প্রত্যেকে প্রত্যেককে কনসাল্ট করি, অ্যাডভাইসও দিই। তোমার ভাবী বর নাকি আর

একটা মেয়ের সঙ্গে লটঘট করে বেড়াচ্ছে?'

একটু রাঙা হল মাধুরীর ফরসা গাল। দেখে বেশ লাগল। আজকালকার মেয়েরা লজ্জায় রাঙা হতে ভুলে গেছে। রাঙা হওয়াটা মেয়েদের একটা প্লাস পয়েন্ট। মাধুরী তা জানে।

চোখ নামিয়ে নিয়ে সেকেন্ড কয়েক পরে সে বললে, 'হ্যাঁ।'

'ঠাকুরপোর সামনে যা বলতে পারোনি, তা আমার সামনে বলো। দরকার হলে চলো পাশের ঘরে যাই—'

'তা দরকার হবে না,' মাধুরী এবার চোখ তুলেছে।

এতটুকু নার্ভাস নয় সে। দু-হাত রেখেছে দু-হাঁটুর ওপর। আঙুলে আঁচল পাকাচ্ছে না। বরং মেরুদণ্ড সোজা। সরল চোখ সোজা তাকিয়ে রয়েছে কবিতার দিকে, 'কোনও অন্যায় তো করিনি যে আড়ালে কথা বলব।'

এত সোজা কথা এত সরলভাবে যে বলতে পারে, তার মনে পাপ থাকতে পারে না।

কবিতা হেসে ফেলল, 'এত রূপ নিয়ে মনের মানুষকে একা দখলে রাখতে পারছ না? সে কি তোমার চেয়েও রূপসী?'

একটু বুঝি অন্যমনস্ক হল মাধুরী—'সে অনেক স্মার্ট। তা হোক। কাজের জায়গায় ছেলেদের মিশতেই হয় মেয়েদের সঙ্গে। তা নিয়ে আমি ভাবি না।'

'তবে ভাবছ কী নিয়ে?'

অন্যমনস্ক ভাবটা সরে গেল চোখ থেকে। স্পষ্ট উচ্চারণে থেমে-থেমে মাধুরী বললে, 'রঞ্জন বেনামে হোটেলে ঘর নিয়েছে কেন? কেন অফিস থেকে বেরিয়ে সেই হোটেলে গিয়ে ওঠে? কেন সেখানে গেলে আর তাকে দেখা যায় না?'

রঞ্জনের পুরো নাম কুমুদরঞ্জন ঘোষ। মাধুরী ওকে শুধু বলে, রঞ্জন। বলে, তুমি শুধু রং লাগিয়েই গেলে আমার মনে—তোমার মনেও কোনও রং নেই, শরীরে তো নেই-ই।

মানুষটাকে মাধুরী খুব ছোটবেলা থেকে দেখছে বলেই এত স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলতে পারে। প্রেমের প্রথম পর্যায়ে যে মেয়ে ভালোবাসার মানুষটাকে বলে বসে, ওগো তোমার শরীরে কোনও রং নেই—তার মতো মূর্খ মেয়ে ভূভারতেও আর নেই।

কিন্তু মাধুরী-রঞ্জনের প্রেম তো আজকের নয়। শরীরের রং যখন দুজনের কারোরই ছিল না—তখন থেকেই রং ধরেছে মনে। বড় পাকা রং, মলেও এ রং উঠবে না।

তাই রঞ্জনের শরীর নিয়ে অত ঠাট্টা করে মাধুরী।

ঠাট্টা করার মতো শরীরও বটে রঞ্জনের। শুধু তালপাতার সেপাই বললে কম বলা হয়। মুখের গড়ন লম্বাটে, চুলের কোনও বাহার নেই। নেই জামাকাপড়ের ছিরিছাঁদ। একটা ঢলঢলে সাদা বুশশার্ট, আর ততোধিক ঢলঢলে সাদা ফুলপ্যান্ট।

ওস্তাগর তার শ্রীহস্তের পরশ বোলালে তালপাতার সেপাইয়ের অঙ্গেও কিঞ্চিৎ সুষমা এনে দিতে পারত, কিন্তু রঞ্জন দরজির সঙ্গে আড়ি করেছে অনেকদিন। কেনাজামা আর প্যান্ট দেদার পাওয়া যায় এবং অনেক সস্তাতেও হয়—অতএব কেন বেশি খরচ করতে যাবে?

মাধুরী ওকে অনেক বলেছে, দ্যাখো, এটা দ্যাখন-এর যুগ। আগে বাইরেটা দেখাও, তবে তো লোক তোমার ভেতরটা দেখতে কাছে আসবে।

রঞ্জন ওর বিখ্যাত দাঁত বের করে হেসে-হেসে বলে, 'আরে রাখো তোমার মেয়েলি লজিক। আমি কি মেয়েছেলে যে নিজেকে সাইনবোর্ড করে রাখব? সোনার আংটি যদি বেঁকাও হয়—কাঞ্চন-শিল্পী তার কদর করে। যে করে না, সে সোনা চেনে না—তার কাছে আমি যেতেও চাই না।'

চিরকালই এমনই ফটর-ফটর বুকনি ছেড়ে এসেছে রঞ্জন। মুখে কোনও কথা আটকায় না। লম্বাটে করোটি দেখে ছেলেবেলায় বাড়ির মেয়েরা হাসাহাসি করত—কিন্তু চুপ মেরে যেত করোটির গ্রে সেল-দের কেরদানি দেখলে। একরত্তি ছেলের জিভ তো নয়—যেন শানানো ক্ষুর! ব্রেন তো নয়—যেন টগবগে লাভা। একটুও না রেগে এমন আঁতে ঘা মেরে কথা বলে যেত রঞ্জন—পাড়াপড়শি থ হয়ে যেত। গালে হাত দিয়ে বলত—এ ছেলে কিছু একটা হবে। বাব্বা, এত কথা শিখল কোত্থেকে?

কথায় রঞ্জনের সঙ্গে কেউ পেরে ওঠেনি—আজ পারে না। শুধু কথার ধোকড় নয়—বুদ্ধিতেও চৌকস। বীরভূমের ছেলেদের ধমনীতে বীর রস থাকবে—এটা স্বাভাবিক। শৌর্য বীর্য তাই কথাতেও ফুটে বেরোয়—দুনিয়ার কারও সে ধার ধারে না—জিভ ছোটালেই সেটা হাড়ে-হাড়ে টের পাওয়া যায়।

তার আগে নয়। তখন সে শান্তশিষ্ট, অমায়িক হাস্যবিশিষ্ট এক অতি সজ্জন পুরুষ।

কাঠি দিলেই কিন্তু সে অন্য পুরুষ। তখনও সে হাসে। হাসিতে তখন থাকে মিছরির ছুরি। বচনে থাকে লাভার ফুলকি।

শান্তিনিকেতনের হস্টেল লাইফে এই বচনের ক্ষুর চালিয়ে তছনছ করে ছেড়েছিল রঞ্জন। খোদ প্রধানমন্ত্রীও এক ঘরে এক মাদুরে সামনাসামনি থই পাননি। ভাঙা-ভাঙা বাংলায় ধমকেছেন। শেষে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন। প্রধানমন্ত্রীত্ব যাঁকে করতে হয়, তাঁকে সবসময়ে তো সোজা পথে চলানো যায় না—

রঞ্জন কিন্তু সটান পথের পথিক। ওই তোমার লক্ষ্য—মারো গুলি—উড়িয়ে দাও চাঁদমারি।

কড়া বিবেকের শাসন তাই রঞ্জনকে বিপথে যেতে দেয়নি। কোনও লোভের ফাঁদে পা দিতে দেয়নি। বিবেক ছাড়া কাউকে গুরু বলে মানেনি—মানবেও না।

শান্তিনিকেতনের ছেলে, বীরভূমের ছেলে রঞ্জন যখন বড় হল, পর-পর অনেক পরীক্ষার বেড়া টপাটপ টপকে এসে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়ে বসল—তখনও পালটাল না ওর স্বভাব আর চরিত্র, নীতিবোধ আর বিবেক।

মাধুরীও আর ছোট খুকিটি নেই। শুধু মনে নয়, রং ধরেছে তার গোটা মনেও। সিউড়ির বড় পরিবারের মেয়ে সে। বোলপুরের পথেঘাটে দেখা হতে-হতে কখন যে এই লিকলিকে শ্রীহীন কালো রঙের মানুষটাকে মন দিয়ে ফেলেছিল, তা সে নিজেই জানে না। শরীর যখন পল্লবিত হল, যখন জ্যোৎস্নারাতে মন হু-হু করে উঠতে লাগল, যখন তালপাতার সেপাইকে দুদিন না দেখলেই মনের ভেতর অদ্ভুত এক মোচড়ানির আবির্ভাব ঘটতে লাগল, তখন...শুধু তখন সে বুঝল, এরই নাম প্রেম।

রঞ্জনও তা বুঝেছিল। কিন্তু এতই রসকষহীন যে দুটো প্রেমের কথাও গুছিয়ে বলতে

পারত না। প্রেমের চিঠিও লিখতে পারত না। বিয়ের কথা উঠলেই খালি বলত, দাঁড়াও, একটু গুছিয়ে নিই।

'আর কী গুছোবে? পাকা চাকরি, নামী ব্যাঙ্ক, মোটা মাইনে। এবার মালাটা বদল করে নাও না গো। আর কত দিন মাস্টারি করব? আমারও কি ইচ্ছে যায় না সংসার করার?'

এইরকম ভাবেই সোজা কথা সোজাভাবে বলে এসেছে মাধুরী। এত দুদিনের মন দেওয়া-নেওয়া নয় যে হিসেব করে আলতো হাতে গিঁট দিতে হবে?

একবগ্গা রঞ্জনকে কিন্তু কিছুতেই রাজি করাতে পারেননি। বিখ্যাত দাঁত বের করে হেসে-হেসে বলত, 'কি বিয়ে পাগলি মেয়ে রে বাবা! দুটো দিনও তর সইছে না! দাঁড়াও, কিছু একটা করি।'

রেগে যেত মাধুরী, 'তদ্দিনে আমার স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি হয়ে যাবে।'

'ভালোই তো, দুজনে হাত ধরাধরি করে, সেই সিঁড়ি বেয়ে স্বর্গে গিয়ে সেখানেই মালাটা বদল করে নেব। বিয়ের মন্ত্র কে পড়বে জানো? নারদ!'

এইভাবেই চলছিল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। দুজনে থাকে কলকাতার দুদিকের মফস্বলে। রঞ্জনের ডেরা বর্ধমানে—মাধুরীর ব্যারাকপুরে। রঞ্জনকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে হয় বলে শনি আর রোববার ছাড়া মাধুরীর সঙ্গে দেখা করতে পারে না। শনিবার মাধুরী চলে আসে কলকাতায়—অফিস থেকে রঞ্জন বেরিয়ে ওকে নিয়ে চলে যায় গঙ্গার ঘাটে। রবিবারে রঞ্জন চলে যায় ব্যারাকপুরে। মাধুরীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে চলে যায় গান্ধীঘাটে।

গঙ্গা ওদের দুজনেরই প্রিয়। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে দুজনেরই খুব ভালো লাগে।

কিন্তু মাস কয়েক ধরে যেন একটু বেশি চুপ মেরে থাকে রঞ্জন।

বেশি খোঁচালে শুধু বলে, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, শিগগিরই একটা নতুন নাম নিতে যাচ্ছি।'

'কী নাম গো?'

'এক্স রে?'

'হ্যাঁ।'

'এ নাম কেন?'

'আমি হব অদৃশ্য রশ্মি। অদৃশ্য আলো হয়ে ঢুকে যাব একদম ভেতরে—যেখানে রয়েছে কংকালের বীভৎস হাড়গোড়।'

'কী বলছ?'

'বাইরের চাকচিক্য দেখে এ মিঞা কোনওদিন ভোলেনি—ভুলবে না—রক্তমাংসের রূপের আড়ালে রয়েছে হাড়ের কাঠামো—আসল স্ট্রাকচার। অদৃশ্য রশ্মি দেখতে চায় কোথায় চিড় ধরেছে সেই কাঠামোটায়।'

এসব হেঁয়ালির ব্যাখ্যা আর হাজির করেনি রঞ্জন। স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। মাধুরী আর-পাঁচটা মেয়ের মতো নাছোড়বান্দার মতো লেগেও থাকেনি। রঞ্জন কিছু বলতে চাইছে না—বেশ তো সময় হলেই বলবে। না বলে যাবে কোথায়? মন খুলে কথা বলার মানুষ একজনই—মাধুরী?

কিন্তু এহেন অটল প্রত্যয়ে চিড় ধরল অকস্মাৎ। সেইদিন থেকে ভয়ে কাঁটা হয়ে রয়েছে মাধুরী। ঘটনাটা ঘটল এইভাবে।

স্কুলের একটা কাজে বি-বি-ডি বাগ গেছিল মাধুরী। আগে থেকে বলা থাকলে প্রাণের মানুষটাকে বলে রাখা যেত। কাজ শেষ করে একটা আড্ডা টাড্ডা দেওয়া যেত। কিপটের পকেট বেশি ফাঁসানো যেত না—কিন্তু চা আর কচুরি তো খাওয়া যেত।

কাজ শেষ হতেই পাঁচটা বেজে গেল। ব্যাঙ্কে গিয়ে আর লাভ নেই। রঞ্জন এতক্ষণে হাওড়ায় গিয়ে ট্রেনে চেপেছে। শিয়ালদার ট্রামে মানুষ ঝুলে-ঝুলে যাচ্ছে। বাকি মানুষ পিলপিল করে হাঁটছে বৌবাজারের স্ট্রিট ধরে। তাদের সঙ্গেই মিশে গেল মাধুরী। ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সামনে দিয়ে যখন কোলের বাজারের দিকে যাচ্ছে, তখন দেখল রঞ্জন হনহন করে ঢুকে গেল একটা তিনতলা বাড়িতে।

সে বাড়ির দোতলায় ঝুলছে পেল্লাই একটা সাইনবোর্ড। তাতে লেখা ঃ বিনয় লজ।

হাঁ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল মাধুরী। তারপর ভাবল, নিশ্চয় অফিসের কাজে ঢুকেছে ভেতরে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তো। অনেকে ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট খোলে, হাইপোথিকেট করে। রঞ্জনকে এনকোয়ারি করতে যেতে হয় মাঝে-মাঝে। এসব গল্প গঙ্গার পাড়ে শুনেছে।

এখনও নিশ্চয় সেই কাজ নিয়ে এসেছে। ঢুকুক, মাধুরীরও ঢুকতে ক্ষতি নেই। ব্যারাকপুরের ট্রেন অনেক, পরের ট্রেনটা ধরলেই হবে। একটু দেখা করে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

বিনয় লজ-এর সিঁড়িতে পা দিয়েছিল মাধুরী। তিন ধাপ ওপরেই একটা ঘর। সেখানে পালিশওঠা কাঠের কাউন্টারে বসে একজন বুড়ো বিড়ি টানছিল। পাঞ্জাবির যা চেহারা, ম্যানেজার বলেও তো মনে হয় না।

বুড়ো হোক আর ছোঁড়া হোক—সুন্দরী দেখলেই একটু বেশি খাতির করে। মাধুরীকে দেখেই বিড়ি নামিয়ে বুড়ো চেয়ে রইল।

মাধুরী বললে, 'এইমাত্র যিনি এলেন ওঁর সঙ্গে একটু দেখা করে যাব!'

'কাঞ্চনবাবু? যান, ওপরে চলে যান, দোতলায় বাঁদিকের বারান্দার শেষের ঘর—তিন নম্বর...তিন নম্বর!'

যেন ভূতের রাজা বর দিচ্ছে, এমনিভাবে তিন নম্বর—তিন নম্বর শব্দদুটো আউড়ে গেছিল বুড়ো। হাসি চেপে সামনের চটাওঠা কানাভাঙা সিমেন্টের সিঁড়ি বেয়ে দোতলার তিন নম্বর ঘরের সামনে গিয়ে মাধুরী দেখেছিল, দরজায় তালা ঝুলছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আকাশপাতাল ভেবেছিল মাধুরী। রঞ্জন তাহলে এখানে কাজে আসেনি, তিন নম্বর ঘরে এসেছে। কেন? কেন সে কাঞ্চন নামে পরিচিত?

নিচে নেমে এসে বুড়োকে জিগ্যেস করেছিল, 'কই, দেখলাম না তো। দরজায় তালা ঝুলছে।'

'তাহলে বেরিয়েছে। আশ্চর্য লোক, মা। ঠিক এই সময়ে রোজ আসে, পেছনের সিঁড়ি বেয়ে বেরিয়ে যায়। কিছু বলতে হবে?'

'না, না, আমি ব্যাঙ্কে দেখা করে নেব। হঠাৎ দেখলাম, তাই ভাবলাম একটু মুখটা দেখিয়ে যাই।'

'তাই করো। আমার সঙ্গে দেখাও হয় না। এখানে তো বসি না।'

নেমে এসেছিল মাধুরী। রঞ্জনের অদ্ভুত রুটিন শুনে অবাক হয়েছিল। ও যে বর্ধমানে

রাতে থাকে না—কলকাতায় হোটেলে ওঠে, তাতো বলেনি। নাম ভাঁড়িয়েছে, তাও বলেনি। রাত কাটায় কোথায়, তাও তো বলেনি।

পরের দিন ঠিক ওই সময়ে বিনয় লজ-এর উলটোদিকের ফুটপাতে হিন্দু মহাসভার বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে রইল মাধুরী।

বি.বি.ডি. বাগ এর দিক থেকে এল তালপাতার সেপাই। রঞ্জন চিরকাল মাথা হেঁট করে হাঁটে—যেন একটা গণ্ডার। এদিক-ওদিক তাকায় না। সেদিনও গণ্ডার-হাঁটা হেঁটে বিনয় লজে ঢুকে গেল...

এবং বেরিয়ে এল পেছনের ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে।

পেছনের সিঁড়িটা আগেই দেখে নিয়েছিল মাধুরী। তিনতলার ছাদ থেকে ঘুরে-ঘুরে, সব তলার বারান্দার প্রান্ত ছুঁয়ে নেমে এসেছে একতলায়। সেখানে রিক্সওলাদের মালিকের আড্ডা। টিনের শেড। এখান দিয়েই বেরিয়ে এল রঞ্জন।

কিন্তু এত ফিটফাট হয়ে এল কেন? এ যে একেবারে সাহেব। টাই কোট বুট ঝকঝক করছে। কেনা সুট নয়—বানানো। দারুণ মানিয়েছে। ছিপছিপে মানুষটাকে এখন খোলা কৃপাণ বলেই মনে হচ্ছে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল রঞ্জন।

চোখ কপালে উঠে গেছিল সেদিন। কিপটের রাজা রঞ্জন ট্যাক্সি চড়ছে অম্লান বদনে। চা খাওয়াতে গিয়ে যে কিনা বুকপকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট বেরিয়ে গেলে মুখ বেঁকিয়ে ফের ঢুকিয়ে রাখে। বলে, 'আমার পাঁচখানা পাঁজর।'

হতভম্ব মাধুরীর সামনে দিয়ে হু-উ-স করে ট্যাক্সি বেরিয়ে যেতেই সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিল সে। কপাল ভালো ফুটপাতের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল আর একটা ট্যাক্সি, উঠে বসেছিল পেছনে।

মিটার ডাউন করে ট্যাক্সি ড্রাইভার জিগ্যেস করেছিল, 'কোথায় যাবেন?'

উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে দূরের ট্যাক্সি দেখিয়ে মাধুরী বলেছিল, 'ওই ট্যাক্সি যেখানে যায়।'

আড়চোখে মাধুরীর দিকে একবার শুধু তাকিয়েছিল ড্রাইভার। তারপর আর কথা বলেনি। আজকাল মেয়েরাও গোয়েন্দা হচ্ছে—ড্রাইভার তা জানে।

চৌরঙ্গীর ওপর ট্যাক্সি ছেড়ে দিল রঞ্জন। ছেড়ে দিল মাধুরীও।

পাঁচতলা হোটেলের গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়িয়েছিল সুবেশা একটি মেয়ে। সুবেশা ছাড়া তাকে সুন্দরী আখ্যা দেওয়া যায় না। মেজেঘষে শরীরটাকে চলনসই করে রেখেছে, মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে তো বটেই। চেহারায় তার ছাপ রয়েছে।

রঞ্জন তাকে নিয়ে ঢুকে গেল পাঁচতারা হোটেলে।

ঘণ্টাখানেক এদিক-ওদিক করেছিল মাধুরী। কিন্তু জায়গাটা খারাপ। সুন্দরী মেয়ে একলা ঘুরঘুর করছে দেখে চারপাশ থেকে ঘিরে-ধরা, উঁকিঝুঁকি মারা, এমনকি 'চলুন না ঘুরে আসি' আপ্যায়নও শোনা হয়ে গেল।

মাধুরী আর দাঁড়ায়নি। দাঁড়াতে পারেনি। মাথা ঘুরছিল। চোখের জল চাপতে গিয়ে চোখে ঝাপসা দেখছিল। কোনওমতে ধর্মতলার মুখে এসে ট্রামে চেপে চলে এসেছিল শিয়ালদা।

পরের শনিবার যায়নি ব্যাঙ্কে। রবিবার কিন্তু রঞ্জন যথারীতি ব্যারাকপুরে এসে ওকে নিয়ে গেছিল গান্ধীঘাটে। শুধু জিগ্যেস করেছিল, 'শনিবার এলে না কেন?' তার বেশি কিছু

না। মাধুরী যে অপকর্ম দেখেছে—তা নিশ্চয় জানতে পারেনি রঞ্জন। কিছু জিগ্যেসও করেনি।

তবে...আগের চাইতেও বেশি অন্যমনস্ক মনে হয়েছে তাকে।

মাধুরীর কথা যখন শেষ হল, তখন জলের ধারা নেমেছে ওর দু'গাল বেয়ে।

কবিতা শুধু চাইল ইন্দ্রনাথের দিকে।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'ঠিক আছে, আমি দেখছি।'

॥ মাঝের নাটক ॥

পরের রবিবার নাটক দেখিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

সকালে আমি আর কবিতা যখন পৌঁছলাম, মাধুরী তার আগেই এসে গেছে। ইন্দ্রনাথ পাশের ঘরে যোগব্যায়াম করছিল। কবিতা ওকে হিড়হিড় করে টানতে লাগল।

'অসভ্যতার একটা সীমা আছে ঠাকুরপো। মেয়েটা এসে একলা বসে রয়েছে, আর তুমি শূন্যে ঠ্যাং তুলে ঘোড়ার ডিমের আসন করছ?'

'এটা ঘোড়ার ডিমের আসন হল?' গায়ে গেঞ্জি চড়াতে-চড়াতে প্রতিবাদ করেছিল ইন্দ্রনাথ, 'জানো এই আসন জহরলাল নেহরু করতেন। তাই অত শার্প ছিল ব্রেন।'

'মেয়েটাকে একলা বসিয়ে রেখে?'

'একলাই তো থাকবে এখন। তোমার মতো বেরসিক আমি নই।'

'তার মানে?'

'ওরা আসছে', ঘড়ি দেখল ইন্দ্রনাথ, 'সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন পরাতে হবে।'

*

ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো ঝট করে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল মাধুরী। মুখ থেকে নেমে গেছে সমস্ত রক্ত। একে তো হাতির দাঁতের মতো ফরসা গায়ের রং—আচমকা নিরক্ত হয়ে যাওয়ায় এখন তা কাগজের মতো সাদা।

খোলা দরজা দিয়ে ঢুকছে এক তালপাতার সেপাই।

ঢলঢলে শার্ট, প্যান্ট আর কালো গাত্রবর্ণ দেখলেই বোঝা হয়ে গেল, সে কে।

কুমুদরঞ্জন ঘোষ।

পেছন-পেছন এল যে মেয়েটি, তাকেও চিনতে দেরি হল না! এরকম সুবেশা কিন্তু সুরূপা নয় একজনই হতে পারে। পাঁচতলা হোটেলের সেই রহস্যময়ী।

খুব আওয়াজ করে নস্যি নিয়ে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, 'ব্যস, এবার শুরু হোক শেষ অঙ্ক। মাধুরী ঘোষদস্তিদার, ওরকম কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে পেশি টেনে ধরবে—তখন ওই কুমুদরঞ্জন ঘোষকে দিয়েই পা টেপাতে হবে। যেখান থেকে দাঁড়িয়েছেন, ওখানেই টুপ করে বসে পড়ুন। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন ঘোষ, আপনার রঞ্জনরশ্মির আশ্চর্য কাহিনি শুনব সব শেষে। বসুন, বসুন, মাধুরীর পাশে বসুন। ফাইন। এইবার শেফালিকা নন্দী। আপনিই যত নষ্টের গোড়া। আপনার কাহিনি শুরু হোক সবার আগে। স্টার্ট।'

॥ শেফালিকা ॥

নন্দী টাইটেলটা এখনও নিয়ে রেখেছি, রাখবও চিরকাল। কিন্তু ছাদনাতলায় দাঁড়িয়ে যে লোকটা আমার পদবী আর গোত্র পালটে দিয়ে গেল, সে যদি থাকত, আমার মতো সুখী মানুষ দুনিয়ায় আর কেউ থাকত না।

জন্মেছিলাম শেফালিকা দত্ত হয়ে। অনেক আশা আর আনন্দ নিয়ে বিয়ে করেছিলাম ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে। কুবেরদের বাজারদর অনেক।

রমাপতি নিজেও তো ছিল ছোটখাট এক কুবের। নন্দী পদবী শুনেই বুঝছেন? সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের চাপা টাকার খবর অনেকেই রাখে না। কলকাতায় এখনও কত প্রপার্টি ধরে রেখে দিয়েছে, তাও ঢাক পিটিয়ে কাউকে জানায় না।

কুবেরের বিষয়-আশয় পেয়েই বোধহয় এত নির্লোভ আর এত নীতিবাগীশ ছিল রমাপতি। সোনার খাটে গা আর রূপোর খাটে পা দিয়ে যে লোকটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারত—সে এসেছিল লাইনে—খেটে রোজগার করতে। বলত বাপঠাকুরদা বাগানবাড়ি বানিয়ে আর মেয়েছেলে রেখে যত পাপ করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করছি।

সেইটুকু করলেই তো হত। কেন ও দৌড়ল কালো টাকা লুটেরাদের পেছনে। কেন তাদের মুখোশ খসানোর জন্যে কোমর বেঁধে লাগতে গেল। কুচক্রের অচলায়তন ভাঙার ক্ষমতা ওর ছিল না—টলানো তো দূরের কথা।

কিন্তু পায়ের তলায় যারা ঘাস গজাতে দেয় না তারা পায়ের তলায় কাঁটার খোঁচা কখনও সয়?

তাই একদিন কসবার খোলা হাইড্রেনের মধ্যে একটা লাশ পাওয়া গেল।

শেষ হয়ে গেল রমাপতি নন্দী। শেষ হয়ে গেল পুলিশি তদন্ত। অপরাধী রয়ে গেল অন্ধকারে।

আর রইল আমার বৈধব্য। থাকবে সারাজীবন।

সেই সময়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াল এক আদর্শ মানুষ। এই কুমুদরঞ্জন ঘোষ।

আমাকে বললে,—'আমি সব জানি। সন্দেহ আমারও হয়েছে। আমি কিন্তু সাবধানে এগোচ্ছি। এই কুচক্র আমি ভাঙব, রমাপতির অপঘাত মৃত্যুর বদলা নেব, দেশের জন্যে একটা অন্তত ভালো কাজ করে যাব—তাতে আমারও মৃত্যু হয় হোক।

॥ রঞ্জন ॥

হ্যাঁ, একথা আমি বলেছিলাম শেফালিকাকে। আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম—বদলা আমি নেবই।

সেইদিন থেকে কুমুদরঞ্জন ঘোষ হয়ে গেছিল রঞ্জনরশ্মি ঘোষ। মাধুরীকে এর বেশি আর বলিনি। বিয়েটা শুধু আটকে রেখেছিলাম। বিধবা থাকার চেয়ে আইবুড়ো থাকা অনেক ভালো।

দেশসুদ্ধ লোক এখন জেনে গেছে স্ক্যাম নামে শব্দটা। তিন হাজার কোটি টাকা উধাও হওয়ার চাঞ্চল্যকর অপব্যবস্থা। Scam শব্দটা কিন্তু ব্রিটিশ ডিক্সনারিতে খুঁজে পাবেন না। এটা একটা আমেরিকান স্ল্যাং। নিশ্চয় সেদেশেও এইরকম ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারি হয়।

দেশজুড়ে এই হইচই পড়ার অনেক আগে থেকেই টাকা সরে যাচ্ছিল ব্যাঙ্ক থেকে। কোটি-কোটি টাকা। চোখের সামনে দিয়ে টাকার এই রকম উড়ে যাওয়া দেখার পর মানুষের মতো মানুষরা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। রমাপতিও পারেনি। ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু ধমক খেয়েছিল। শাস্তির হুমকি শুনেছিল। বেপরোয়া রমাপতি তখন একা এগিয়ে গেছিল। তাই ওর লাশ পড়েছিল। যেখানে কোটি-কোটি টাকার খেলা চলে, সেখানে দু-দশ হাজারেই একটা মানুষ খুন করিয়ে দেওয়া যায়, নিখুঁতভাবে কোথাও

কোনও সূত্র না রেখে। রমাপতি কিন্তু একটু সূত্র রেখে গেছিল আমার কাছে, মরার আগে। অন্য ম্যানেজারদের সঙ্গে ওর তেমন দহরম-মহরম ছিল না। আমার সঙ্গে ওর মনের মিল ছিল অনেকগুলো বোকামির জন্য। আমরা সৎ, আমরা ঘুষ নিই না, আমরা মুখ বুজে অন্যায় বরদাস্ত করি না। অতএব আমরা মূর্খ।

টাকা জমা না রেখে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলিয়ে দেওয়ার বা তুলিয়ে নেওয়ার অনেকগুলো অপব্যবস্থা আছে। এদের নাম ঃ রিফান্ড অর্ডার, ডিবেঞ্চার ইন্টারেস্ট, ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট, ইন্টারেস্ট ওয়ারেন্ট, কমিশন ওয়ারেন্ট—ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় আরও অনেক পেমেন্ট।

এজন্যে ডেসিগনেটেড অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়। এগ্রিমেন্ট করতে হয় ওয়ারেন্ট ইসু করার আগে। তারপর টাকা জমা দিতে হয়। তখন ব্যাঙ্ক হেড অফিস সার্কুলার ইসু করে দেয়। কোম্পানি তখন ওয়ারেন্ট বা পোস্ট-ডেটেড ওয়ারেন্ট বাজারে ছেড়ে দেয়। সার্কুলার অনুযায়ী ব্যাঙ্ক ম্যানেজাররা টাকা দিয়ে যেতে থাকে।

আমার প্রথম সন্দেহ দেখা দেয় একটা পাঁচতারা হোটেলের অ্যাকাউন্ট নিয়ে। নামটা বলব না। অফিসিয়াল সিক্রেসি।

প্রথমেই যে টাকা জমা দেওয়া উচিত, এই হোটেল কোম্পানি তা না জমা দিয়ে অর্ডিনারি অ্যাকাউন্টের মতোই আস্তে-আস্তে টাকা জমা দিয়ে যাচ্ছিল। অপরেটিং ব্রাঞ্চের ম্যানেজার আমি। কিছু নিয়ম আমাকে মেনে চলতে হয়। আর তখনি আমার সন্দেহ হয় এত কম টাকা জমা পড়ছে কেন?

কৌতূহলের শুরু তখন থেকেই।

তখন আমি ধাপে-ধাপে এগোতে লাগলাম। ছাত্রজীবনে সংগঠন করেছি, আন্দোলন চালিয়েছি, অন্যায়ের প্রতিকার করেছি। কিন্তু হঠকারিতা কখনও করিনি। এটাই আমার ছাত্র জীবনের শিক্ষা।

প্রথম ধাপেই ওয়াকিবহাল করলাম ওপরওলাদের। তাঁদের জানিয়ে দিলাম, কী ধরনের বেআইনি কাণ্ড চলছে আমার নাকের ডগায়। যে রিকুইজিট ফান্ড জমা দেওয়ার কথা—এই পাঁচতারা হোটেলটি তা না দিয়ে বাজার থেকে কোটি-কোটি টাকা তুলিয়ে নিচ্ছে।

রমাপতির কপালে যা ঘটেছিল, আমার কপালে ঘটল ঠিক তাই। ধমক আর শাস্তির হুমকি।

আমি যে ভুল সন্দেহ করিনি, এই হল তার প্রমাণ। চক্রান্ত একটা রয়েছে। হাতে হাত মিলিয়ে রয়েছে ব্যাঙ্কের ঊর্ধ্বতম ম্যানেজমেন্ট আর পাঁচতারা হোটেল। নিচুতলার ম্যানেজাররা নাক গলালেই নাক উড়ে যাবে। যেমন গেছে রমাপতির।

আমি তখন অপারেশন শুরু করলাম সম্পূর্ণ নিজের ঝুঁকিতে কারও সাহায্য না নিয়ে চাকরির পরোয়া না রেখে। একেবারে নিজের মনগড়া নিয়মে।

ব্যাঙ্ক-নিয়ম অনুযায়ী পাঁচতারা হোটেল কোম্পানির উচিত, বাজারে চলতি ইসুগুলোর যোগফল-টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া।

কিন্তু তা তারা করছে না। ডেলিডেবিটেড টাকার চাইতে মাত্র দশ-বিশ হাজার টাকার বেশি করে জমা দিচ্ছে।

আমি ঠিক করলাম, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাব পাঁচতারার প্যাঁচ।

কোম্পানির গড়পরতা যত সংখ্যক চেক ডেবিট হত, তা না করে, নামমাত্র দু-একটা চেক ডেবিট করে, বাকি চেকের আলাদাভাবে হিসেব তৈরি করে রেগুলার যোগ

দিয়ে রাখতে শুরু করলাম।

এ হিসেব গোপনে রাখলাম নিজের কাছে।

ফলে, পাঁচতারা কোম্পানি সন্দেহও করতে পারল না, কত টাকার সত্যিকার চেক ব্যাঙ্কে জমা হয়ে গেছে। শুধু জানল, অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট ব্যালান্স রয়েছে। অডিটিং-এর নিয়ম অনুসারে তাই তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে। পাঁচতারার অফিসার নিয়মিত পজিশন দেখে খুশি হয়ে চলে যায়—জানতেও পারে না আসল পজিশনটা।

সে হিসেব তো আমার কাছে।

এইভাবে একটু-একটু করে পাঁচতারাকে টেনে নিলাম আমার পাতা ফাঁদে।

তারপর গেলাম দ্বিতীয় ধাপে।

তিন-চারদিনের টানা ছুটি ব্যাঙ্কে প্রায়ই থাকে। তক্কে-তক্কে রইলাম এইরকম একটা ছুটির। ছুটির ঠিক আগের দিন দুম করে একদিনেই ২৪ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ডেবিট করে দিলাম।

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষদের তোষামোদ করার লোকের অভাব নেই কোনও ব্যাঙ্কেই। অভাব ছিল না আমার ব্রাঞ্চেও। ঝড়ের বেগে খবর চলে গেল সেখানে।

চাপ এসে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। কাজটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। যা করছ, কোম্পানিকে জানিয়ে করো।

আমার বয়ে গেছে জানাতে, ছুটি তো পড়ে গেছে। এই কদিন ব্যাঙ্ক বন্ধ। ২৪ কোটি ৯৮ লক্ষ জমা দেওয়ার সুযোগ তো পাচ্ছে না পাঁচতারা কোম্পানি।

এ টাকা খাতাকলমে ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিলে ব্যাঙ্ককে দিতে হত বেশি করেও শতকরা ২৫ সুদ। কিন্তু কলমানি মার্কেটে খাটিয়ে পাঁচতারা কোম্পানি লুটে নিচ্ছে শতকরা ৩০ থেকে ৫০ সুদ।

কর্তৃপক্ষ তা জানে। জেনেশুনেও পাঁচতারাকে দিয়ে যাচ্ছে টাকা। রমাপতি বলতে গেছিল, তাকে লিখে জানিয়েছিল—বকেয়া টাকার জন্যে কোনও সুদ নিতে পারবে না। কেন?

আরে, ওই পরিমাণ টাকা তো ওরা অন্য জায়গায় রেখেছে। তোমার বাগড়া দেওয়ার কী দরকার।

বোকা রমাপতি তা সত্ত্বেও বাগড়া দিতে গিয়ে মরেই গেল।

আমি কিন্তু মরলাম না—যদিও যে-কোনওদিন বডি পড়তে পারে। মাধুরী ভয় পাবে বলেই এতদিন এসব বলিনি। কিন্তু কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়? আমরা যারা খেটে খাই, সৎভাবে খেয়েপরে বাঁচতে চাই—আমরা চাকরি পাচ্ছি না—কিন্তু কালো টাকার মালিকরা ব্যাঙ্কের টপমোস্ট ম্যানেজমেন্টদের নিয়ে ফুর্তির ফোয়ারা ছুটিয়ে যাচ্ছে পাঁচতারার ঘরে-ঘরে। কত মধ্যবিত্তের মেয়ে কৌমার্য বলি দিচ্ছে সেখানে—কেউ তার খবরও রাখে না। যে পাপাচার কল্পনাতেও জানা যায় না—তাই চলছে অবাধে কারণ সর্ষের মধ্যেই ঢুকে রয়েছে ভূত। রক্ষক যে, সেই হয়েছে ভক্ষক। পাবলিক তা জানবে কী করে?

ভাগ্যিস আমি ব্যাঙ্ক ম্যানেজার হয়েছিলাম। তাইতো জানতে পারলাম। জানতে যখন পেরেছি, বিহিত না করলে আমি কি মানুষ পদবাচ্য?

যাক, যা বলছিলাম, ছুটির ঠিক আগের দিন আমার ওই কীর্তির ফলে পাঁচতারা কোম্পানির বেআইনি দাদন লেখা হয়ে গেল ২৪ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্কের ভাষায় যাকে বলে, Clean Advance—সিকিউরিটি ছাড়াই।

আনন্দে ডগমগ হয়ে আমি চলে গেলাম ছুটিতে। রমাপতির আত্মা বোধহয় সেদিন কিছুটা শান্তি পেয়েছিল।

ছুটি কাটিয়ে ফিরে এসে শুনলাম, ব্যাঙ্কের শিরায়-উপশিরায় রটে গেছে সেই খবর। কুমুদরঞ্জন ঘোষ ঘায়েল করেছে পাঁচতারাকে। পালটা প্যাঁচে ধরাশায়ী কোম্পানি পাগলের মতো ধর্না দিয়েছে টপমোস্ট ম্যানেজমেন্টের কাছে।

মুখরক্ষা করার জন্যে ম্যানেজমেন্ট চিঠি দিয়েছে পাঁচতারাকে—কিন্তু তুলোধোনা করছে বেঁড়ে ব্যাটাদের নিয়ে। পাচ্ছে না কেবল এই পাতি অফিসারকে।

অনেক চিঠির ঝড় বয়ে গেল দুই তরফে। পাতি অফিসারের সুবাদে প্রায় দশ লক্ষ টাকারও বেশি সুদ আদায় পেয়ে গেল ব্যাঙ্ক।

লাভ হল ব্যাঙ্কের।

আমার লাভও হল না, ক্ষতিও হল না। মাইনে তো পেলাম। মাইনে পাওয়ার কর্তব্য করে গেলাম—যা আর কেউ করতে সাহস পায় না।

কিন্তু ক্ষতি হয়ে গেল পাঁচতারা আর টপমোস্ট ম্যানেজমেন্টের। দশ লাখ কি কম কথা। কত বখরা থাকত ম্যানেজমেন্টের?

ফলে, মিটিং-এর পর মিটিং হয়ে গেল আমাকে নিয়ে—আমাকে ঠান্ডা করার জন্যে—নরমে-গরমে কতভাবেই না বোঝানো হল আমাকে—আর বেড়ো না—যা হচ্ছে হোক।

কিন্তু তাই কি হয়! কতরকম টোপ যে পড়েছিল আমাকে কব্জায় আনার জন্যে—তা বললে মাধুরী হয়তো মূর্ছা যাবে। কতরকম ঘেরাটোপ যে রচনা হয়েছিল আমার হাত-পা বেঁধে ঠুঁটো বানিয়ে রাখার জন্যে—তার বিশদ বর্ণনাও আর দিতে চাই না।

আমি শুধু চালিয়ে গেলাম। কে তখন রোখে আমায়। উচ্চিংড়ের মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে যেখানে ফাঁক পেলাম, সেখানেই প্যাঁচ কষে গেলাম। কু-কাজ ফাঁস করে দিলাম। যা কিছু পাওনা, আদায় করে গেলাম।

ফল হল ভয়ানক।

আমাকে বদলি করে দেওয়া হল।

পাঁচতারাকে প্যাঁচ কষবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হল। তাতে কিন্তু ব্যাঙ্কের ক্ষতিই হল। কিন্তু তাতে কার কী এসে যায়? ওই ব্রাঞ্চে যদি আরও দশ থেকে পনেরো বছর আমি থাকতাম, ব্যাঙ্কের মুনাফা বা লভ্যাংশ হিসেবে কম করেও ২০ থেকে ৩০ কোটি টাকা ব্যাঙ্ককে হাতেকলমে পাইয়ে দিতাম—কাগুজে হিসেব নয়—কড়কড়ে টাকায়। ভাবতে পারেন? একটা ব্যাঙ্কের একটা শাখায় একজন মাত্র অফিসার যদি এই লভ্যাংশ এনে দিতে পারে, তাহলে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত কনজার্ভেটিভ হিসেবে শতকরা দশটা শাখায় এই পরিমাণ লাভ এলে প্রতি বছরে আমাদের দেশের একটা করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকর করা যায়। চরম অসংযমী ন্যায় নীতিহীন মুনাফাখোরদের হাতে পড়ে আপামর জনসাধারণের ভোগান্তি কোন পর্যায় পৌঁচেছে, তাও কি ব্যাখ্যা করে দিতে হবে?

না। কক্ষনও না। আজও গায়ের রক্ত টগবগিয়ে ওঠে সেই নাটকীয় মিটিং-এর কথা মনে পড়লেই। ২৪ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকার ভাউচার নিয়ে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল আমাকে। ভাউচার লিখেছিলাম আমি—সই করেছিলাম আমি। পাঁচতারার ওপরতলায় বসেছিল জরুরি অধিবেশন। মিটিং তো নয়—কাঠগড়া। সেখানে হাজির হয়েছিলেন পাঁচতারার চিফ সেক্রেটারি, ফিন্যান্স ডিরেক্টর, জয়েন্ট সেক্রেটারি, কমপিউটার অপারেশন-এর ডিরেক্টর আর

ডিলিং অফিসার।

ব্যাঙ্কের তরফ থেকে হাজির হয়েছিলেন জেনারেল ম্যানেজার, একজন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, তিনজন অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, একজন ডেপুটি ম্যানেজার আর এই পাতি অফিসার।

কত গুরুত্বপূর্ণ সেই মিটিং আন্দাজ করতে পারছেন? পাপচক্রের অংশীদার কারা, তা কি আর খুলে বলার দরকার আছে? ব্যাঙ্কের লাভকে এঁরাই এতদিন ভাগ করে নিয়েছেন—আমি বাগড়া দিয়েছি বলে আমাকে কাঠগড়ায় তুলেছেন।

রমাপতি মরেছে, আমিও না হয় মরব, কিন্তু মেরে মরব।

চিফ সেক্রেটারি ভদ্রলোককে এমনিতেই একটা ভদ্র বাঘ বললেই চলে। না...না...ভদ্র সিংহ। সিংহের মতোই তো কেশর, আলমগিরের মতো দাড়ি। চোখ দুটোয় সুমেরু-কুমেরুর জমাট বরফ।

কনকনে চোখে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে স্রেফ তুলোধোনা করে গেলেন চোস্ত ইংরেজিতে। ভাগ্যিস ভাষাটায় দখল ছিল। তাই রক্ষে। ভদ্র সিংহ আমার চেহারা দেখে বোধহয় ভেবেছিলেন—কিংস ইংলিশ শুনলেই নিশ্চয় প্যান্ট নষ্ট করে ফেলব।

ধোপা, নাপিত, কুলি, মজুরকেও এভাবে আমরা গালাগাল দিই না।

আমি চুপ করে রইলাম।

ব্যাঙ্কের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার আমাকে একটু স্নেহ করতেন। আমার হাড়মজ্জার খবর রাখতেন। কিন্তু আমি যে রঞ্জনরশ্মি হয়ে গিয়ে তাঁদেরও হাড়মজ্জার খবর রাখতে শুরু করেছিলাম, তা জানতেন না।

এই ভদ্রলোকই আমার হেনস্থা দেখে নরম গলায় আমার সেন্স অফ ডিউটি সম্বন্ধে দু-চারটে ভালো-ভালো কথা সেদিন বলেছিলেন।

ভদ্র সিংহ কনকনে চোখে তাকিয়েই রইলেন আমার দিকে। চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, 'কুমুদরঞ্জন ঘোষ!'

সবিনয়ে আমি বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, অধীনের নাম কুমুদরঞ্জন ঘোষ। ওরফে কে আর ঘোষ। সংক্ষেপে রঞ্জন ঘোষ। আরও একটা নাম আছে আমার। রঞ্জনরশ্মি ঘোষ।'

'হোয়াট?'

'মানে, এক্স-রে ঘোষ। আপনার কোম্পানির ভেতর পর্যন্ত দেখে ফেলেছি তো।'

'ইউ পেটি অফিসার।'

'ও ইয়েস, আই অ্যাম এ ভেরি-ভেরি পেটি অফিসার। কিন্তু আপনার কোম্পানির সব অফিসার ঠিক আছে তো?'

'অ্যাকাউন্ট কীভাবে রাখতে হয়, শিখে নিন আমার কাছ থেকে।'

'আপনার কাছ থেকে? সরি, স্যার। আপনার কোম্পানির অ্যাকাউন্ট শিখে আমার কী লাভ?'

'ইউর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট—'

'সেটাও আপনার কাছ থেকে শিখব না।'

'ইউ ব্লাইটার।'

'ল্যাঙ্গুয়েজ প্লিজ। আপনার কোম্পানি-অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে তো?'

'মানে?'

'যে টাকা রেখে যে টাকা তোলার কথা—তা কি হচ্ছে?'

'হু দ্য হেল ইউ আর টু কোশ্চন মি?'

'কত টাকা ব্যাঙ্কে রেখে, কত টাকার চেক ছেড়েছেন বা কত টাকা তুলিয়ে নিয়েছেন—তা তো আপনাকে জানাতে হবে—এখুনি।'

'আপনার সাহস তো কম নয়। আপনার ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানও আমাদের Credential নিয়ে প্রশ্ন তোলেন না। আপনার কি অথরিটি আছে?'

'আছে, আছে। তাছাড়া, এটা তো আপনার কোম্পানির Credential-এর প্রশ্ন নয়—ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের প্রশ্ন। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট 'রিকনসাইল' করতে গেলে এ প্রশ্নের সদুত্তর তো চাই।'

সবেগে মাথা ঘুরিয়ে ফিন্যান্স ডিরেক্টরের দিকে তাকালেন ভদ্র সিংহ। বললেন, 'এর সঙ্গে আপনি কথা বলুন।'

ফিন্যান্স ডিরেক্টর একটি অমায়িক পশু বিশেষ। তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন পাশের কামরায়। জামাই আদরে একটা দামি সোফায় বসালেন। হুইস্কি রেডি ছিল। অফার করলেন। আমি সেদিকে না তাকিয়ে বললাম, 'কী বলতে চান, বলে নিন।'

উনি জবাব না দিয়ে মস্ত টেবিল প্রদক্ষিণ করে পিঠ-উঁচু চেয়ারে বসলেন। তখন আমার খেয়াল হল, আমাকে ডেকে এনেছেন নিজের চেম্বারে। ড্রয়ার টেনে ডানহাতে কী যেন নাড়াচাড়া করতে-করতে আমার দিকে হাসি-হাসি মুখে চেয়ে রইলেন। এসব লোকেরা হাসিমুখেই খুন করে। তাই আমি সতর্ক হলাম।

উনি বললেন, 'চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে এভাবে কথা বলতে আপনার ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানও সাহস পায় না।'

'আমি চেয়ারম্যান নই,' বললাম আমি।

'আপনি একটু বুঝেসুঝে কথা বলুন।'

'কী বলতে চান, প্রাঞ্জল করুন।'

'এভাবে, এইসব কথা না বললেই ভালো করতেন।' এবার দেখলাম ফিন্যান্স ডিরেক্টর তোতলাচ্ছেন।

আমি চালিয়ে গেলাম, 'আমি নিরুপায়। আপনার কোম্পানির অফিসার আমি নই। কাজেই আপনার চিফ সেক্রেটারির মন জুগিয়ে কথা বলার দরকার আমার নেই।'

'মিঃ ঘোষ—'

'কেন উনি আমাকে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পাঠালেন, সেটা বলুন। যদি কিছু বলার না থাকে, এখানে সময় নষ্ট করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।'

'আপনার যা প্রশ্ন সেটা আমাকে করুন।'

'প্রশ্ন তো একটাই ঃ আপনার কোম্পানির অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে কি?'

ফিন্যান্স ডিরেক্টর জবাব না দিয়ে ড্রয়ারটার দিকে চাইলেন। ডানহাতে যা নাড়াচাড়া করছিলেন, এবার তা বের করে এনে টেবিলের ওপর রাখলেন। একতাড়া নোট।

পাঁচশো টাকার একশোটা নোট। নতুন নোট। নগদ পঞ্চাশ হাজার।

উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, 'চলুন, আপনার কথা শোনা হয়ে গেছে।'

অমায়িক পশু বিশেষের মতোই ফিন্যান্স ডিরেক্টর আমাকে নিয়ে মিটিং রুমে ফিরে এলেন। চিফ সেক্রেটারিকে বললেন, 'স্যার, ইনি শুধু জানতে চাইছেন, আমাদের কোম্পানি

অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে কিনা।'

চিফ সেক্রেটারি চোখের পাতা না ফেলে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন ফিন্যান্স ডিরেক্টরের দিকে। কথা হয়ে গেল চোখে-চোখে, তাকালেন ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের দিকে।

বললেন, 'তাহলে তো আপনাদের সঙ্গে একটা সিটিং দিতে হয়।'

জেনারেল ম্যানেজারের জবাব যেন তৈরি ছিল। সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, 'তাহলে এখন যাই। ব্যাঙ্কের মিটিং ডাকছি—আপনারাও আসুন সেখানে।'

মিটিং কিন্তু আজও ডাকা হয়নি। যে তথ্য জানতে চেয়েছিলাম, আজও তা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানতে পারেনি। জানতে চায়ও না। জানলে তো আর পাঁচতারার ঘরে-ঘরে মধুযামিনী করা চলবে না।

শুধু বদলি করা হয়েছে আমাকে।

তার আগে অবশ্য জেনারেল ম্যানেজার তলব করেছিলেন আমাকে তাঁর চেম্বারে।

বলেছিলেন রুষ্ট গলায়, 'তোমার এসব খোঁজখবরে দরকার কী, ঘোষ?'

'আপনি বলছেন, দরকার নেই?' বলেছিলাম বেঁকা সুরে, 'ভবিষ্যতে তাহলে আর কৈফিয়ৎ চাইবেন না কোনও কাজে গাফিলতির জন্যে।'

'ঘোষ—'

'আগে কথা দিন, কৈফিয়ৎ চেয়ে বিরক্ত করবেন না—'

'ওভাবে ব্যাপারটা নিচ্ছ কেন?'

'তাহলে কীভাবে নেব?'

'এরা তো খুব বড় কোম্পানি। এদের ব্যাপারে একটু রয়েসয়ে চারদিক ওজন করে কথা বলা দরকার।'

'মানতে পারলাম না স্যার, আমার কাছে সব অ্যাকাউন্ট হোল্ডারই সমান—কার বড় কোম্পানি, কার ছোট কোম্পানি—এ বিচার করি না ক্লায়েন্ট হ্যান্ডল করার সময়ে। সবাই খদ্দের, সবাই লক্ষ্মী।'

'তা তো বুঝলাম—'

'না স্যার, আপনি বোঝেননি। বুঝলে এই উপদেশ আমাকে দিতে আসতেন না। এই কোম্পানি আপনার আমার পেটের ভাত মেরে দিচ্ছে—চাকরির সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে। এদের কাছ থেকে কে কত পেয়েছে জানি না—আমি তো কিছু পাইনি।'

দুম করে রেগে গেলেন জেনারেল ম্যানেজার। ভদ্রলোক এমনিতেই খুব কম কথা বলেন। যমের মতো সবাই ভয় পায়। আমি কিন্তু মরার ভয় কাটিয়ে উঠেছিলাম বলে যা-যা বলবার, কটাকট বলে যাচ্ছিলাম। রাগ তো হবেই।

কড়া গলায় বললেন, 'কী বলতে চাইছ?'

'রেগে গেলে তো চলবে না। যা ঘটবার ঘটে গেছে—ক'জনের চাকরি খাবেন, তাই ভাবুন। তার বাইরেও বড় ভাবনা হয়তো আপনার মাথায় ঘুরছে—আপনার নিজের চাকরিটাই না যায়, কারণ একটাই ঃ এই যে টাকা তোলার হুলিয়া—এতে তো সই দিয়েছেন আপনি। এই হুলিয়ার ফলেই তো পাঁচতারা কোম্পানি গড়পরতা দশ লাখ টাকারও কম রেখে আজ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় পঁচিশ কোটি টাকা তুলিয়ে দিয়েছে। আপনার দায়িত্ব আপনি অস্বীকার করতে পারেন, আমি যে ভাউচার লিখেছি সেটা ঘুরিয়ে দিয়ে আপনি লিখতে পারেন? পারলে লিখুন না।'

'যাও, যাও, পরে ডাকছি।'

আমি কিন্তু যাইনি। জবাব না দিয়ে উঠব না ভান করেছিলাম। চোখ রাঙানিতেও ওষুধ ধরল না দেখে হাঁকডাক করে পারসোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টকে ডেকেছিলেন জেনারেল ম্যানেজার, 'এটা করো ওটা করো'—আবোলতাবোল হুকুম ছেড়ে গেছিলেন। বেশ বুঝলাম, বিলক্ষণ ঘাবড়ে গেছেন—সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

আমি তখন উঠে চলে এসেছিলাম। আসবার সময়ে বলে এসেছিলাম, 'পরে ডাকবেন স্যার।'

স্যার আর ডাকেননি শুধু বদলির হুকুম জারি করেছিলেন। তারপর থেকেই আমি হুঁশিয়ার হয়েছি। রমাপতির কপালে কী ঘটেছিল, তা ভুলিনি। বর্ধমানে আমি একা থাকি পৈতৃক ভিটেতে। কেউ তো নেই। পাড়ার ছেলেদের দিয়ে খবর নিয়ে জানলাম—বাড়ির ওপর কেউ বা কারা নজর রাখছে।

বুঝলাম। রাতেই সাবাড় করার মতলব। একবার খতম হয়ে গেলে কে আর দেখছে।

বাড়ি যাওয়া বন্ধ করলাম। বিনয় লজে ঘরভাড়া নিলাম। সেখানে অনেক লোকজন। খুনখারাপি এত সোজা নয়।

দুদিনেই টের পেলাম, অফিস থেকে বেরোলেই পেছনে ফেউ লাগছে।

তখন থেকেই বিনয় লজে এ দরজা দিয়ে ঢুকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া আরম্ভ করলাম। রাত কাটানোর জন্যে মুচিপাড়ার এক বস্তিঘর ভাড়া নিলাম। বিনয় লজ থেকে বেরিয়ে কিছুটা সময় নিরাপদে কাটানোর জন্যে ঢুকতাম খোদ সিংহের গহ্বরে—পাঁচতারা হোটেলে। কেউ অন্তত সেখানে আমাকে খুঁজবে না। ওপরতলার বড় সাহেবরাও তো নিচে নামে না। রেস্তোরাঁয় ঢোকে না।

সঙ্গে নিয়ে যেতাম শেফালিকাকে। তাতে সন্দেহটা কম থাকে। ওসব জায়গায় একলা গেলেই তো সন্দেহ বাড়ে। শেফালিকা আমার প্ল্যানে সাহায্য করেছে। বৈধব্য বেশ ঘুচিয়ে সেজেগুজে হাজির থাকতে কষ্ট অবশ্য হয়েছে। মাধুরী কিন্তু ভুল ভেবেছে।

বেশ বুঝেছিলাম, এভাবে বেশিদিন চলবে না। মাধুরী যদি টিকি ধরে ফেলতে পারে—ওরাও ধরবে।

খবরটা পেলাম ইন্দ্রনাথবাবুর কাছে। মাধুরী আমাকে ফলো করেছে জেনে প্রথমে খুব হাসলাম। তারপর বুঝলাম খেল খতম হতে আর দেরি নেই।

কী করব জানি না। ইনি বললেন এখানে আসতে, তাই এলাম, এরপর?

॥ শেষের নাটক ॥

কবিতা বললে, 'আপনি আমার এই ঠাকুরপোটাকে চেনেন না। ও যদি মনে করে...সত্যিই যদি মনে করে...তাহলে পৃথিবীর কোনও শক্তিকে আপনার মাথার চুল ছুঁতে দেবে না।' বলে, চাইল ইন্দ্রনাথের দিকে।

ইন্দ্রনাথ সশব্দে এক-টিপ নস্যি নিয়ে বললে, 'তাই হবে।'

তাই হয়েছে। ইন্দ্র ওর মন্ত্রগুপ্তি খাটিয়েছে। কুমুদরঞ্জনের কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারেনি—পারবেও না।

মাধুরীর গলায় মালা দেওয়ার সময়ে নারদকে ডাকতে হয়নি। খুব খেয়েছিলাম সেদিন। কঞ্জুষ দুর্নাম ঘুচিয়েছিল কুমুদ—একদিনের জন্যে।

সবচেয়ে বড় কথা, আজও সত্যিকারের দেশপ্রেম দেখিয়ে যাচ্ছে কুমুদরঞ্জন—অন্য এক ব্রাঞ্চে বসে।

'প্রসাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত। (শারদীয় সংখ্যা, ১৯৯২)

নিরুদ্দেশ নীলকান্তমণি

ইন্দ্রনাথের একটা বদখেয়াল আছে। হাতে যখন কোনও কাজ না থাকে, রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। তাতে ওর মন প্রসন্ন থাকে।

এইভাবেই একদিন বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে। তখন সকাল সাতটা। চলে এল বেলেঘাটা মেন রোডে। চলল শিয়ালদার দিকে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই খেয়াল হল, ওর হাত দশেক দূরে সামনে হাঁটছে লুঙ্গিপরা আধবুড়ো একটা লোক। গায়ে হলুদ হাতকাটা গেঞ্জি। তার হাতে একটা সাদা কাপড়ের থলি। মাঝে-মাঝে সে থমকে দাঁড়াচ্ছে, হেঁট হচ্ছে, থলি থেকে রাধাচূড়া ফুল বের করে ফুটপাতে ফেলছে, ফের সিধে হয়ে হাঁটছে।

পাগল নাকি? কিন্তু আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে দেখা যাচ্ছে উলটোদিকের ফুটপাতে। সেখানে হনহন করে হাঁটছে হাফপ্যান্ট পরা একটি ছেলে। বছর বারো বয়স। গা খালি। আশপাশের বস্তির ছেলে নিশ্চয়। এ-ফুটপাতের আধবুড়ো যেই হেঁট হয়ে ফুল ফেলছে, ও ফুটপাতের ছেলেটা তক্ষুনি খড়ি দিয়ে পাশের বাড়ির দেওয়ালে গোল কেটে মাঝখানে ক্রশ চিহ্ন দিচ্ছে।

এ তো ভারি মজার খেলা। নাকি বদমায়েশির যোগসাজস?

এইভাবে মোট উনিশবার ফুল ফেলা হল, উনিশবার দেওয়াল-লিখন হল—তারপরেই আধবুড়ো লোকটা রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল ছেলেটার কাছে। প্যান্টের পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে ছেলেটা দিল আধবুড়োর হাতে। দুজনে মিলে দরজা খুলে ঢুকে গেল একটা বাড়ির মধ্যে।

বাড়িটা তিনতলা। নিচে দোকানপাট। ওপরের জানলাগুলো বন্ধ।

সদর দরজা খোলাই রয়েছে। ইন্দ্রনাথও ঢুকে গেল ভেতরে। সিমেন্ট বাঁধাই পুরোনো সিঁড়ি ওপরে উঠেছে দরজার ডানপাশ থেকে। দোতলার চাতালে দাঁড়িয়ে দেখল, লম্বা গলিপথ অন্ধকার। সব ঘর বন্ধ। এময় সময় কানে এল দুমদাম শব্দ তিনতলা থেকে। জিনিসপত্র ভাঙচুর চলছে।

এক-এক লাফে চারটে করে ধাপ টপকে তিনতলার চাতালে পৌঁছে গেল ইন্দ্র। লম্বা গলিপথে আলো এসে পড়েছে একটা খোলা দরজা দিয়ে। ঝড়ের বেগে পৌঁছল দরজার

সামনে, দেখল সেই আধবুড়ো আর ছেলেটা দুখানা চেয়ার মাথার ওপর তুলে মেঝেতে আছড়ে-আছড়ে ভাঙছে।

হুঙ্কার ছেড়ে চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল ইন্দ্রনাথ। সঙ্গে-সঙ্গে পেছনে শোনা গেল কৌতুক-তরল কণ্ঠস্বর—'সুপ্রভাত, ইন্দ্রনাথ রুদ্র।'

সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ইন্দ্র। দেখেছিল, কালো চশমাপরা, কালো দাড়িওলা, ঘি রঙের সাফারি সুট গায়ে এক সুদর্শন পুরুষ দাঁত বের করে হাসছে।

কড়া গলায় বলল ইন্দ্র, 'কে আপনি? এ সব কী হচ্ছে?'

পকেট থেকে একখানা একশো টাকার নোট বের করে আধবুড়ো আর ছেলেটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল সুদর্শন পুরুষ, 'তোমাদের কাজ শেষ। একশো টাকায় রফা হয়েছিল —দিয়ে দিলাম। যাও।'

কান এঁটো-করা হাসি হেসে দুই মূর্তিমান বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অক্ষত একটা চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলের পাশে বসল সুন্দরদেহী পুরুষ। বললে, 'বসুন ওই চেয়ারটায়। আস্ত আছে। চিনতে পারলেন না আমাকে?'

চোয়াল শক্ত করে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। বুঝল, বিরাট একটা রঙ্গ হচ্ছে তাকে নিয়ে।

সুদর্শন পুরুষ কালো চশমাটা খুলে বললে, 'এবার?'

পৈশাচিক ওই বেড়াল-চোখ কি ভোলা যায়? দাঁতে দাঁত পিষে ইন্দ্রনাথ বললে, 'চন্দ্রনাথ মল্লিক?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার ভাষায় আমি নাকি পাঁকাল মাছ। ধরেও ধরা যায় না। অবশ্য আমার মতোন সমাজবিরোধীর সঙ্গে টক্কর দিয়ে আপনি বেজায় খুশি হন—ঠিক কিনা?'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'ইয়ার্কি হচ্ছে?'

চন্দ্রকান্ত বললে, 'জীবনটাই বিষ হয়ে গেল আমার! আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি? ছিঃ! ছিঃ! আমি ডাকলে কি আপনি আসতেন? আসতেন না। তাই খেলিয়ে আনতে হল। রাস্তায় যদি না বেরোতেন—ওই দুজন অন্য খেলা দেখাত।'

'দরকারটা কী?'

'আপনাকে একটা মাথার খোরাক উপহার দিতে চাই—যা পেলে আপনি আনন্দ পান।'

ইন্দ্রনাথের এক চোখে বিরক্তি, আর এক চোখে কৌতূহল দেখা গেল।

চন্দ্রকান্ত কালো চশমাটা পরে নিয়ে বললে, 'কাল রাত এগারোটা নাগাদ বিদ্যাসাগর সেতুর তলা দিয়ে একটা লঞ্চ যাচ্ছিল। সেতুর ওপর থেকে একটা কাগজের প্যাকেট ফেলা হয় গঙ্গার দিকে—কিন্তু সেটা পড়ে লঞ্চের ওপর। এই সেই প্যাকেট।'

নীল নাইলন দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা কাগজের প্যাকেট টেবিলের ওপর রাখল চন্দ্রকান্ত মল্লিক। ইন্দ্রনাথ তাতে হাত দিল না। মুচকি হাসল চন্দ্রকান্ত। খুলল নাইলন দড়ির গিঁট। দুহাতে কাগজটাকে চেপে-চেপে মেলে ধরল টেবিলের ওপর। জিনিসগুলোকে সাজিয়ে রাখল কাগজের পাশে।

একটা ছোট ছোরা—ফলাতে লেগে শুকনো রক্ত। একটা পেতলের মোমবাতি স্ট্যান্ড—বেশ ভারি। একটা লাল সিল্কের স্কার্ফের আধখানা—তাতেও জায়গায়-জায়গায় লেগে শুকনো রক্ত। আর, একটা কাঁচি।

কেউ আর কথা বলছে না। ইন্দ্রনাথ চেয়ে আছে জিনিসগুলোর দিকে—চন্দ্রকান্ত চেয়ে আছে ইন্দ্রনাথের দিকে—তার মুখে দুর্জ্ঞেয় হাসি।

ইন্দ্রনাথের চোখ কিন্তু শক্ত হয়ে উঠেছে।

খুব আস্তে সে বললে, 'খুন হয়েছে একটি মেয়ে। পোশাকে শৌখিন।' বলে, কাগজটা উলটেপালটে দেখল, 'খুনি রেস খেলে। রেসের মরশুমে সন্ধের দিকে এই কাগজ বেরোয়। কিছু বাড়িতে কুরিয়ার ডেলিভারি দেয়। ব্রাউন র‍্যাপারের একটা কোণ আঠা লেগে সেঁটে রয়েছে কাগজে—এই র‍্যাপারে লেখা ছিল ঠিকানা।'—কাগজ রেখে তুলে নিল আধখানা স্কার্ফ। চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে রৌদ্রালোকিত জানলার কাচে চেপে ধরতেই দেখা গেল হাতের ছাপটা। রক্তমাখা হাতে স্কার্ফ খামচে ধরার ফলে পাঞ্জার ছাপ উঠেছে অসমানভাবে—কিন্তু এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, ছাপটা ডানহাতের।

ইন্দ্র বললে, 'খুনি ছোরা মারার পর ডানহাতে স্কার্ফ খামচে ধরে বাঁ-হাতে কাঁচি দিয়ে কেটেছিল—এই সেই কাঁচি। খুনি ল্যাটা।'

তন্ময় হয়ে শুনছে চন্দ্রকান্ত। মুখের হাসি অম্লান, 'তারপর?'

ইন্দ্রনাথ তখন দেখছে, স্কার্ফের প্রান্তের লাল ঝুমকো। সন্তর্পণে প্রতিটি লাল সুতো ফাঁক করে দেখবার পর খসে পড়ল একটা ছোট্ট জিনিস—খুট করে পড়ল মেঝেতে।

সঙ্গে-সঙ্গে চিতাবাঘের মতোন চেয়ার থেকে ছিটকে এসে ছোঁ মারতে গেছিল চন্দ্রকান্ত—তার আগেই বস্তুটা বাঁ-হাতে তুলে নিয়ে ডানহাত সামনে বাড়িয়ে ধরে বললে ইন্দ্রনাথ, 'তিষ্ঠ। আর এগোলেই বিপদ।'

বক্তা যে মিথ্যে বলছে না, তা বুঝল শ্রোতা। দাঁড়িয়ে গেল ওইখানেই। এখন কালো চশমার আড়ালে তার চোখ ধকধক করে জ্বলছে।

ইন্দ্র বললে, 'বুদ্ধি আছে তাহলে।' বলেই, দু-হাতে বস্তুটা ধরল চোখের সামনে। লাল সুতো দিয়ে ঘন প্যাটার্ন বুনে মোড়া হয়েছে জিনিসটাকে। নখ দিয়ে খুঁচিয়ে সুতো সরিয়ে দেখে নিল ইন্দ্র। দেখাল চন্দ্রকান্তকে।

বললে, 'লকেট। ওপরে লেখা রয়েছে 'মাউন্ট মেরি'। বম্বের কাছে এই চার্চে এরকম লকেট পাওয়া যায়। গলায় পরে থাকলে কপাল খুলে যায়—চন্দ্রকান্ত মল্লিক, মুখ দেখেই বুঝেছি, আপনি লকেট নয়—অন্য কিছু আশা করেছিলেন। তাই এত কষ্ট করে জিনিসগুলো বয়ে এনেছেন। খুনিকে আপনি চেনেন?'

'চিনি। নাম বলব না।'

'তার কাছেই জেনেছেন, মেয়েটাকে খুন করলে পাওয়া যাবে অত্যন্ত দামি একটা জিনিস। সাইজে ছোট হলেও খুব দামি।—রত্ন?'

'নীলকান্তমণি। দারুণ লাকি স্টোন। কিন্তু মেয়েটার নাম-ঠিকানা বলেনি পাছে আমি নীলকান্ত হাতিয়ে নিই। খুনির ঠিকানা? মাপ করবেন, আমরা নিচের তলার মানুষ, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা কখনও করি না। গঙ্গার ধারে কাছেই থাকে। খুঁজে নিন। এখন বাজে আটটা। পুলিশ লাশ নিয়ে নিশ্চয় মাথা ঘামাচ্ছে। যান, দেখুন যদি পান নীলকান্তমণি।'

'খুনি পায়নি?'

'না। মেয়েটার ঘরেই আছে। ভালো কথা, প্যাকেটের মধ্যে পেতলের মোমবাতি স্ট্যান্ড কেন ছিল, সেটা কিন্তু বলেননি।'

'প্যাকেট ভারি করবার জন্যে—যাতে জলে পড়েই ডুবে যায়।'

'কিন্তু পড়ল লঞ্চের ওপর। কার লঞ্চ? সরি, সিক্রেট আউট করা যাবে না। প্যাকেটের নাইলন দড়ির ব্যাখ্যাটা আমার মুখেই শুনে নিন। খুনি ওই দড়ি গলায় পেঁচিয়ে ঘাড় পর্যন্ত ভেঙে দেয়—ওস্তাদ কারিগর। দড়িটা সঙ্গে এনেছিল সেই কারণেই। চললাম।'

বলে, মিঠে হেসে, লম্বা-লম্বা পা ফেলে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল চন্দ্রকান্ত মল্লিক।

পুলিশের দপ্তর থেকে খবর নিয়ে নটা নাগাদ অকুস্থলে পৌঁছে গেল ইন্দ্রনাথ। রেসকোর্সের ধারে, ফ্ল্যাটবাড়ির তিনতলার লণ্ডভণ্ড ঘর, শুয়ে আছে মেয়েটা। বয়স তিরিশের মধ্যে। ফরসা, সুন্দরী, সুসজ্জিতা। প্রসাধনের পুরু প্রলেপ ভেদ করে ফুটে বেরুচ্ছে ভয়াবহ আতঙ্ক। পরপর দুবার ছোরা মারা হয়েছে বুকে। গোলাপী সালোয়ার কামিজ রক্তে ভিজে গায়ে লেপটে রয়েছে। ওড়নার বদলে লাল সিল্কের স্কার্ফ ব্যবহার করে মেয়েটি। কাঁচি দিয়ে কাটা আধখানা স্কার্ফ চেপে রয়েছে শক্ত মুঠোর মধ্যে।

গলায় কিন্তু নাইলন দড়ির ফাঁস লাগানো হয়নি। সাদা কোনও দাগ নেই, পুলিশ ডাক্তার বললেন, 'স্কার্ফ পেঁচিয়ে আগে দমবন্ধ করা হয়েছে—ছোরা মারা হয়েছে তার পরে।'

তদন্তকারী অফিসার বীরেন শাসমলকে ইন্দ্রনাথ বললে, 'খুনিকে ধরে দেব আজ রাতেই। কিন্তু আমার একটা কথা রাখতে হবে।'

'বলুন?'

'কাগজের এই প্যাকেটটা ততক্ষণ কাছে রাখব। ফেরত দেব খুনির সামনে।'

ধূর্ত চোখে সন্দেহ বিছিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রাজি হলেন আই. ও.।

তখন বাজে এগারোটা। বারোটা নাগাদ গঙ্গার ধারে এক নামী কুরিয়ার-এর অফিসে দেখা গেল ইন্দ্রনাথকে। ম্যানেজারের চেম্বারে বসে বললে, 'রেসের এই সান্ধ্য-দৈনিক কোন কোম্পানি পৌঁছে দেয় বাড়ি-বাড়ি?'

ম্যানেজার খুব চৌকস ছোকরা। নামেই মাদ্রাজি—বাংলা বলে যে-কোনও বাঙালির চাইতে ভালো। প্যাকেটের কাগজ দেখেই বললে, 'আপনাকে বেশি ঘুরতে হবে না। এ-কাগজ আমরাই ঘরে-ঘরে পৌঁছে দিই—আমাদের এলাকায়।'

'গত সন্ধ্যায় যাদের ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তাদের নাম-ঠিকানা দেবেন?'

'নিশ্চয়।'

আটজনের নাম-ঠিকানা নিয়ে বেরিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। সবই আলিপুর, খিদিরপুর, রেসকোর্স অঞ্চলে। ট্যাক্সি নিয়ে চতুর্থ ঠিকানায় পৌঁছে দেখল, সেটাও ফ্ল্যাটবাড়ি। খিদিরপুর অঞ্চলে। কেয়ারটেকার বললে, 'আশু দাস? কাল রাত আটটায় কাগজ ডেলিভারি হয়েছে—নটায় আমার কাছ থেকে নিয়ে বেরিয়ে গেছিলেন, ফিরেছেন রাত বারোটা নাগাদ।'

'ফ্ল্যাটে আছেন এখন?'

'খেতে বেরিয়েছেন। একা মানুষ তো—ব্যাচেলর। ফিরবেন এখুনি।'

'তাহলে বসে যাই,' বলে কেয়ারটেকারের টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে পড়ল ইন্দ্রনাথ।

আধঘণ্টাও গেল না। বটলগ্রীন কালারের একটা মারুতি ঢুকল উঠোনে। গাড়ি থেকে নামল ব্লু-জিনস্-এর প্যান্ট আর ইট রঙের ডবল-পকেট শার্ট পরা এক কৃশকায় পুরুষ। টকটকে ফরসা, হিলহিলে শরীর এবং বিলক্ষণ সুদর্শন। যদিও বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। সরু গোঁফের দু-চারটে সাদা চুলে তার আভাস রয়েছে।

একহাতে একটা ছড়ি নিয়ে সে দরজার সামনে এগিয়ে আসতেই কেয়ারটেকার বললে,

'আসছেন।'

ভেতরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা হিরো-হিরো চেহারার এক মানুষ তারই দিকে চেয়ে আছে দেখে প্রথমে থমকে দাঁড়াল আশু দাস। চোখে হিম চাহনি।

পরের মুহূর্তেই ঝট করে সরে গিয়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল পাশের দরজায়। ডানহাতে ছড়িটা সামনে বাড়িয়ে ধরে বাঁ-হাত চালান করলে পেছনে—খুঁজছে দরজার হাতল।

ইন্দ্রনাথ প্রথমে তাই ভেবেছিল। দরজার হাতল ঘুরিয়ে ভেতরে সটকান দেওয়ার ধান্দায় আছে আশু দাস। তাই ছড়ির ভয় না করে দু-পা সামনে এগোতেই মনে পড়ে গেল নিজেরই কথা—সকালেই বলেছিল চন্দ্রনাথকে।

খুনি ল্যাটা।

নিমেষে একপাশে ছিটকে গেছিল বলেই পর-পর দুটো বুলেটের কোনওটাই গায়ে লাগেনি। হিপ পকেট থেকে এত দ্রুত রিভলভার বের করার দৃশ্য কেবল সিনেমাতেই দেখা যায়।

তৃতীয়বার ট্রিগার টেপবার সময় দেয়নি ইন্দ্রনাথ।

আধঘণ্টার মধ্যে এসে গেলেন আই. ও. বীরেন শাসমল। ইন্দ্রনাথের রামরদ্দা খেয়ে বেহুঁশ আশু দাসকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে গেলেন তারই ফ্ল্যাটে। টু-রুম ফ্ল্যাট। খাটের ওপরেই পাওয়া গেল নীল নাইলন দড়ির একটা গোলা। প্যাকেটের দড়ি যে এই গোলা থেকেই কেটে নেওয়া হয়েছে, তা কাটা প্রান্ত দুটো মেলাতেই পরিষ্কার হয়ে গেল।

ইন্দ্র বললে, 'আশু দাস, আপনার জ্ঞান এখন টনটনে। পম্পাকে যে আপনিই খুন করেছেন, সে প্রমাণ আমাদের হাতে। কিন্তু, দড়ির ফাঁস না লাগিয়ে স্কার্ফ দিয়ে দমবন্ধ করলেন কেন?'

হিমচোখে ইন্দ্রনাথকে নিরীক্ষণ করে নিয়ে আশু দাস বললে, 'পম্পার লাভার নাকি?'

'আজ্ঞে না। তবে, আপনার মতোই ব্যাচেলর—কিন্তু চরিত্র খোয়াইনি। পম্পা সান্যাল তো বেলি ড্যান্সার। হোটেলে-হোটেলে নাচ দেখাত। লাকি নীলকান্তমণির খোঁজে পেছনে লেগেছিলেন? রিয়্যাল লাভ নয়? ছি!'

'পাওয়া গেছে নীলকান্ত?'

'গেছে,' ছোট্ট হাসল ইন্দ্রনাথ, 'এখুনি দেখবেন।'

'ঘরেই ছিল?'

'ছিল। আপনার চোখের সামনেই—আপনার হাতের মুঠোয়।'

'আমার হাতের মুঠোয়?'

'আমার প্রথম প্রশ্নের জবাব কিন্তু এখনও পাইনি। সঙ্গে নাইলন দড়ি নিয়ে গেছিলেন গলায় ফাঁস লাগাবেন বলে। কিন্তু দড়ি রইল পড়ে—প্যাঁচ দিলেন স্কার্ফ দিয়ে। কেন?'

আশু দাস নিরুত্তর।

জবাবটা দিল ইন্দ্রনাথই, 'স্কার্ফের ঝুমকোর গিঁট খুললেই নীলকান্তমণি পাবেন বলে। তাই না?'

'আমাকে তো তাই বলল।'

'হাতও চালালেন সঙ্গে-সঙ্গে। স্কার্ফ দিয়েই খতম। গিঁট খুললেন—দেখলেন 'মাউন্ট মেরি'র লকেট। ঘর তছনছ করলেন। কিচ্ছু না পেয়ে খুনের সব প্রমাণ গুছিয়ে নিলেন প্যাকেটে। এই সেই প্যাকেট। এর মধ্যে রাখলেন মোমবাতি স্ট্যান্ড। এই সেই স্ট্যান্ড। জমাট

মোম খোঁদল থেকে কেন বের করলেন না আশু দাস?'

বলে, খোঁদলের মোম খুঁচিয়ে বের করল ইন্দ্রনাথ।

দেখা গেল, নীল সূর্যের মতোন জ্বলন্ত সেই পাথর...নীলকান্ত মণি।

'নবকল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত। (শারদীয় সংখ্যা, ১৪০২)

মই

রবিনবাবুর বয়স ষাটের অধিক। খুব ফরসা। ঢ্যাঙা। খাড়াই নাক। চওড়া কপাল। চোখ দুটি কিন্তু এখনও উজ্জ্বল। মাথার সব চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। নাকের নিচে দুপাশে পাকানো একজোড়া গোঁফ আছে—সাদা। এমনকি ভুরুর চুল পর্যন্ত সাদা। পরনে গিলেহাতা আদ্দির পাঞ্জাবি এবং পায়জামা। হাতে রুপো বাঁধানো ছড়ি। রবিনবাবু একা আসেননি। গিন্নিকে এনেছেন। রবিনবাবুর তুলনায় তিনি অল্পবয়স্কা। সিঁদুর দিতে-দিতে মাথার দিকের চুল প্রায় উঠে গিয়েছে। ইনিও খুব ফরসা। সাদাপেড়ে সাদা সিল্কের শাড়ি দিয়ে সর্বাঙ্গ মুড়ে বস্তার মতো বসে আছেন। স্থূলাঙ্গী। সে তুলনার রবিনবাবু বেশ ছিপছিপে।

ছড়ির রূপো-হাতলে হাত বুলোতে-বুলোতে রবিনবাবু বললেন, 'ইন্দ্রনাথবাবু, এই হল ব্যাপার। জানলার নিচে শুধু মইটা পাওয়া গিয়েছে।'

গালের ব্রন খুঁটতে-খুঁটতে ইন্দ্রনাথ বললে, 'কীসের মই?'

'কাঠের।'

'আঙুলের ছাপ?'

'একদম নেই।'

'সেইসঙ্গে খোকাও নেই,' পাশ থেকে ডুকরে কেঁদে-ওঠা স্বরে বললেন রবিনবাবুর গিন্নি। ইন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'চলুন দেখে আসি।'

রাসবিহারী এভিন্যুর ওপরে বাগানওলা বাড়ি যে কজনের আছে, নিঃসন্দেহে তারা বিত্তবান। রবিনবাবুও এই মুষ্টিমেয়দের মধ্যে পড়েন। চা-বাগান আছে, কয়লার খনি আছে। সুতরাং লক্ষ্মীর পায়ে শেকল পরিয়ে রেখেছেন সিন্দুকের মধ্যে। দোতলার বিরাট চওড়া বারান্দায় দাঁড়ালে বড় রাস্তা দেখা যায় আউট হাউসের মধ্যবর্তী গেটের মধ্যে দিয়ে! আউট হাউসে এইমাত্র ঘুরে এসেছে ইন্দ্রনাথ। জিজ্ঞাসাবাদ করে নতুন কিছু জানা যায়নি। এস্টেটের কর্মচারী, দারোয়ান, চাকর সে রাতে ঘর ছেড়ে বেরোয়নি তুমুল বৃষ্টির জন্যে। তাই দেখেনি কাউকে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হেঁট হয়ে মইটার দিকে তাকিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। পুলিশ বিশেষজ্ঞরা ওই মই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু কিডন্যাপার অতিশয় ধুরন্ধর। আঙুলের ছাপ রেখে যায়নি, কোথাও কোনও সূত্র ফেলে যায়নি। শুধু ওই মইটা ছাড়া।

বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়ে হেঁট হয়ে মই নিরীক্ষণ করতে-করতে ইন্দ্রনাথ বললে,

'মৃগ, এরকম মই তো ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে বিস্তর পাওয়া যায়, তাই না?'

'হ্যাঁ। ঘরাঞ্চি ঠিক নয়, বাঁশের মইও নয়। প্যাকিং কাঠ কেটে তৈরি।'

মইয়ের ওপরের ধাপটা ঈষৎ চওড়া। অন্যান্য ধাপের মতো সরু নয়। কাঠটাও অন্যরকম। সাদাটে। গোটা মইটা কিন্তু নীলচে কাঠের তৈরি।

ইন্দ্রনাথ চেয়েছিল ওই ওপরের ধাপের দিকেই।

চেয়ে থাকতে থাকতেই বললে মৃদু কণ্ঠে, 'মৃগ, ধাপটার গায়ে কতকগুলো ফুটো রয়েছে।'

'পেরেকের ফুটো', বললাম আমি। 'প্যাকিং কেস ভাঙা কাঠে অমন থাকে।'

'ফুটোর মধ্যে মরচে নেই।'

'তার মানে বাক্সটা রোদে জলে বেশিদিন থাকেনি,' বললাম আমি।

'কাঠটার রং এদেশি কাঠের মতো নয়।'

'কারণ ওটা বিদেশি কাঠ। বিলিতি পাইন। কাঠের শুঁয়ো দেখছিস না কত মিহি। রঙটাও সাদা। সাহেবদের দেশের কাঠ তো।'

'সদ্য কেনা মই। কিডন্যাপিংয়ের জন্যেই যদি কেনা হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দোকান থেকে কেনা?'

'তার কোনও মানে নেই,' বললাম আমি। 'কিডন্যাপার যদি বালিগঞ্জ অঞ্চলের মানুষ হয়, তাহলে এপাড়া থেকেই কিনতে পারে।'

'এদিকে এরকম দোকান আছে?'

'আছে। কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলেও আছে। নিউমার্কেটের পেছনে ওদের বড় ঘাঁটি।'

আর কোনও কথা বলল না ইন্দ্রনাথ। প্রখর হল চক্ষু। হাত বাড়িয়ে মইটা টেনে আনল বারান্দার ওপর।

'কী দেখছিস?' শুধোই আমি।

নিরুত্তরে ওপর ধাপটার দিকে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। অনেকক্ষণ পরে সঙ্কুচিত চোখে বললে আস্তে-আস্তে, 'কাঠটা র‍্যাঁদা দিয়ে চাঁচা হয়েছে দেখছি।'

'তা তো হবেই,' দুই ভুরু কাছাকাছি এনে বন্ধুবরের দৃষ্টিরেখা অনুসরণ করলাম, ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না র‍্যাঁদা দিয়ে কাঠ চাঁচা নিয়ে মন্তব্য করা হল কেন।

ইন্দ্র বললে, 'র‍্যাঁদা জোরে চাপার দরুন মাঝে-মাঝে কাঠের গায়ে বসে গিয়ে আটকে গিয়েছে। যেখানে-যেখানে এইভাবে আটকেছে, সেই-সেই জায়গায় তাকালেই বুঝবি, র‍্যাঁদাটা ভাঙা।'

'র‍্যাঁদা ভাঙা!'

'হ্যাঁ, ফলাটার মাঝখানে সামান্য ভাঙা ফাঁক আছে। সেই ফাঁকা জায়গায় কাঠ কাটেনি—উঁচু হয়ে রয়েছে।'

'ভারি আবিষ্কার করলি!' বললাম তাচ্ছিল্যের সুরে, 'তোর আগেই ফোরেনসিক এক্সপার্টরা ও জিনিস দেখেছে। তাঁরা নিশ্চয় ঘাস কাটেন না।'

'না, না, ঘাস কাটবেন কেন।—এমনি বললাম। নন্দনের হদিশ কি আর ওই ভাঙা র‍্যাঁদা থেকে বেরোবে।—তাই মাথা ঘামাননি।'

কান্নাজড়ানো কণ্ঠস্বর শুনলাম পেছনে, 'ইন্দ্রনাথবাবু, তাহলে কি খোকাকে পাওয়া যাবে না?'

রবিনবাবুর স্ত্রী। নন্দনের গর্ভধারিণী। নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল পেছনে।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'দেখুন আমার যথাসাধ্য আমি করব। —তার আগে বাড়ির সবাইকে দেখতে চাই।'

'কুন্দনকে ডাকব?'

'ডাকুন।'

আয়নার মতো চকচকে মার্বেল মেঝের ওপর শুভ্র নগ্ন পা ফেলে একজন সুদর্শন তরুণ এসে দাঁড়াল সামনে। বয়স কুড়ি-বাইশের বেশি নয়। সুকুমার মুখশ্রী। গড়ুর নাসিকা। সুদীর্ঘ চোখ। কৃষ্ণকালো মণিকায় সুগভীর ব্যঞ্জনা। দীর্ঘদেহী কন্দর্পকান্তি এই তরুণ যে শিল্পচেতনায় উদ্বুদ্ধ তার প্রমাণ ওই চোখে। বেশভূষা সাদাসিধে। খদ্দরের ঢিলেহাতা পাঞ্জাবি আর ধুতি। এই হল রবিনবাবুর প্রথমপক্ষের সন্তান। মাত্র এক বছরের শিশুকে আয়ার হাতে সঁপে দিয়ে তিনি ধরাধাম ত্যাগ করেছিলেন কর্কট রোগের আক্রমণে।

অপরিসীম মাতৃস্নেহ দিয়ে শিশু কুন্দনকে কৈশোরের সিংহদ্বারে নিয়ে এসেছিলেন এই আয়া। নাম সুচরিতা। কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করেছিলেন রবিনবাবু আয়াকে স্ত্রীর আসনে অভিষিক্ত করে। কুন্দনের বয়স তখন পনেরো। নন্দন এল বছর ঘুরতেই। সমান স্নেহ দিয়ে নন্দন আর কুন্দনকে সিঞ্চিত করে চললেন সুচরিতা। গর্ভধারিনী নন বলেই বরং কুন্দনের প্রতি তাঁর স্নেহ বর্ষিত হল একটু অধিক পরিমাণেই।

পাঁচ বছরের সেই নন্দনই দুদিন আগে নিখোঁজ হয়েছে। তার মায়ের ঘর থেকে। মই বেয়ে দোতলার বারান্দায় উঠেছে কিডন্যাপার। সুচরিতাকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে। নন্দনকে নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে বৃষ্টিঝরা অমানিশায়।

রেখে গিয়েছে শুধু একটি চিঠি। কয়েক লাইনের বাংলা চিঠি। তাতে লেখা ঃ

'অ্যানথ্রপলজিস্ট স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন ফিংগ্রারপ্রিন্টের প্রথম পরীক্ষা চালিয়েছিলেন ভারতবর্ষে। ড্যাকটিলোগ্রাফি আজকে একটা মস্ত বিজ্ঞান। কিন্তু ওপথে আমাদের ধরা যাবে না। আঙুলের ছাপ রইল না কোথাও। নন্দনকে ফিরিয়ে দেব শুধু টাকার বিনিময়ে। দশ লাখ কি খুব বেশি হল? কালো টাকার পাহাড় জমিয়েছেন মনে নেই?

বৈভব যদি অধিক প্রিয় হয়, নন্দনের লাশ ফেরত দিয়ে যাব। আর যদি তা না চান তো বাগানের রাধাচূড়ায় একটা সাদা কাপড় ঝুলিয়ে রাখবেন সামনের পূর্ণিমায়। টাকা সংগ্রহ করব পরে। আমরা বিজ্ঞান-জানা তরুণ দল। গোয়েন্দাও বটে। থানা পুলিশ করলে টের পাব পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। লাশ পাবেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে।'

ইন্দ্রনাথ তাই প্রথমে জিগ্যেস করেছিল, 'এই চিঠি পাওয়ার পরেও থানা পুলিশ করলেন? আপনার সাহস তো কম নয়?'

রবিনবাবু শুকনো হেসে বলেছিলেন, 'প্রশংসাটা সুচরিতার প্রাপ্য। আমার চেয়ে ওর মনের জোর বেশি।—এই দেখুন না, পুলিশ প্রকারান্তরে আমাকে দশ লাখ টাকা দিতে বলায় সুচরিতাই টেনে এনেছে আপনার কাছে।'

সেই সুচরিতা আর কুন্দন দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে। ধাত্রীজননীর গা-ঘেঁষে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে কুন্দন, যেন মহীরুহের পাশে লতাটি।

চোখ মুছে সুচরিতা বললেন, 'এই আমার বড় ছেলে কুন্দন। বড় ভালো ছেলে। স্কুলে কখনও সেকেন্ড হয়নি। এখন ঢুকেছে আর্ট কলেজে।'

ইন্দ্রনাথ শুধু বললে, 'দেখেই বুঝেছিলাম।'

কুন্দন মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। ছেলেটি প্রকৃত শিল্পী। অন্তর্জগত নিয়েই তন্ময়।

সুচরিতা গর্বিত সুরে বললেন, 'ওর স্টুডিও দেখলে আপনার তাক লেগে যাবে। একাই একশো। কখনও কুমোর, কখনও পটুয়া, কখনও ছুতোর। সবরকম হাতের কাজের ব্যবস্থা আছে একতলায়।'

'একতলায়?'

'হ্যাঁ, ওইখানেই ওর স্টুডিও। ছেলের আমার বন্ধুটন্ধু তেমন নেই। দিন রাত ওই স্টুডিওতেই মাটি ডলছে নয় তো তুলি চালাচ্ছে, অথবা র‍্যাঁদা ঘষছে।'

র‍্যাঁদা শব্দটা শুনেই আপনা হতে আমার চোখ নেমে এল পায়ের কাছে রাখা মইয়ের দিকে।

ইন্দ্রনাথ হেসে বললে, 'তা হলে তো স্টুডিওটা একবার দেখে আসতে হয়।

মৃদু আপত্তির সুরে কুন্দন বললে, 'বড় নোংরা সেখানে—।'

'হোক। তবুও স্টুডিও তো।—তোমার আপত্তি না থাকলে—'

'না, না, আপত্তি কীসের! আসুন।'

নিখোঁজ নন্দনের তদন্তে এসে শিল্পী কুন্দনের শিল্পপ্রতিভা নিয়ে ইন্দ্রনাথের হঠাৎ আগ্রহ আমাকে বিস্মিত করেনি। র‍্যাঁদা শব্দটি ওর মনেও সাড়া ফেলেছে নিশ্চয়।

একতলায় পশ্চিমদিকের একটি বড় ঘর। জানালার পাশেই রাধাচূড়া। ঘরের এক দেওয়ালে আলমারি ঠাসা বই। টেবিলের ওপর হ্যান্ডব্যাগের খোপে কমপ্লিট ডু-ইট-ইওরসেলফ্ ম্যানুয়েল। আর একদিকের দেওয়ালে থরে-থরে সাজানো বিভিন্ন সাইজের তুলি, রঙের শিশি, ছুতোরের যন্ত্রপাতি। আরেক দেওয়ালের গায়ে কাঠ আর মাটির স্তূপ। ঘরের মাঝখানে ইজেল আর কুমোরের চাকা, ছুতোরের বেঞ্চি, আর একটা অর্ধসমাপ্ত মৃণ্ময় মূর্তি।

বিমুগ্ধ বিস্ময়ে চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ, 'বাঃ! কুন্দনের দেখছি বহুমুখী প্রতিভা।'

পুত্রগর্বে গর্বিতা সুচরিতা বলে উঠলেন, 'কাঠের চেয়ারবেঞ্চি আর মাটির মূর্তি বানিয়ে ও কী করে জানেন?'

'কী?'

'বিক্রি করে। সেই টাকা অন্ধদের স্কুলে দান করে।'

এবার আমিও বিস্মিত হলাম। এ যে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। বাপ কালো টাকার হিমালয় রচনা করেছেন—ছেলে প্রায়শ্চিত্ত করছে নিজের গতর দিয়ে।

কুন্দন মাথা হেঁট করে বললে, 'মা তুমি থামো।'

সস্নেহে কুন্দনকে ধমকে উঠলেন সুচরিতা, 'তুই থাম।'

স্মিতমুখে মা ছেলের কথা শুনতে-শুনতে যন্ত্রপাতির তাকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। আমার চোখ নিমেষে অনুসরণ করল ওকে। সর্বাগ্রে একটি র‍্যাঁদা তুলে নিয়ে উলটেপালটে দেখল ইন্দ্রনাথ। সব শেষের র‍্যাঁদাটির ফলার পানে অনিমেষে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর গেল বিপরীত দিকের দেওয়ালে। সেখানে কাঠের স্তূপ আর মাটির গাদা। শিকারি কুকুর যেমন গন্ধ শুঁকে-শুঁকে খরগোসের কান টেনে বার করে, বন্ধুবরও সন্ধানী চোখে তাকিয়ে কাঠের গাদা থেকে টেনে তুলল এক টুকরো কাঠ। বিলিতি পাইন কাঠ। কাঠটার গায়ে কতকগুলো পেরেকের ফুটো। ফুটোগুলো যে প্যাটার্নে রয়েছে, সেই একই প্যাটার্নে পেরেকের ফুটো একটু আগেই আমি দেখে এসেছি দোতলায় রাখা কাঠের মইতে।

ওপরের ধাপের কাঠটা কেটে নেওয়া হয়েছে এই কাঠ থেকেই।

চোখ তুলল ইন্দ্রনাথ। ধীরে-ধীরে পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেল মুখ। বললে মৃদু কঠিন কণ্ঠে, 'ছিঃ কুন্দন! সম্পত্তির লোভটাই বড় হল!—কোথায় রেখেছ নন্দনকে?'

কুন্দন যে 'গুডি' টাইপের গুড বয় নয়, তার প্রমাণ পেলাম পরক্ষণেই। আস্ত একটা ভিজে বেড়াল। এতক্ষণ মাথা হেঁট করে থাকা শান্ত মানুষটাই নিমেষে যেন জ্বলে উঠল। ইন্দ্রনাথের মৃদু কঠিন কণ্ঠের তীব্র শ্লেষ যেন সেই, দেশলাইয়ের আগুন। ছুঁয়ে গেল বারুদের স্তূপ। ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো টান-টান চেহারায় কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পরেই ঘৃণাকুটিল কণ্ঠে শুধু বললে, 'আপনি...আপনি।'

বলেই লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল যন্ত্রপাতির দেওয়ালের সামনে, খপ করে তুলে নিল একটা তুরপুন এবং ছোরার মতো উঁচিয়ে তেড়ে এল ইন্দ্রনাথের পানে।

চকিতের মধ্যে শক্ত হয়ে গেল ইন্দ্রনাথের দেহ। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে কুন্দনকে জাপটে ধরলেন সুচরিতা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বললেন, 'কুন্দন! কুন্দন!'

'মা!' হাঁফাচ্ছে কুন্দন, 'তুমি ছাড়ো—'

'কুন্দন! শেষে তুই!'

'মা!'

'কুন্দন!' বলতে-বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন সুচরিতা।

পাথর হয়ে গেল কুন্দন। শিথিল হাত থেকে খসে পড়ল তুরপুন।

'মা...আমি....আমি!'

নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন সুচরিতা।

ঝড়ের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল কুন্দন। যাওয়ার সময়ে বিষদৃষ্টি হেনে গেল ইন্দ্রনাথের পানে।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগলেন সুচরিতা।

কাছে গিয়ে নিবিড় কণ্ঠে বললে ইন্দ্রনাথ, 'রবিনবাবু উইল করে ফেলেছেন নিশ্চয়?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন সুচরিতা।

'কাকে কত দিয়েছেন?'

অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বললেন সুচরিতা, 'দশ আনা ছ'আনা। মা নেই বলে দশ আনা কুন্দনকে। তাতেও ও খুশি নয়। ছ'আনার লোভে ছোট ভাইকে—'বলতে-বলতে চোখ থেকে আঁচল নামিয়ে বললেন, 'খোকাকে পাব তো?'

'নিশ্চয় পাবেন। আপনিই তাকে ফিরিয়ে আনবেন।'

'আমি! আমি কী করে জানব—!'

'জানেন বইকি সুচরিতা দেবী,' অদ্ভুত স্বরে বললে ইন্দ্রনাথ।

'কী বলছেন—!'

স্ক্রু-প্যাঁচালো চোখে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। তারপর খপ করে ছুতোরের টেবিল থেকে পেনসিল তুলে নিয়ে খস-খস করে লিখল সাদা দেওয়ালে....

দু-টুকরো স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল সুচরিতার গোলগাল ফরসা মুখের অক্ষিগহ্বরে।

•

ইন্দ্রনাথ কী লিখল দেওয়ালে?

মাতৃস্নেহের চরম পরীক্ষা এসেছিল ধাত্রী জননীর জীবনে—উইল লেখবার সময়ে।

নাড়ী ছেঁড়া ধনকে সব পাইয়ে দেওয়ার অভিলাষে ছোট্ট একটি চক্রান্ত করেছিলেন সুচরিতা। রবিনবাবুর মন যাতে প্রথম পুত্রের ওপর বিষিয়ে যায়, তাই লোক লাগিয়ে নন্দনকে কিডন্যাপ করিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্যে। ক্লোরোফর্মে বেহুঁশ হয়ে শুয়েছিলেন নিজে-নিজে। ভাড়াটে কিডন্যাপার আঙুলের ছাপ কোথাও রাখেনি—কিন্তু মইটি রেখে গিয়েছে। মই মেরামতের টুকরো কাঠটিও রেখে দেওয়া হয়েছিল কুন্দনের স্টুডিওতে—ওরই র‍্যাঁদা দিয়ে চাঁচা হয়েছিল মইয়ের কাঠ। স্বামীকে সুচরিতাই জোর করে পাঠিয়েছিলেন থানায়। থানা আমোল না দেওয়ায় ইন্দ্রনাথের কাছে। সূত্র প্রমাণগুলো রহস্যসন্ধানীর চোখে ধরা পড়লেই ভাড়াটে কিডন্যাপারকে দিয়ে ফিরিয়ে আনত নন্দনকে।

কিন্তু ইন্দ্রনাথের খটকা লাগল ছেলের লাশ দেখবার ঝুঁকি নিয়েও থানা পুলিশ ডিটেকটিভদের শরণাপন্ন হওয়ার আগ্রহ দেখে। আগ্রহটা একা সুচরিতারই। মায়ের জাত তো এরকম হয় না!

তাই দেওয়ালে লিখল ইন্দ্রনাথ—'পেটের বাচ্চা আর সতীন কাঁটা কখনও সমান হয়?'

**'দক্ষিণী বার্তা' পত্রিকায় প্রকাশিত। (শারদীয় সংখ্যা, ১৯৭৭)*

ব্ল্যাকমেল

'বলুন, আমি ইন্দ্রনাথ রুদ্র বলছি।'

'নমস্কার। আমার নামটা টেলিফোনে বলতে চাই না। কিন্তু দেখলেই চিনবেন।'

'দেখা করতে চান?'

'হ্যাঁ। আজ রাত দশটায়। যখন আপনি একা থাকবেন। বিষয়টা অত্যন্ত গোপনীয়। আমার কেস যদি টেক-আপ না-ও করেন, আপনি ছাড়া কেউ আর তা জানবে না—এই শর্তে যদি রাজি থাকেন, তাহলে আসব।'

'আসুন।'

'আমি নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে যাব। সাদা অ্যামবাসাডর। সব কাচ তোলা থাকবে। আপনি কাইন্ডলি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আশপাশে যখন কেউ থাকবে না, আমি গাড়ি থেকে নেমে আপনার বাড়ি ঢুকব।'

'তাই হবে।'

'লাস্ট রিকোয়েস্ট। অফেন্ডেড হবেন না। আপনার প্রফেশনাল ইথিক্স্-এর ওপর আমার বিশ্বাস আছে বলেই আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি।'

'বুঝেছি। ঘরে টেপ রেকর্ডার জাতীয় কোনও 'বাগিং ডিভাইস' যেন না থাকে—এই তো?'

অস্ফুট হাসি ভেসে এল তারের মধ্যে দিয়ে। তারপরেই রিসিভার নামিয়ে রাখার আওয়াজ।

রাত ঠিক দশটায় সাদা অ্যামবাসাডর ব্রেক কষল সুভাষ সরোবরের পাশে একতলা বাড়ির সামনে। গাড়ির সব কাচ তোলা। ধোঁয়াটে ফিল্ম লাগানো বলে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না চালককে।

ইন্দ্রনাথ ডাইনে-বাঁয়ে দেখে নিল। কেউ নেই। এ সময়ে সুভাষ সরোবর বলতে গেলে ফাঁকাই থাকে। এগিয়ে গেল গাড়ির দরজার সামনে।

খুলে গেল দরজা। সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরা মধ্যবয়স্ক নাতিদীর্ঘ ভদ্রলোক নেমে এসেই ইন্দ্রনাথের পাশ দিয়ে গেট পেরিয়ে দাওয়ায় উঠে, ঢুকে গেলেন ঘরের মধ্যে।

গেট বন্ধ করে দিয়ে ইন্দ্রনাথ ঢুকল তারপর। দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রাতের অতিথির দিকে।

মাথার ওপর ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছে। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন ঠিক তার নিচে। মাথায় বড় জোর পাঁচ ফুট। না-রোগা না-মোটা। বয়স পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে। সে অনুপাতে মাথার চুল বেশ পেকেছে। কপালের ওপর থেকে চুল উঠে গেছে। উঁচু চওড়া কপাল আরও চওড়া হয়েছে। বাঁদিকে সিঁথি। বেশি পেকেছে জুলপির চুল এবং অস্বাভাবিকভাবে চোয়ালের হাড় চাপা দিয়ে ঝুলছে ঘাড় পর্যন্ত। দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। ভুরুর লম্বা-লম্বা চুল কখনও উঁচিয়ে রয়েছে, কখনও ঝুলে পড়েছে। নাক সিধে আর শক্ত। ঠোঁট চাপা আর কঠিন। লম্বা জুলপির আড়ালে চোয়ালের হাড়ও যে বিলক্ষণ কঠোর, তা আন্দাজ করে নেওয়া যায় গ্র্যানাইট মুখাবয়ব আর প্রদীপ্ত চোখ দেখলে। এঁর এই চোখ আর এই জুলপি কার্টুনিস্টদের কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে। ছোটখাট মানুষটার শক্ত ধাতকে ফুটিয়ে তুলতে বেগ পেতে হয় না। পার্লামেন্টে অথবা জনসভায় ইনি যখন উঠে দাঁড়াল—থমথমে নৈঃশব্দ্য নেমে আসে চারপাশে। এমনই এঁর ব্যক্তিত্ব আর বাগ্মিতা। প্রজ্ঞা আর পাণ্ডিত্য।

কিংবদন্তিসম সেই সম্মোহনী চাহনি ইন্দ্রনাথের ওপর নিবদ্ধ রেশমমসৃণ কণ্ঠস্বরে তিনি বললেন, 'ইন্দ্রনাথবাবু, আমি যে বিপদে পড়েছি, তার সমাধান আমার ব্ল্যাককোট কমান্ডোরা করতে পারবে না। কারণ আমাকে ব্ল্যাকমেল করছে একটি মেয়ে—যাকে নিয়ে এক সময়ে আমি মাতামাতি করেছিলাম—একটু বেশিমাত্রায় করেছিলাম—বুঝতেই পারছেন কী বলতে চাইছি—এর বেশি বলা সমীচীন নয়—আজ আমি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র বলেই ইন্ডিয়ার হাল ধরতে পেরেছি—আমার ইন্টারন্যাশনাল ইমেজ অতিশয় উজ্জ্বল—গোটা ইন্ডিয়ার ফিউচার নির্ভর করছে আমার নীতি নির্ধারণের ওপর। কিন্তু এই মেয়েটি যদি তার স্মৃতিচারণ ছেপে বের করে দেয়, তাহলে সবাই জানবে, আমার ভেতরেও দুর্নীতি আছে, আমি চরিত্রহীন, দেশের ভার আমার হাতে রেখে দেওয়া নিরাপদ নয়। আমি তো ডুববই, নেক্সট ইলেকশনে আমার পার্টিও মুছে যেতে পারে।'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'বসুন।'

পাশাপাশি বসল দুজনে। একই সোফায়।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি ডিকেটটিভ গল্প পড়তে ভালোবাসি ছেলেবেলা থেকেই। আপনার কাহিনি অনেক পড়েছি। অনেক উঁচুতে উঠে গেছি বলে, আর দরকার হয়নি বলে, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়নি। আজ আমি হাতে অনেক সময় নিয়ে এসেছি—কাল ভোরের ফ্লাইটে দিল্লি ফিরে যাব। দরকার হলে সারারাত আপনার সঙ্গে গল্প করব। তাতে আমার টেনশন কাটবে।' টেনশনের শিখরে যাঁরা বসে থাকেন, টেনশন তাঁদের চোখেমুখে প্রকাশ পায় না। কণ্ঠস্বরে তো নয়ই। কণ্ঠস্বরে তো নয়ই। ইন্দ্রনাথ শুধু চেয়ে রইল।

তিনি বললেন, 'কোনান ডয়ালের 'চার্লস অগাস্টাস মিলভারটন' আপনি পড়েছেন, আমিও পড়েছি। ব্ল্যাকমেলার মিলভারটন-এর গল্পটা প্রথম ছেপে বেরয় কোলিয়ার্স ম্যাগাজিনে—১৯০৪ সালে। জানেন? তারিখটা ইন্টারেস্টিং। কেননা, ব্ল্যাকমেলাররা তাদের ক্রাইম অবাধে চালিয়ে গেছে সমাজে—সবই ধামাচাপা পড়েছে। শার্লক হোম্স্ ওয়াটসনকে বলেছিলেন, চিড়িয়াখানার মাপের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে কিলবিলে, হড়হড়ে, পিচ্ছিল, ক্লেদাক্ত প্রাণীগুলোর কালো মৃত্যুর মতো চকচকে চোখ আর কুটিল, চ্যাপ্টা মুখের দিকে তাকালে তোমার গা শিরশির করে না? আপাদমস্তক রি-রি করে ওঠে না অপরিসীম ঘৃণায়? সারাজীবনে পঞ্চাশজন খুনির সঙ্গে বুদ্ধির পাঞ্জা লড়েছি আমি, কিন্তু ওদের মধ্যে সবচেয়ে বদ লোকটার নাম শুনলেও আমার এতটা ঘৃণা আর বিদ্বেষ জাগে না, যতটা হয়, এই লোকটার নাম শুনলে। ওর ছায়া মাড়াবার প্রবৃত্তিও আমার নেই।—ইন্দ্রনাথবাবু, শার্লক হোমসের কথার প্রতিধ্বনি করে বলতে ইচ্ছে করছে, এই মেয়েটার হাতে লেখা চিঠি দেখলেও আমার গা শিরশির করে ওঠে।'

ইন্দ্র বলে, 'চিঠিতে ব্ল্যাকমেল করছে?'

'হ্যাঁ। এক্সিকিউটিভ বন্ড পেপারের মোটা সাদা খাম দেখলেই আজকাল আমার গা ঘিনঘিন করতে থাকে। বিশেষ করে সেই খামে যখন সবুজ কালি দিয়ে লেখা থাকে আমার নাম—অতিশয় চেনা হাতের লেখা—একটা সময় যখন এই হাতের লেখা দেখবার জন্যে পাগল হয়ে থাকতাম—আর এখন? বুক গুড়-গুড় করে।'

'আপনার?'

হাসলেন ভদ্রলোক। সীমিত হাস্য। যান্ত্রিক হাসিও বলা যায়। মনের হালকা রসকে প্রকাশ করবার এই ক্ষমতা ঈশ্বর দিয়েছেন শুধু মানুষকে। কিন্তু এই মানুষটার সেন্টিমিটার দিয়ে মাপা ক্ষীণ হাসিতে হালকা রস প্রকাশ পেল না—নিঃসীম তিক্ততা ছাড়া সেখানে কিছুই নেই।

বললেন, 'আমি অকুতোভয়—সব্বাই তা জানে। কিন্তু আমার মনেও ভয়ের সঞ্চার করতে পেরেছে কন্যাকুমারিকা।'

'তার নাম?'

'হ্যাঁ। ইন্দ্রনাথবাবু, আমার অতীত পাঁচজনকে বলবার মতোন নয়। কামারপুকুরের পাশে বিশ বিঘে জমির মালিক ছিলেন আমার দাদু। ভট্টচাজ্যি বামুন। যজমান ছিলেন, গরু-লাঙ্গলও ছিল। আমার ছয় পিসি, বাবারা চার ভাই। আমার বাবা সবচেয়ে বড়। তিনি কলকাতার একটা জুটমিলে ক্যান্টিন সুপারভাইজার ছিলেন। দুই ছেলে থাকত তাঁর কাছে—কলকাতায়। আমি আর আমার মেজোভাই থাকতাম দাদু-দিদিমার কাছে। বাবা মাসে-মাসে টাকা পাঠিয়ে দিতেন। দাদু-দিদিমা তখন খুব ভালোবাসতেন আমাকে। জুটমিল বন্ধ হয়ে যেতেই বাবা আর মা দুই ভাইকে নিয়ে চলে গেলেন দেশে। অত্যাচার শুরু হল আমার ওপর। দশটা গরু দেখতে হবে, যজমানদের দেখতে হবে, বাড়ির ঠাকুরঘরগুলোর দেখাশুনো করতে হবে—তারপর যদি সময় থাকে—স্কুলের পড়াশুনো করতে পারব। তাই করেছিলাম—রাত তিনটেয় উঠে সব কাজ সেরে পড়তে যেতাম। অঙ্ক পরীক্ষার আগে তিনদিন একটু বেশি তৈরি হতে চেয়েছিলাম। ছোটকাকা কোনও কাজ করত না। তাকে বলেছিলাম—এই তিনটে দিন তুমি সামলাও। সে আমাকে যাচ্ছেতাই বলে বেরিয়ে গেল বাজারে আড্ডা মারতে।

দাদু আর দিদিমাকে বলতে গেলাম—তেনারা রেগে গেলেন। সব শেষের কথা, কাজ না করলে বাড়ি থেকে বিদেয় হও—পড়াশুনো গোল্লায় যাক।

'ইন্দ্রনাথবাবু, পরের দিন ভোর ছ'টা পাঁচের ট্রেনে কলকাতা রওনা হলাম। শিয়াখালায় টিকিট চাইতেই স্টেশনে নেমে পড়লাম। তখন মনে পড়ল, এখানে একজন কালীসাধক জ্যোতিষী থাকেন। তিনি শুধু মুখ দেখে ভবিষ্যৎ বলে যান। চলে গেলাম তাঁর ডেরায়। তিনি মন্দির থেকে পুজো শেষ করে বেরচ্ছিলেন। চৌকাঠে পা রেখেই আমাকে দেখলেন। দেখেই বললেন, 'যা, যা, তুই অনেক বড় হবি। শিগগিরই একটা মেয়ের পাল্লায় পড়লি—সে তোকে অনেকদূর নিয়ে যাবে।

'সেই মেয়েই এই কন্যাকুমারিকা। জ্যোতিষীর ওখান থেকে শিয়াখালা স্টেশনে চলে এসেছিলাম। আমার দূর-সম্পর্কের এক দাদু দাঁড়িয়েছিলেন—কলকাতায় যাবেন বলে। তিনিই আমাকে নিয়ে এসে ফেললেন এই বেলেঘাটায়। তখন এই অঞ্চলের এত রমরমা ছিল না। সুভাষ সরোবর ছিল না। বাইপাস ছিল না। শুধু ভেড়ি আর জঙ্গল। জোড়ামন্দিরের উলটোদিকে মসজিদের সামনেও এত দোকান ছিল না। ওইখানে একটা রঙের কারখানায় দারোয়ানের কাজ পেলাম। একটা বিরাট বাগানঘেরা পাথরের মূর্তি দিয়ে সাজানো চারতলা বাড়িতে রঙের কাজ চলছিল। তখনকার আমলে চারতলা বাড়ি যাদের থাকত, তারা কত বড়লোক হত বুঝতেই পারছেন। এদের ছিল ভেড়ির কারবার। এই বাড়িতে রং নিয়ে যেতাম। মিস্ত্রিদের কাজের তদারকি করতাম। আলাপ হল কন্যাকুমারিকার সঙ্গে। বাড়ির একমাত্র মেয়ে। একমাত্র সন্তানও বটে। বড় আদুরে। খামখেয়ালি। দাদুর চোখের মণি। তার ইচ্ছেতেই চলে এলাম বড় বাড়িতে। তার ইচ্ছেতেই মাস্টারের কাছে নতুন করে পড়াশুনো শুরু করলাম। এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে ধাপে-ধাপে তুলে নিয়ে গেল শিক্ষাদীক্ষার শিখরে। আজকের রাম ভট্টাচার্য তাই চিরকাল ঋণী থাকবে কন্যাকুমারিকার কাছে।

'বাড়ির পেছনে তিন বিঘে বাগানে পুকুর ছিল, বড়-বড় গাছ ছিল। আমরা সেখানে খেলা করেছি। তখনি অনেক বাড়াবাড়ি করেছিলাম। বড় বাড়িতে যা হয়। কিন্তু সবই গোপনে।

'কন্যাকুমারিকার চাপেই বিলেত গেছিলাম। ফিরে এলাম ব্যারিস্টার হয়ে, শুরু করলাম রাজনীতি। কলকাতার পাট চুকে গেছিল—দিল্লিতেই ঘাঁটি গাড়তে হয়েছিল। বিবেকানন্দই আমার জীবনে প্রথম আদর্শ। তাই সারা ভারতকে নিজের দেশ বলে ভেবেছিলাম। তাই ভারতের সবাই আমাকে নিজের লোক মনে করেন। আপনি তা জানেন।

'কন্যাকুমারিকা সেই কারণেই বলেছিল, কলকাতায় এলে তুমি আর এ-বাড়িতে উঠবে না। বালিগঞ্জে তোমাদের ডেরায় থাকবে। মাঝে-মাঝে সঙ্গ দিয়ে যাবে আমাকে।

'কন্যাকুমারিকা বিয়ে করেনি। আমারই মতোন। বিয়ে-থা'র কথাও কোনওদিন আমাকে বলেনি। বললেও রাজি হতাম না। কারণ, ওই বন্ধন আমাকে মানায় না। সময় কম, কাজ বেশি। সবই দেশের কাজ। স্ত্রী-র জন্যে সময় আমার নেই।

'কন্যাকুমারিকার মা-বাবা ছেলেবেলাতেই মারা গেছিলেন। দাদু মারা যান আমি বিলেতে থাকবার সময়ে। বিষয়সম্পত্তির চাপে কন্যাকুমারিকা সংসারী হওয়ার স্বপ্ন ছেড়ে দেয়। সবই আমাকে চিঠি লিখে জানাত। যা জানায়নি, তা জেনেছি অনেক পরে।

'কৈশোরেই যে শরীর নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে পারে, যৌবনে সে সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে না—এটা আমার ভাবা উচিত ছিল। যার হাতে টাকা, তার পারিষদবর্গের অভাব হয় না। কন্যাকুমারিকা একাধারে হয়েছিল চরিত্রহীনা আর উড়নচণ্ডে। কলকাতায় এসে মাঝে-

মাঝে যখন তাকে সঙ্গ দিয়ে যেতাম, স্বাভাবিকভাবেই সে মেয়েলি কৌতূহলে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে আমার গোপনতম কথাও জেনেছে। কৈশোরের সেই চাপল্য আর দেখায়নি। আমি তার এই পরিবর্তন দেখে একটু অবাক হয়েছিলাম। ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারিনি সে দেউলে হতে বসেছে। দেনা যত বেড়েছে, রূপ আর যৌবনকে ততই উজাড় করে দিয়েছে কলকাতার ধনীদের পায়ে। সংক্ষেপে, সে ভদ্র-বারবনিতা হয়ে গেছে।

'রাষ্ট্রের বহু সিক্রেট কন্যাকুমারিকার কাছে বলেছিলাম। আমেরিকা, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, জাপান, জার্মানি—কার সঙ্গে কখন কী কথা বলেছি—রঙ্গচ্ছলে গল্প করে যেতাম। আমার জীবনে একমাত্র সঙ্গিনী সে, আমার জীবনকে গড়ে দিয়েছে—তাকে ছাড়া বলব কাকে? যদিও সেসব গুহ্য কথা কারও জানবার কথা নয়। সে কিন্তু অনেকদিন ধরেই লিখতে শুরু করেছিল তার আত্মজীবনী। কলকাতায় এসে তাঁকে সঙ্গ দিতে গিয়ে দেখেছিলাম তাকে লেখার নেশায় ধরেছে। সবুজ কালির দোয়াতে কলম ডুবিয়ে লিখত, আর গালে হাত দিয়ে জানলা দিয়ে বাগানের গাছপালার দিকে চেয়ে থাকত—যে-বাগানে কেটেছে আমাদের দুজনের কৈশোর। চিঠির পর চিঠি লিখত—ডাকটিকিটে জিভ বুলিয়ে খামে সাঁটত—বরাবরের অভ্যেস। আমি ঠাট্টা করে ইদানীং বলতাম, "তুমি কি তসলিমা নাসরিন হওয়ার স্বপ্ন দেখছ?—ও হেসে বলত, তুমি যদি দেশের জন্যে জীবন দিতে পারো, আমি কেন পারব না?"

'স্মৃতিচারণ লেখা যে তখন থেকেই শুরু করেছিল, আমার জানা ছিল না। পরপর কয়েকটা কাজে ইন্ডিয়ার বাইরে কাটিয়ে দিল্লি ফিরেই ওর তিনটে চিঠি পেলাম। মাথা ঘুরে গেল। কন্যাকুমারিকা আমার কাছে একশো কোটি টাকা চেয়েছে।

'কলকাতায় এলাম। শুনলাম ওর সর্বস্বান্ত হওয়ার কথা। ভেড়ি লুঠ হওয়ার পর থেকেই কপাল পুড়তে থাকে। বিষয়জ্ঞান না থাকার ফলে প্রতারকদের খপ্পড়ে পড়ে অস্থাবর সম্পত্তি সবই বাঁধা পড়েছে। চিট ফান্ড করে টাকা তুলতে গিয়ে পুলিশকে দোরগোড়ায় এনে ফেলেছে। একশো কোটি পেলে সবদিক বাঁচবে।

'একশো কোটি কেন, একশো টাকারও এদিক-ওদিকে করেনি রাম ভট্টাচার্য—সেটাই সেদিন তাকে জানিয়েছিলাম। অন্য কীভাবে তার সমস্যা মিটোনো যায়, তাই নিয়ে ভাবতে বলেছিলাম। ও গোঁ ছাড়েনি। সব শেষে জানিয়েছে, যে স্মৃতিচারণটা লিখে রেখে দিয়েছে—সেটা কিনে নিতে চেয়েছে এক পাবলিশার—বাংলা থেকে হিন্দি আর ইংরেজি তর্জমাও তারা করে নেবে। তারা হয়তো লাখ কয়েক টাকার মুনাফা লুটবে—কিন্তু রাম ভট্টাচার্যর হাজার-হাজার কোটি টাকার মসনদ ধুলোয় গড়িয়ে যাবে—রাম ভট্টাচার্য যে নিখাদ সোনা নয়—এই বই হবে তার ডকুমেন্ট।

'লেখবার টেবিলে বসেই কন্যাকুমারিকা হেসে-হেসে বলে গেল সব কথা। একটা চিঠি সাদা খামের মধ্যে ভরা ছিল। জিভ বুলিয়ে তার মুখ জুড়ে এক টাকার ডাকটিকিটও লাগাল জিভে ঠেকিয়ে। বললে—পাবলিশারকে জানিয়ে দিলাম, আর এক মাসের মধ্যে রেডি হবে পাণ্ডুলিপি। পাবলিশারের নামটা দেখে রাখো।

'গোটা পৃথিবী জুড়ে ব্যবসা রয়েছে বিশেষ সেই প্রকাশকের।

'বুঝলাম, ঠিক এক মাস সময় পেলাম। একশো কোটি টাকা বের করে দিতে হবে আমাকে। অসৎ পথে নামতেই হবে।

'দিল্লি ফিরে যাওয়ার পথে প্লেনে বসে খটকা লাগল—এ ধরনের অসৎ পরিকল্পনা কন্যাকুমারিকার মাথায় এল কী করে? এ তো সাংঘাতিক সফিসটিকেটেড ব্ল্যাকমেল।

কাকপক্ষীও জানবে না এত বড় একটা ক্রাইমের খবর। অথচ রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হবে, দেশের লোক প্রতারিত হবে। হর্ষৎ মেটার সঙ্গে আমার কোনও প্রভেদ থাকবে না।

'ইনটেলিজেন্স খবর এনে দিল লাইটনিং স্পিডে। কন্যাকুমারিকা যে কুপথগামিনী হয়েছে, রাতের অভিসারিকা হয়েছে, রাষ্ট্রের শত্রুদের অঙ্কশায়িনী হয়েছে—তা জানলাম এই সার্ভিসের মারফৎ।

'তাই এসেছি আপনার কাছে। ব্ল্যাকমেলারকে আমি ভালোবাসি—তার ক্ষতি করতে চাই না—অথচ নিজে বাঁচতে চাই, দেশকে বাঁচাতে চাই। ইন্দ্রনাথবাবু, কী করব?'

ইন্দ্রনাথ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'রাত ঠিক বারোটা। চরিত্রহীনা কন্যাকুমারিকা নিশ্চয়ই এখন জেগে আছেন। ফোন করুন।'

রাম ভট্টাচার্যর মুখ শক্ত হয়ে গেল—'না।'

'নাম্বারটা বলুন। আমি করছি।'

'কেন?'

পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, 'কথায় সব হয়। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলব। দরকার হলে আজ রাতেই দেখা করব। কূটনীতিতে আপনার কাছে আমি শিশু। কিন্তু একটা সহজ কৌশল বারেবারে কাজ দিয়েছে—সেই কৌশলটা প্রয়োগ করব।'

'কী কৌশল?'

'টু ক্রিয়েট এ বিগার প্রবলেম। আপনার সামনে যে প্রবলেম তুলে ধরেছেন কন্যাকুমারিকা—তার চাইতেও বড় প্রবলেম তৈরি করব কন্যাকুমারিকার জীবনে।'

'সেটা কী প্রবলেম?'

'এই প্রথম আপনার চোখের পাতা কাঁপতে দেখলাম। কারণ, আপনি তাকে ভালোবাসেন, ঘৃণাও করেন।—আর শুনতে চাইবেন না। আমার ওপর ছেড়ে দিন।—নাম্বারটা কী?'

'থ্রি ফাইভ জিরো...।'

ডায়াল করল ইন্দ্রনাথ। রিং হয়ে গেল। বার বার তিনবার। উঠে দাঁড়াল সোফা ছেড়ে। বললে, 'চলুন।'

'কোথায়?'

'কন্যাকুমারিকার বাড়ি।'

'আমি যাব? এত রাতে?'

'আপনার মুখ দেখিয়ে দরজা খোলাব—আমি গেলে সেটা হবে না। চলুন।'

লোহার ফটক ধরে নাড়া দিতেই গুমটি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল দারোয়ান। রাম ভট্টাচার্যকে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে বলেছিল, 'কী হল দাদাবাবু?'

'দিদিমণি ঘুমোচ্ছে নাকি?'

'নাতো। সেই যে দুপুরে আপনি চলে গেলেন—ঘর বন্ধ করে বসে রয়েছে। কত ডাকলাম—সাড়া দিল না। খাবার ঢাকা দিয়ে রেখেছি।'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'নিয়ে চলো সেই ঘরে।'

চারতলা। বাগানের দিকের ঘরটার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দারোয়ানের ডাকে সাড়া মিলল না। রাম ভট্টাচার্যের অনুরোধও বিফলে গেল।

ইন্দ্র বললে, 'সাবেকি বাড়ি। ভেতরে নিশ্চয়ই খিল অথবা ছিটকিনি তোলা রয়েছে। চাড় মারলেই ভেঙে যাবে।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দু-হাট হয়ে গেল দরজা।

ঘর অন্ধকার। করিডরের আলো পৌঁছচ্ছে না ঘরের ভেতরে।

ইন্দ্রনাথ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল দারোয়ানকে, 'টর্চ বা হ্যারিকেন—যা হয় কিছু নিয়ে এসো।'

'সুইচ টিপব? ঘরেই তো আলো আছে।' বললে দারোয়ান।

'যা বলছি তাই করো।'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল দারোয়ান।

ইন্দ্র বললে, 'ওকে সরিয়ে দিলাম। ঘরে ঢোকবার আগে, আলো জ্বালবার আগে একটা জিনিস জেনে নিই। আপনি এখানে এসেছিলেন আমার কাছে যাওয়ার আগে?'

'দুপুরে এসেছিলাম। ফিরে যাই বালিগঞ্জে। সেখান থেকে গেছি আপনার কাছে।'

'ঠিক। দুপুর থেকেই দরজা বন্ধ করে বসে আছেন কন্যাকুমারিকা। দিনের আলোয় আলো জ্বালানোর দরকার হয়নি। এখনও আমাদের ডাকে আলো জ্বালাননি—দরজা ভেঙে কথা বলে যাচ্ছি, উঠেও এলেন না। মানে বুঝছেন?'

রাম ভট্টাচার্যর গ্র্যানাইট মুখাবয়বে ভাবান্তর নেই—কিন্তু বুঝি ঈষৎ নিষ্প্রদীপ হল সদাপ্রদীপ্ত দুই চক্ষু।

আর কথা না বলে অন্ধকার ঘরে দেওয়াল হাতড়ে সুইচ টিপে দিল ইন্দ্রনাথ।

ঘরে এখন আলো ঝলমল করছে। টেবিলে মাথা রেখে বসে রয়েছে কন্যাকুমারিকা। অস্বাভাবিকভাবে একটা হাত ঝুলছে চেয়ারের পাশে। লাল টেলিফোন রয়েছে ভাঁজ করা বাঁহাতের কাছে।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ইন্দ্রনাথ। ছিটকিনি ভেঙেছে, কিন্তু খিল অটুট রয়েছে। তুলে দিল খিল।

টেবিলের ওপর কন্যাকুমারিকার মাথার কাছে একটা সাদা খাম। ওপরে সবুজ কালিতে লেখা বিখ্যাত এক প্রকাশকের নাম আর ঠিকানা।

খামের কোণ ধরে তুলে ঘুরিয়ে পেছন দিক দেখল ইন্দ্রনাথ। নামিয়ে রেখে টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিল এক টাকার বেশ কয়েকটা ডাকটিকিট। গান্ধীজির ছবি ছাপা ডাকটিকিট।

বললে, 'ছিল কুড়িটা ডাকটিকিট—এখন রয়েছে উনিশটা। —একটা নিশ্চয় ছিঁড়েছিলেন কন্যাকুমারিকা। কিন্তু খামে লাগাননি!' হেঁট হয়ে দেখল মেঝে, কুড়িয়ে নিল একটা ডাকটিকিট। 'এইটা ছিঁড়েছিলেন, খামে লাগাবেন বলেই। তার আগেই মন ঘুরে গেল —সুইসাইড করলেন।'

'সুইসাইড!' মৃদুস্বরে বললেন রাম ভট্টাচার্য, 'আমার সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পরেই?'

'হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পরেই। ছিটকিনি তুলে দিয়ে চিঠি লিখলেন। খামের মুখ বন্ধ করলেন। ডাকটিকিট ছিঁড়লেন। তার পরেই সুইসাইড করলেন—ডাকটিকিট খসে পড়ল মেঝেতে। স্ট্রেঞ্জ!'

'স্ট্রেঞ্জ কেন বলছেন?'

'ওঁর অভ্যেস তো জিভ বুলিয়ে ডাকটিকিট ভিজোনো। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ডাকটিকিটে নিশ্চয় জিভ বুলিয়েছিলেন?'

'মনে তো হয়।'

'হ্যাঁ বুলিয়েছিলেন। এই দেখুন পেছনটা। আঠা-ভাবটা তেমন নেই—যেন জল লেগেছিল। ফোরেনসিক রিপোর্টেই জানা যাবে, জিভের লালা কন্যাকুমারিকার।—জানা যাবে আর একটা জিনিস,' বলতে-বলতে উনিশটা ডাকটিকিটের পাত তুলে নিল ইন্দ্রনাথ।—চোখ কুঁচকে দেখল পেছনের আঠার দিক।

বললে, 'বাদামি রঙের কী যেন লেগে রয়েছে, তাই না?'

'তাই তো দেখছি।'

'এই উনিশটা ডাকটিকিট আর এই খসে-পড়া ডাকটিকিট কি আমি নিয়ে যাব?'

'কোথায়?'

'ফোরেনসিক টেস্ট করার জন্যে।'

'কেন?'

'আমার অনুমান, এতে লাগানো রয়েছে পটাসিয়াম সায়ানাইড।'

'কন্যাকুমারিকা—'

'না, তিনি লাগাননি। ডাকটিকিটে জিভ বুলোনার অভ্যেস আছে কন্যাকুমারিকার, একথা যিনি জানতেন, তিনি লাগিয়ে রেখে গেছিলেন আজ দুপুরবেলা। তাঁর অপূর্ব বাগ্মিতা দিয়ে খেপিয়ে দিয়ে গেছিলেন যাতে তিনি চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রকাশককে চিঠি লিখতে বসেন কন্যাকুমারিকা। কিন্তু বিরাট এই প্রতিভা আমার মতোন ক্ষুদ্র ব্রেনের শরণ নিলেন কেন, সেটা বুঝলাম না।'

'ইন্দ্রনাথবাবু, আপনি যে এত লাইটনিং স্পিডে অ্যাকশন নেন, আমার তা জানা ছিল না।' মন্দ্রমন্থর কণ্ঠস্বরে বলে গেলেন রাম ভট্টাচার্য—'রাত দশটায় আপনার কাছে যাওয়ার কারণ একটা—যাতে আপনার অ্যাকশন শুরু হয় পরের দিন সকালে—আমি তখন দিল্লির পথে—আকাশে। আজ আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে কন্যাকুমারিকার এই ঘরে আসতাম—কারণ আমি জানতাম, সে আর বেঁচে নেই—আপনার বাড়ি যাওয়ার আগে ফোন করেছি—কন্যাকুমারিকা বেঁচে থাকলে টেলিফোন ধরত—তাই নিশ্চিন্ত হয়ে আপনার কাছে এসেছিলাম। এ ঘরে এসে দরজা ভেঙে আগে ডাকটিকিটগুলো সরাতাম—তারপর দারোয়ানকে দিয়ে পুলিশে খবর দেওয়াতাম—তাকে শিখিয়ে যেতাম—আমি যে এত রাতে এসেছি—কাউকে যেন না বলে। কাল সকালে শুরু হত তদন্ত। সরকারি তদন্ত একটু এগিয়েই ধামাচাপা পড়ে যেত। নিছক আত্মহত্যা—পটাসিয়াম সায়ানাইডের জন্যে। তখন আপনার টনক নড়লেও আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারতেন না—ষড়যন্ত্রের চাপে এরকম আত্মহত্যা অনেকেই করে।—যাক সে কথা, আগেই কথা দিয়েছেন, এ-কেস যদি টেক-আপ নাও করেন—মুখ খুলবেন না।

'আপনার শরণ নিয়েছিলাম কেন? পাপ চেপে রাখবার ক্ষমতা নেই বলে। হালকা হয়েছিলাম আপনার কাছে গিয়ে। আপনি সব জেনেও অপরাধী কে, তা জানতে পারতেন না। কিন্তু জেনেই যখন ফেলেছেন, তখন ডাকটিকিটগুলো ফিরিয়ে দিন। ওদের কাজ ফুরিয়েছে। দেশ রক্ষে পেয়েছে।'

'নিন। কিন্তু স্মৃতিচারণের পাণ্ডুলিপি?'

'যে ব্যাঙ্কলকারে আছে, তা 'সীজ' করা হবে। তারপর...'

'বুঝেছি। দারোয়ানকে বলে দিন, পুলিশে খবর দিতে—কিন্তু পুলিশকে যেন না বলে যে আমরা দুজন এসেছিলাম আজ রাতে।'

'বলে দিচ্ছি। ইন্দ্রনাথবাবু, একটা অনুরোধ করব?'

'স্বচ্ছন্দে।'

'আপনি মুক্তপুরুষ। দিল্লিতে একটা বিশেষ দপ্তরের ভার গ্রহণ করবেন?'

'মাপ করবেন। আমি মুক্ত-ই থাকতে চাই।'

'কোলফিল্ড টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত। (শারদীয় সংখ্যা, ১৯৯৪)

রাজা কঙ্ক

বাই রোড গাড়িটাকে পাঠিয়েছিলাম আগের দিন চম্পকনগরে। ট্রেন থেকে সেখানে নেমেই গাড়ি হাঁকিয়ে যাব বন্ধুদের বিবরে—এই ছিল আমার প্ল্যান।

হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়বার মিনিট কয়েক আগেই আমার কামরায় এসে উঠল সাতজন আরোহী। পাঁচজন আবার সিগারেটখোর। এতটা পথ এদের সঙ্গে যেতে হবে ভেবে মেজাজ খিঁচড়ে গেল। স্টেটসম্যান আর ব্র্যাডশ নিয়ে চলে এলাম পাশের কামরায়।

আমাকে দেখেই খুবই বিরক্ত হল যে মেয়েটি তার বয়স পঁচিশও নয়। ভারী মিষ্টি মুখখানা। পানপাতার মতো গড়ন। চোখ-মুখ-নাক নিখুঁত। ঢলঢলে চোখে মাদকতা বা সেক্স যাই বলুন না কেন আছে। কামরার একমাত্র আরোহী সে। তাই আমাকে দেখে ভুরু কুঁচকে ফিসফিস করে কী যেন বলল ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকটিকে।

বুঝলাম আমার সম্বন্ধে লাগানো হল। ভদ্রলোক মেয়েটির স্বামী নিশ্চয়। ট্রেনে তুলে দিতে এসেছেন। আমার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখলেন। সন্তুষ্ট হলেন এবং মৃদু হেসে বোধহয় অভয় দিলেন স্ত্রীকে। শুনে মেয়েটিও হাসল আমার দিকে চেয়ে। ছোট্ট কামরায় ঘণ্টাকয়েক আমার সঙ্গে তালা চাবি দিয়ে রাখলেও যেন তার আর কোনও ভয় নেই।

ভদ্রলোক বললেন, 'রাগ কোরো না মণি কেমন? চলি, নইলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করব।'

জানলা থেকে রুমাল নেড়ে বিদায় জানাল মেয়েটি এবং লুকিয়েচুরিয়ে আঙুলের ডগায় অধর ছুঁইয়ে কয়েকটা তোফা চুম্বনও নিক্ষেপ করল স্বামীর পানে।

গার্ড হুইশল দিয়েছে। ট্রেন চলতে শুরু করেছে।

ঠিক এই সময়ে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে ছুটতে-ছুটতে এল একটা লোক।

লোকজন হইচই করে উঠল তার দুঃসাহস দেখে। কিন্তু কোনওদিকে না চেয়ে ফুটবোর্ডে লাফিয়ে উঠেই দড়াম করে দরজা খুলে ভেতরে এসে পড়ল আগন্তুক।

আমার সঙ্গিনী অন্যমনস্ক ছিল। আচমকা ওইভাবে একজনকে কামরায় ঢুকতে দেখেই আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে ধপ করে বসে পড়ল বেঞ্চিতে।

আমি ভীতু নই। কিন্তু প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেন বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক আগেই এভাবে কামরায় ছিটকে আসা মোটেই স্বাভাবিক নয়। বদ মতলব না থাকলে সচরাচর....

লোকটার চেহারা দেখে কিন্তু সেরকম কিছু মনে হয় না। ঠিক যেন পাকা মাকাল ফলটি। যেমন টুসটুসে রং—টুসকি দিলেই যেন ফেটে পড়ে—তেমনি ফিটফাট সাজগোজ। যে লোক এ-রকম তেড়েমেড়ে ছুটন্ত ট্রেনে লাফিয়ে ওঠে, তার চেহারা আর পোশাক আর একটু নিরেশ হলে যেন মানাত। চেহারা দেখলে মনে হয় বুঝি পারস্যের খানবাহাদুর কিম্বা আরব দেশের তৈল সম্রাট। লাল-লাল ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, টানা-টানা চোখ, চোখা-চোখা নাক। আর পোশাক? র‍্যানকিন-হার্মান গোলাম মহম্মদরাও বুঝি অমন কাট-ছাঁট রপ্ত করতে পারেনি এখনও। যেমন দামি কাপড় তেমনি বাহারি স্যুট। অমন সুন্দর টাইও বড় একটা দেখা যায় না। জোডিয়াক তো নয়ই বিলিতি নিশ্চয়ই।

দেখেই আমার কিন্তু খটকা লাগল। হ্যান্ডসাম ফিগার, চোস্ত পোশাক-আশাক, মুখটাও কেমন জানি চেনা-জানা। চেনা লোকের ফটোগ্রাফ অনেক দিন পর দেখলে যেমন চিনেও চিনে ওঠা যায় না এ যেন তেমনি। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না কোথায় দেখেছি নবরূপী কার্তিক মহাশয়কে।

সঙ্গিনী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখি অবস্থা তার শোচনীয়। দু-চোখ কোটর থেকে খসে পড়ার উপক্রম হয়েছে—আতঙ্ক মূর্ত হয়েছে বিস্ফারিত চোখের তারায়। ফরসা রং ফ্যাকাশে হলে বিশ্রী লাগে—মেয়েটিকেও বিশ্রী লাগছে মুখটা কাগজের মতো সাদা হয়ে যাওয়ার দরুন। বেঞ্চির ওদিকে বসে সুদর্শন আগন্তুক—এদিকে বসে সুন্দরী সঙ্গিনী। আগন্তুক চেয়ে আছে জানলা দিয়ে বাইরে, সঙ্গিনী ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে আগন্তুকের দিকে। ভ্যানিটি ব্যাগ পড়ে রয়েছে ইঞ্চি কয়েক দূরে। মেয়েটির ইচ্ছে ব্যাগটাকে কাছে টেনে আনে—কিন্তু ভয়ের চোটে হাত বাড়াতেও পারছে না। থরথর করে আঙুল কাঁপছে, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। অবশেষে আঙুল দিয়ে পৌঁছল ব্যাগের হাতলে এবং কোলের ওপর উঠে এল হলুদ থলে।

এতক্ষণে চারচোখে মিলন হল আমার সঙ্গে মেয়েটির। আমি ওর নার্ভাসনেস দেখে না বলেও পারলাম না 'ব্যাপার কী? শরীর খারাপ নাকি? জানলা খুলে দেব?'

জবাব না দিয়ে ভীরু চোখে মেয়েটি কেবল চেয়ে রইল। কথা বলার মতো সাহসও তার নেই বুঝে আমি অভয় চোখে তাকিয়ে রইলাম। মেয়েটি আমার চোখের মধ্যে তাকিয়ে আড়চোখে বারবার ইশারা করতে লাগল আগন্তুকের পানে। চোখের ইশারায় সে যেন বলতে চায়, 'লোকটাকে দেখেছেন? সুবিধের নয়।'

আমি ওর সভয় চাহনির জবাব দিলাম অভয় হাসি হেসে—ঠিক যেভাবে হেসেছিল তার স্বামী আমার সম্বন্ধে তার ভয় কাটিয়ে দেওয়ার জন্যে। ইঙ্গিতে বললাম—ভয় কী? আমি তো রয়েছি। যুবতীদের দেখলেই যুবকদের প্রাণে বীররসের সঞ্চার ঘটে। আমিই বা বাদ যাই কেন?

ঠিক এই সময়ে আগন্তুক চাইল আমাদের পানে। পর্যায়ক্রমে চোখ বুলিয়ে নিল আমার আর সঙ্গিনীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত। সে চোখে জিজ্ঞাসা নেই, ঔৎসুক্য নেই, ঔদাসীন্যও

নেই। পর্যবেক্ষণ সমাপ্ত হতেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ফের চেয়ে রইল জানলা দিয়ে বাইরের দিকে।

কামরার মধ্যে আর কোনও কথা নেই। মেয়েটি এই নৈঃশব্দ্য সইতে পারল না যেন। সর্বশক্তি কেন্দ্রীভূত করল সুচারু রসনায়—বললে ফিসফিস করে, 'শুনেছেন?'

'কী?'

'এই ট্রেনে সে চলেছে?'

'কে?'

'সে আবার কে...একা!'

'কে? কার কথা বলছেন?'

'রাজা কঙ্ক।'

আগন্তুকের পানে চেয়েই শেষ কথাটা বলল মেয়েটি। অর্থাৎ রাজা কঙ্ক তার দৃষ্টিপথেই আবির্ভূত হয়েছে। বেঞ্চের অপর প্রান্তেই উপবিষ্ট রয়েছে।

সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত হলাম। ভয়াবহ ওই নামের মর্যাদা থেকে আমি রেহাই পাওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আগন্তুক কিন্তু ঘাড় হেঁট করে বসেই রয়েছে। মুখটা ঈষৎ ফেরানো—যেন আমরা দেখেও চিনতে না পারি। প্রতিবাদের সুরে বললাম, 'রাজা কঙ্কর কিন্তু বিশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডর হুকুম হয়েছে গতকাল—পলাতক থাকা অবস্থাতেই। সুতরাং পলাতক রাজা কঙ্ক খামোকা লোকের সামনে এসে নতুন ঝামেলায় জড়াতে যাবে বলে মনে হয় না। সবচেয়ে বড় কথা খবরের কাগজওয়ালারা পর্যন্ত জেনে গিয়েছে রাজা কঙ্ক ছুটি উপভোগ করতে গিয়েছে লঙ্কার সমুদ্রতীরে—পাকিস্তান থেকে লম্বা দেওয়ার পর থেকে ইন্ডিয়ার মাটি তার কাছে এখন বিষবৎ। সুতরাং—'

'রাজা কঙ্ক এই ট্রেনেই রয়েছে,' বলল মেয়েটি। একটু জোর গলাতেই বলল যাতে গলাটা আগন্তুকের কান পর্যন্ত পৌঁছয়। 'আমার হাজব্যান্ড ডেপুটি জেল-সুপার। স্টেশনেও শুনলাম পুলিশ তাকে খুঁজছে।'

'কিন্তু খুঁজবে কেন?'

'টিকিট কাউন্টারে তাকে দেখা গেছে বলে। চম্পকনগরের টিকিট কেটেছে রাজা কঙ্ক।'

'সেখানেই তার কলারটা চেপে ধরা হল না কেন?'

'অদৃশ্য হয়ে গেল বলে। টিকিট কালেক্টর তার টিকিও দেখতে পেল না। তাই সবাই ভাবলে নিশ্চয় এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠে এসেছে রাজা কঙ্ক। জানেন. তো এই ট্রেনের দশ মিনিট পরেই আছে এক্সপ্রেস।'

'তাহলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল। এক্সপ্রেসেই পুলিশ তাকে হাতকড়া লাগাবে।'

'লাস্ট মোমেন্টে নিশ্চয় এক্সপ্রেস থেকে লাফিয়ে এই ট্রেনে উঠে পড়েছে রাসকেল।'

'বেশ তো রাসকেলকে এই ট্রেনেই ধরা যাবে'খন।'

'ধরবে? রাজা কঙ্ককে ধরবে?'

'চম্পকনগরেই সে ধরা পড়বে।'

'ইহজীবনে আর ধরা পড়বে না। রাজা কঙ্ককে ধরা যায় না। ঠিক পালাবে।'

'তাহলে পালাক। যাত্রা তার শুভ হোক।'

'তার আগে কী সর্বনাশটা করবে ভেবেছেন?'

'কী সর্বনাশ?'

চুপ মেরে গেল ভয়াতুরা সঙ্গিনী। নীরবে আঁকড়ে ধরল ভ্যানিটিব্যাগ। বললাম, 'অত ঘাবড়ালে চলে কি? রাজা কঙ্ক ট্রেনে উঠেছে মেনে নিয়েও বলব সে বোকা নয়। খামোকা নতুন ফ্যাসাদ ডাকতে যাবে না।'

আমার কথায় বিশ্বাস হল না মেয়েটির। ভয়ও কমল না।

কি আর করা যায়? আমি খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে রাজা কঙ্কর বিচারকাহিনি পড়তে লাগলাম। সবই অবশ্য জানা। তবুও মন্দ লাগছিল না রংচঙে উপাখ্যানটা। পড়তে-পড়তে চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। পরপর দুটো রাত কম ধকল হয়নি শরীরের ওপর। ঘুম তো পাবেই।

চমকে উঠলাম মেয়েটির চাপা আর্তনাদে। খপ করে কাগজটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ককিয়ে উঠল সে, 'কী সর্বনাশ! ঘুমোচ্ছেন নাকি?'

'না, না, ঘুমোব কেন?' প্রাণপণে সজাগ থাকবার চেষ্টা করে বললাম।

'এখন ঘুমোনো মানেই রাজা কঙ্ককে সুযোগ দেওয়া!'

'একশোবার!' সায় দিলাম তৎক্ষণাৎ।

এই বলে চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইলাম জানলা দিয়ে বাইরে। ঘুমোবো না পণ করলেও ঘুমকে কি ছাই আটকানো যায়। ট্রেনের টিকি-টিকি ছন্দ আর দুই বিনিদ্ররজনীর অবসাদ—দুয়ে মিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম পাড়িয়ে ফেলল আমাকে। চোখের সামনে থেকে মুছে গেল নিসর্গ দৃশ্য।

স্বপ্নজগতে দেখলাম রাজা কঙ্ক নামধারী সেই রহস্যাবৃত অতিমানবটিকে। দেখলাম ধনীর সিন্দুক শূন্য করে দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল টপকে দুর্গম অঞ্চলেও বিজয়কেতন উড়িয়ে ছায়ার মতো অপসৃয়মান কিংবদন্তীর নায়ক রাজা কঙ্ককে। দেখলাম দরিদ্রের বন্ধু এবং শোষকের শত্রু রাজা কঙ্কর পাঁকের মতো পিচ্ছিল দেহরেখা, অশরীরীর মতো যে ধরাছোঁয়ার বাইরে, ঈগলের মতো যে দুরন্ত দুঃসাহসী—দেখলাম সেই অমিতশক্তিধর অসামান্য পুরুষটিকে। সেইসঙ্গে দেখলাম আর একটি চরিত্রকে যে রাজা কঙ্কর নাম নিয়েও রাজা কঙ্ক নয়। দেখলাম ছায়ার মতো শরীর নিয়ে অকস্মাৎ লাফিয়ে ঢুকল কামরার মধ্যে, হনুমানের লঙ্কাদাহনের সময়ে শরীর বিবর্ধনের মতো ক্রমশ ফুলে উঠল তার ছায়াময় কায়া এবং চেপে বসল আমার বুকের ওপর। তার সাঁড়াশীর মতো শক্ত আঙুলের নিষ্পেষণে চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল আমার, রুদ্ধ হয়ে এল নিশ্বাস। দমবন্ধ হয়ে মরতে বসেও রক্তজমা চোখে দেখলাম বেঞ্চিতে শুয়ে হাত-পা খেঁচছে ভয়কাতুরে মেয়েটা।

বাধা দিতে চেষ্টা করলাম না...শক্তিও ছিল না...রগ দপদপ করছে অক্সিজেনের অভাবে...বড়জোর আর একটা মিনিট...তারপরেই সব শেষ।

আগন্তুক তা বুঝল। আঙুল শিথিল করল বটে, বুক থেকে উঠল না। ডানহাতে একটা নাইলন দড়ি বার করল পকেট থেকে। দড়ির প্রান্তে ঢিলে ফাঁস। ফাঁসের মধ্যে আমার দুহাত গলিয়ে আমাকে বেঁধে ফেলল নিমেষমধ্যে...মুখে রুমাল ঠেসে, দু-পা বেঁধে পোঁটলার মতো ফেলে রাখল বেঞ্চির কোণে। ধড়ফড় করল না উদ্বিগ্ন হল না। ঠান্ডা মাথায় ঝড়ের মতো হাত চালিয়ে এত সংক্ষেপে অথচ এমন পরিপাটিভাবে বাঁধল আমাকে যে বুঝলাম লাইনের লোক। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা না থাকলে এমন নৈপুণ্য অর্জন করা যায় না। বাহাদুর

বটে! রতনেই রতন চেনে! পুলিন্দার মতো অসহায় অবস্থায় বেঞ্চিতে শুয়ে মনে-মনে তাকে এক লক্ষবার প্রশংসা করলাম আমি—রাজা কঙ্ক!

পরিস্থিতিটা হাস্যকর। আসল রাজা কঙ্ককে পিছমোড়া করে বেঁধেছে নকল রাজা কঙ্ক। শুধু তাই নয় আমার পকেট মেরে বারো হাজার টাকা সমেত নোটবইটা নিজের পকেটে চালান করেছে। রাজা কঙ্ক আনাড়ির মতোই মার খেয়েছে, সর্বস্বান্ত হয়ে আছে একটা মস্ত গর্দভের মতো!

মহিলা সঙ্গিনী চোখ মুদে পড়ে আছে কাঠের মতো। আগন্তুক তার যৌবনের দিকে ফিরেও তাকাল না। মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল ভ্যানিটি ব্যাগটা। অমনি আঙুল থেকে সোনার আংটিটা খুলে বাড়িয়ে ধরল নকল মূর্ছায় মূর্ছিতা সঙ্গিনী। আগন্তুক আংটি নিয়ে গিয়ে বসল কোণে। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে কোলের ওপর ঢালল কতকগুলো জড়োয়া গয়না। উলটেপালটে দেখে হৃষ্ট হল নিশ্চয়। লুঠের মালের দাম যে সামান্য নয়, আমিও তা দূর থেকে বুঝলাম।

আগন্তুক আমাদের নিয়ে আর চিন্তিত বলে মনে হল না। সিগারেট ধরিয়ে বসে রইল চুপচাপ।

আমি রাজা কঙ্ক জুল-জুল করে চেয়ে রইলাম তার পানে। পরিস্থিতি খুবই ঘোরতর। হাওড়া পুলিশ যখন আমায় দেখেছে চম্পকনগরের পুলিশকেও সজাগ করা হয়েছে। স্টেশনে নামলেই আমাকে পুলিশ ঘেরাও করবে আমি জানি। এও জানি, হাওড়া পুলিশের চাইতে বেশি বুদ্ধি ধরে না চম্পকনগরের পুলিশ। পোস্টাল আইডেনটিটি কার্ডে আমার নাম লেখা আছে অভীক সামুই। চম্পকনগরের বন্ধুবান্ধবরাও জানে অভীক সামুই আসছে তাদের বিবরে। রাজা কঙ্ককে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। রাজা কঙ্ককে সবাই চেনে তার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর ঈগল চাউনির জন্যে। সিনথেটিক পরচুলা আর কনট্যাক্ট লেন্সের দৌলতে দুটিই আমার ছদ্মবেশ। দুটিই এখন অনুপস্থিত। ছদ্মবেশহীন রাজা কঙ্ককে তাই চেনা অত সহজ নয়। অভীক সামুই লেখা পোস্ট্যাল আইডেনটিটি কার্ডটা যেন অন্যমনস্কভাবেই দেখিয়েছিলাম হাওড়ার টিকিট কালেক্টরকে—একই কায়দায় চম্পকনগরেও চম্পট দেব আমি—এই ছিল প্ল্যান।

কিন্তু পরিস্থিতি এখন অন্যরকম। হাত-পা বাঁধা রাজা কঙ্ককে পুলিশ এত সহজে প্রিজন ভ্যানে তুলবে, এ যে ভাবাও যায় না। বারো হাজার টাকার কথা বাদ দিলাম—তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা নাম ঠিকানা রয়েছে নোটবইয়ের পাতায়। আমার আগামী অভিযানের প্ল্যান পর্যন্ত ছকে রেখেছি নোটবইয়ে। সুতরাং পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার চাইতেও আমার কাছে এখন বড় সমস্যা হল নোটবইটা উদ্ধার করা।

কিন্তু আগন্তুকের মতলবটা কী? লাইনের লোক বলেই কৌতূহলটা হতভম্ব করল আমাকে। আমি একলা হলে তার কোনও ঝামেলাই ছিল না। চম্পকনগরে ট্রেন দাঁড়ালেই দরজা খুলে প্যাসেঞ্জারদের ভিড়ে মিশে যাওয়া যেত। কিন্তু কামরায় রয়েছে ওই মেয়েটি। সামনে কঙ্ক বসে আছে বলেই মূর্ছার ভান করে এলিয়ে আছে বেঞ্চির ওপর। কিন্তু চম্পকনগরে ট্রেন দাঁড়ালেই চিলের মতো চেঁচিয়ে উঠবে সে। সুতরাং এখন থেকেই মেয়েটির মুখ বন্ধ করা দরকার। কিন্তু তাতো করছে না আগন্তুক। সুতরাং তার মতলবটা কী?

আগন্তুকের কিন্তু খেয়াল নেই আমাদের পানে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে বাইরের দিকে—তাল-তাল ধোঁয়া উঠছে সিগারেটের প্রান্ত থেকে। একবার কেবল হাত বাড়িয়ে আমার ব্র্যাডশটা টেনে নিয়ে পাতা উলটোনো ছাড়া কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না তার হাবভাবে।

আশ্চর্য ব্যাপার তো!

মেয়েটি এখনও মূর্ছার ভাবটা টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চলেছে প্রাণপণে। একবার কেবল খুক-খুক করে কেশে উঠল সিগারেটের ধোঁয়ায়, তাইতেই বোঝা গেল মূর্ছাটা বিলকুল নকল—আসল মোটেই নয়। শত্রুকে ঠান্ডা রাখার কৌশল।

আমার সারা গা টনটন করছে বাঁধনের জন্যে। মন কিন্তু বসে নেই...ফন্দি রচনা চলছে পুরোদমে মনের কারখানায়...।

একটার পর একটা স্টেশন টপকে ছুটে চলেছে ট্রেন।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল আগন্তুক। দু'পা এগিয়ে এল আমাদের পানে। মেয়েটির দিকে চাইতেই তক্ষুনি জবাব এল সেদিক থেকে, 'ওগো তুমি কোথায়!' চিৎকারের সঙ্গে-সঙ্গে সত্যিকারের মূর্ছা।

লোকটার মতলব ধরতে পারলাম না। আমার পাশের জানলা তুলে বাইরে চেয়ে রইল। বৃষ্টি পড়ছে রিমঝিম শব্দে। যেন বিরক্ত হল তাই দেখে। সঙ্গে ছাতা নেই বলেই যেন ব্যাজার মুখে চেয়ে রইল বাইরে।

তারপর মেয়েটির ছাতা আর আমার রেনকোট নিয়ে এগোল দরজার দিকে।

দরজা খুলেই রেনকোট গায়ে চাপিয়ে নিল আগন্তুক। এক-পা নামিয়ে রাখল পাদানিতে। সর্বনাশ। চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেবে নাকি? বাইরে ধোঁয়া আর বৃষ্টির মধ্যে তাকিয়ে শিউরে উঠলাম আমি। উন্মাদ নাকি?

ঠিক এই সময়ে স্যাকসবি-ফার্মারের ব্রেক চেপে বসল লোহার চাকায়। গতি কমে আসছে, লোহার ক্যাঁচক্যাঁচ আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে।

চকিতে পরিষ্কার হয়ে গেল আগন্তুকের উদ্দেশ্য। লাইন মেরামত চলছে নিশ্চয়। লোকটা তা জানে। গাড়ির গতি কমবেই। সে হেঁটে উধাও হবে জহরৎ আর নোটবই নিয়ে।

রগদুটো দপদপ করতে লাগল তার নিখুঁত প্ল্যান দেখে।

ফুটবোর্ডে দুটো পা নামিয়েছে আগন্তুক। ট্রেন আরও আস্তে চলছে। হঠাৎ জানলার সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ওভারব্রিজ।

অন্ধকার কেটে গেল সেকেন্ড কয়েকের মধ্যেই। লোকটাকে আর দেখলাম না।

অন্ধকারের মধ্যেই ওভারব্রিজের তলায় নেমে পড়েছে সে। চম্পকনগরও এসে গেল বলে। আর একটা ওভারব্রিজ পেরোলেই ট্রেন দাঁড়াবে চম্পকনগরে।

রেগুলেট করা মূর্ছা কাটিয়ে সটান উঠে বসল মেয়েটি। প্রথমেই শুরু হল বিলাপ—জহর হারানো শোকোচ্ছ্বাস। (ওগো তোমার দেওয়া নেকলেসটা...ইত্যাদি)

আমি কাতর নয়নে চাইলাম। মেয়েটি বুঝল। উঠে এসে খুলে দিল মুখের রুমাল। হাত-পায়ের বাঁধনও খুলতে যাচ্ছিল আমি বাধা দিলাম।

বললাম, 'না-না, থাকুক। পুলিশ এসে দেখুক রাস্কেলটা কী হাল করেছে আমার!'

'চেন টানব?'

'সেটা আগেই টানা উচিত ছিল, এখন আর দরকার নেই। আমার গলা টিপে ধরার সঙ্গে-সঙ্গে যদি চেনটা ধরে ঝুলে পড়তেন...'

'তাহলেই তো আমাকে চটকে পিণ্ডি বানাতো! আপনাকে বলিনি রাজা কঙ্ক এই ট্রেনে উঠেছে! ছবি দেখেই চিনেছি আমি।'

'এবার আর নিস্তার নেই—পুলিশ ধরল বলে।'

‘কাকে? রাজা কঙ্ককে? পুলিশের...ক্ষমতা নেই।’ ফুটকি দেওয়ার জায়গায় উচ্চারিত শব্দটা লেখা চলে না।

‘ম্যাডাম, আপনি যদি ঠিক থাকেন, রাজা কঙ্ক ধরা পড়বেই। যা বলছি শুনুন। স্টেশনে ট্রেন ঢুকলেই আপনি চেঁচাতে থাকবেন। পুলিশ ছুটে আসবে। দু-চার কথায় তাদের বুঝিয়ে দেবেন রাজা কঙ্ক এসেছিল, আমার ওপর চড়াও হয়েছিল। কীভাবে পালিয়েছে ট্রেন থেকে তাও বলবেন। বলবেন, তাকে দেখতে কীরকম। খানদানি চেহারা পায়ে অ্যামবাসাডর বুট, হাতে ছাতা—আপনার গায়ে রেনকোট—’

‘আপনার’, বললে তন্বী।

‘আমার? না, না, ওর নিজের। আমার রেনকোট নেই।’

‘কিন্তু আমার যেন মনে হল রেনকোট ছাড়াই ট্রেনের মধ্যে লাফিয়ে এসেছিল রাজা কঙ্ক।’

‘ভুল দেখেছিলেন,...রেনকোট গায়ে না থাক হাতে ছিল নিশ্চয়...নয়তো কামরার মধ্যে কেউ ফেলে গিয়েছিল...রাজা কুড়িয়ে পেয়েছে। যেখান থেকেই আসুক না কেন, রেনকোটটা গায়ে চাপিয়ে সে পালিয়েছে। পয়েন্টটা দারুণ, ইমপরট্যান্ট...গায়ে চেক কাটা গ্রে রেনকোট...বলতে ভুলবেন না। গোড়াতেই আপনার হাজব্যান্ডের নামটা বলবেন। নাম শুনলেই ওরা কানখাড়া করে আপনার সব কথা গিলবে...কাজও করবে...জুয়েলগুলোও ফেরত পাবেন।’

চম্পকনগর আর বেশি দূরে নেই। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছে কারারক্ষকের যুবতী বধূ। আমি চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে তার ব্রেনের মধ্যে গেঁথে-গেঁথে বললাম ঃ

‘আমার নাম অভীক সামুই। যদি দরকার মনে করেন, বলবেন আমাকে আপনি চেনেন...তাতে অনেক সময় বেঁচে যাবে...প্রিলিমিনারী এনকোয়ারি যত ঝটপট শেষ করা যায়, ততই মঙ্গল...মোদ্দা কথা হল রাজা কঙ্ককে পাকড়াও করা...আপনার জুয়েল সমেত... বুঝেছেন? অভীক সামুই আপনার স্বামীর বন্ধু।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ...অভীক সামুই।’

জানলা দিয়ে হাতছানি দিতে শুরু করে দিয়েছে সুন্দরী সঙ্গিনী সেইসঙ্গে চেঁচিয়ে চলেছে তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠে। ট্রেন নিশ্চল হওয়ার আগেই পাদানিতে লাফিয়ে উঠল কয়েকজন ষণ্ডামার্কা পুরুষ। সবশেষে কামরায় উঠল আরেকটি লোক। সঙ্কট সময় এসেছে!

গলায় শির তুলে চেঁচিয়ে চলেছে মেয়েটি ঃ

‘রাজা কঙ্ক...অ্যাটাক করেছিল আমাদের...আমার জড়োয়া গয়না নিয়ে পালিয়েছে...আমার নাম মিসেস আচারী...আমার হাজব্যান্ড ডেপুটি জেল সুপার...এই তো আমার ভাই এসে গেছে...আশু...আশু...রাজা কঙ্ক আমার সর্বনাশ করে গেছে রে...ওরে আমার কী হবে রে... তোর জামাইবাবু শুনলে কী ভাববে রে...’

প্ল্যাটফর্ম থেকে দিদিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই আশু নামধারী ভাইটি কামরায় পা দিয়েছিল।

স্মার্ট চেহারার একজন সুদর্শন কিশোর। মিসেস আচারী তাকে জাপটে ধরে কেঁদে উঠল হাউহাউ করে।

তারপর বললে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে, ‘রাজা কঙ্ক...এই ভদ্রলোকের টুঁটি টিপে ধরেছিল ...উনি তখন ঘুমোচ্ছিলেন...মিস্টার সামুই, অভীক সামুই, আমার হাজব্যান্ডের ফ্রেন্ড।’

'কিন্তু রাজা কঙ্ক এখন কোথায়?'

'ওভারব্রীজের তলায় ট্রেন আসতেই লাফিয়ে পড়ল বাইরে।'

'আপনি ঠিক দেখেছিলেন তো? রাজা কঙ্কই তো?'

'হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাঁ...দেখেই চিনেছি। হাওড়াতে। তাকে দেখা গেছে বুকিং অফিসের সামনে...হাতে ছাতা, পায়ে অ্যামবাসাডর বুট—'

'একসক্লুসিভ সু', পুলিশ অফিসার আমার জুতো দেখিয়ে বলল, 'এইরকম?'

'না, না, যা বলছি শুনুন, আমবাসাডর বুট, চেককাটা গ্রে রেনকোট।'

'কিন্তু', মাথা চুলকে বলল পুলিশ অফিসার, 'টেলিগ্রামে তো রেনকোটের কথা লেখা ছিল না। ছাই রঙের কোটপ্যান্টের কথা লেখা ছিল শুধু।'

'ঠিক বলেছেন অ্যাশ কালারের সুট', সোল্লাসে বললে মিসেস আচারী। এতক্ষণে নিশ্বাস নিলাম আমি। এই না হলে বান্ধবী...চরম বিপদেও কী রকম বাঁচিয়ে দিল আমাকে।

কথা শুনতে-শুনতে আমার হাতের বাঁধন খুলে দিল পুলিশ অফিসার। আমি অবশ্য তার আগেই ঠোঁট কামড়ে রক্ত বার করে ফেলেছিলাম। বন্ধনমুক্ত হয়েও যেন কাহিল হয়ে পড়েছি, এমনিভাবে চি চি স্বরে বললাম ঃ

'রাজা কঙ্ক...রাজা কঙ্ক...মনে কোনও সন্দেহ করবেন না... এখনও দৌড়োলে তাকে ধরা যাবে!'

এমনভাবে বললাম যেন ধুঁকছি। রাজা কঙ্ক আমাকে চোরের মার মেরেছে। প্রাণটা কেবল রেখে গেছে।

আমার রক্তমাখা ঠোঁটের দিকে সমবেদনা মিশোনো চোখে চেয়ে রইল পুলিশ অফিসার। প্রথম রাউন্ডে রেহাই পেলাম।

কামরাটা পুলিশ ইন্সপেকসন হবে বলে কেটে রাখা হল সাইডিংয়ে। বাকি ট্রেন রওনা হল গন্তব্যস্থানে। আমরা এসে বসলাম স্টেশন মাস্টারের ঘরে। কাতারে-কাতারে লোক মজা দেখবার জন্যে ছেঁকে ধরল আমাদের। কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস!

টনক নড়ল আমার। আর দেরি করা সমীচীন নয়। হাওড়া থেকে নতুন টেলিগ্রাম এসে পৌঁছোলেই আমি গেছি! কোনও একটা অছিলা নিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে আমাকে যেতেই হবে। গাড়িটা খুঁজে নিয়ে সটকান দিতে হবে এক্ষুনি!

কিন্তু তস্কর মহাপ্রভু কি সত্যিই একহাত নেবে আমার ওপর? এদিকের রাস্তাঘাট আমি চিনি না—কিন্তু সে চেনে। তাকে ধরা কি সম্ভব হবে?

আমার মন বলল, চেষ্টা করতে দোষ কী? অসম্ভবকে সম্ভব করাই তো রাজা কঙ্কর ব্রত। ঠগকে ঠকানোই তো রাজা কঙ্কর আদর্শ।

পুলিশ অফিসার তখনও রুটিনমাফিক এজাহার লিখছে দেখে হঠাৎ চেঁচিয়ে বললাম আমি ঃ

'শুনছেন? রাজা কঙ্ক কিন্তু প্রতিমুহূর্তে দূরে সরে যাচ্ছে। স্টেশনের বাইরে কার পার্কে আমার গাড়ি রয়েছে। আপনি অনুমতি দিলেই গাড়ি নিয়ে তাকে ধাওয়া—'

'মতলবটা মন্দ নয়।' হেসে বলল অফিসার। 'আপনি বলার আগেই দুজন এস আইকে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'তাই নাকি?'

'সাইকেলে করে খুঁজছে রাজা কঙ্ককে।'

‘কোথায় খুঁজেছে?’

‘ওভারব্রীজের ধারেকাছে। ওখানে গেলেই এক-আধটা ক্লু পাওয়া যাবেই। রাজা কঙ্কও ধরা পড়বে।’

‘দূর মশাই, আপনার অফিসাররা খালি হাতে ফিরবে। ক্লু পাবে না।’

‘আপনি কি জ্যোতিষী?’ একটু চটেছে মনে হল পুলিশ অফিসার।

‘ওভারব্রীজ থেকে বেরোনোর সময়ে কেউ যাতে তাকে দেখতে না পায়, সেইমতো হুঁশিয়ার থাকবে রাজা কঙ্ক। সুতরাং কোনও সাক্ষী আপনি পাবেন না। সবচাইতে কাছের রাস্তা ধরে সে—’

‘রাস্তা তো গেছে কোহিমায়। সেখানেই ধরব তাকে।’

‘কোহিমায় সে যাবে না।’

‘না গেলে আশেপাশেই থাকবে। তাতে তো আমাদেরই সুবিধে।’

‘আশপাশেই থাকবে না।’

‘বটে? বটে? বটে? লুকোবে কোথায়? মাটির তলায়?’ ঘড়ির দিকে তাকালাম।

বললাম—এই মুহূর্তে বলরামপুরে স্টেশনের আশপাশে ঘুরঘুর করছে রাজা কঙ্ক। দশটা পঞ্চাশে মানে, এখন থেকে ঠিক বাইশ মিনিট পরে কোহিমা থেকে একটা ট্রেন এসে দাঁড়াবে বলরামপুরে। রাজা কঙ্ক তাতে উঠে বসবে—যাবে মহেন্দ্রনগর জাংশনে।’

‘তাই নাকি? তাই নাকি? জানতে পারি কি তার গতিবিধির খবর আপনি জানলেন কী করে?’

‘খুব সহজে। কম্পার্টমেন্টে বসে রাজা কঙ্ক আমার ব্র্যাডশ খুলে দেখছিল। কী দেখছিল? যেখানে সে অদৃশ্য হবে, ঠিক সেইখানে আর কোনও ট্রেন আসার সম্ভাবনা আছে কিনা—এই জন্যেই খুলেছিল ব্র্যাডশ। আমিও এই মাত্র দেখেছি ব্র্যাডশ। ওভারব্রীজের কাছেই বলরামপুর স্টেশনে দশটা পঞ্চাশে কোহিমা থেকে আসছে একটা ট্রেন।’

শুনে চোয়াল ঝুলে পড়ল পুলিশ অফিসারের।

‘মার্ভেলাস! মিস্টার সামুই, আপনি ডিটেকটিভ হলেন না কেন? এ লাইনে এক্সপার্ট হতে পারতেন।’

সেরেছে। বেশি বুদ্ধি দেখাতে গিয়ে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরে বসেছি। পুলিশ অফিসারের চোখে বিস্ময় দেখলাম, আর দেখলাম চাপা সন্দেহ। কপাল ভালো যে রাজা কঙ্কর ফোটো সে পেয়েছে ওপরমহল থেকে, তার সঙ্গে সামনে-বসা এই রাজা কঙ্কর কোনও মিল নেই। আসল রাজা কঙ্ককে চিনতে পারল না শুধু ওই ছদ্মবেশী রাজার ছবি দেখেছিল বলেই। তা সত্ত্বেও দেখলাম বিষম ঘাবড়ে গিয়েছে, বিষম অস্থির হয়েছে, বিষম উত্তেজিত হয়েছে ভদ্রলোক।

কিছুক্ষণ আর কোনও কথা নেই। শ্বাসরোধী নীরবতা। চাপা উদ্বেগে আমি নিজেও শিউরে উঠেছিলাম কিনা বলতে পারব না। তবে হাজার হোক আমি রাজা কঙ্ক। নিমেষ মধ্যে জাগ্রত হল ইস্পাত কঠিন মনোবল।

হেসে উঠলাম। বললাম, ‘মশাই, পকেট-বই খোয়া গেলে গর্দভের মাথাতেও বুদ্ধি খেলে। আপনার জনা দুই লোক দিতে পারেন? তিনজনে মিলে চেষ্টা করলে হয়তো তাকে ধরা যাবে—’

‘প্লীজ, প্লীজ’, মিনতি করল সুন্দরী সঙ্গিনী। মিস্টার সামুই প্র্যাকটিক্যাল কথা বলেছেন।

আর দেরি করবেন না। আমার জুয়েলগুলো....'

মহীয়সী বান্ধবীর একটি কথাতেই দাঁড়িপাল্লার কাঁটা হেলে পড়ল। ডেপুটি জেল সুপারের স্ত্রী আমাকে ডাকছে মিস্টার সামুই নামে। বড় অফিসারের বউয়ের মুখে জাল নামটা যেন নতুন মর্যাদা নতুন প্রতিষ্ঠা পেল। আর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে কি? উঠে দাঁড়াল পুলিশ অফিসার।

'চলুন মিস্টার সামুই। রাজা কঙ্ককে আপনারও দরকার, আমারও দরকার।'

ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে এল বাইরে—আমার গাড়ির সামনে। আলাপ করিয়ে দিল দুজন শক্ত-সমর্থ জোয়ানের সঙ্গে—বাঁটলো বটব্যাল আর তলাকান্ত তালুই। দুই চ্যালাকে নিয়ে উঠে বসলাম আমার গাড়িতে। আমি বসলাম ড্রাইভারের জায়গায়। ড্রাইভার বসল পেছনে। মিনিট খানেক পরেই স্টেশন রইল পেছনে। উড়ে গেল রাজা কঙ্ক।

সত্যি কথাই বলব মশায়, অহংকার একটু হয়েছিল বইকি। পাওয়ারফুল ইঞ্জিন তখন ফুসছে, পয়ত্রিশ হর্স পাওয়ারের ইমপোর্টেড মোরো-লিপটন বাঘের বাচ্চার মতোই ধেয়ে চলেছে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে। হু-হু হাওয়ায় চুল উড়ছে আমার। ইঞ্জিনে যেন একটা ভোমরা গুনগুনিয়ে চলেছে—ভ্রমরগুঞ্জন ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। দু-পাশের গাছগুলো সটাসট পেছিয়ে যাচ্ছে পেছনে। মুক্তি পেয়েছি ঠিকই কিন্তু এখনও কিছু কাজ বাকি। স্রেফ প্রাইভেট ব্যাপার বলতে পারেন।

সরকারি কর্মচারীদের সাহায্যেই আইনানুগভাবেই কাজটা সারব আমি। তাই তো রাজা কঙ্ক চলেছে রাজা কঙ্কর সন্ধানে—সরকারিভাবে।

যাই বলুন, সরকারের সাহায্য না পেলে সেদিন আমি অত সহজে গাড়ি হাঁকতে পারতাম কি? রাস্তা তো চিনি না। কখন মোড় ঘুরতে হবে, কোন রাস্তা ছাড়তে হবে, কোন সড়কে ঢুকতে হবে—আমি জানি না। নির্ঘাত পথ হারিয়ে গোলকধাঁধায় ঘুরে মরতাম। রাজা কঙ্ক পথ হারাতো, আরেক রাজা কঙ্ক সেই ফাঁকে হত পগাড়পার।

কিন্তু ওই যে বললাম, সরকার আমাকে সাহায্য করল সরকারি কর্মচারী জুগিয়ে। তলাকান্ত তালুই আর বাঁটলো বটব্যাল জীবন্ত গাইডবুক বললেই চলে।

অথচ পলাতক রাজা কঙ্কর সঙ্গে হিসেবনিকেশ মিটিয়ে নেওয়ার সময়ে বাঁটলো আর তলাকান্তকে চোখের আড়াল করতে হবে। আমার নোটবই ওদের খপ্পরে দেওয়া তো দূরের কথা নোটবইয়ের পাতাতেও যদি চোখ দিয়ে ফেলে দুই মূর্তিমান তাহলেও সর্বনাশ।

বলরামপুর পৌঁছে শুনলাম তিন মিনিট আগেই ট্রেনটা বেরিয়ে গেছে। আমার ভুল হয় না। রেন কোটপরা একটা দাড়িওয়ালা কার্তিক-কার্তিক চেহারার লোক সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট কেটে উঠেছে—যাবে মহেন্দ্রনগর জাংশনে।

জীবনে প্রথম ডিটেকটিভ হল রাজা কঙ্ক—সফল ডিটেকটিভ—শার্লক হোমস মেডেল দেওয়া উচিত আমাকে।

শুনলাম—ট্রেনটা এক্সপ্রেস। মহেন্দ্রনগর জাংসনের আগে কোথাও দাঁড়াবে না। সেখানে তাকে ধরা না গেলে সে চম্পট দেবে কলকাতার দিকে—মিলিয়ে যাবে জনারণ্যে।

'মহেন্দ্রনগর কদ্দূর এখান থেকে?'

'সাড়ে চোদ্দ মাইল।'

'উনিশ মিনিটে সাড়ে চোদ্দ মাইল?....ঠিক আছে—আগেই পৌঁছব।'

মোটর রেসে নাম লেখালে নিশ্চয় গোল্ডকাপ পেতাম সেদিন। মোরো-লিপটন আমার

হুকুমের দাস বরাবরই, কিন্তু সেদিন যেন আমার অন্তরের আকুলতাকে ও স্পর্শ করল। ওর যান্ত্রিক ব্যাকুলতা মূর্ত হল অসম্ভব গতিবেগের মধ্যে। আমার ইচ্ছাশক্তি যেন তার পঁয়ত্রিশ হর্স পাওয়ারকে উদ্দীপিত করল অলৌকিকভাবে এবং যেন সত্যি সত্যিই পঁয়ত্রিশটা ঘোড়া একযোগে পক্ষিরাজ ঘোড়ার মতোই উড়ে চলল পথের ওপর দিয়ে। শয়তান রাজা কঙ্ককে পাকড়াও করতেই হবে। রাস্কেল! স্কাউন্ড্রেল। চোর! কে কাকে টেক্কা দেয়, দেখা যাক এবার। আসল জেতে কি নকল জেতে—শুরু হল সেই পরীক্ষা।

'ডাইনে!...বাঁয়ে...সোজা।' হাঁক দিচ্ছে তলাকান্ত আর বাঁটলো।

পেছনের ধুলোর ঝড় উড়ছে। মাইল পোস্টগুলো দেখতে-দেখতে মিলিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে।

হঠাৎ একটা মোড় ঘুরে দেখলাম ধোঁয়ার মেঘ। এক্সপ্রেস ট্রেন।

আধঘণ্টা ধরে চলল দারুণ রেস। ট্রেনে-মোটরে প্রতিযোগিতা। তারপর মাত্র বিশ গজের ব্যবধানে স্টেশনে আগে পৌঁছলাম আমরা।

তিন সেকেন্ড লাগল প্ল্যাটফর্মে উঠে সেকেন্ড ক্লাস কামরার সামনে পৌঁছতে। কিন্তু সে নেই। রাজা কঙ্ক মিলিয়ে গেছে।

রেগেমেগে বললাম, 'কী বোকা আমি। ট্রেন থেকেই আমাকে দেখেছে গাড়ির মধ্যে। নিশ্চয় লাফিয়ে পড়েছে চলন্ত ট্রেন থেকে।'

গার্ডসাহেব সায় দিলেন। প্ল্যাটফর্ম থেকে শ-দুই গজ আগে একজনকে তিনি দেখেছেন বাঁধ বেয়ে নেমে যাচ্ছে।

'ওই তো। ওই যে যাচ্ছে। ...লেবেল ক্রসিংয়ে।'

তীরবেগে ছুটলাম। সরকারি সাগরেদ দুজনও এল পেছন-পেছন। কিন্তু তলাকান্ত দেখলাম খরগোশের মতো দৌড়োয়। আমাদের ছাড়িয়ে নকল রাজার নাগাল ধরে ফেলে আর কী। প্রমাদ গুণলাম আমি।

হাঁপাতে-হাঁপাতে একটা ঘন ঝোপের কাছে পৌঁছে দেখি তলাকান্ত চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। পাছে আমরা খুঁজে না পাই তাই আর এগোয়নি।

'ভালোই করেছেন।' আন্তরিকভাবেই বললাম আমি। 'আপনি দাঁড়ান বাঁ-দিকে ওই ঝোপের আড়ালে, বাঁটলোবাবু যান ডানদিকের ঝোপে। আমি পেছন দিক থেকে তাড়া দিচ্ছি ওকে। বেরোলে আপনাদের সামনে দিয়েই বেরোবে। ও হ্যাঁ—বিপদে পড়লে গুলি ছুঁড়ব—মাত্র একবার।'

বলে ওদের দুজনকে পাঠিয়ে দিলাম ঝোপের মধ্যে। চোখের আড়াল হতেই আমি সোজা উঠে গেলাম এবং কাঁটাঝোপের ফাঁকে-ফাঁকে একটু ঘুরপথে এগোতেই দেখলাম নকল রাজা কঙ্ক আমার দিকে পেছন করে গুটি গুটি এগোচ্ছে।

লম্বা দুটো লাফ দিয়ে পড়লাম তার ঘাড়ে। হাতের রিভলভার ঘুরিয়ে সে চেয়েছিল আমাকে গুলি করতে। কিন্তু আমার যুযুৎসু তার চাইতেও বেশি চটপটে। নিমেষমধ্যে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে বসলাম বুকের ওপর।

বললাম চাপা গলায়, 'উজবুক কাঁহাকার। আমি রাজা কঙ্ক। এক মিনিটের মধ্যে আমার নোটবই আর ভদ্রমহিলার ভ্যানিটিব্যাগ ফেরত দাও...তার বদলে পুলিশের খপ্পর থেকে তোমাকে রেহাই দেব, আর আমার দলে টেনে নেব। রাজি?'

'রাজি।'

উঠে দাঁড়ালাম আমি। লোকটা পকেট হাতড়ে একটা ছুরি নিয়ে তেড়ে এল আমার দিকে।

'গাধা কোথাকার' বলে বাঁ-হাতে তার ছুরিসুদ্ধ হাতের কবজি চেপে ধরে ডানহাতে প্রচণ্ড ঘুসি ঝাড়লাম ক্যারোটিড আর্টারির ওপর। একেই বলে 'ক্যারোটিড হুক্'—এক ঘুসিতেই এক লক্ষ সর্ষে ফুল দেখতে-দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল হতভাগ্য।

কাগজপত্র, নোটের তাড়া—সবই পেলাম আমার নোটবইয়ে। লোকটার কাগজপত্র কৌতূহল ভরে দেখতে গিয়ে একটা খানে দেখলাম নাম লেখা রয়েছে বিম্পে ফিরিঙ্গি। বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লির তিন-তিনজন শেঠজিকে গলা কেটে খুন করে যে চম্পটি দিয়েছে! বিম্পে ফিরিঙ্গি। সোনার বিস্কুট আর হিরের বুদ্ধ কোটিপতি মালহোত্রার তোষাগার থেকে গায়েব করে যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে।

বিম্পে ফিরিঙ্গি শুধু গলা কাটা খুনে নয়, ধুরন্ধর চোরও বটে। এতক্ষণে বুঝলাম, ট্রেনের কামরায় তাকে কেন অত চেনা মনে হচ্ছিল।

সময় বিশেষ নেই। দুটো একশো টাকার নোট খামের মধ্যে রেখে বাইরে লিখলাম ঃ

'সুযোগ্য সহকারী বাঁটলো এবং তলাকান্তকে—রাজা কঙ্ক'

খামটা রাখলাম ঘাস জমির ওপর। মিসেস আচারীর ভ্যানিটিব্যাগটা ফিরিয়ে দেওয়া দরকার। ভদ্রমহিলা অনেক উপকার করেছে আমার। তাই ব্যাগটাও রাখলাম খামের পাশে। হিরে জহরতগুলো অবশ্য আমার পকেটে রাখলাম। বিজনেস ইজ বিজনেস! তা ছাড়া যার স্বামী ওইরকম বিচ্ছিরি চাকরি করে, তাকে করুণা করা সঙ্গত নয়...!

বাকি রইল বিম্পে ফিরিঙ্গি। দেখলাম, একটু-একটু করে জ্ঞান ফিরছে তার। কী করব একে নিয়ে? পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার অধিকার আমার নেই। ও কাজ যাদের তারা করুক।—

সুতরাং ওর রিভলভারটা পকেটে পুরলাম। আমার রিভলভার বার করে একবার মাত্র ফায়ার করলাম শূন্যে...

ছুটে আসুক তলাকান্ত আর বাঁটলো...আমি আমার পথ দেখি।

উলটো দিকে দৌড়োলাম। আসবার সময়ে দেখে এসেছিলাম গাড়িতে পৌঁছনোর শর্টকাট। সেই পথেই উঠে বসলাম মোরো-লিপটনে।

চারটের সময়ে টেলিগ্রাম করে দিলাম বন্ধুদের—বিশেষ কাজে এ-যাত্রা আর দেখা করা সম্ভব হচ্ছে না। দুঃখিত।

ছটার সময়ে পৌঁছলাম কলকাতায়।

পরদিন সকালবেলায় যুগান্তরে পড়লাম বিম্পে ফিরিঙ্গির ধরা পড়ার কাহিনি ঃ

চম্পকনগরের কাছে বেশ খানিকটা প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেওয়ার পর বিম্পে ফিরিঙ্গিকে অ্যারেস্ট করিয়েছে রাজা কঙ্ক। গলাকাটা খুনে এবং ধুরন্ধর জহর-চোর ডেপুটি জেল সুপারের গৃহিণীর জড়োয়া চুরি করে সটকান দেওয়ার তালে ছিল। রাজা কঙ্ক যে ভ্যানিটিব্যাগে জড়োয়া গয়না ছিল, সেটি ফিরিয়ে দিয়েছে এবং দুজন সরকারি গোয়েন্দার সাহায্যে নাটকীয় গ্রেপ্তার সম্ভব হয়েছে, তাদেরকে মোটা বখশিশ দিয়ে গেছে।'

'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত। (১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১)

শনিবারের মড়া

নারায়ণী গোয়েন্দানীর এই তেরোতলার অফিসঘর থেকে পাতালরেলের খোঁড়াখুঁড়ি দেখা যায়। এ ঘরের পুরো পশ্চিমের দেওয়ালটা অদ্ভুত পুরু কাচ দিয়ে তৈরি। পশ্চিমে যখন সূর্য অস্ত যায় গঙ্গার ওদিকে, কালচে কাচ পড়ন্ত রোদ্দুরকে ফিলটার করে ঘরে ঢোকায়। পুরো ঘরখানায় তখন গোধূলির রহস্য ভাসতে থাকে। দিনের বেলায় এ ঘরে নকল আলোর দরকার হয় না। সূর্য তাঁর আলো পাঠান কালচে কাচের মধ্যে দিয়ে। মোটা পরদা দিয়ে ইচ্ছে করে খানিকটা কাচ ঢেকে রেখে দেয় নারায়ণী গোয়েন্দানী—যাতে বেশি আলো চোখের মধ্যে দিয়ে ঢুকে মাথা গরম না করে দেয়।

নারায়ণী গোয়েন্দানীর চোখ দুটো অবশ্য বেশ বড়ই—জগতের আলো আর অন্ধকার দুটোই একটু বেশি করে ঢুকে পড়ে—চোখের সুড়ঙ্গ দিয়ে পৌঁছয় মগজে। সমাজের ওপরমহল আর নিচের মহল—দুটো মহলের খবর রাখে। রাঘববোয়াল আর চুনোপুঁটি—সব্বাই তাই তাকে যমের মতো ভয় পায়।

কারণ, নারায়ণী গোয়েন্দানী রহস্যের কিনারা করে দেয় বটে—কিন্তু সোজাপথে করে না। এক পয়সা দক্ষিণাও নেয় না। আইন-টাইন কিচ্ছু মানে না। ছুঁচবুদ্ধি, গণ্ডারের গোঁ, সিংহের সাহস, আর হাতির শক্তি নিয়ে ও বদমাশ ঘায়েল করে, ষড়যন্ত্র ছিন্নভিন্ন করে, ছদ্মবেশীর মুখোশ ছিঁড়ে উড়িয়ে দেয়—গরিবকে বাঁচায়, অত্যাচারের অবসান ঘটায়।

হ্যাঁ, এতগুলো গুণের সঙ্গে আরও একটা উপাদান ও মিশিয়ে দেয় কাজ উদ্ধারের সময়ে। ওর রূপ। শান্তশিষ্ট অবস্থায় মা লক্ষ্মী বলে মনে হয় বটে, কিন্তু রণক্ষেত্রে যখন নামে, তখন ওর বড়-বড় চোখ দুটো দিয়ে ধকধক করে আগুন ছিটকোয়, তখন ওর দশবাই চণ্ডীরূপ দেখে মূর্ছা যেতে পারলে বেঁচে যায় কুটিলকরাল কুচক্রীরা।

মানুষ গড়ার কারিগর নারায়ণী গোয়েন্দানীকে বানিয়েছিলেন আরও অনেক বিচিত্র উপকরণ দিয়ে। সেসব একটু-একটু করে প্রকাশ পাবে। হাতির মতো বিরাট দেহ তো ওর নয়—ছিপছিপে হিলহিলে যেন এক নাগিনী। কিন্তু ক্যারাটে ফ্যারাটে শিখে একাই দশজনের মহড়া নিতে পারে। অবিশ্বাস্য বেগে ঘুরতে থাকে তখন ওর মা লক্ষ্মীর মতো বডিখানা—শত্রুদের হাড়গোড় ভেঙে পঙ্গু করে দেয় চক্ষের নিমেষে।

কলকাতা এখন একটা আজব জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোটা দেশটাই তাই হয়েছে—কলকাতার আর দোষ কি। এ দেশে এখন যে যত কুকর্ম করতে পারবে—সে তত শিরোপা পাবে। কুকাজের অবসান ঘটানোর জন্যে অলিতে-গলিতে এখন ডিটেকটিভরা দোকান খুলে বসেছে। কেউ বলছে আমি 'গোমেশ গোয়েন্দা'। এরা যে-যার পাড়ার রহস্যসন্ধানের ব্যবসায় নেমেছে।

নারায়ণী গোয়েন্দানী কিন্তু ব্যবসা-ট্যবসা বোঝে না। ও স্রেফ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়। যেহেতু গোঁফ দেখলেই ও শিকারি বেড়াল চিনতে পারে—তাই ওর হাতে রক্ষে নেই দুর্জনের।

আজব শহর কলকাতায় ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটাতেই আবির্ভূত হয়েছে গোয়েন্দানী নারায়ণী। অপকর্ম দিয়ে অপকর্মের অবসান ঘটাতে তার তিলমাত্র অরুচি নেই। এইসব কারণেই তার কীর্তিকাহিনি লিখতে চাইনি এতদিন। হয়তো অপকর্মকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে যাবে। কিন্তু উদ্দেশ্য যখন সাধু হয়, তখন...

নারায়ণীর মতো রূপসী মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না। কিন্তু বিখ্যাত সেই প্রবাদের মতো তার রূপ নয়। প্রবাদটা যাঁদের এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, তাঁদের অবগতির জন্যে জানাই ঃ

ইষ্টকালয়, শ্যামা নারী, বটচ্ছায়া, কৃপাবারি।

এইসব কে না চায়? ইটের বাড়ি, কালো মেয়ে, বটের ছায়া আর দয়ার দান।

নারায়ণী কিন্তু এই ফরমুলায় পড়ে না। সে মোটেই কালো নয়, অথচ তাকে দেখলেই সব পুরুষই ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকে। তার গায়ের রঙটা কীরকম জানেন? এরকম গাত্রবর্ণ শুনেছি নাকি শুধু রূপকথার রাজকন্যেদেরই থাকে। প্রথম পরিচয়ের সময়ে আমি কিন্তু নারায়ণীর গায়ের রং দেখে ফস করে বলে ফেলেছিলাম, 'এক বাটি দুধে একটু আলতা মিশিয়ে দিয়ে গায়ে মেখেছেন নাকি?'

নারায়ণী তখন ওর দাঁতের ঝিলিক দেখিয়ে বলেছিল (দাঁত তো নয়, কোথায় লাগে সিংহলী মুক্তো), 'গালটা একটু চেটে দেখবেন?...'

শুধু আমিই লজ্জায় লাল, মানে বেগুনি হয়ে গেছিলাম। (কারণ আমি কালো মহাদেশের মানুষদের মতোই তিমির বর্ণের অধিকারী)।

যাক সেই প্রথম পরিচয়ের কথা। নারায়ণী গোয়েন্দানীর অভিনব কীর্তিকলাপ আমাকে এমনই অভিভূত করেছে যে, তার সর্বশেষ কীর্তিটি সবিস্তারে আপনাদের সমীপে উপস্থিত করার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

আবেদন মঞ্জুর? তাহলে শুনুন!

নারায়ণীর কথা লিখতে গেলে আমার কথাও একটু বলতে হবে। আমি লোকটা একেবারেই ছাপোষা। আমার এমন কিছু এলেম নেই যে পাঁচজনের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি। অথচ চেষ্টার কসুর করিনি। আমার মা-বাবা পটকে গেছে কোনকালে; ভাইবোন আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। আমি থাকি মুচিপাড়ার নেবুতলা পার্কের কোণের মেসবাড়িতে। আমি চেষ্টা করেছিলাম ফিল্ম ডিরেক্টর হতে, সাংবাদিক হতে এবং লেখক হতে—যেগুলো হতে গেলে মগজের পুঁজি বেশি দরকার হয় না—পকেটে টাকা না থাকলে হওয়া যায় (এর ব্যতিক্রম আছে নিশ্চয়—আমি সে দলে পড়ি না)। এত ঘাটে জল খাওয়ার ফলে আমার যোগাযোগ অনেক—সাদা বাংলায়, আমার আড্ডাখানার শেষ নেই। ছেলেদের সঙ্গে যেমন রকবাজি করি, ঠিক তেমনি মেয়েদের সঙ্গেও গুলতানি চালাই। সবাই আমাকে পছন্দ করে। ফিল্ম লাইন আর লেখাজোখার লাইনে একটা ম্যাজিক আছে। এ লাইন যে ছুঁয়ে থাকে, তাকেই সবাই ম্যাজিশিয়ান মনে করে।

আমাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে মেয়েরা। আমাকে দেখলেই দাঁত বের করে হেসে গায়ে ঢলে পড়ে কতরকম রগড়ই না করে। কারণ কী জানেন? আমি নির্বিষ। আমি কুৎসিত। গরিলা আর মানুষের মধ্যে আমি একটা মিসিং লিঙ্ক। আমার হাইট সাড়ে চার ফুট। গুহামানবদের কপাল যেরকম কার্নিশের মতো সামনে ঝুঁকে থাকত, আমার বিরাট কপাল

ঠিক সেইভাবে অনেকখানি এগিয়ে এসে দুটো চোখের ওপর ঝুলে থাকে। কার্নিশ থেকে লম্বা-লম্বা ভুরুর লোম যখন ঝুলে পড়ে, তখন চোখে ঢুকে গিয়ে চোখের মধ্যে কড়কড়ানি শুরু করে দেয়। সে এক বিচ্ছিরি অবস্থা। আমার গালের হনু দুটোও ছোট টিলার মতো উঁচিয়ে থাকে। এমন কি আমার চোয়াল বেধড়ক বড় হওয়ায় ওপরের দাঁতের পাটিকে পেছনে রেখে এগিয়ে থাকে সামনে আধইঞ্চির মতো। আমার ঘাড় আছে কিন্তু গর্দান নেই। তাই বিশাল চিবুক ঠেকে থাকে লোমশ বুকে। কাঁধ দুটো ষাঁড়ের কাঁধের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। ধড়টা যে অনুপাতে নিরেট আর বিরাট—পা দুটো সেই অনুপাত মেনে চলেনি; দুটো পা-ই বেঁটে আর বাঁকা। আমি অষ্টপ্রহর পাঞ্জাবি আর পাজামা পরে থাকি গরিলা আকৃতিটাকে কিঞ্চিৎ সভ্যভব্য করে তোলার জন্যে।

এ রকম চেহারার ব্যাটাছেলেকে কোনও মেয়েছেলেই ভালোবাসতে পারে না—মানে, প্রেমের পুরুষ করে তুলতে পারে না—কিন্তু তাকে নিয়ে অনায়াসে রঙ্গপরিহাস করা চলে। আমিও আমার গজালের মতো দাঁত বের করে হাসি। তাই আমি সবার প্রিয়।

কলেজ স্ট্রিটে আমার একটা ডেরা আছে। এক প্রকাশকের খাস কামরায়। এখানে জলপথের বিহার করতে অনেক কেষ্টবিষ্টু আসেন। জলপথে মানে বুঝলেন না? বড্ড ব্যাকডেটেড আপনি। কলেজ স্ট্রিটে লক্ষ্মী, সরস্বতী আর গণেশের উপাসকরা দুটো পথে পরিভ্রমণ করেন। একটা বিদ্যাসাগরীয় পথ—সেটা স্থলপথ; রঙিন জলের স্কোপ এ পথে নেই। আর একটা মধুসূদনীয় পথ—এটা জলপথ; এখানে রঙিন জলের ফোয়ারা ছোটে। রঙিন জলের ব্যাখ্যা নিশ্চয় করতে হবে না। সিরাজি এখন কালচারের ওপিঠ।

আমি এই আড্ডায় প্রায় যেতাম অফুরন্ত সময়ের কিছুটা কাটানোর জন্যে। প্রকাশক ছোটখাট কাজ দিতেন আর লাল-হলুদ-সাদা জল খাওয়াতেন। এই আড্ডাতেই একদিন জমে গেলাম নারায়ণীর সঙ্গে।

নারায়ণীর যে রূপ পরে দেখেছিলাম, প্রথম পরিচয়ে কিন্তু তার ছিটেফোঁটাও চোখে পড়েনি। ভারি ভদ্র, ভারি মিষ্টি, নিপাট সুন্দরী মেয়ে। চোখ-মুখ-দাঁত-নাক-চিবুক সবই যেন সাদা পাথর কেটে বানিয়েছে এক ভাস্কর যিনি কামিনীকে দামিনী করার গুপ্ত কৌশল রপ্ত করে ফেলেছেন। এই দামিনীর ঝলক মাঝে-মাঝে টের পেতাম নারায়ণীর বড়-বড় চোখের মধ্যে। কণ্ঠ তখন রণরণিয়ে উঠত—এর বেশি কিছু না। এই মেয়েই যে পরে তার ভয়ঙ্করী রূপ দেখিয়ে থ করে দেবে দুর্জনদের—তা কল্পনাও করতে পারিনি।

আমার সঙ্গে বিলকুল জমে গেছিল নারায়ণী। 'বিউটি অ্যান্ড দ্য বীস্ট' উপন্যাসটা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা আমাদের মুখোমুখি ছবিটা আন্দাজ করে নিতে পারবেন। আমাদের প্রকাশক বন্ধুটি বিলক্ষণ রসিক পুরুষ এবং জলপথে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করছেন। তাঁর আপ্যায়নকে আমরা অপমান করতে পারতাম না। আমি আর নারায়ণী দুজনেই জলপথের পথিক হয়ে যেতাম। সেই সময়ে খুলে যেত ওর মনের আগল। হুড়হুড় করে বলে যেত নিজের কথা। দিদি মরে যাওয়ার পর জামাইবাবুর আশ্রয় থেকে চলে এসেছে। দিদির শেষ ইচ্ছে ছিল যেন জামাইবাবুর হাতে সিঁথিতে সিঁদুর পরে নেয়। কিন্তু নারায়ণী তো অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি হয়েছিল। অত্যাচারী এই সমাজটার ওপর সীমাহীন আক্রোশ বুকের মধ্যে নিয়ে ও ঘরছাড়া হয়েছিল। থাকত একটা মেয়েদের হস্টেলে—ভবানীপুরে। খরচপত্র জুটিয়ে নিত টিউশনি আর প্রুফ দেখে। এরই মধ্যে পড়াশোনা চালিয়েছে আর গড়েছে নিজেকে। আজকাল মার্শাল আর্ট অনেক রকম বেরিয়েছে। নারায়ণী সেই বিদ্যে দিয়ে ওর নরম তুলতুলে শরীরটাকে

প্রয়োজনের মুহূর্তে শতঘ্নী অস্ত্র বানিয়ে তুলতে পারে—একই সময়ে একশো লোককে নাকি ঘায়েল করতে পারে। ওর হাত আর পা তখন চারখানা গদা হয়ে যায়—হাতের মুঠো দুটো হয়ে যায় দুটো লোহার বল।

জলপথে ভ্রমণবীরদের মুখে এরকম আস্ফালন ঢের-ঢের শুনেছি—আর এ তো বীরাঙ্গনা। কাজেই বিশ্বাস করতাম না একবর্ণও। তবে অবাক হয়ে যেতাম অকপট কথাবার্তা শুনে। মনের মধ্যে কোনও কপাট তো রাখেইনি—লজ্জা-ফজ্জারও ধার ধারত না। সিগারেট টানতে-টানতে কামসূত্র নিয়েও দিব্যি আড্ডা চালিয়ে গেছে। বাৎস্যায়ন মুনি কত রকম আসনের বর্ণনা দিয়ে গেছেন এবং কোনটা কোনদিক দিয়ে উৎকৃষ্ট, তার নিপুণ ব্যাখ্যা দিয়ে তাক লাগিয়ে দিত আমাদের। আমি আমার গরিলা-চোয়াল ঝুলিয়ে ফেলে তাজ্জব গলায় বলতাম, 'তুই তো বিয়েই করিসনি—এত খবর জানলি কী করে?'

অমনি প্রাণখোলা হাসি হেসে নারায়ণী বলত, 'তুই কী করেছিস?'

এই হল নারায়ণী। দেখলে মনে হয় মা লক্ষ্মী—বাংলার বধূ, মুখে তার মধু, নয়নে নীরব ভাষা। কিন্তু জমে গেলেই ঠেলা বুঝবেন। তখন সে জীবন্ত শতঘ্নী। মা দুর্গার রূপটা দেখেছিলাম পরে। ক্রমে-ক্রমে আসছি সে প্রসঙ্গে।

সে ব্যাপারে হোতা ছিলাম কিন্তু আমিই। গুচ্চের বিলিতি বই পড়তাম। কলেজ স্ট্রিটের পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে জলের দামে লোমহর্ষক রহস্য উপন্যাস কিনতাম। একদিন পড়লাম সাইমন টেম্পলারের কাহিনি। 'সেন্ট' অর্থাৎ সন্ত নামে যে দুর্জনদের কাছে একটা বিভীষিকা। সমাজের দুর্গ্রহদের সে টাইট দিত আইন-ছাড়া পথে—রেখে যেত একটা স্কেচ।—সেন্ট-এর নিজের হাতে একটানে আঁকা দেহরেখা।

নারায়ণী বইটা আমার কাছে ছিনিয়ে নিয়ে গেছিল। দুদিন বাদে ফেরত দিল। সেই সঙ্গে দেখাল পেনসিলে আঁকা একটা স্কেচ।

স্কেচ দেখেই বুঝেছিলাম 'সেন্ট'-এর প্রভাব ওর ওপর পড়েছে। নিজেও তাই বললে, 'নরহরি, এই হল আমার প্রতীক। সমাজের আঁচিলদের শায়েস্তা করব এই প্রতীক পাঠানোর পর।'

আমার নামটাই এতক্ষণ বলা হয়নি। নরহরি সরকার। জাতে কায়স্থ। কিন্তু গরুর মাংসও খেয়েছি। শুওর আরও ভালো লাগে। ভালো লাগে নারায়ণীকেও। নারায়ণীও আমাকে দারুণ পছন্দ করে। কিন্তু তাই বলে যেন কেউ ভাববেন না আমরা প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি। ওসব ছেনালিপনা আমাদের মধ্যে নেই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও একটা আড়াল থাকে—সব কথা বলা যায় না; ভাইবোন আর বন্ধুবান্ধবীদের মধ্যেও রেখে ঢেকে কথা বলতে হয়। কিন্তু নরহরি আর নারায়ণীর মধ্যে কোনও কথাই আটকায় না। দুজনেই দুজনের কাছে দুটো তেপান্তরের মাঠ। তাই তো আমাদের জলপথের পথিক প্রকাশক বন্ধুটি আমাদের নাম দিয়েছেন—নর-নারায়ণী।

আমি আগেই নিজের গাওনা গেয়ে নিচ্ছি এই কারণে, যে এর পর থেকে শুধু নারায়ণী স্তোত্রপাঠই করতে হবে। নারায়ণীর গায়ের রঙের সঙ্গে আমার গায়ের রঙের আশমান-জমিন ফারাক আছে, সে কথা আগেই লিখেছি। কালার কমপিটিশনে আমি দাঁড়কাককেও হারিয়ে দিতে পারি। উপরন্তু এই গরিলা-ফিগার। কাজের মধ্যে ভ্যারান্ডা ভাজা। ট্যাঙস-ট্যাঙস করে কলকাতায় চক্কর না মারলে আমার বেঁটে আর বাঁকা পা কটকট করে।

পাঁচজনের চোখে আমি একটা পয়মাল। কিন্তু নিশ্চয় নারায়ণীর কাছে নয়। তাই সে একদিন আমাকে বলেছিল, 'নরহরি, আমি হব কলকাতার প্রথম মেয়ে ডিটেকটিভ।' আমি বলেছিলাম, 'তোকে কেটে ফেলবে, খুবলে-খুবলে খাবে, ধর্ষণ পর্যন্ত করে ফেলতে পারে। কলকাতার দোগলাবাজদের তুই চিনিস না।' নারায়ণী হেসে গড়িয়ে পড়ে বলেছিল, 'তুই সত্যিই আর জন্মে গরিলা ছিলিস। মানুষ মেয়েদের এখনও চিনতে পারিসনি। মেয়েদের বুদ্ধি, মেয়েদের হিসেব, মেয়েদের সাহস তোদের চেয়ে বেশি। ঘাটতি ছিল শুধু গায়ের জোরে। মার্শাল আর্ট শিখে সেদিকেও মেরে দিয়েছি। মেয়েদের সবচেয়ে বড় গুণটা কী বলতো?' আমি বলেছিলাম, 'চোখ মারা। ভদ্রভাষায় কটাক্ষ।' ও বলেছিল, 'তুই একটা গাধা। মেয়েদের মোক্ষম মারণাস্ত্র হল তাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। ইনটিউশন। এর সঙ্গে আমি আরও দু-চারটে বিদ্যে শিখে নিয়েছি। এক নম্বর হল বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। যে-কোনও মানুষের হাত-পা-চোখ-মুখের ভঙ্গিমা দেখেই আঁচ করতে পারি তার মনের চেহারা—এর জন্যে টেলিপ্যাথি জানার দরকার হয় না। এই সঙ্গে জানি আর একটা বিদ্যে। পৃথিবীর যে-কোনও ভাষা একবার শুনেই উলটোদিক থেকে বলে যেতে পারি—বলার শব্দটাকেই শুধু নকল করি। এটা আমার কোড ল্যাঙ্গুয়েজ। নারায়ণী গোয়েন্দানীর সাংকেতিক ভাষা।'

আমি বলেছিলাম, 'নারায়ণী গোয়েন্দানী। এটা একটা নাম হল?'

ও বললে, 'মাই ডিয়ার হাফ-গরিলা, আমার এই অভিযানে তোকে মাঝে-মাঝে শাগরেদি করতে হবে। কেননা, তোর মতো ভিজে বেড়াল চট করে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার কোড ল্যাঙ্গুয়েজটা তোকে শিখে নিতে হবে। শত্রুদের সামনেই হয়তো এই ভাষায় কথা বলব—লোকে ভাববে ভয়ের চোটে আবোলতাবোল বকচি। ট্রেনিং এখুনি শুরু করছি ঃ নায়ন তাকিচ নিরীহ লাঞ্চচ। কী বুঝলি?'

আমার কানের মধ্যে ঝমঝমাঝম করে যেন একটা অজানা গানের পশলাবৃষ্টি হয়ে গেল। কিচ্ছু না বুঝে গজাল দাঁত বের করে হেসে ফেললাম। রেগে নিয়ে নারায়ণী বললে, 'তুই একটা আস্ত মর্কট। নায়ন তাকিচা নিরীহ লাঞ্চচ। শুধু শব্দ শুনে উলটোদিক বুঝতে পারছিস না? চঞ্চলা হরিণী চকিতা-নয়না। হল?'

নারায়ণী কিন্তু এই ভাষা আমাকে শিখিয়ে ছেড়েছিল।

এর পর থেকেই নারায়ণীর সঙ্গে কলেজ স্ট্রিটের জলপথ জাহাজঘাটায় তেমন আর দেখাসাক্ষাৎ হত না। বেশ কিছুদিন যেন উবেই গেছিল। তারপর পরপর দুটো পিলেচমকানো ঘটনা ঘটিয়ে ছেড়েছিল এই কলকাতায় আর আশেপাশে। আক্কেল গুড়ুম করে ছেড়েছিল পুলিশমহল আর মুখোশধারী শয়তানদের। সে দুটো ব্যাপারে আমার কোনও হেল্প নেয়নি। বলেছিল, 'এখন হাত পাকাচ্ছি। ইনকাম ভালোই হচ্ছে। সমাজের বুকে বসে যারা গরিবদের রক্ত শুষে খাচ্ছে পুলিশ প্রোটেকশন নিয়ে তাদের রক্তমোক্ষণ করিয়ে দেওয়ার মধ্যে একটা চার্ম আছে। সেই রক্ত মানে বস্তাপচা কালো টাকা দিয়ে সর্বহারাদের উপকার করে যাচ্ছি। আমার একটু কমিশন রেখে দিচ্ছি অবশ্য। নইলে এসটাব্লিশমেন্ট চালাব কী করে।'

এসব কথা বলেছিল ওর তেরোতলার অফিসঘরে বসে। এইরকম খানদানি এলাকায় এরকম একটা ঘর ম্যানেজ করল কী করে, ভেবে অবাক হয়ে গেছিলাম। লিফট্ থেকে নেমেই বাঁ-হাতি দরজা। কালো কাচের পাল্লা। ভেনেসিয়ান ব্লাইন্ড দিয়ে ঢাকা। ওপরে কাচের ওপর সোনালি সুতো দিয়ে আঁকা ওর সেই নারায়ণী স্কেচ। তলায় কিছু লেখা নেই। আমি ইতিউতি তাকাচ্ছিলাম কলিংবেল-এর বোতাম টিপব বলে, এমন সময় প্রায় কানের কাছে

শুনলাম নারায়ণীর হাসি আর বিদ্রূপবচন, 'ওরে-ওরে মর্কট, চলে আয় ভেতরে, দরজা খোলাই আছে, হেলেদুলে আয় রে!'

নারায়ণীর এরকম ফচকেমি আমার গা-সওয়া। তাই কিচ্ছু মনে করলাম না। পাল্লা ঠেললাম। খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে ছেড়ে দিলাম, আপনিই বন্ধ হয়ে গেল। দেখলাম খাঁটি কাশ্মিরী কার্পেটে মোড়া একটা দারুণ ঘরে দাঁড়িয়ে আছি। এ ঘরের মেঝেতে কার্পেট, দেওয়ালে কার্পেট, কড়িকাঠে কার্পেট। প্রকৃতই কার্পেটকক্ষ। নেই শুধু নারায়ণী। কেউই নেই।

শুনলাম আবার সেই খিলখিল হাসি আর বিচ্ছিরি ইয়ারকি, 'ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয়—দরজা ঠেলে চলে আয়!'

তাকিয়ে দেখি, সামনে দরজার মতো কী একটা রয়েছে বটে, আমি তো ভেবেছিলাম পারস্যের কার্পেট। সোনালি হাতল চোখে পড়তেই সেটা আঁকড়ে ধরলাম। অমনি গোটা পাল্লাটা সাঁৎ করে বাঁ-দিকের দেওয়ালে ঢুকে গেল!

চমকে উঠেছিলাম। দরজার এরকম ব্যবহার আমি আশা করিনি।

তারপরেই দেখেছিলাম এই কাহিনির নায়িকা গোয়েন্দানী নারায়ণীকে (আমাকে নায়ক যদি মনে করে থাকেন, তাহলে মস্ত ভুল করলেন—আমি যে কী তাই আমি জানি না)।

নারায়ণী ওর ভুবন-ভোলানো হাসি হেসে আমার দিকে তাকিয়েছিল। এতদিন পরে দেখে আমার তাক লেগে গিয়েছিল। মেয়েদের একটু মেজে-ঘষে দিলে দেখতে আরও ভালো হয়। নারায়ণী কী দিয়ে মেজেছে নিজেকে? এরকম অপ্সরার মতো লাগছে কেন? কাচের ঘরের জেল্লার জন্যেও চেহারা হয়তো আরও খুলে গেছে। পাজামা পাঞ্জাবি পরা এই হাফ-গরিলা যে নিতান্তই বেমানান এখানে!

নারায়ণী বললে, 'নরহরি, তোর বাঁকা পা আরও বেঁকে গেছে। বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলছে, তুই ঘাবড়ে গেছিস—মুখ যদিও নির্বিকার। বোস। এ ঘর আমি ম্যানেজ করেছি খোদ পুলিশ কমিশনারের কৃপায়—তাঁর একটা ছোট্ট উপকার করে দিয়েছিলাম। উনিই দরজার বাইরে টিভি ক্যামেরা বসিয়ে রেখেছেন—এই দ্যাখ স্ক্রিন—এখানে বসেই আমি দেখতে পাই এল কোন মক্কেল। কোড ল্যাঙ্গুয়েজটা ভুলে যাসনি দেখে আই অ্যাম গ্ল্যাড।'

মেসবাড়ি থেকে টেলিফোনে ডেকে পাঠিয়েছিল নারায়ণী। তিনতলা বাড়িতে ফোন একটাই। ওর ফোন যখন গেছিল, আমি তখন আমার মাসিক ২৬২ টাকার তক্তপোশে শুয়ে দৈনিক গল্পপত্রিকা পড়ছিলাম। বেড়ে গল্প লেখে প্রতিদিন—মনে হয় যেন টাটকা খবর। এমন সময়ে শুনলাম-কে একটা মেয়েছেলে আমাকে ডাকছে।

মেসের চাকর এসেই দিয়ে গেল খবরটা। মেয়েছেলেদের পাতে পড়বার যোগ্য আমি নই, তা সে জানে। তাই মুচকি হাসল না।

লুঙ্গি সামলে নিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে যেই বলেছি 'হ্যালো', অমনি নারায়ণীর কোড ল্যাঙ্গুয়েজে কলকলিয়ে উঠেছিল খোদ নারায়ণীর কণ্ঠস্বর—

রকারদ ইকেমাতো
সয়ে লেচ রেক টচ
রকারস রিহরন
রেমাতো ছিনেচি ছিনেচি।

একবার শুনেই শিহরণ বয়ে গেছিল শিরদাঁড়া দিয়ে। এ যে মদ্দানি নারায়ণীর পেটেন্ট ভাষা!

বলেছিলাম, 'আর একবার হোক, আর একবার।'

তখন নারায়ণী টেলিফোনের তারের মধ্যে দিয়ে যে হাসিখানা পাঠিয়েছিল, তা শুনলে (আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি) যে কোনও মুনি-ঋষির শরীরে উত্তেজনা ঘটে যেত। আমি কিন্তু রইলাম নির্বিকার (জিনিসই আলাদা) এবং শুনলাম আজব ভাষার পুনরাবৃত্তি। মানেও করে নিলাম তক্ষুনি। নারায়ণী ছড়া কাটছে এইভাবে ঃ

চিনেছি চিনেছি তোমারে
নরহরি সরকার
চট করে চলে এস
তোমাকেই দরকার।

ঠিকানা নিলাম। চলে এলাম এই তেরোতলার মুকুরমহলে।

আমি চেয়ার টেনে নিয়ে বসতেই নারায়ণী টেবিলের তলা দিয়ে নিজের পা দুখানা ছড়িয়ে দিল সামনে। শিরদাঁড়াটাকেও হড়কে নামিয়ে নিল পিঠ-উঁচু গদি চেয়ারের ওপর দিয়ে। কাঁধের হলুদ শাড়ির আঁচল খসে পড়ল হেঁচড়ানির ফলে। ওর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

আমি বললাম, 'আমাকে কি নাগর পেয়েছিস? ওইভাবে বুকের আঁচল খসালি কেন? খোলা বুক উঁচিয়ে বসাটা বেহায়া মেয়েদের সাজে।'

ও বললে, 'তোকে আমি ছেলে বলেই মনে করি না। তাই তো এত ভালোবাসি।'

আমিও বললাম, 'তোকেও আমি মেয়ে বলে মনে করি না, তাই তো এত কাছে আসি।'

ও বললে, 'এটা আড্ডায় জায়গা নয়—কাজের জায়গা।'

আমি বললাম, 'কী কাজ?'

ও বললে, 'মন্টেগু জন ড্রুইট খুব সম্ভব কলকাতায় পুনর্জন্ম নিয়েছে। চিনিস মন্টেগুকে? গুড। স্কটল্যান্ডের সন্দেহ, এই ছোঁড়াই জ্যাক দ্য রিপার নাম নিয়ে লন্ডনের ইস্ট এন্ডে পরপর ছজন বেশ্যাকে খুন করে কেটে ছিঁড়ে ফালা-ফালা করেছিল। মাংস কেটে নিয়ে নিয়ে ছবি ঝোলানোর পেরেকে টাঙিয়ে রেখেছিল, নাড়িভুঁড়ি চেঁচে বের করে নিয়েছিল, হার্ট, কিডনি, ব্রেস্ট কেটে নিয়ে টেবিলের ওপর পাশাপাশি সাজিয়ে রেখেছিল, মুখ চিরে ফালা-ফালা করেছিল, নাক আর কান কেটে রেখেছিল, গলা কেটে দু-টুকরো করেছিল। কসাই-এর অধম হলেও ছিল তার কবিত্ববোধ। তার লেখা একটা কবিতা আজও রেখে দিয়েছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড।'

আমি বললাম, 'সে কবিতাটা এই ঃ

I'm not a butcher,
I'm not a yid,
Nor yet a foreign skipper,
But I'm your own light-hearted friend,
Yours truly, Jack the Ripper."

নারায়ণী বললে, 'তোর গরিলা ব্রেনের শার্পনেস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। নরহরি,

জ্যাক দ্য রিপার আত্মহত্যা করেছিল আজ থেকে ঠিক একশো চার বছর আগে। মেয়েখুনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে নিশ্চয় ফের জন্ম নিয়েছে ধরাধামে—এবার এই কলকাতায়।'

আমি গালে হাত দিয়ে বললাম, 'একদিক দিয়ে ভালোই করেছে। বড্ড এডস রোগ ছড়াচ্ছে বেশ্যারা।'

'বেশ্যা নয়, ধরেছে বাড়ির বউদের।'

সত্যিই আঁতকে উঠলাম—'কটা খুন হয়েছে? কোথায়? কাগজে বেরোয়নি কেন?'

'হয়েছে আপাতত একটা। কাল রাতে। কাগজওয়ালারা এখনও খবর পায়নি। কাল ছিল শনিবার। কথায় আছে, শনিবারের মড়া দোসর চায়, তাই আরও মৃত্যু আসন্ন বলেই আমার বিশ্বাস। অবলা মেয়েদের এইভাবে যে খুন করে, আমিও তাকে খুন করব। তোকে শুধু একটা কাজ করতে হবে।'

আমি বললাম, 'হয় তুই বেশি হুঁশিয়ার, না হয় বাতিকে ভুগছিস। আইবুড়ো থাকলে ও রোগ হয়। ধরে নিয়েছিস, জ্যাক দ্য রিপার নতুন জন্ম নিয়ে মেয়ে খুন শুরু করেছে। যেহেতু শনিবারে মড়া পড়েছে অতএব আরও খুন হবে। কিন্তু তোকে তো খুন করবে না। তুই বয়ে একার, শয়ে য-ফলা আকার নস, তুই কারও বউও নস, তোর ভয় কী?'

নারায়ণী বললে, 'ব্যাপারটা আগে শোন। তারপর ফুট কাটিস। এই যে বাড়িটায় বসে আছিস, এটা ইংরেজি E অক্ষরের প্যাটার্নে তৈরি। এই কমপ্লেক্সে মোট ফ্ল্যাটের সংখ্যা ২৯৩। এত বড় ফ্ল্যাটবাড়ি গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে আর নেই। এখানে ব্যবসা চলছে, ফ্যামিলি নিয়ে থাকাও হচ্ছে। এক ফ্ল্যাট থেকে আর এক ফ্ল্যাট দেখা যায়। ইচ্ছে করেই তা করা হয়েছে—যাতে ২৯৩ টা ফ্ল্যাট মালিকদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই বিল্ডিংয়েরই ১২৩ নম্বর ফ্ল্যাটে মিসেস সাহানা সিকদারকে কাল রাতে জন্মান্তরিত জ্যাক দ্য রিপার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ক্ষুর চালিয়ে সরু-সরু করে ফালি করে রেখে গেছে। গলাও দু-টুকরো করেছে। শুধু রেপ করেনি। রক্তমাখা ক্ষুরখানা রেখে গেছে। কাঠের বাঁটে তার বুড়ো আঙুলের ছাপও পাওয়া গেছে।'

'সাহানা সিকদারের স্বামী তখন কোথায় ছিলেন? ছেলেমেয়ে?'

'স্বামী রয়েছেন ব্যাঙ্গালোরে—অফিস থেকে পাঠিয়েছে সেখানকার হেড-অফিসে—ফেরার কথা পনেরো দিন পর—কিন্তু খবর চলে গেছে। আজকের ফ্লাইটেই ফিরছেন। ওঁদের কোনও ছেলেমেয়ে নেই। সাহানার বয়স ছাব্বিশ। স্বামী সুজন সিকদার মাত্র দু-বছরের বড়। সাহানাকে আমি দেখেছি। খুব একটা আহামরি রূপসি নয়। হিংসে করে বলছি, ভাবিসনি যেন, সাহানার রং মাঝারি, অতিরিক্ত স্মোকিং-এর ফলে দাঁতে ছোপ পড়েছে, হাসলে চোখের কোণ আর ঠোঁটের কোণে চামড়া ইকড়িমিকড়িভাবে ভাঁজ খেয়ে যায়। স্বামীকে মাসের মধ্যে দিন পনেরো কলকাতার বাইরে থাকতেই হয়। তখন সাহানা একপাল পরপুরুষ নিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরোয়—মানে বেরোত। বাড়িতেও অনেক রাত পর্যন্ত হুল্লোড় চলত।'

'তুই জানলি কী করে?'

হাসল নারায়ণী, 'হাজার হোক মেয়ে হয়ে জন্মেছি, কেচ্ছা জানবার কৌতূহল তো আছেই। এই ঘর থেকেই দেখা যায় ১২৩ নম্বর ফ্ল্যাট। আয় দেখাচ্ছি।'

গদিচেয়ার ছেড়ে ওঠবার আগে বেঁকে গিয়ে, টেবিলের ড্রয়ার টেনে একটা বাইনোকুলার বের করল নারায়ণী। তারপর গেল পশ্চিম দিকের দেওয়ালের কাছে। এখানে কাচ নেই। ইটের দেওয়ালে সারি-সারি তাকে বিস্তর বই। সবই ক্রাইমের বই। খাড়াইভাবে

রাখা বইয়ের ভিড়ের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে ফ্রেডরিক ফোরসাইথ-এর লেখা 'দ্য নিগোসিয়েটর' বইখানা। এই বইয়ের প্লট নকল করেই খুন করা হয়েছে রাজীব গান্ধীকে। বুঝলাম নারায়ণী বইটা ফের পড়ছিল।

আমি যখন বই দেখছি, নারায়ণী তখন তাক-ভর্তি দেওয়াল ধরে টানছে। কাঠের পাল্লার ওপর বই রাখায় দরজা দেখা যাচ্ছিল না। এখন তা খুলে গেল। এসে দাঁড়ালাম ব্যালকনিতে। চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে ফোকাস করে নিল নারায়ণী। তারপর আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে, 'দ্যাখ।'

১২৩ নম্বর ফ্ল্যাটের দরজা-জানলা সব বন্ধ।

নারায়ণী বললে, 'জানলা যখন খোলা থাকত, তখন তো আমি দেখেছি ওদের কীর্তি। চারজনকে নিয়ে ফুর্তি করত সাহানা। পুলিশ তাদের খবর পাবে না। কারণ সাহানা আর নেই। প্রতিবেশীরা মুখ খুলবে বলে মনে হয় না—মার্ডার কেসে আন্দাজে মার্ডারারের নাম কেউ বলতে চায় না। সুজন সিকদারও জানে না, এই চারজন কে-কে। কিন্তু আমি চিনি এই চারজনের একজনকে।

এই বলে নারায়ণী আমাকে ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে এল—তাকভর্তি পাল্লা বন্ধ করতে-করতে বললে, 'ওই ফ্ল্যাটের ঠিক ওপরকার ফ্ল্যাটে সে থাকে।'

'তার নাম?'

'বিনয় মালাকার। ছবি আঁকতে জানে। কিন্তু রোজগার তেমন নেই। আমার নারায়ণী স্কেচ দেখে নিজে এসে আলাপ করে গেছিল—তাই আমি এই সময়ে লোকটার কাছে ঘেঁষতে চাই না। লম্বায় সে ছ'ফুটের কাছাকাছি। আগের জন্মের জ্যাক দ্য রিপার ছিল বেশ ছিপছিপে সুশ্রী ছোকরা। বেশ্যাপ্রিয় পুরুষ। আর এই লোকটা মানুষ-দানব। চোখের তারা দেখলেই বুঝবি মেয়ে-পটানো চাহনিটা কি মারাত্মক। আমাকেও হিপনোটাইজ করতে চেয়েছিল। ওরকম চেহারা দেখলে সব মেয়েই ঢলে পড়ে। সাহানার দোষ কী। মাসের পনেরো দিন স্বামীছাড়া থাকা একটু কষ্টকর ব্যাপার বইকি। বিনয় ওই ফ্ল্যাটে প্রায় যেত। এক বিছানায় শুতেও দেখেছি।'

'খুব খারাপ কাজ করেছিস,' বললাম আমি—'নিষিদ্ধ দৃশ্য দেখা অত্যন্ত কুরুচি। তোকে মানায় না। যাক, দেখেই যখন ফেলেছিস, তখন আমাকে জড়াচ্ছিস কেন?'

'পৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারি হতে যাসনি, নরহরি। দোব হাটে হাঁড়ি ভেঙে। বিনয় মালাকার খুনি কিনা সেটা প্রমাণ করতে হবে। তুই ওর ঘরে যাবি জার্নালিস্ট সেজে। টিপিক্যাল জার্নালিস্টদের মতোই তুই কদাকার, পোশাকও সেই রকম, জার্নালিজম-ও করিস—কিন্তু কল্কে পাসনি, তবে ইন্টারভিউ নিতে হয় কী করে তা জানিস। এই নে আমার ক্যামেরা। এক গেলাস জল এনে দিতে বলবি বিনয়কে—সেই গেলাস হাতসাফাই করে কাঁধের ঝোলায় ফেলবি—ফিংগার-প্রিন্টের ফটো নিয়ে মিলিয়ে দেখব ক্ষুরের ফিংগার-প্রিন্টের সঙ্গে মিলে যায় কিনা। ক্ষুরের ফিংগার-প্রিন্ট কাল সকালেই পেয়ে যাব—সে লাইন করে রেখেছি। এলোমেলো খানকয়েক ফটো তুলবি। আর জেনে নিবি, সাহানার সঙ্গে আর যে তিনজন ছোকরা ঘুরঘুর করত, তাদের নাম কী ধাম কোথায়।'

আমি বললাম, 'বিনয় মালাকার সাহানাকে খুন করতে যাবে কেন? মোটিভ কী?'

'জেলাসি। এক মেয়ে চার নাগর—নিশ্চয় বিনয়কে কাট করতে চেয়েছিল সাহানা। তুই যা—এখন বিনয় একা আছে।'

‘ফ্ল্যাটে আর কেউ থাকে নাকি?’

‘ওর বউ থাকে। বাঁজা মেয়েছেলে। হস্তিনী বললেই চলে। কিন্তু রোজগার করে ভালো। নইলে এ ফ্ল্যাট কিনতে পারত না। অনেক রাত করে বাড়ি ফেরে। নাম তার হাসি। দেখে হেসে ফেলিসনি যেন। যদিও এখন নেই। যা, যা।’

প্রায় ঘাড়ধাক্কা দিয়েই আমাকে বের করে দিল নারায়ণী।

হাসি কিন্তু ফ্ল্যাটেই ছিল। আমার ধারণা ছিল, সৃষ্টিকর্তা শুধু আমাকেই অমাবস্যার অন্ধকার দিয়ে গড়েছেন। এখন তো দেখছি হাসি মেয়েটাও কম যায় না। আমি তো মশাই হাঁ করে চেয়েছিলাম দরজা খোলার পরেই। বেল টিপতেই ইলেকট্রনিক মিউজিক শুরু হয়েছিল। শুনছিলাম আর তৈরি হচ্ছিলাম মানব-দানব বিনয় মালাকারের সঙ্গে মোলাকাতের জন্যে। তার বদলে দরজা খুলে দিল হাসি মালাকার স্বয়ং। রক্ষেকালীর বাচ্চা বললেই চলে। দাঁত ছরকুটে রয়েছে। মোটা-মোটা কাফ্রী ঠোঁট ফেটেফুটে রয়েছে। নাক থ্যাবড়া—প্লাস্টিক সার্জারি করে একটু উঁচু করা হয়েছে কিনা ঈশ্বর জানেন। উটকপালী নাম্বার ওয়ান। অনায়াসে ফুটবল খেলা যায় যেন সেই কপালে। চুল এতই পাতলা যে নেই বললেই চলে। চোখ গোল-গোল। মুখও গোল। কালো হাঁড়ি বলা চলে। পুরো বডিখানাও বোধহয় গোল। তাই গলা থেকে পা পর্যন্ত ম্যাক্সি দিয়ে ঢেকে রেখে দিয়েছে। গোটা অবয়ব থেকে এমনই একটা বিশ্রী ব্যাপার বিচ্ছুরিত হচ্ছে যে আমি হাসতে ভুলে গিয়ে হাঁ করে চেয়ে রইলাম। হাসিও আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। সে-ও তো আমার মতো কদাকার পুরুষ কখনও দেখেনি।

দুজনেই যখন হাঁ, তখন পেছনে এসে দাঁড়াল মানব-দানব বিনয় মালাকার। দানবদেহী হলেও মানব তো বটে। চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি পরকীয়া প্রেমের পাত্রীটি নৃশংসভাবে নরকে প্রস্থান করেছে। তার প্রতিক্রিয়া চোখেমুখে ফুটে উঠেছে। উদ্বেগে কালো, উৎকণ্ঠায় টানটান।

আটঘাটের জল-খাওয়া ঘোড়েল মাল আমি। নিমেষে ম্যানেজ করে নিলাম নিজেকে। জার্নালিস্টের জয় যে সর্বত্র, তার আর একদফা প্রমাণ হাতেনাতে জুটিয়ে নিলাম। আমি যে কাগজের লোক এবং বিশেষ তদন্তে বেরিয়েছি—একথা জানামাত্র দুজনেরই মুখ আরও শুকিয়ে গেল। হাসিদেবী এমনিতেই কান্নাকান্না মুখ করেছিল। এখন তা শুকনো আমড়া হয়ে গেল। সাহানাকে ক্ষুর দিয়ে চেরা হয়েছে শুনে ইস্তক ভয়ে আধমরা হয়ে রয়েছে হাসিরাশি দেবী। (পুরো নামটা তাই—রাশি রাশি হাসি-কে উলটে নিলেই হাসিরাশি!) ভীষণ টেনশন চলছে। মানব-দানব স্বামী তাকে অনেক বুঝিয়ে গেল আমার সামনেই। বাড়ি থেকে বেরনো বন্ধ করলে কী হয়? সব কাজ চলুক। সবসময়ে ব্যালকনি থেকে ১২৩ নম্বর ফ্ল্যাটের দিকে তাকিয়ে থাকলে টেনশন তো বেড়েই চলবে। মডার্ন জ্যাক দ্য রিপার অন্তত এ ফ্ল্যাটে ঢুকবে না—শিরদাঁড়া টেনে ছিঁড়ে দেবে বিনয় মালাকার।

কিন্তু তাতেও স্বস্তি পাচ্ছে না হাসিরাশি দেবী। আরও শুনলাম, এই ফ্ল্যাটবাড়ির ঘরে-ঘরে আতঙ্ক ঢুকে গেছে। প্রত্যেকেই ‘ম্যাজিক আই’ দিয়ে আগে দেখছে, কে বেল টিপছে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। আমাকেও ম্যাজিক আই দিয়ে দেখে নিয়েছে হাসিরাশি। চিনেছে বলেই তো দরজা খুলেছে। একটু আগেই আমি নিচের ফ্ল্যাটে ঢুকেছিলাম তো?

নিচের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখছিলাম ১২৩ নম্বর ফ্ল্যাট। রূপসি মেয়েটার সঙ্গে যখন আমার এতই ভাব, তখন আমাকে দরজা খুলে দিতে ডর লাগেনি।

অথচ ভয়ডর কাকে বলে, এতদিন তা জানত না হাসিরাশি। ছেলেবেলা থেকেই ডানপিটে। বড়লোকের মেয়ে। কনভেন্টে পড়া মেয়ে। ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান ভাষা জানা মেয়ে। কাজ করে বিভিন্ন এমব্যাসিতে। ফরেনার এলে কলকাতা ঘুরিয়ে দেখায়। বাড়ি ফেরার সময়ের ঠিক নেই। কখনও মাঝরাতে, কখনও রাতভোরে। বাপ-মা'র অমতে বিনয়কে মালা পরিয়েছে বলে ত্যাজ্যকন্যা হয়েছে। তাতে ওর বয়ে গেল। রোজগারের টাকায় ফ্ল্যাট তো কিনেইছে। টাকাও জমিয়েছে। কাল সকালেই লাখ টাকার ইনসিওর করেছে নিজের নামে, রাতেই ফর্দাফাঁই হল সাহানা। এর পর কে হবে? ভাবতে ভাবতেই একরাতেই খানকয়েক চুল পাকিয়ে ফেলেছে হাসিরাশি দেবী।

আমি বকবকানি শুনছি আর টুকটাক প্রশ্ন চালিয়ে যাচ্ছি। হাসি যেই রান্নাঘরে আমার তেষ্টা মেটাতে গেলাসভর্তি কোল্ড ড্রিঙ্ক আনতে গেল, অমনি আমি জিজ্ঞেস করে নিলাম বিনয় মালাকারকে, 'সাহানা দেবীর বাকি তিনজন পরপুরুষ বন্ধুর নামধাম কি বলবেন?' বিনয় চমকে উঠেছিল। আমি গজাল দাঁতের হাসি হেসে দেখিয়ে বলেছিলাম, 'সবাই সব জানে মশাই। আপনারই কোনও রাইভ্যাল তো এ কাজ করতে পারে?' বিনয় যেন কীরকম হয়ে গেল। গলার কণ্ঠা ওঠানামা করছে দেখে হাসিরাশি দেবীকে বললাম আর এক গ্লাস ঠান্ডা পানি তাকে এনে দিতে এবং তা আনতে চোঁ-চোঁ করে শেষ করে দিল মানব-দানব। মুখ তার ফ্যাকাশে। আমি বললাম, 'আপনার এত ভয় কীসের? আমি তো আছি। কাগজের লোককে মশাই পুলিশেও ভয় পায়—খুন যে করেছে, সে আর এ তল্লাটে ভিড়বে না—আপনি শুধু আমাকে হেল্প করুন।'

আমি ধানাই-পানাই করে যাচ্ছি আর ভাবছি কোন ফাঁকতালে বিনয়ের আঙুলের ছাপ লাগা গেলাসটা সরানো যায়। দেবা আর দেবী দুজনেই যে উপস্থিত, আগে তো জানতাম না। আমাকে এই সংকট থেকে মুক্তি দিল স্বয়ং নারায়ণী।

ইলেকট্রনিক মিউজিক বেজে উঠল দরজার পাশে। মানব-দানব উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই ভুবনমোহন হাসি হেসে ঘরে ঢুকল নারায়ণী—এ হাসি যে হাসতে পারে দুনিয়ায় তার অপ্রাপ্য কিছু থাকে না। কাঁধে ঝুলছে জরিদার কাচ-চুমকি-পুঁতি বসানো রাজস্থানী ঝোলা। ঘরভরতি বিষাদ-মেঘকে চকিতে উড়িয়ে দিল প্রাণবন্ত কথাবার্তায়। প্রতিবেশিনী হিসেবে তার দায়িত্ব রয়েছে এই ফ্ল্যাটবাড়ির সব মেয়ের দেখভাল করার। কথা বলতে-বলতে উঠে গেল ব্যালকনিতে। ঝোলা থেকে বাইনোকুলার বের করে দেবা আর দেবীর হাতে গছিয়ে দিয়ে ফিরে এল ঘরে। শরবতের গেলাস তিনটে (একটা গেলাসে হাসিও শরবত খেয়েছিল) তুলে নিয়ে গিয়ে রেখে দিল রান্নাঘরে। ফিরে গেল ব্যালকনিতে। আরও কিছুক্ষণ বকর-বকর করে আমাকে নিয়ে চলে এল নিচের তলায় নিজের ফ্ল্যাটে। ঝোলা থেকে গেলাস তিনটে বের করে রাখল টেবিলে।

বললে, 'চুরি করে আনলাম। শরবতের গেলাস সবসময়ে দরকার হয় না। চুরি গেছে জানতে পারার আগেই কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'তুই নিজেই যদি যাবি তো আমাকে পাঠালি কেন?'

'কারণ আছে, কারণ আছে,' বলতে-বলতে ফোনের রিসিভার তুলে নিল নারায়ণী। ডেকে পাঠাল পুলিশেরই এক ফিংগার-প্রিন্ট এক্সপার্টকে।

সন্ধের সময়ে বিনয় বেরিয়ে গেছিল গঙ্গার হাওয়া খেতে। তখন ঘড়িতে বাজে ছ'টা। আধঘণ্টা পরেই ইলেকট্রনিক মিউজিক শুনে ম্যাজিক আই দিয়ে তাকিয়ে হাসি দেখল বিনয় ফিরে এসেছে। দরজা খুলে দিল। বিনয় ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে সোফায় গিয়ে বসল। মুখ পাথরের মতো শক্ত। হাসিও বসল ওর গাঁ-ঘেঁষে। মুখের পরতে-পরতে অশান্ত স্নায়ুর নৃত্য চলছে। বিনয় উঠে গেল টয়লেটে। ফিরে এসে দাঁড়াল সোফার পেছনে—হাসির ঠিক পেছনে। বাঁ-হাতে বউয়ের থুতনি চেপে ধরে পেছনে হেলিয়ে চুমু দিল কপালে। ডান হাতে পকেট থেকে বের করে আনল ক্ষুর। আঙুলের কায়দায় খুলে গেল ফলা। এর পর একটানে দু-টুকরো হবে হাসির গলা।

কিন্তু তা হয়নি। পর্দার আড়ালে আমি আর নারায়ণী দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। বিনয় বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দুজনে ঢুকেছিলাম ফ্ল্যাটে। হাসিকে বলেছিলাম—খোদ পতিদেবতাও যদি ফিরে আসে আমাদের অস্তিত্ব যেন না জানায়। জানান দেব আমরা নিজেরাই।

ক্ষুর যখন খেলে গেল বাতাসে, নারায়ণীর হিলহিলে বডিও খেলে গেল বাতাসে। পর্দার আড়াল থেকে বিনয় পর্যন্ত দূরত্বটা যেন বিদ্যুতের পিঠে চেপে পৌঁছে গেল—ক্যারাট মারে উড়িয়ে দিল ক্ষুর।

তারপরেই পরের পর মার। তছনছ হয়ে গেল লিভিংরুম, ঠিকরে গেল হাতির দাঁতের স্ট্যান্ড ল্যাম্প। দানবদেহী বিনয় মালাকারকে নিয়ে কিছুক্ষণ যেন লোফালুফি খেলে গেল নারায়ণী। তারপর তার হাত-পা পাঁজরা ভাঙা শরীটাকে এক লাথি মেরে ঘরের কোণে গড়িয়ে দিয়ে তুলে নিল ফোনের রিসিভার। ডেকে পাঠাল পুলিশের লোকদের।

তারা এল। গদ্গদ গলায় নারায়ণীকে বললে, 'সাধু! সাধু! এত সহজে সাহানার হত্যাকারী ধরা পড়বে ভাবতেই পারিনি।'

চোখ পাকিয়ে গলা রণরণিয়ে নারায়ণী বললে, 'এইজন্যেই রসাতলে যাচ্ছে কলকাতার পুলিশ। আপনারা যাকে ধরলেন, সে তার নিজের বউয়ের গলায় ক্ষুর চালাতে যাচ্ছিল বউয়ের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আর ইনসিওরেন্সের টাকার জন্য। আপনারা ভাবতেন সাহানার হত্যাকারী হাসিরাশি দেবীকেও খুন করে গেছে। কোনওদিনও জানতে পারতেন না কে খুন করেছে সাহানাকে।'

চোখ ছানাবড়া করে (নারায়ণীর দশবাই চণ্ডীরূপের জন্যেও বটে) পুলিশ অফিসার বলেছিল, 'আপনিও জানেন মনে হচ্ছে?'

'না জানলে কি ন্যাকামি করছি?'

'নামটা জানতে পারি?'

'হাসিরাশি মালাকার। আপনার সামনেই বসে রয়েছে।'

হাসি তক্ষুনি চোখ উলটে অজ্ঞান হয়ে গেছিল। নারায়ণী ফাঁস করে দিয়েছিল হাসির কুকীর্তি। লম্পট স্বামীর জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছে। অথচ লাম্পট্য চলছে অবাধে। চোখের সামনে। ১২৩ নম্বর ফ্ল্যাটে। স্বামীকে রোখা দরকার। ব্যাভিচারিণীকে মারা দরকার। তাই ক্ষুর চালিয়েছিল কাল রাতে। তাই এত ভয়।

প্রমাণ? ক্ষুরের বাঁটে আঙুলের যে ছাপ পাওয়া গেছে, সেই একই ছাপ রয়েছে শরবতের গেলাসে—হাসি শরবত খেয়েছিল যে গেলাসে।

সন্দেহটা নারায়ণীর মাথায় আসতেই দৌড়ে উঠে এসেছিল ফ্ল্যাটে আমি থাকতে থাকতেই। ক্লু একটাই।

সাহানাকে রেপ করা হয়নি।

নারায়ণী-নৃত্য নেচে এসে গোয়েন্দানী মহারাণী শরীর চাঙা করার জন্যে সিরাজির পেয়ালা বের করেছিল (যদিও একটুও হাঁপায়নি, শাড়িও হাঁটু ছাড়িয়ে ওপরে ওঠেনি)।

আমি বাধা দিইনি। দিলেই তো বলবে, 'দেবতারা সোমরস খেলে দোষ হয় না, মানুষের হবে কেন?'

খাক, খেয়েই তো শরীটাকে অমন টসটসে আঙুর করে রেখেছে। তাই শুধু একটাই প্রশ্ন করেছিলাম, 'তুই বুঝলি কী করে, আজ রাতেই বিনয় ক্ষুর চালাবে?'

নারায়ণীর চোখ তখন ঢুলঢুলু হয়ে এসেছে। আমার চোখেও রং ধরেছে। তাই একজোড়া নারায়ণী দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল, রূপ যেন আরও বেড়ে গেছে। গেছো মেয়েরা একটু বেশি রূপসিই হয়, এটা তো ঠিক। ঝাঁটা হাতে মারকুটে হলে তো সোনায় সোহাগা।

মদির চোখে তাকিয়ে নারায়ণী বলেছিল, 'প্রথমে খটকা লেগেছিল বিনয়ের বডি ল্যাংগুয়েজ দেখে। যে মিথ্যে বলে, তার অঙ্গভঙ্গি দেখে তা ধরা যায়। মনের মধ্যে ফন্দির তোড়জোড় চললে, চাহনি দেখে তা আঁচ করা যায়। এ বিদ্যে অনেক কষ্টে শিখতে হয়েছে আমাকে। সেইসঙ্গে কাজ করেছে আমার ইনটিউশন—যে জিনিসটা অন্য মেয়েদের চেয়ে আমার একটু বেশিই আছে বলে আমি জানি। এটা একটা সাইকিক ফোর্সও বলতে পারিস। তখন খাটালাম আমরা যুক্তি। এখন হাওয়া গরম। আরও মেয়ে চেরাই হবে—এই আতঙ্ক জেগেছে ঘরে-ঘরে। গরমে-গরমে নিজের ঘরের বউটাকে একই কায়দায় কেটে ফেললেই তো একঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে যায়। পুলিশ জানবে, জন্মান্তরিত জ্যাক দ্য রিপার-ই খুন করে গেল হস্তিনী হাসিকে। মরা হাসির আঙুলের ছাপও কেউ নেবে না—সাহানার খুনি কে, তা অজানাই থেকে যাবে। ফাঁকতালে হাসির ফ্ল্যাট, বীমার টাকা, ব্যাঙ্কের টাকা—সব পেয়ে যাবে। এন্তার মেয়ে ভোগ করা যাবে। আরও একটা মোটিভ তো নিজের কানেই শুনলি। কী বলছিল বিনয় ধোলাই খাওয়ার সময়ে?'

'সাহানাকে মেরেছে ক্ষুর চালিয়ে—আমিও মারব ক্ষুর চালিয়ে!'

'অর্থাৎ প্রতিহিংসা। হাসির অস্বাভাবিক আতঙ্ক দেখে সন্দেহ হয়েছিল বিনয়ের। খটকা লেগেছিল আমার আবির্ভাবে—তাই আর সময় নষ্ট করতে চায়নি। গোয়েন্দানী যখন চর পাঠায়, তখন তার সন্দেহটাকে ঝটপট ঘুরিয়ে দেওয়া দরকার।'

'প্ল্যান এঁটেই তাহলে তুই আগে আমাকে পাঠিয়ে পরে নিজে গেছিলি?'

'আজ্ঞে। আমার না গেলেও চলত, কিন্তু মূল সূত্রটা মাথায় ঝলক দিতেই আর দেরি করিনি—দরকার ছিল হাসির ফিংগার প্রিন্ট।'

'এ তো দেখছি আড়াই প্যাঁচ।'

'নারায়ণীর আড়াই প্যাঁচ। ছেলে গোয়েন্দাদের মাথায় এসব কুচুটে প্ল্যান গজাবে? নে, ওঠ, অর গিলিসনি!'

*'নবকল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত। (শারদীয় সংখ্যা, ৩৩শ বর্ষ।)

শিয়রে শমন

গোয়েন্দানী নারায়ণী বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আয়নার সামনে। তার নীল রঙের দু-পকেটওলা ডেনিম শার্টের দুটো পকেটই ঠেলে উঠেছে। উদ্ধত বুকের নিচেই কটিদেশ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়েছে দেড়ইঞ্চি চওড়া বেল্টের বন্ধনে। নিম্নাঙ্গ আবৃত ব্লু-জিনস প্যান্টে। নিতম্ব কামড়ানো জিনস।

গোয়েন্দানী নারায়ণী প্রসাধন পছন্দ করে না। সূর্মাটানা চোখের চাইতে অনেক বেশি বিপজ্জনক ওর পিঙ্গল চক্ষুর চাহনি। বাঘিনী চক্ষু বললেই চলে। নিমেষে হিপনোটাইজ করে ফ্যালে। রসিকা প্রকৃতিদেবী তার অধর আর ওষ্ঠের আধারে এত রস দিয়েছেন যে রঞ্জক পদার্থ দিয়ে তাদের আকর্ষণ বৃদ্ধির দরকার হয় না।

এই মুহূর্তে সে মুক্তোর মতো সুন্দর সাজানো দাঁত দিয়ে কামড়ে রয়েছে নিচের ঠোঁটের বামপ্রান্ত।

সে ভাবছে। খুন করবে, না স্রেফ পিটিয়ে ছেড়ে দেবে।

আয়নার ঠিক ওপরের জোরালো স্পট লাইট ফোকাস করে রয়েছে ওর তিলোত্তমা দেহবল্লরীকে। প্রতিটি লোমকূপে বিধৃত অজস্র রূপের কণা। বিধাতা মাঝেমধ্যে এই রকম এক একটি রমণীকে সৃষ্টি করেন। পুরুষের প্রতাপ ভাঙবার জন্যে। অন্যায়ের কাণ্ডারিদের নিধন করবার জন্যে। তিল-তিল সঞ্চিত রূপরাশিই এদের অমোঘ অস্ত্র। কটাক্ষের দামিনীই এদের দধীচির অস্থি। এরা সুন্দরী অথচ ভয়ঙ্করী। এদের সাবধান।

কলিকালের কুটিল কলকাতায় নারায়ণী তাই মূর্তিমতী বিভীষিকা। যারা ওর রূপের আকর্ষণে কাছে এসেছে—তারাই টের পেয়েছে, নারায়ণীকে বিধাতা শুধু রূপের অস্ত্রই দেননি—দিয়েছেন পেশির শক্তি। নারায়ণী নিয়মিতো শরীরচর্চা করে এই পেশিদের বজ্রাধিক সর্বনাশা করে তুলেছে। মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ ওর নরম শরীরে এনে দিয়েছে মৃত্যুর হাতছানি। সেই সঙ্গে গ্রহণ করেছে আধুনিক মারণাস্ত্রের সর্ববিধ শিক্ষা।

তাই বলছিলাম, রূপসী নারায়ণীর রণরঙ্গিনী রূপের স্বাদ যারা পেয়েছে, তাদের অধিকাংশই ধরাধাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে—যাদেরকে শেষ মুহূর্তে কৃপা করেছে রহস্যময়ী এই নিতম্বিনী—তারাই পঙ্গু দেহে আতঙ্কিত কণ্ঠে হুঁশিয়ার করে গেছে জানপহচান ব্যক্তিদের ঃ খবরদার, ল্যাজে পা দিও না নারায়ণীর। নিজেকে সে গোয়েন্দানী বলে ঠিকই—কিন্তু আইনের ধরাবাঁধা লাইনে গোয়েন্দাগিরি করে না। যে দেশে বিচারপতিকেও কাঠগড়ায় উঠতে হয়, যেদেশে কুখ্যাত বহু-বিজ্ঞাপিত খলনায়করা নির্বিচারে পার পেয়ে যায়, সে দেশে থানা-পুলিশ-প্রমাণ-আদালতের প্রহসন কীসের?

নারায়ণী তাই নিজেই শিকার ধরে, নিজেই তার বিচার করে, নিজেই তাকে নিকেশ করে। নারায়ণীর বিচারালয়ে আপিল হয় না, পলিটিক্যাল কানেকশন কাজ দেয় না, উৎকোচের স্তূপ তাকে আরও ক্ষমাহীনা করে তোলে।

এই মুহূর্তে তাই ঘটেছে। তার কাছে একটা লকারের চাবি এসেছে। ব্যাঙ্ক লকারের চাবি। বিলিতি ব্যাঙ্ক। এ ব্যাঙ্কে যাদের লকার থাকে, তারা কোটিপতি তো বটেই—বিদেশের

বহু ব্যাঙ্কেও তাদের বেনামি অ্যাকাউন্ট খুলে রাখতে হয় বিবিধ গোঁজামিল ব্যবসার জন্যে।

চকচকে চাবিটা আয়নার সামনে। সামান্য একটা চাবি। কিন্তু এই চাবি যে লকারের দ্বার উদ্ঘাটন করে দেবে—তার অন্দরে যে আলিবাবার রত্ন আছে—নারায়ণী তা জানে।

জানে বলেই কঠিন চোখে নিজেকে দেখছে আয়নার মধ্যে দিয়ে। জিগ্যেস করছে বিবেককে, 'কী করব? খুন? না, পিটুনি?'

'খুন,' জবাব দিল বিবেক।

পরের দিন কাঁটায়-কাঁটায় দশটায় ব্যাঙ্কের সামনে ব্রেক কষল একটা হেভি মোটর বাইক। বাইক যে চালিয়ে নিয়ে এল, তার ওজন বাইকের চাইতে কম। কিন্তু গুরুভার গম্ভীর নিনাদী এই বাইক তার হাতে যেন খেলার পুতুল। পৃথিবীবিখ্যাত এই ব্র্যান্ডের বাইক একসময়ে ছিল ব্রিটিশ আর্মিতে। ১৯৪০-এ তারা বেচে দেয় ভারতের মানুষকে। আজকে সেই বাইক রূপান্তরিত হয়েছে। দিল্লির ফটফটিয়া-য় রেড ফোর্ট থেকে কনট সার্কাস যায় একেবারে আটজন যাত্রী নিয়ে। মাথাপিছু ভাড়া তিনটাকা।

কিংবদন্তীসম এই বাইক পথের রাজা হয়ে রয়েছে ১৯৩০ সাল থেকে—যে সালে রাইট ব্রাদার্স আকাশে উড়িয়েছিলেন তাঁদের প্রথম উড়োজাহাজ।

আজও সে পথের রাজা। হার্লে ডেভিডসন। ব্যাঙ্কের সামনে এসে দাঁড়াল লেটেস্ট মডেল—আলট্রা ক্লাসিক ইলেকট্রা গ্লাইড। ১৩৪০ সিসি ইঞ্জিন থেকে গম্ভীর গজরানি বেরয় এই কারণেই। ঝকঝক করছে পেছনের টুরিং কম্পার্টমেন্ট—সেখানে রয়েছে দুটি ফুল-ফেস হেলমেট। হেলমেটের মধ্যে রয়েছে স্পিকার—যাতে চালক রেডিও ইনটারকম-এর মাধ্যমে কথা বলতে পারে পেছনের রাইডারের সঙ্গে, রয়েছে ইলেকট্রনিক ক্রুইজ কন্ট্রোল, ক্যাসেট স্টিরিও সিসটেম।

ছোট গাড়ির চাইতে অনেক বেশি দাম এই দ্বিচক্রযানের। কিন্তু এ বাহন যাকে সাজে, দামের পরোয়া সে করে না। কারণ, স্পিড তার কর্মযজ্ঞের মূল মন্ত্র, জীবন আর মৃত্যু তার দুই পায়ের দুই ভৃত্য।

নিতান্ত অবহেলায় মেটাল মন্সটারকে স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে ব্যাঙ্কের প্রবেশ পথের দিকে অগ্রসর হল টেরিফিক বিউটি। পথের লোক হাঁ করে চেয়ে রয়েছে তার দিকে আর তার চোখ ধাঁধানো বাহনের দিকে। মাথায় তার হেলমেট নেই—কারণ কলকাতার সার্জেন্টদের সে তোয়াক্কা করে না। হালকা খাটো চুলের শোভা নষ্ট করতে যাবে কেন শিরস্ত্রাণ দিয়ে? কক্ষনও না। অঙ্গে গাঢ় বেগুনি প্যান্টসুট। কাঁধ, বুকের ওপর দিক আর বাহু সম্পূর্ণ অনাবৃত। কলমকারি ছাপার একটা হালকা চাদর একটা কাঁধের কিছুটা ঢেকে রেখেছে—বাকি চাদর ঝুলছে বামবাহুর ওপর। এইভাবেই সে হার্লে ডেভিডসন চালিয়ে এসেছে রাজপথ দিয়ে—নিশানের মতো পত-পত করে উড়ছে তার কলমকারি ফুলকাটা চাদর।

মোহিনী নারায়ণী নেমেছে অভিযানে। পাঠক, ত্রস্ত হোন।

পাথরের চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়ে কাচের দরজা ঠেলে বাঁদিকে মোড় নিল নারায়ণী। বিশাল হলঘর পুরোপুরি এয়ারকন্ডিশনড। মোলায়েম শীতলতায় শীতল প্রত্যেকেরই মস্তিষ্ক। তা সত্ত্বেও রুধির স্রোত দ্রুতগতি হল সামনের সুবেশ তরুণের ধমনীতে। পার্সোনাল কমপিউটার নিয়ে বসে আছে সে লকার-হোল্ডারদের পথ দেখিয়ে পাতাল ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। নারায়ণীর পেলব বাহু আর ঝকঝকে পিঙ্গল চোখ উত্তাল করেছে তার হৃৎপিণ্ডকে।

বাক্যব্যয় করল না নারায়ণী। কোড নাম আর নম্বর লেখা কার্ডে বাঁধা চাবিটা রাখল টেবিলে।

নিমেষে ভাবলেশহীন হয়ে গেল সুবেশ তরুণের মুখমণ্ডল।

যেন তৈরি ছিল এই চাবি আর এই কোড নম্বর দেখবার জন্যে। আশা করেনি শুধু নারায়ণীর মতো অপ্সরাকে। অথচ হাঁটছে দেখ! চলমান দামাস্কাস তরবারি বললেই চলে।

তরুণের মুখচ্ছবি পাঠ করে নিয়েছে নারায়ণী। সব মিলে যাচ্ছে। অঢেল পয়সা উড়ছে। ক্রীতদাস বনেছে এই ছোকরাও।

উঠে দাঁড়িয়েছে ছোকরা। ফাইলিং ক্যাবিনেটের সামনে গিয়ে দোসরা চাবি বের করে এসে বসল টেবিলে। এখন একটা ফর্ম সই করতে হবে। নারায়ণী জানে। লকার খোলা হয়েছে তারই নামে। সই নিয়ে যাতে মাথা ঘামানো না হয় তাই তো কেনা হয়েছে ছোকরাকে।

ফর্মে সই টেনে দিল নারায়ণী। বললে, 'বাকি যা লেখবার লিখে নেবেন। চলুন।'

রোবটের মতো উঠে দাঁড়াল ছোকরা। ডানাকাটা পরীর গলা দিয়ে যে এরকম গম্ভীর মেঘের ডাক বেরতে পারে, তা সে জানত না। পট-পট করে নেমে গেল বাঁ দিকের সিঁড়ি বেয়ে। লাল কার্পেট পাতা পাতাল ঘরের সিঁড়ি। নিচের চাতালে নেমেই ডাইনে লকার রুম। সারি-সারি লোহার ক্যাবিনেট। ফাইলিং ক্যাবিনেট বলেই মনে হয়।

নম্বর মিলিয়ে একটা চাবি লাগিয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছে তরুণ। নারায়ণ লাগাল নিজের চাবি। শুধু চাইল তরুণের দিকে। সরে গেল সে নিঃশব্দে। হাড় হিম হয়ে গেছে তার ওই এক চাহনিতেই। বাঘিনীর কটাক্ষ কি এরই নাম?

চাবি ঘুরিয়ে হাতল ধরে টান দিল নারায়ণী। বেরিয়ে এল একটা ড্রয়ার। লকার। গুপ্তধন রাখার আইনসঙ্গত অধিকার।

পাতাল ঘরে আর কেউ নেই।

ড্রয়ারে রয়েছে তাড়াতাড়া নোট। একশো টাকার নোট। পঁচিশটা থাক। প্রতিটা থাকে দশটা বাণ্ডিল।

এক-এক বাণ্ডিলে দশ হাজার। মোট পঁচিশ লাখ।

অনিমেষে সেকেন্ড কয়েক চেয়ে রইল নারায়ণী। স্পর্শ করল না। শুধু তেউড়ে গেল রসালো অধর। শ্বাপদ ভঙ্গিমায়।

ঠিক এই সময়ে বেলেঘাটার সুভাষ সরোবরের পাড়ে ইন্দ্রনাথ রুদ্রর বৈঠকখানা ঘরে জমে উঠেছে আর এক নাটক।

অনেকদিন পর পাইপের তাম্রকুট সেবন করছে ইন্দ্রনাথ। ব্রায়ার নয়, স্ট্রেট পাইপ। ডানহিল পাইপ, শুধু পাইপটারই দাম পাঁচ হাজার টাকা। এইমাত্র উপহার দিলেন অ্যাডভোকেট রতিকান্ত সমাদ্দার।

উনি বসে আছেন ইন্দ্রনাথের সামনের সোফায়। বয়স প্রায় পঞ্চান্ন। অতিশয় রোমশ। তাঁর কানে চুল। ভুরুর চুল বাড়ির কার্নিশের মতো ঠেলে রয়েছে। মাথাভরতি কাঁচাপাকা চুল গালপাট্টা হয়ে নেমে এসেছে চোয়াল পর্যন্ত। বলিষ্ঠ আকৃতি। গায়ে খদ্দরের হাফহাতা বুশশার্ট। ট্রাউজার্স এতই ঢলঢলে যে পাজামা হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যায়। বড় গম্ভীর। কাজ ছাড়া কিছু বোঝেন না।

আসন গ্রহণ করেই তিনি বলেছিলেন, 'ইন্দ্রনাথবাবু, শুনেছি আপনি রহস্যভেদ করেন

তাতে আনন্দ পান বলে। ব্রেনওয়ার্ক না থাকলে কেস টেকআপ করেন না। আমি এইরকম একটা কেস আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। যার কেস, মানে আমার যে মক্কেল, সে খুন হয়েছে গতকাল রাতে। প্রাইভেট ডিটেকটিভ অ্যাপয়েন্ট করার ভার সে আমাকে দেয়নি। টাকা পয়সার ব্যবস্থাও করে যায়নি। আমি নিজেই এসেছি। পারিশ্রমিক দিতে পারব না। তবে একটা স্মোকিং পাইপ উপহার দেব। যা আপনি একসময়ে খুব ভালোবাসতেন।'

ভূমিকা শেষ করে ডানহিল পাইপটা আর টোব্যাকো ইন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়েছিলেন রতিকান্ত সমাদ্দার।

মৌজ করে সেই পাইপ থেকেই এখন অনর্গল ধূম বিতরণ করছে ইন্দ্রনাথ। আধবোজা চোখে চেয়ে আছে সমাদ্দার মশায়ের দিকে।

রতিকান্তবাবু বলছেন ঃ

আমার সমস্ত মক্কেল অবাঙালি। গুড পে-মাস্টার। পয়সাকড়ি নিয়ে কখনও ভোগায় না। রাকেশ মালহোত্রা এদের একজন।

জন্ম তার পাঞ্জাবে। ডাকাতদের গুলিতে খতম হয়েছিল বাবা আর দাদা। তখন তার বয়স বারো। মা'কে নিয়ে লড়তে হয়েছে তখন থেকেই। লেখাপড়া করবার সুযোগ পায়নি। পয়সা তো ছিল না। মায়ে-পোয়ে রাস্তাও ঝেঁটিয়েছে, নর্দমা সাফ করেছে, তাতেও দুবেলা খাবার জোটেনি।

একটু বড় হয়ে ট্রাক ড্রাইভারি আরম্ভ করেছিল। বছর তিনেক সেই কাজ করে হাতে একটু পয়সা জমতেই চলে আসে কলকাতায়। হাওড়া স্টেশনে যখন পা দিয়েছিল, তখন তার পকেটে ছিল মাত্র চোদ্দো টাকা।

নতুন জায়গা। নতুন মানুষ। বাংলাও জানে না। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষের ভাগ্য সহায় হয়। কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল একটা গ্যারেজে। লরির যন্ত্রপাতিতে গ্রিজ লাগানোর বাঁদুরে কাজ, মজবুত চেহারার দৌলতে পরে একটা কারখানায় দারোয়ানি করেছে। রাস্তায় হেঁকে তালা বিক্রিও করেছে।

কিছু টাকা জমতেই চলে গেছে অমৃতসর। মা ছিল ওইখানেই। নিয়ে এসেছে কলকাতায়। তারপর শুরু করেছে জমি কেনাবেচার কাজ।

ভাগ্য খুলেছে তখন থেকেই। ফুলে উঠেছে ব্যাঙ্কের ব্যালেন্স। পরের কয়েক বছরে বেশ কয়েকবার ঘুরে এসেছে অমৃতসরে। একা। কারণ অমৃতসরে ছিল ওর গার্লফ্রেন্ড। মার্গারেট। জন্ম তার গোয়ায়। খ্রিস্টান। বাবার চাকরি ছিল অমৃতসরে। বন্ধুত্ব জমেছিল রাকেশের সঙ্গে।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। বছরের পর বছর, সেধেছে রাকেশ। কলকাতায় আসেনি মার্গারেট। বিয়ে নিয়ে অ্যাডভেঞ্চার চলে না।

ফলে, শীতল হয়ে আসে দুজনের সম্পর্ক।

এদিকে ফুলে ফেঁপে উঠছিল রাকেশের বিজনেস। জমি কেনাবেচা ছাড়াও ফ্ল্যাট বানিয়ে বেচে দেওয়ার আইডিয়াটা তখনই মাথায় আসে ওর। এখন যাকে প্রোমোটার বলি, তাই। কোম্পানির নাম দিয়েছিল ইডেন গার্ডেন্স লিমিটেড।

চড়চড় করে ব্যবসা বেড়ে যেতেই যাতায়াত শুরু হয়েছিল বোম্বাইতে। টাকা তো ওখানেই। কৌশলও ওখানে।

এই সময়ে ক্রিস্টিন-এর সঙ্গে আলাপ হয় রাকেশের। গোয়ানিজ খ্রিস্টান। লাভলি

মেয়ে। রিয়াল বিউটি। পেশায় ছিল মডেল। রাকেশের সঙ্গে আলাপ একটা ফিল্ম প্রোডিউসারের অফিসে। এই অফিসেই মডেলিং করছিল ক্রিস্টিন। রাকেশ গেছিল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে জানতে। কাঁচা টাকা হাতে এলে সবাই যা করতে চায়।

শেষ পর্যন্ত ফিল্ম লাইনে যায়নি রাকেশ। তবে ওই লাইন থেকেই তুলে এনেছিল ক্রিস্টিনকে। যে প্রোডিউসারের অফিসে আলাপ, তাকেই বিয়ে করবে ঠিক করেছিল ক্রিস্টিন। কিন্তু সে প্ল্যান ভেস্তে দিয়েছিল রাকেশ। টাকা মানুষকে পালটে দেয়। কথায় সে চৌকস। চেহারায় রাজপুত্র। টাকার কুমির। প্লেনে চাপিয়ে ক্রিস্টিনকে নিয়ে এল কলকাতায়। বিয়ে করল পরের মাসেই।

বিয়ের পরও মডেলিংয়ের কাজ ছাড়েনি ক্রিস্টিন। এ এক নেশার কাজ। আনন্দ ছাড়া বাঁচবে কী করে মেয়েটা। তাই পার্ক স্ট্রিটের একটা মডেলিং এজেন্সিতে নাম লিখিয়ে রেখেছিল। তখন ওর বয়স সাতাশ। সূচনা থেকে বোঝা গেছে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে বিলক্ষণ। বম্বের মেয়ে, গোয়ানিজ কালচার। ফ্রী, ফ্র্যাঙ্ক, স্মার্ট, ইজি। বিজ্ঞাপনের একটা সিরিজে ওই মেয়ে ছাড়া আর কাউকে পাওয়াই গেল না কলকাতায়। গাড়ি কোম্পানির বিজ্ঞাপন। বেরিয়েছিল খবরের কাগজে। চিতাবাঘের চামড়া দিয়ে তৈরি অদ্ভুত ড্রেস পরে বাগিয়ে রয়েছে একটা বর্শা—বিঁধিয়ে দিতে যাচ্ছে সামনের চকচকে সাদা গাড়িটার গায়ে। আইডিয়ার বলিহারি যাই! কাগজে দেখেছেন? গুড। সেই মেয়েই হল ক্রিস্টিন—আমার মার্ডাড ক্লায়েন্ট। ক্লিক করেছিল সিরিজটা। কপাল খুলে গেছিল ক্রিস্টিনের।

সেই সঙ্গে ওর স্বামীরও। কথায় বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন। টাকায় টাকা বাড়ে। রাকেশের টাকা বস্তায় বেঁধে রাখবার সময় এসে গেছিল। দুদিনেই একটা আনকোরা নতুন মারসিডিজ বেঞ্জ কিনে দিয়েছিল ক্রিস্টিনকে। বিয়ের উপহার। ওই গাড়ি নিয়েই বেরিয়েছিল দেশ বেড়াতে—আপনারা যাকে বলেন হানিমুন—তাই আর কি—গেছিল গোয়ায়। টাকা উড়িয়েছিল জলের মতো। শ্বশুরবাড়ির লোকের চক্ষুস্থির করে ছেড়েছিল ঐশ্বর্য দেখিয়ে। হইহই পড়ে গেছিল গোটা গোয়ায়।

থাক সে কথা। কলকাতায় ফিরেই নিজের নতুন বাড়ি বানিয়েছিল রাকেশ। এতদিন পরকে জায়গাজমি বাড়ি জুটিয়ে দিয়েছে—এবার বউয়ের চাঁদমুখে আরও হাসি ফুটোনোর জন্যে তৈরি করে নিল নিজের থাকবার জায়গা। ছোটখাট একটা প্রাসাদ। শহর থেকে অবশ্য দূরে। ডায়মন্ডহারবার যাওয়ার পথে। ছ-বিঘে ফুলের বাগানের ওপর ছিমছাম বাড়ি। অথচ তার মধ্যে আছে রাজসিক রুচি। বিলাস কাকে বলে, এ বাড়িতে ঢুকলে হাড়ে-হাড়ে টের পাওয়া যায়। এমনকি গাড়ি রাখার গ্যারেজেও রেখেছে চোখ ট্যারা করে দেওয়ার ব্যবস্থা। গ্যারেজের সামনে এসে দাঁড়ায় গাড়ি। ড্রাইভার গাড়িতে বসেই রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে রোলিং শাটার ঘুরিয়ে তুলে দেয় ওপরে। শুনেছেন? তাহলে দেখেই আসুন। রাকেশের সঙ্গে আপনার কথা বলা দরকার।

সুখেই ছিল দুজনে। এ যুগের লায়লা মজনু। দেখে ঈর্ষা হত মশাই। চোখ টাটাত পাঁচজনের। হিন্দি সিনেমাতেই এমনি রূপকথা দেখা যায়। রূপকথা যে সত্যি হয়, তা এই কলকাতায় এসে দেখিয়ে দিল রাকেশ। ছেঁড়া কাঁথা থেকে সোনার খাটে গা রূপোর খাটে পা। বুক ফেটে যাবে না?

পরশ্রীকাতরদের কথা বাদ দিচ্ছি। কথায় বলে নজরে বিষ থাকে। সেই বিষেই বুঝি ধ্বংস হয়ে গেল সুখের ফ্যামিলিটা। এবার আসি সেই কথায়।

কয়েক হপ্তা ধরেই ডায়মন্ডহারবার অঞ্চলের খুনখারাপির কথা কাগজে বেরচ্ছে বটে—কিন্তু দায়সারাভাবে। গোটা দেশজুড়ে চলছে নারকীয় নৃত্য। ডায়মন্ডহারবারের দুচারটে মানুষের প্রাণ গেলে কারও গদি কাঁপে না।

কয়েক সপ্তাহের আগের ঘটনা বলছি। স্কুলের একটি মেয়েকে রেপ করে মেরে ফেলা হয়। রাকেশ-ভিলা থেকে মাত্র মাইলখানেক দূরে। আর একটা মেয়েকে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না।

তারপরেই ঘটল কাল রাতের ঘটনা।

বাড়িতে লোকজন এসেছিল। রাকেশেরই বন্ধুবান্ধব। হইহুল্লোড় চলেছে সকাল থেকেই। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, সাঁতার...

বলতে ভুলে গেছি। ছ-বিঘে বাগানবাড়ির মধ্যে সুইমিং পুলও রেখেছে রাকেশ। ভারি সুন্দর ডিজাইন। ঠিক যেন নীল রঙের একটা ঝিনুকের খোলা।

একদম তলায় কাচঢাকা আলো। সে আলো জ্বললে মনে হয় বুঝি মুক্তো ঝিলিক মারছে শুক্তির বুকে।

দুপুর নাগাদ খানাপিনা শেষ করে বন্ধুবান্ধব নিয়ে কলকাতায় শপিং করতে গেছিল রাকেশ। নিয়ে গেছিল ক্রিস্টিনের মার্সিডিজ ৩০০ সেল গাড়িখানা। নিজের ক্যাডিলাক গাড়ি রেখে গেছিল গ্যারেজে। টাকার তো মা-বাপ নেই। প্রোমোটার হলে যা হয়—যেভাবে পারে টাকা উড়িয়েছে।

ফটকে দাঁড়িয়ে বিদায় জানিয়েছিল ক্রিস্টিন। সঙ্গে যায়নি। বাড়িতে তার অনেক কাজ। ঘরদোর পরিষ্কার করতে হবে। রাতের খানাপিনা রেডি করতে হবে। তিন বছরের মেয়েটাকে সঙ্গ দিতে হবে।

কত বয়স ক্রিস্টিনের।

তেত্রিশ। রাকেশের চল্লিশ। দেখলে অবশ্য বুঝবেন না। সুখ মানুষের বয়স কমিয়ে দেয়।

গেস্টদের নিয়ে রাত পৌনে নটায় বাড়ি ফিরেছিল রাকেশ। গাড়িতে বসে বলেছিল বন্ধুদের, 'কাঁটায় কাঁটায় পৌনে নটা। এক রাউন্ড কফি হয়ে যাক। তারপর চলবে হুইস্কি। জনি ওয়াকার।'

এই বলেই রিমোট কন্ট্রোলে খুলে দিয়েছিল গ্যারেজের রোলিং শাটার, মার্সিডিজের জোরালো হেডলাইট গিয়ে পড়েছে শাটারে। মেঝে ছেড়ে একটু-একটু করে উঠছে ওপর দিকে। তলার ফাঁকে দেখা গেছিল চকচক করছে রক্তের ধারা—গড়িয়ে বেরিয়ে আসছে গ্যারেজের ভেতর থেকে।

শাটার তখনও উঠছে ওপর দিকে। স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে থ হয়ে বসে রয়েছে রাকেশ। চোখ ঠিকরে আসছে গেস্টদের। তারপরেই শুধু একটা নাম আর্তনাদের আকারে বেরিয়ে এল রাকেশের ভাঙা গলা দিয়ে—'ক্রিস্টিন।'

শাটার পুরো উঠে গেছে ওপরে। মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে ক্রিস্টিন। রক্তের নদীর মধ্যে। রক্ত ছিটকে লেগেছে পাশের ক্যাডিলাক গাড়িতে। ভোঁতা ভারি হাতিয়ার দিয়ে পিটিয়ে ছাতু করা হয়েছে মাথা। পাশবিক জিঘাংসা না থাকলে এমনভাবে খুন করা যায় না।

গ্যারেজে যখন নরপশু পিটছে মা-কে, মেয়ে তখন কোথায় জানেন? ওপরতলায়। মুগ্ধ চোখে দেখছে টেলিভিশন। রোলিং শাটার যখন উঠে গেল—তখন সে বসে টিভির

সামনে। মা কখন আসবে, গল্প বলবে, ঘুম পাড়াবে—এই প্রতীক্ষায় একদম নড়েনি বিছানা ছেড়ে। পুলিশ এসেছিল কাল রাতেই। পাড়াপড়শি বলেছে, এ সেই প্রফেশনাল কীলার-এর কাজ। হপ্তা কয়েক আগেই যে লোকটা স্কুলের মেয়েকে রেপ করে পিটিয়ে মেরেছে—একই ভাবে—মাথা গুঁড়িয়েছে ডান্ডা মেরে—আর একটা মেয়েকে তো খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না।

ক্রিস্টিনের সুন্দর শরীরটাকেও কি ভোগ করেছিল নরপশু?

টাকায় সব হয়। কনট্যাক্ট থাকলে সবাই নড়ে বসে। আজ সকালেই স্পেশাল অটোপ্সি রিপোর্ট পাওয়া গেছে। রেপ করা হয়নি ক্রিস্টিনকে। খুবলোয়নি শরীরের কোনও জায়গা। শুধু সাতবার ডান্ডা মেরেছে মাথায়।

পুলিশের সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে যা হওয়ার তাই হয়েছে; কেস আত্মহত্যার নয়—নরহত্যা। চুরি ডাকাতিও হয়নি। রাকেশ সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত। কোনও জিনিসই খোয়া যায়নি। খুন হয়েছে চকিতে আর নিঃশব্দে। এত চুপিসারে যে নির্জন বাড়ির দোতলায় বসে টিভি দেখে গেছে তিনবছরের মেয়েটা টের পায়নি কিচ্ছু। রাকেশরা ফিরে আসার একটু আগেই হয়েছে মার্ডার। কেননা, ডেডবডির চারপাশে পড়ে থাকা রক্ত তখনও ছিল টকটকে লাল—পুরোপুরি অক্সিজেন বোঝাই। ফুলবাগান আর গাছপালা দিয়ে ঘেরা বলে বাড়িটা পাড়াপড়শিদের উঁকিঝুঁকির বাইরে। খুনি সহজেই চম্পট দিয়েছে।

ইন্দ্রনাথবাবু, এই পর্যন্ত সব পরিষ্কার। এ কেস নিয়ে পুলিশ আর মাথা ঘামাবে না—তাদের অনেক বড় কাজ রয়েছে। স্ত্রী যখনই খুন হচ্ছে, রাকেশ তখন বন্ধুবান্ধব নিয়ে প্রায় বিশ মাইল দূরে কলকাতার নিউমার্কেটে—সুতরাং স্ত্রী-হত্যার দায়ে তাকে ফেলা যায় না।

কিন্তু আমার সন্দেহ তাকেই। কারণ? মাস তিনেক আগে ক্রিস্টিন আমার কাছে গেছিল। গোয়া থেকে তার বাবা আর মা বলেছিল অ্যাডভোকেটকে সব কথা জানিয়ে রাখতে। সব কথার সার একটাই কথা। রাকেশকে ডিভোর্স করতে চায় ক্রিস্টিন। বাবা-মা'কে যা লিখে জানিয়েছে আমাকেও বলে গেল সেই কথা।

বাইরে সুখের চালচিত্র আঁকলেও ভেতরে-ভেতরে জ্বলছিল অশান্তির আগুন। সুখের হয়নি এ বিয়ে। আগেই বলেছি আপনাকে, অমৃতসরের বান্ধবী মার্গারেটকে কলকাতায় এনে বিয়ে করতে চেয়েছিল রাকেশ। মার্গারেট আসতে চায়নি—কারণ, তখন রাকেশের পকেট ছিল গড়ের মাঠ—ছুঁচোয় ডন মারছিল সেখানে। ঘোড়েল মেয়ে মার্গারেট তাই ছিল তফাতে।

বোম্বাই গিয়ে আর এক গোয়ানিজ মেয়ে পেয়ে তাই বর্তে গেছিল রাকেশ। মার্গারেটকে টাইট মারার মোক্ষম সুযোগ। টাইট খেয়ে গেছিল মার্গারেট।

গোয়ায় ক্রিস্টিনকে নিয়ে গিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে নিজের ঐশ্বর্যের কথা জাহির করেছিল রাকেশ ভয়ানক ঘুঘু বলেই—খবর চলে যাক মার্গারেটের কাছে। জ্বলে মরুক ঈর্ষায়।

হয়েও ছিল তাই। ধূর্ত মার্গারেট যখন দেখলে, পাখি প্রায় উড়ে গেছে, তখন ফাঁদ পেতেছিল মেয়েদের চিরকালের ছলাকলা দিয়ে।

সে ফাঁদে ধরা পড়েছিল রাকেশ।

চিঠিপত্র চলছিল সমানে—প্রথম-প্রথম ক্রিস্টিন কিস্সু জানতে পারেনি।

পারল সেইদিনই, যেদিন মার্গারেট এল কলকাতায়। লর্ড সিনহা রোডের একটা গোয়ানিজ ফ্যামিলির বাড়িতে উঠল পেয়িং গেস্ট হয়ে। গোপনে দেখাসাক্ষাৎ চালিয়ে গেল রাকেশের সঙ্গে।

ক্রিস্টিনের তা অজানা রইল না। প্রথম সন্দেহটা হয়েছিল রাকেশের হাবভাব দেখে।

মেয়েরা সব বোঝে। ওদের কাছে কিছুই লুকোনো যায় না। প্রাইভেট ডিটেকটিভ লাগিয়ে—

এই পর্যন্ত শুনে ইন্দ্রনাথ ডানহিল নামালো দাঁতের ফাঁক থেকে।

বললে, 'জানি।'

আশ্চর্য হলেন রতিকান্ত সমাদ্দার, 'কীভাবে?'

'প্রথমে এসেছিল আমার কাছে। এসব পেটি কেস আমি হ্যান্ডল করি না শুনে রেগেমেগে বেরিয়ে গেছিল। তবে কোথায় গেছিল, সেটা জানি। ঠিকানাটা আমিই দিয়েছিলাম।'

জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইলেন রতিকান্ত সমাদ্দার।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'প্রেমচাঁদ প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিতে—আমার বন্ধুর অফিসে।—তারপর?'

রতিকান্ত সমাদ্দার বলে চললেন তাঁর বাকি কথা। প্রায় একই কথা।

ঠিক সেই সময়ে শোনা যাচ্ছিল গোয়েন্দানী নারায়ণীর কণ্ঠ—অন্য জায়গায়।

সে এখন বসে রয়েছে রাজাবাজারের বস্তি পাড়ায়। দিনের আলোয় এখানে হাজারো বিজনেসের জলুস। রাতের অন্ধকারে গলিঘুঁজিতে চোখ জ্বলে আদিম কামনায়, চলে হরেক পাপের অগুন্তি ব্যবসা। গেরস্থরা সেসবের খবর রাখে না।

রাখে কিন্তু গোয়েন্দানী নারায়ণী। সে যে এই লাইনের লোক। বিচরণ করে অবশ্য রাজহংসীর মতো। কাদা আর পাঁক গায়ে লেগে থাকে না।

রাতের নগরী কলকাতায় যে-যে অঞ্চল কুৎসিত আর ভয়াবহ হয়ে ওঠে—এই পাড়া সেগুলোর একটা।

বড় রাস্তায় ট্রামলাইন ঘেঁষে সারি-সারি ঝকমকে দোকান। তিনতলা একটা বাড়ির একতলাতেও তাই। দোতলা আর তিনতলায় অন্য অফিস। বৈধ উপায়ে অবৈধ কাজের অফিস।

নারায়ণী বসে রয়েছে এমনি একটা অফিসে। ওর সামনে একটা চৌকোনো টেবিল। অদ্ভুত ডিজাইন। ঘরটাও চৌকোনা। সিলিং খুব নিচু। সাদা প্লাস্টারের ফুল লতাপাতা। দেওয়ালে ডুমোডুমো ফোম রবারের গদি। সাউন্ড-প্রুফ ঘর। একটি মাত্র দেড় টন এয়ারকন্ডিশনার চলছে ফুর-ফুর করে।

টেবিলের ওদিকে বসে কর্নেল ফ্লিন্ট। সেল্ফ-স্টাইলড কর্নেল। আর্মিতে জীবনে নাম লেখায়নি। তার আর্মি সে নিজে গড়ে নিয়েছে। বেকারের অভাব নেই। তার কাজের লোকের অভাব নেই। নিজে জন্মেছিল পতিতার গর্ভে। ব্যবসা জমিয়েছে পতিতাপল্লীতেই। জমজমাট ব্যবসা। তার শেকড় সর্বত্র। বটগাছ বললেই চলে।

বয়স বেশি নয় কর্নেল ফ্লিন্টের। মাত্র পঁয়ত্রিশ। নিপাট ভালো মানুষের মতো চেহারা। রোগা। বেঁটে। শুকনো। এরকম অ্যাংলো গণ্ডায়-গণ্ডায় দেখা যায় ইলিয়ট রোডে।

নারায়ণী তার চোখে-চোখে চেয়ে বলে যাচ্ছে, 'কর্নেল, প্রেমচাঁদ ডিটেকটিভ এজেন্সিতে ক্রিস্টিন দরবার করার আগে ওর প্রাণের সখী সিনথিয়াকে জানিয়ে রেখেছিল রাকেশের সঙ্গে বিয়েতে ঘুণ ধরেছে। এজেন্সি থেকে সিক্রেট রিপোর্ট পাওয়ার পর বলেছিল সিনথিয়াকে, 'ওরা আমাকে সরিয়ে দেবেই। ঘর করছি একটা পিশাচের সঙ্গে। ডিভোর্স দেবে না। দিলেই তো খোরপোষ চাইব। প্রপার্টির শেয়ার চাইব। বিজনেস দারুণ চলছে। বছর

পনেরো নিশ্চিন্ত—টাকার হিসেব থাকবে না। ডিভোর্স দেবে না ওই জন্যেই। কিন্তু আমাকেও বাঁচতে দেবে না।'—সিনথিয়ার বিশ্বাস, রাকেশই খতম করেছে ক্রিস্টিনকে। কাল এসে বলে গেল সব কথা। পুলিশ কিচ্ছু করবে না। কিনে রেখেছে রাকেশ। সিনথিয়াকে বলে দিয়েছি, রাকেশকে দিয়েই কবুল করাব—বিশ মাইল দূরে থেকেও ভাড়াটে লোক দিয়ে সে-ই খুন করিয়েছে ওয়াইফকে।'

কর্নেল এক দৃষ্টে চেয়ে আছে নারায়ণীর চোখের দিকে—যে চোখে চোখ রাখলেই রোমাঞ্চিত-কলেবর হয় না—এমন পুরুষ ধরাধামে নেই।

কর্নেল ফ্লিন্টের ধমনীতে বইছে অর্ধেক ব্রিটিশ রক্ত। বাকি অর্ধেক এসেছে আরবের মরুভূমি থেকে।

ধূসর নির্ভাষ চোখে তার আভাস মেলে যখন সে পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে। এখনও সে চেয়ে আছে সেইভাবে।

শকুনির চোখে পলক পড়ছে না।

নারায়ণী বললে, 'প্রেমচাঁদ ডিটেকটিভ এজেন্সির রিপোর্ট সব রহস্য ফাঁস করে দিয়েছে। প্রমাণ এনে দিয়েছে ক্রিস্টিনের হাতে। মার্গারেটের সব চিঠি রাকেশ রেখে দিয়েছিল অফিসে। বিজনেস ফাইলে। চিঠির তাড়া চলে এসেছিল ক্রিস্টিনের হাতে। ব্যভিচারিতার কেস মজবুত করার ডকুমেন্টারি এভিডেন্স। রাকেশকে চার্জ করেছিল ক্রিস্টিন। বলেছিল—শেয়ার দাও—ডিভোর্স দেব। প্রচণ্ড চেঁচামেচি হয়ে গেছিল সেদিন। বাড়ির ঝি জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেছে। যাওয়ার সময়ে বলে গেছে—এ বাড়িতে আর টেকা যাবে না। ঝি-কেও জেরা করে প্রেমচাঁদ ডিটেকটিভ এজেন্সি জেনেছে সেদিন কী-কী কথা হয়েছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে।'

কী যেন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও চুপ করে গেল কর্নেল ফ্লিন্ট।

নারায়ণী বললে, 'ক্রিস্টিন খুন হয়েছে, এ খবর পেয়েই অত রাতে সিনথিয়া ছুটে এসেছিল আমার কাছে। রাকেশের পরনারী গমনের ডকুমেন্টারি এভিডেন্স তুলে দিয়ে গেছে আমার হাতে। তার কিছুক্ষণ পরেই পেলাম একটা খাম। লকারের চাবি আর তোমার চিঠি। টাকা নিয়ে সরে দাঁড়াতে বলেছ। তাই এলাম তোমার কাছে। চিঠির জবাব মুখেই দিয়ে যাই। রাকেশ মরবে—আমার হাতে। এই রইল তোমার লকারের চাবি—ক্ষমতা আছে বটে তোমার। অত রাতে বিলিতি ব্যাঙ্কের লোককে ম্যানেজ করলে কীভাবে?'

বুকের খাঁজে হাত গলিয়ে দিয়ে লকারের চাবি টেনে এনে টেবিলে ছুঁড়ে দিল নারায়ণী। সেদিকে তাকাল না কর্নেল।

শুধু বললে রেশম মসৃণ নরম গলায়, 'দেবী, তুমি কথা বলছ ঠিক ভারতীয় নারীদের মতো। অনেকদিন ধরেই তোমার খোঁজ রাখছিলাম। তুমি আমাদের পথের কাঁটা। পঁচিশ লাখেও তোমাকে কেনা গেল না। এরকম পঁচিশ আরও পেতে সুন্দরী—যদি আসতে আমার আর্মিতে। চোখা মেয়ের বড্ড অভাব চলছে। যাক, যখন এলে না—তখন তোমাকেও রাখব না। পায়ের তলাতে ঘাস গজাতে আমি দিই না। ক্রিস্টিন আর সিনথিয়ার যে দশা হয়েছে—তোমারও হবে তাই।'

চোখের পাতা একটুও কাঁপল না নারায়ণীর, দুহাত রয়েছে টেবিলের ওপর। চোখের কোণ দিয়ে টের পেল পেছনের দরজা নিশ্চয়ই একটু ফাঁক হয়েছে আলো ঢুকছে সেই কারণে। ফাঁক যখন হয়েছে, ফায়ার আর্মস-এর চোখও নিশ্চয় টিপ করেছে ওর পৃষ্ঠদেশ।

পিঠ সিধে রেখে বললে, 'ক্রিস্টিনকে খুন করেছে তোমার লোক?'

'এ বাড়িতেই সে আছে। আগে বক্সিং লড়ত। এখনও লড়ে দুশমনদের সঙ্গে। বড় বাজে অভ্যেস। হাত ভেঙে দেয় মোচড় দিয়ে। তোমার সঙ্গেও লড়বে। ধৈর্য ধরো, ভারতীয় নারী।'

অবিচলিত কণ্ঠে বললে নারায়ণী, 'সিনথিয়ার কী দশা হয়েছে?'

ভারি মিষ্টি হাসল কর্নেল ফ্লিন্ট, 'সে তো আমার হিট লিস্টেই ছিল। যার নুন খাব, তার কাজ পুরো করে দেব। রাকেশ সাহেবই দিয়েছিল মেয়েটার নাম ঠিকানা। নজরে ছিল বলেই দেখলাম অত রাতে দৌড়েছে তোমার কাছে। মাই গড। তোমার ডেরা থেকে বেরতেই তুলে আনলাম। সারারাত তাকে এনজয় করেছে আমার লোকগুলো। এখন ঘুমোচ্ছে। আজ রাতে তোমার পালা। তার রেস্ট। এইভাবেই চলুক কিছুদিন—তারপর লড়িয়ে দেব বক্সারের সঙ্গে—মেয়ে মর্দানির সঙ্গে কক্ষনও লড়েনি। নতুন টেকনিক দেখাবে মনে হচ্ছে। হাত না ভেঙে হয়তো টেনে ছিঁড়ে আনবে—

বলে নারায়ণীর বক্ষশোভার দিকে তাকিয়ে উচ্চহাস্য করে উঠল ফ্লিন্ট।

এইটাই ছিল সঙ্কেত। এই হাসিটা। পুরো খুলে গেল পেছনের দরজা। উঠতে যাওয়াটা ভুল হবে বুঝে বসেই রইল নারায়ণী। পিঠে অনুভব করল শক্ত খোঁচা। ফায়ার আর্মস।

মিঠে হাসে ফ্লিন্ট, 'আমার অস্ত্রাগারের লেটেস্ট অটোমেটিক এখন তোমার পিঠে লেগেছে, সুন্দরী। দলে এসো, এরকম জিনিস অনেক পাবে—না এলে,' ঈষৎ সঙ্কুচিত হল ফ্লিন্টের একটা চোখ।

খুলে গেল পরক্ষণেই, 'ভালো কথা, মাই বিউটি। এই কেসে অনেক খবরই রেখেছ—একটা খবর পাওনি। জানা দরকার তোমার। জানবার পর হয়তো রাকেশ হত্যার প্ল্যান মাথা থেকে মুছে ফেলবে। মাসুদ, লক্কা পায়রাটাকে পাঠিয়ে দে।'

নারায়ণীর পিঠ থেকে নলচে সরে গেল না। মাসুদ নামধারী স্যাঙাৎ নিশ্চয় দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। ফ্লিন্ট চেয়েছিল সেইদিকেই। পায়ের আওয়াজ সরে গেল দূরে।

ফ্লিন্ট বলে গেল সিল্ক-নরম গলায়, 'তোমার মতো সুন্দরী একজনও যদি থাকত আমার আর্মিতে—ডোজ পড়লেই সুর অবশ্য পালটাবে—খালিস্তানিদের হাতেই তোমাকে ছেড়ে দেব ভাবছি। কলকাতায় ওদের সেলটার দিচ্ছি তো আমিও—মাথা পিছু এক লাখ অ্যাডমিশন ফী—রাতের খরচ আলাদা—তুমি থাকলে রোজগার হবে ভালোই।—এই যে লক্কা, এসো, ভেতরে এসো।'

মার্জারের মতো নিঃশব্দ চরণে একব্যক্তি টেবিল ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল ফ্লিন্টের চেয়ারের পাশে। গায়ে গিলে করা কেমব্রিকের পাঞ্জাবি। বোতাম হিরের। ভেতরে গেঞ্জি নেই। ফরসা গা ফুটে বেরচ্ছে। ডুমোডুমো পেশি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ঘাড়েগর্দানে সমান। শুয়োরের মতোন। মুখখানাও সেইরকম। অমানুষিকতা প্রকট হয়েছে প্রতিটি রেখায়। চাহনি ক্ষুধার্ত। চোখ দিয়ে যেন চেটে খাচ্ছে নারায়ণীর সর্বাঙ্গ।

সিল্ক-সফট গলায় ফ্লিন্ট বললে, 'এই আমাদের লক্কা—বাহিনীর বক্সার—হাত ভেঙে দেয় হারিয়ে দিয়ে। তোমার কী করবে, সেটা পরে টের পাবে। লক্কা, তুই খুন করেছিস ক্রিস্টিনকে? উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর মতলবে হপ্তাকয়েক আগে স্কুলের মেয়েটাকে রেপ করে খতম করেছিলিস? আর একটা মেয়েকে লোপাট করে চালান দিয়েছিস?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল লক্কা। চোখ কিন্তু নারায়ণীর দিকে। ঠোঁট চাটছে জিভ দিয়ে।

'ক্রিস্টিনকে তুই আগে থেকে চিনতিস?'

আবার ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে গেল লক্কা নামধারী লম্পট।

'সেই জন্যেই নির্জন বাড়ির গ্যারেজ ঘরে দেখা করেছিল তোর সঙ্গে?'

'হ্যাঁ,' এতক্ষণে একটি অক্ষরে জবাব দিল লক্কা। চেঁচিয়ে গলা ভেঙে ফেললে কণ্ঠস্বর যেরকম দাঁড়ায়—লক্কার গলার সুর সেইরকম।

'তার আগে ক্রিস্টিনের সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছিল কেন?'

দাঁত বেরিয়ে পড়ল লক্কার। লালচে-হলুদ দাঁত। হাসছে। হেসে-হেসে যা বলে গেল, শুনে থ হয়ে গেল গোয়েন্দানী নারায়ণী।

বকে-বকে ক্লান্ত হয়েছেন রতিকান্ত সমাদ্দার। এখন তিনি স্তব্ধ।

ইন্দ্রনাথ ডানহিল নামিয়ে রেখেছে। দুই চোখে দূরবিস্তৃত চাহনি। চিন্তাচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে আছে ঘরের ওপর কোণে।

একটু পরে দৃষ্টি ফিরে এল টেলিফোনের দিকে। তুলল রিসিভার। কথা হয়ে গেল প্রেমচাঁদ ডিটেকটিভ এজেন্সির ক্যালকাটা ব্রাঞ্চে। ছোট্ট রিপোর্ট শুনে নিল টেলিফোনেই।

বললে, 'ডকুমেন্টারি এভিডেন্স সবই কি ক্রিস্টিনের কাছে?'

'না,' জবাব এল তারের মধ্যে দিয়ে, 'উনিই আমাদের জানিয়েছিলেন—বাড়িতে রাখা নিরাপদ নয় বলে গচ্ছিত রেখেছেন বান্ধবীর কাছে।'

'বান্ধবীর নাম?'

'সিনথিয়া ডিয়েট্রিক।'

'তার ঠিকানা জানেন? জানেন। দেখুন তাকে পান কিনা।'

আস্তে রিসিভার নামিয়ে রাখল ইন্দ্রনাথ। চিন্তাকুটিল চোখে কিছুক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে রতিকান্ত সমাদ্দারকে, 'রাকেশের ঠিকানা দিয়ে যান। হ্যাঁ, আপনি যান—আপনার কার্ডও রেখে যান। এর মধ্যে ব্রেনওয়ার্কটা কোথায়, তাই তো বুঝছি না। রাকেশ মার্ডার করিয়েছে কাউকে দিয়ে—তাকে চাই?'

'আজ্ঞে। তাহলেই রাকেশকে কোর্টে ফাঁসানো যাবে।'

'দেখি।'

একঘন্টা পরে বাজল রিঙ। ঘর এখন ফাঁকা। আর এক ছিলিম টানা হয়ে গেছে ডানহিলে। ঘন্টা বাজতেই ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিল ইন্দ্রনাথ। কানপেতে শুনল পিঁক পিঁক রিপোর্ট। নামিয়ে রাখল যন্ত্র।

সিনথিয়া কাল রাত থেকে নিরুদ্দেশ।

বাড়ি বটে একখানা। ছ-বিঘে ফুলবাগানে মাত্র দোতলা বাড়ি। প্রাসাদের খুদে সংস্করণ।

একতলার ঘরে পরিচয় হল রাকেশ মালহোত্রার সঙ্গে। অতিশয় সুদর্শন, অতিশয় মিষ্টভাষী, অতিশয় সফিসটিকেটেড এক যুবক। হিন্দি সিনেমার পরদা থেকে নেমে আসা হিরো বললেই চলে। এখন তার মুখ জুড়ে থই-থই করছে বিষাদ-সমুদ্র। ঘরে সে একা ছিল না। সমবয়েসি প্রায় সমান-সুদর্শন এক যুবক বসেছিল গম্ভীর মুখে। রাকেশই আলাপ করিয়ে

দিল তার সঙ্গে। যুবকের নাম রোশনলাল। বাড়ি চণ্ডীগড়ে। অফিসও সেখানে। সল্টলেকে এসেছিল অফিসের কাজে। সকালে ইংরেজি কাগজ খুলে খবরটা পড়েই দৌড়ে এসেছে। রাকেশ তার অনেকদিনের বন্ধু। বিয়ের আগে থেকে।

পরিচয়-পর্ব সাঙ্গ হওয়ার পর রাকেশ চতুরভাবে চট করে চলে এল কাজের কথায়, 'মিঃ রুদ্র, আপনি ডিটেকটিভ। এ কেসে কে আপনাকে লাগিয়েছে?'

'কেউ না। নিজের ইন্টারেস্টেই এলাম।'

সরু চোখে চেয়ে রইল রাকেশ। এখন তার মুখের বিষাদের মেঘ অনেকটা ফিকে।

'কী জানতে চান বলুন?'

'আপনার স্ত্রীর এক বান্ধবীর নাম সিনথিয়া? সিনথিয়া ডিয়েট্রিক?'

ঘাড় নেড়ে নীরবে সায় দিয়ে গেল রাকেশ। অনিমেষ চক্ষু নিবদ্ধ ইন্দ্রনাথের হীরক চক্ষুর ওপর।

গলায় শান দিয়ে নিল ইন্দ্রনাথ, 'তিনি এখন কোথায়?'

অসাধারণ অভিনেতা বটে রাকেশ। অবিচল রইল মুখভাব। কিন্তু চোখের তারায় যেন লাগল ছোট্ট ধাক্কা। ক্ষীণ কাঁপুনি চোখ এড়াল না ইন্দ্রনাথের।

রাকেশ বলল, 'এ প্রশ্ন আমাকে কেন?'

কারণ তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না কাল রাত থেকে।

'সিনথিয়া? কাল রাতেই তো ফোন করেছিল—যাকে চাইছিল, সে তখন ছিল না। এর বেশি তো জানা নেই।'

উঠে দাঁড়িয়েছে রোশনলাল। হাওয়া যেরকম ভারি হয়ে উঠেছে, তার আর থাকা সমীচীন নয়। রাকেশের অনুরোধ এড়িয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। একটু পরেই শোনা গেল তার গাড়ির আওয়াজ। জানলা দিয়ে নম্বর প্লেটটা দেখে নিল ইন্দ্রনাথ।

শক্ত গলায় বললে রাকেশ, 'মিঃ রুদ্র, কেউ যখন আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়নি—তখন আমি দিচ্ছি আপনাকে। পুলিশকে দিয়ে হবে না। ক্রিস্টিন-এর মার্ডারারকে বের করুন। আপনার পারিশ্রমিক কত?'

একটু থেমে ইন্দ্রনাথ বললে, 'টোয়েন্টি থাউজান্ড। ফিফটি পারসেন্ট ইন অ্যাডভান্স।'

পাঁচ মিনিট পরে ট্যাকসিতে উঠে বসল ইন্দ্রনাথ। ওর পকেটে ফুটছে দশহাজার টাকার একখানা চেক।

ঘুষ!

রাকেশ ভিলা থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এসে তেমাথা। বাঁদিকে মোড় নিতে গিয়ে দাঁড় করাতে হল ট্যাক্সি।

রোশনলাল রাস্তায় দাঁড়িয়ে। হাত বাড়িয়ে রুখেছে ট্যাক্সি। বললে, 'ট্যাক্সি ছেড়ে দিন, ইন্দ্রনাথবাবু, চলে আসুন আমার গাড়িতে।'

সুভাষ সরোবর। ইন্দ্রনাথের বাড়ি। বৈঠকখানা ঘর।

ইন্দ্র বলছে, 'প্রথম পরিচয়েই আপনার পরিষ্কার বাংলা শুনে আঁচ করেছিলাম আপনি আদতে কলকাতার মানুষ। গাড়ির নাম্বার নোট করে নিয়েছিলাম—খুঁজে বের করতামই। কিন্তু আপনি এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। যা বললেন তা থ্রিলিং।'

রোশনলাল বললে, 'কিন্তু প্রমাণ?'

'এই নিন টেপরেকর্ডার। ফিরে যান বন্ধুর কাছে। ছোট্ট ক্যাসেট রেকর্ডার। পকেটেই রাখবেন। কথা বলুন পুরোনো প্রসঙ্গ নিয়ে—সেই সব কথা—যা শুধু প্রাণের বন্ধু হিসেবে রাকেশ বলেছিল আপনাকে। ক্রিস্টিনকে খুন করবার কত রকম ফন্দি এঁটেছিল—'

'মোট আটরকম। প্রথমে ঠিক করেছিল, গুলি করাবে ভাড়াটে খুনি দিয়ে ডাকাতির অছিলায়। তারপর ভেবেছিল, গাড়ির ব্রেক বিগড়ে রাখবে। তিন নম্বর প্ল্যানটা ছিল, সুইমিং পুলে ইলেকট্রোফিউশন—

ক্যাসেট ফুরোনোর আগেই সব কথা বলবেন—ওকে দিয়েও সায় দেওয়াবেন। বলবেন, কাজটা ভালো করলে না...'

পরের দিন সকালে ক্যাসেট রেকর্ডার পৌঁছে গেল ইন্দ্রনাথের বাড়িতে। শেষের দিকে রাকেশ বলছে, 'তুমিই শুধু জানলে...।'

ইন্দ্রনাথের টেপ শেষ হল, হার্লে ডেভিডসন ব্রেক কষলো ওর বাড়ির সামনে। আওয়াজ শুনেই উঠে দাঁড়িয়েছিল ইন্দ্রনাথ—ঘর থেকে বেরোনোর আগেই ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল একটি নারীমূর্তি। তার নাকের পাটা ফুলে-ফুলে উঠছে, দুই চোখে আগুন ঝরছে। চুল তার উসকোখুসকো, পোশাক ছেঁড়াখোঁড়া।

মূর্তিমতী প্রভঞ্জন বললে তীব্রস্বরে, 'আপনি ইন্দ্রনাথ রুদ্র? আমি গোয়েন্দানী নারায়ণী।'

স্থির চোখে তাকিয়ে ইন্দ্র বলল, 'নাম শুনেছি। কী কাণ্ড করে এলে, বোন?'

'কর্নেল ফ্লিন্টের আস্তানা উড়িয়ে দিয়ে এলাম। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল একটা পাপের ডেরা। রাজাবাজার বস্তির আগুন নেভাতে কলকাতার সব দমকল এখন হাজির। নাইট্রোগ্লিসারিন আর আর. ডি. এক্স-এর গুদোম ছিল—উড়িয়ে দিয়েছি রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে। আমার গায়ে হাত। শয়তান। সিনথিয়াকে কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না।'

চমকে উঠল ইন্দ্রর শিরদাঁড়া, 'সিনথিয়া ওখানে?'

'হ্যাঁ আপনাকেও যেতে হত। রাকেশ ফোনে জানিয়ে দিয়েছে ফ্লিন্টকে। তাই তাড়াতাড়ি বেরোতে গিয়ে লক্কাও খতম হয়ে গেল। যাকে দিয়ে খুন করানো হয়েছে ক্রিস্টিনকে। কিন্তু আপনি আসল জিনিসটা জানেন না—আমিও জানতাম না। জানত লক্কা—সে থাকলে নিজেই কবুল করত।'

'আসল জিনিস মানে?'

'লক্কার কাছে অ্যাপ্রোচ করেছিল ক্রিস্টিন-ও। খুন করাতে চেয়েছিল রাকেশকে। স্বামী আর স্ত্রী দুজনেই চেয়েছে একজন আর একজনকে খতম করতে। হরিবল। ইন্দ্রনাথদা, আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—খতম করবই রাকেশকে।'

স্নেহনিবিড় গলায় বললে ইন্দ্রনাথ, 'দরকার কী? বাঘের শত্রু ষাঁড়ে মারে। রাকেশের বিরুদ্ধে কেস পাকা করে এনেছি। এগোক আইনের পথে।'

'তাহলে আমি চলি আমার পথে।'

নিমেষে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল মূর্তিমতী প্রভঞ্জন। নিরেট গম্ভীর নিনাদে সুভাষ সরোবর কাঁপিয়ে উধাও হয়ে গেল মেটাল মন্সটারি।

প্রশ্ন একটাই থেকে যায়। একা নারায়ণী কর্নেল ফ্লিন্টের দুর্ভেদ্য দুর্গ উড়িয়ে দিল কী করে? বেরিয়ে এল কীভাবে?

আজকের ভারতীয় নারীই বিশ্বের প্রথম নারী যারা এভারেস্টের শৃঙ্গ জয় করেছে।

কৌশলে সবই হয়। সূক্ষ্ম বুদ্ধির কাছে চিরকালই পরাজিত হয়েছে মোটা বাহুবল।

মার্শাল আর্টে বলীয়সী নারায়ণী অবশ্য বাহুবলের একটা স্বাক্ষর রেখে গেছে দুর্গ উড়িয়ে দেওয়ার আগে। লক্কার পায়রার শিরদাঁড়া মাঝখান থেকে ভেঙে দিয়েছে। মুচড়ে দিয়েছে গলা—পুরো একপাক।

বাকি কাহিনি দীর্ঘ, বীভৎস এবং লোমহর্ষক। রক্ত জল হয়ে যেতে পারে। সুতরাং...!

** 'মনোরমা' পত্রিকায় প্রকাশিত।)শারদীয় সংখ্যা, ১৪০০)*

জিরো জিরো গজানন

॥ ত্রিশূল এর আমন্ত্রণ ॥

জিরো জিরো গজানন পরপর দুটো ট্যাবলেট মুখে ফেলে দিয়ে বললে পুঁতিবালাকে, লাশটা কোথায়?

পুঁতিবালা তখন হাঁফাচ্ছে। অনেকটা পথ ছুটে আসতে হয়েছে খবরটা দিতে। একে তো এই পাহাড়ি রাস্তা। ওঠো আর নামো, ওঠো আর নামো। ধুস! দম বেরিয়ে যায়!

বললে জোরে-জোরে নিঃশ্বাস নেওয়ার ফাঁকে-ফাঁকে—এখন ও রাস্তায়...মানে, বস্তির দিকে যে সিঁড়িটা নেমে গেছে, তার ওপর।

ট্যাবলেট দুটো ততক্ষণে জিভের তলায় মিলিয়ে গেছে। বেশ চাঙ্গা লাগছে গজাননের। আমেরিকান বড়ি। ব্রেনটাকে ঝাঁকুনি মেরে সজাগ করে দেয় চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে।

মোষের শিংয়ের নস্যাধার খুলে এক টিপ নস্যি নিয়ে নাসিকা গহ্বরে সশব্দে চালান করে দিয়ে ভারিক্কি গলায় বললে গজানন, মানে জিরো জিরো গজানন, ওরফে সুপার স্পাই ট্রিপলজি—পুঁতিবালা, যে অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছি, মনে হচ্ছে, এবার তার ভেতরে প্রবেশ করব। এ সময়ে তোমার এই ভয়ংকর হাঁপানিটা সব বানচাল করে দিতে পারে।

পুঁতিবালা নামটা গেঁইয়া হতে পারে, কিন্তু মেয়েটি খাসা। সুপার মডার্ন গার্ল বললেই চলে। গজানন একে আবিষ্কার করেছিল হিন্দ সিনেমার সামনে থেকে। কলগার্ল পুঁতিবালা ষোড়শী বালিকার মতোই ডাগর চোখে উৎসুক পথচারীদের প্রাণে পুলক জাগিয়ে চলেছিল। গোধূলির লাল আভা গণেশ এভিনিউ বেয়ে তার মুখে পড়েছে। চৌমাথায় ট্রাফিক পুলিশ যথারীতি কথাকলি নৃত্য করে যানবাহন জট রুখে দিচ্ছে। পুঁতিবালাকে সে রোজই দেখে। ছেলেছোকরা থেকে আরম্ভ করে প্রৌঢ়রা পর্যন্ত হেসে-হেসে তার সঙ্গে কথা বলে স্কুটার অথবা গাড়িতে চাপিয়ে হু-উ-উ-স করে উধাও হয়। কনস্টেবল পুঙ্গব তা দেখেও দেখে না। আহা, মেয়েটা রোজগার করছে, করুক।

কিন্তু জিরো জিরো গজাননের চোখের কোয়ালিটিই আলাদা। মেনটাল হোমে থাকতে থাকতেই তার চোখের আর মনের ধার বেড়েছে। ম্যাচুইরিটি এসেছে। ইনটেলেকচুয়াল ম্যাচুইরিটি।

তারপরেই বেপারিটোলা লেনে ভোলা হাউসের ঠিক পেছনের লাল বাড়িটায় পেয়ে গেল একটা ঘর। আশেপাশে কালোয়ারদের আড্ডা। পুরোনো মাল নীলামে কিনে এনে খুলে রকমারি পার্টস চড়া দামে বেচেই এরাই এখন লাখোপতি কোটিপতি। শুধু নীলামে নয়, চোরাই মালও আসছে এই তল্লাটে। সুতরাং এসপায়োনেজ অ্যাকটিভিটির পক্ষে জায়গাটা উপযুক্ত।

মেনট্যাল হোম থেকে বেরোনোর আগেই গজানন ঠিক করেছিল সে স্পাই হবে। নিক কার্টার পড়েছে বিস্তর। জেমস বন্ড তার প্রিয় হিরো। ব্রুস লীর পরম ভক্ত। এই সবগুলো মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যাওয়ার ফলেই যেতে হয়েছিল মেনট্যাল হোমে। ঝাঁকড়া চুল নেড়ে একদিন লরির ওপর লাফিয়ে উঠে লাথি মেরে উইন্ডস্ক্রিন ভেঙে দিতেই পা কেটে গেছিল—ভ্রূক্ষেপ করেনি। কিন্তু লরির ভেতর স্মাগলার তিনজন যখন ছুরি হাতে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গজাননের ওপর—টনক নড়েছিল তখনই।

একটা বাচ্চা মেয়েকে ঠিকরে ফেলে দিয়ে উধাও হওয়ার ফিকিরে ছিল বলেই অসমসাহসিকতাটা দেখিয়ে ফেলেছিল গজানন। নিমেষের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল। বেঞ্চিতে বসা ইয়ারবন্ধুদের সঙ্গে গল্প করা মাথায় উঠেছিল। হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে উঠেই নক্ষত্রবেগে ধেয়ে গিয়ে ঠিকরে গেছিল লরির ওপর।

তারপরেই প্রচণ্ড লাথি। ঝনঝন করে ভেঙেছে কাচ। থেমেছে লরি। পরমুহূর্তেই ভাঙা কাচে রক্তরক্তি ড্রাইভারের পাশে বসা তিন মস্তান বেরিয়ে এসে খোলা ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গজাননের ওপর।

বেলেঘাটা মেন রোডের ওপর বোমা নিয়ে দুদলে মারামারি নতুন দৃশ্য নয়। কিন্তু সে দিনের সেই দৃশ্য ছিল একেবারে অন্যরকম। তিন-তিনটে ঝকঝকে ছুরি তিনদিকে ঝলসে উঠতেই গজাননের মাথার মধ্যে কী যেন ঘটে গেল। মনে হল পটাং করে একটা টান করে বাঁধা তার ছিঁড়ে গেল। সেতারের তার ছোঁড়ার মতো আওয়াজটা মাথার মধ্যে মিলিয়ে যেতে না যেতেই গজানন হয়ে গেল আর এক মানুষ।

তিন-তিনটে ছুরিধারী মস্তানকে কীভাবে রুখেছিল গজানন, তা তার কিচ্ছু মনে নেই। পটাং করে তার ছিঁড়ে যাওয়ার পর থেকেই কী-কী ঘটেছিল, কিসসু মনে নেই।

রাস্তার লোকে দেখেছিল যেন স্বয়ং জেমস বন্ড, ব্রুস লী আর অমিতাভ বচ্চন একইসঙ্গে মিলেমিশে গেছে গজাননের বিদ্যুৎ গতি ক্ষিপ্রতার মধ্যে। ক্যারাটে, মার, লাথি, ঘুসি চলছে এত দ্রুত পরম্পরায় যে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না কী ঘটে চলেছে। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে তিন-তিনটে হাত-পা মাথা ভাঙা জোয়ান ঠিকরে পড়ল বেলেঘাটা মেন রোডের খোলা ড্রেনে পাঁকের মধ্যে।

আর রক্তাক্ত দেহে দাঁড়িয়ে সুন্দরবনের আহত বাঘের মতো সমানে গর্জে চলল গজানন। তিনটে ছুরির একটা তার পেটের চামড়া এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত কেটে দিয়েছে, আর একটা গোটা পিঠটাকে কোণাকুণিভাবে চিরে দিয়েছে, তৃতীয়টায় কেটেছে ডান গাল।

বীভৎস মূর্তি নিয়ে তাই হুঙ্কারের পর হুঙ্কার ছেড়ে চলেছে গজানন। চোখ ঘুরছে বনবন করে। দাঁত খিঁচিয়ে রয়েছে হিংস্র হায়নার মতো।

বন্ধুরাই ওকে জাপটে ধরে এবং দশ-দশটা বন্ধু নাকানি চোবানি খেয়ে যায় তাকে মেনট্যাল হোমে নিয়ে যেতে। স্ট্রেটজ্যাকেট পরিয়ে সেল-এ রাখতে হয়েছিল কিছুদিন। মাথায় শক দিতে হয়নি—স্রেফ টক থেরাপিতেই কাজ হয়েছিল। মাস কয়েক পরে ডাঃ রাঘব বক্সীর চেম্বার থেকে যখন বেরিয়ে এল, তখন আর গজাননকে চেনা যায় না। বাবরি প্যাটার্নের অসুর মার্কা চুল ওর বরাবরই। কিন্তু শরীর আরও মজবুত হয়েছে। গায়ের রং আগে ছিল ফরসা, এবং লালচে। চোখ-মুখ-নাকের ধার আরও বেড়েছে। সব মিলিয়ে ঝকঝক করছে চেহারাটা।

ডাঃ বক্সী তাকে পিটিয়ে শক্ত করে দিয়েছেন। লোহা থেকে ইস্পাত। আসবার সময়ে চোখে চোখ রেখে কঠোর কাটা-কাটা স্বরে শুধু বলেছিলেন, 'গজানন, আর যাই করো, কুপথে যেও না, তোমার মধ্যে যে সম্পদ আছে, তা দেশের কাজে লাগিও।'

তাই স্পাই কোম্পানি খুলে বসেছিল গজানন ওরফে ট্রিপল-জি ওরফে জিরো জিরো গজানন।

উদ্দেশ্য একটাই, দুর্নীতির অবসান। কালোবাজারি হটাও, দেশকে বাঁচাও—এই হচ্ছে জিরো জিরো গজানন কোম্পানির পলিসি।

বেপারিটোলা লেনের অফিস থেকে বেরিয়ে একদিন হিন্দ সিনেমার সামনে ট্যাক্সির জন্যে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে দেখেছিল কলগার্ল পুঁতিবালাকে। দেখেই বুঝেছিল, এমন মেয়েকেই তার দরকার সাগরেদ হিসেবে। ন্যাতাজোবরা মেয়েদের দিয়ে এ লাইনে কিছু হবে না। চাই শার্প, ডেয়ারিং, বডি অ্যাফেয়ার্স নিয়ে সনাতনী ধারণাহীন বলগা ছাড়া মেয়ে। যার তেরচা চাহনি, বুকের ইশারা আর নিতম্বের দুলুনি দেখে পার্টি মজবে, পথ পরিষ্কার হবে—দরকার হলে বডিলাভেও পার্টিকে ঘায়েল করবে—মনে কিন্তু দাগ পড়বে না। ইমোশন-টিমোশন নিয়ে এ কারবার চলে না। টিট ফর ট্যাট।

পুঁতিবালাকে অফিসে নিয়ে এসেছিল গজানন। তিনকূলে কেউ নেই শুনে, বউবাজারের হাড়কাটা গলির ডেরা তুলে দিয়ে ঠাঁই দিয়েছিল অফিস ঘরেরই পাশের ঘরে। পুঁতিবালার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল শার্দুল-চরিত্র ট্রিপল-জি।

ট্রেনিং? বেলেঘাটার রাস্তার ধারে বসে আর পাড়ায়-পাড়ায় মস্তানি করে যে ট্রেনিং পেয়েছে গজানন, তা কম কী? যে-কোনও টেররিস্ট বর্তে যাবে এই জাতীয় কলকাত্তাই ট্রেনিং পেলে। কথায় বলে যা নেই কলকাতায় তা নেই....

যাক সে কথা। গজানন কোম্পানি দু-বছরেই গাড়ি কিনে ফেলেছে। অফিস চেম্বারটিকেও মডার্ন করে ফেলেছে। এই কলকাতারই বেশ কয়েকটা বড় কোম্পানি তাকে দিয়ে অনেক কালো কারবার ধরে ফেলেছে। লোকসান কমতেই কোম্পানির লাভের অঙ্ক বেড়েছে। গজাননের কোনও নির্দিষ্ট দক্ষিণা নেই। যত লোকসান বাচিয়ে দেবে তার ফাইভ পারসেন্ট দিতে হবে।

তাতেই এই অবস্থা। যার জীবনের ভয় নেই, রাতদুপুরেও যে খিদিরপুর ডকে গিয়ে বিদেশি মাল চুরি হচ্ছে দেখে, লুকিয়ে থেকে, বিদেশি জাহাজ থেকে নৌকোয় আউটরাম ঘাটে প্যাকেটে দামি বস্তু হস্তান্তরের সময়ে সাহেব পার্টিকেও খপাত করে চেপে ধরতে দ্বিধা করে না—এমন ডাকাবুকো মূর্তিমান যমকেই তো চায় বড়-বড় কোম্পানিরা।

বর্তমান কাহিনির শুরু বেশ কিছুদিন আগে। এয়ারকন্ডিশনড ঘরে বসে নস্যিও নিচ্ছে,

পাইপও খাচ্ছে গ্রেট গজানন। পুঁতিবালা বেরিয়েছে একটা ধুরন্ধর অ-বাঙালি স্মাগলারের পেট থেকে কথা বার করতে। তৈরি হয়েই বেরিয়েছে। হয়তো রাত্রে নাও ফিরতে পারে। বেশ আছে ছুঁড়ি। মজাও লুটছে, কাজও করছে। গজানন অবশ্য এই সময়গুলোয় বেশ উদ্বেগের মধ্যেই থাকে পুঁতিবালার জন্যে। হাজার হোক মেয়েছেলে তো। গজানন ওকে দেখে নিজের বোনের মতো। তাই....

এমন সময়ে বাজল টেলিফোন। লাল টকটকে রিসিভার তুলে নিল গজানন। তারের মধ্যে দিয়ে ভেসে এল সুমিষ্ট নারীকণ্ঠ—জিরো জিরো গজানন?

বলছি।

একটু ধরুন।

সেকেন্ড কয়েক পরেই ভারি গলা ভেসে এল তারের মধ্যে দিয়ে।

মিঃ ট্রিপল জি, আমি ত্রিশূল বলছি। একটু থেমে—চিনতে পারছেন?

আন্তর্জাতিক দুর্নীতি প্রতিরোধ সঙ্ঘ?

রাইট, মিঃ ট্রিপল-জি আপনার সাহায্য দরকার।

আমি তো পিঁপড়ে আপনাদের কাছে। টিপে মেরে ফেললেই পারেন।

আরে ছিঃ ছিঃ। উদ্দেশ্য আমাদের একই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। যাক, টেলিফোন ট্যাপিং হতে পারে।

হয়ে গেল বোধ হয় এতক্ষণে।

পাবলিক টেলিফোন থেকে কথা বলছি ওই কারণেই। আমাদের প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস জানেন?

অতবার ঠিকানা পালটালে জানব কী করে?

নোট ডাউন। থ্রি লেটার্স—সিক্স—টোট্যাল লাইন। মাইনাস থ্রি। ফাইন্যাল সিক্স। সুপ্রভাত।

লাইন কেটে গেল।

সুপ্রভাত দৈনিকটা সামনেই পড়ে। 'সুপ্রভাত' বলে শুভেচ্ছা জানানো হল না গজাননকে, সেটুকু বোঝবার বুদ্ধি ওর ব্রেনে আছে। কোড মেসেজে বলা হল সুপ্রভাত কাগজটা দেখতে। দেখতে হবে সম্পাদকীয় পাতা। এইটাই নিয়ম। সম্পাদকীয় বার করে প্রথম প্যারাগ্রাফের প্রতি ষষ্ঠ শব্দ বেছে নিয়ে কাগজে লিখল গজানন। লেখাটা দাঁড়াল এই ঃ

দিলদার ভবন। অরুণাভ। পঁয়ত্রিশ।

পাইপ নিভে গেছে। নস্যির ডিবে পৌঁচিয়ে খুলতে-খুলতে হাতঘড়ি দেখে নিল গজানন। ঠিক পনেরো মিনিটেই পৌঁছে যাবে দিলদার ভবনের পঁয়ত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে অরুণাভর কাছে।

॥ যন্ত্রদানবের সামনে ॥

অরুণাভ লোকটা যে এত কালো আর বেঁটে, এত মোটা আর কদাকার হবে, গজানন ভাবতেই পারেনি।

কালো জুতোয় কালো পালিশ লাগিয়ে বুরুশ দিয়ে ঘষলে যা দাঁড়ায়, শ্রী অরুণাভর মুখের কান্তি সেই রকম। তার ওপর মাথাজোড়া টাক। গদিমোড়া কালো রিভলভিং চেয়ার

ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই চেয়ার বেচারি যেন স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে পিঠঠাকে একটু সিধে করল। মোটা বটে। কী খায়? এত চর্বি আসে কোত্থেকে?

বলুন গজাননবাবু, কালো মুখে সাদা দাঁত বার করে ভারি অমায়িক হাসি হাসল অরুণাভ। ওই হাসি আর কথাগুলোর মধ্যে দিয়েই প্রকট হল লোকটার ভেতরে সচল রয়েছে বুঝি একটা ডায়নামো। শক্তির ডায়নামো। ঝকঝকে কিন্তু ছোট-ছোট দুই চোখে যেন তারই স্পার্ক।

সতর্ক হল গজানন। বেলেঘাটার রাস্তা থেকে আজ সে উঠেছে যেখানে, এই ত্রিশূল সঙ্ঘ কিন্তু সেখান থেকে অনেক উঁচুতে। পৃথিবী জুড়ে জাল পেতে খপাখপ ধরছে রাঘববোয়ালদের। তার মতো চুনোপুটিকে কী দরকারে তলব পড়ল, ঠিক ভেবে ওঠা যাচ্ছে না। খতম-টতম করে দেবে না তো? সিক্রেট এজেন্টদের পক্ষে সবই সম্ভব। এই লাইনে প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ রাখতে চায় না।

বসল গজানন। একটু ঝুঁকেই বসল। যাতে বাঁ-দিকের কোমরে হোলস্টারটা টেবিলে ঠেকে যায়। বুশ শার্টের তলায় থেকেও খাপে গোঁজা নাইন এম এম লুগারটা অনেকটা ধাতস্থ করে তোলে ট্রিপল জি'কে। শক্তির আধার তারও হাতের কাছে। এক থেকে তিন গুনতে যেটুকু সময় লাগে, তার মধ্যেই লুগার চলে আসবে হাতে—রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে চক্ষের নিমেষে।

চোখে-চোখে চেয়ে মিটিমিটি হাসছিল অরুণাভ। যেন গজাননের মনের কথা টের পেয়েছিল। ড্রয়ার টেনে একটা চকচকে উইলহেলমিনা বার করে রাখল সাড়ে পাঁচ মিলিমিটার পুরু কাচ দিয়ে ঢাকা টেবিলের ওপর।

বলল, আপনারটাও এখানে রাখতে পারেন।

বিনা বাক্যব্যয়ে নাইন এম এম লুগার বের করে উইলহেলমিনা-র পাশে রেখেছিল গজানন। দুটো আগ্নেয়াস্ত্রই প্রায় একই রকম দেখতে। দুটোই প্রাণ-প্রদীপ নিভিয়ে দিতে মোক্ষম।

এবার কাজের কথায় আসা যাক, বলেছিল অরুণাভ—আপনি রিসেন্ট সুইসাইড কেসগুলো নিয়ে ভেবেছেন?

কাজের লোক বটে এই অরুণাভ। এক্কেবারে আসল পয়েন্টে চলে এসেছে। মাস দুয়েকের মধ্যে তিনটে সুইসাইডের রহস্য গজাননের মগজেও আলোড়ন তুলেছে। এদের মধ্যে একজন ছিল তারই পার্টি। হরেন জোয়ারদার। কোটিপতি। উলটোডাঙায় গেঞ্জির কল আছে। মিজোরামে নিজের জমিতে ঔষধি গাছের চাষবাসও করত। মিজোরামের হার্বস এক্সপোর্ট করে যখন কোটিপতি, ঠিক তখন ভদ্রলোক দ্বারস্থ হয়েছিল গজাননের। কারা যেন তাকে সমানে হুমকি দিয়ে চলেছে টেলিফোনে আর চিঠিতে। ওখানে অত টাকা রাখো, এখানে এত টাকা রাখো—নইলে বোমা মেরে দেব খুলি উড়িয়ে।

গজানন নেমে পড়েছিল মাঠে। নামে, কাজটা টেক-আপ করেই ধড়াধড় এগিয়ে গেছিল বেশ খানিকটা। হাতেনাতে ধরেও ফেলেছিল হুমকি দেনেওলাকে। হ্যাঁ, একজনই। জোয়ারদারের গেঞ্জির কলের ইউনিয়ন লিডার।

সে কেস মেটবার মাসখানেক পরেই একটা টেলিফোন এল গজাননের কাছে। ফোন করছে জোয়ারদার স্বয়ং।

গজাননবাবু? ভারী বিমর্ষ স্বর—এসব কী হচ্ছে?

কী হচ্ছে মনে? ঘাবড়ে গেছিল গজানন। অন্যায়-টন্যায় করে ফেলল না কি? ডাঃ

বক্সীর কাটা-কাটা কথা এখনও কানে লেগে রয়েছে—'অন্যায় পথে যেও না।' জ্ঞাতসারে তো যায়নি গজানন। তবে?

জোয়ারদারের বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর হঠাৎ বিষম উত্তেজিত হয়ে ওঠে—ওই...ওই শুনুন আবার ওরা শাসাচ্ছে...।

কারা? কারা? কারা? চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে গজানন—কোন শয়তানের বাচ্চারা?

ওই তো—ওই তো দলে-দলে দরজা দিয়ে ঢুকছে আর জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমাকে ডাকছে, গজাননবাবু, আমাকে ডাকছে, বলছে—শান্তি, শান্তি, এই পথেই শান্তি—উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তার শান্তি এইখানে, এই জানলার বাইরে। গজাননবাবু, ও গজাননবাবু বেরিয়ে যাব জানলা দিয়ে?

না, না, না, এমন জোরে সেদিন গজানন চেঁচিয়েছিল যে তিনদিন ভোক্যাল কর্ড ভালো কাজ দেয়নি—ভাঙা গলায় কথা বলতে হয়েছে—চোদ্দোতলার জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাবেন কী? আপনার মাথা কি খারাপ হয়েছে?

আমার মাথা খারাপ? হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ! আমার মাথা খারাপ বলার আগে গজাননবাবু আপনার মাথাটা মনের ডাক্তার দিয়ে দেখিয়ে নিন। ওই ওই ওই কটমট করে আবার তাকাচ্ছে, শাসাচ্ছে—বলছে, চলে আয়—চলে আয়—চলে আয়—ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয়! যাই গজাননবাবু, এত করে ডাকছে—।

দড়াম করে টেলিফোন আছড়ে পড়ার শব্দ ভেসে এসেছিল। মনশ্চক্ষে গজানন দেখতে পেয়েছিল, টেলিফোন ক্রেডল-এ রিসিভার বসানো হয়নি। ঝুলছে। তাই শোনা যাচ্ছে জোয়ারদারের জোরাল গলায় অট্টহাসি দূর হতে দূরে সরে যাচ্ছে। তারপরেই—নৈঃশব্দ্য!

মনের চোখে বাকি দৃশ্যটুকুও কল্পনা করে শিউরে উঠেছিল গজানন। ধাঁই করে রিসিভার নামিয়ে রেখে ধড়মড় করে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। উল্কাবেগে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের চোদ্দোতলা বাড়িটার সামনে পৌঁছেই দেখেছিল কাতারে-কাতারে লোক জমে রয়েছে রাস্তা পর্যন্ত।

জোয়ারদার তার কথা রেখেছিল। এই বহুতল অট্টালিকার কোনও ঘরেই জানলায় গরাদ নেই। জানলার বাইরে তাই পাটাতন পেতে ফুলের টব রাখা হয়। এই রকমই জানলা গলে হাসতে-হাসতে শূন্যে লাফ দিয়ে—আছড়ে পড়েছে একতলায়।

থ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল গজানন। আচমকা শক খেয়েই স্থাণু হয়ে গেছিল। মস্তিষ্ক একদম কাজ করেনি।

তারপরেই বিদ্যুৎ খেলে গেছিল কোষে-কোষে। জোয়ারদারকে কি ভূতে পেয়েছিল? নাকি পাগল হয়ে গেছিল? মনের ডাক্তারকে দিয়ে গজাননের মাথাটা দেখাতে বলছিল। ভদ্রলোকের জানা ছিল না, ও কাজটি সেরেই এ লাইনে এসেছে গজানন। তাহলে, তাহলে—

দি আইডিয়া। মনের ডাক্তারের কাছেই ছোটা যাক।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড থেকে বাঁই-বাঁই করে গাড়ি চালিয়ে একেবারে ইন্দ্র দত্ত রোড—এক কোণে ডাঃ বক্সীর কেয়ার ক্লিনিক। লোহার গেটের ভেতরে চাবি হাতে বসেছিল নেপালি দারোয়ান। গজাননকে দেখেই একগাল হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল ঃ

—কী খবর?

ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু আছেন?

গজাননের মুখের চেহারা আর কথার ধরন দেখে হাসি মিলিয়ে গেছিল দারোয়ানের মুখ থেকে। কেস গড়বড় মনে হচ্ছে? অনেকেই এরকম ফিরে আসে বটে। কিন্তু এভাবে নিজে থেকে—

তাড়াতাড়ি তালা খুলে গজাননকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়েছিল দারোয়ান।

—বসুন, খবর দিই।

একটু পরেই ডাক এসেছিল ওপর থেকে। বাইরের ঘরে গদিমোড়া চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছিলেন দীর্ঘদেহী অতীব সুপুরুষ ডাঃ বক্সী। ফরসা দুই চোখে যেন ঈগলের চাহনি।

কী ব্যাপার, গজানন?

ব্যাপার কী তা ব্যক্ত করেছিল গজানন। শুনেটুনে হা-হা করে হেসে ডাঃ বক্সী বলেছিলেন—না, না ভূত নয়, প্রেত নয়, দত্যি নয়, দানো নয়, পিশাচ নয়—কিসসু নয়। গজানন, ব্যাপারটা তোমার বোঝা উচিত ছিল।

কী, স্যার?

অডিটরি হ্যালিউসিনেশন। অপটিক্যাল হ্যালিউসেনশন। কর্ণ বিভ্রম আর দৃষ্টি বিভ্রম। এরকম কেস তো এখানেই ছিল—তুমি যখন ছিলে। এখনও আছে। মনে হয় যেন দেবব্রত বিশ্বাসের রবীন্দ্রসঙ্গীত অবিরাম শুনে যাচ্ছে। অথবা চোখের সামনে সায়রা বানুকে দেখতে পাচ্ছে। ইডিয়ট!

অরুণাভ চেয়েছিল গজাননের দিকে। দুই চোখে সেই স্পার্ক। এখন বললে—বুঝতে পারছেন কেন আপনাকে ডাকা হয়েছে? আপনারই একজন ক্লায়েন্ট পাগল হয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ঠিক একইভাবে পাগল হয়ে গিয়ে একজন চলন্ত লরির সামনে লাফিয়ে পড়েছে হাসতে-হাসতে। আর একজন হাওড়ার পোল থেকে। গজাননবাবু, এই দুজনেই ছিল আমাদের ক্লায়েন্ট।

অ্যাঁ।

আজ্ঞে হ্যাঁ। কুচক্রীদের হাত থেকে বাঁচতে এই তিনজনেই শরণ নিয়েছিল আমাদের। এই ঘটনা পরপর ঘটে যেতে থাকলে কেউ আর আমাদের কাছে আসবে না। কুচক্রীদের কারবার ফলাও চলবে। আপনি কি তাই চান?

কক্ষনও না।

তাহলে শুনুন এখনও যা জানেন না। জোয়ারদার আপনার মক্কেল ছিল—কারেক্ট?

সব খবরই তো রাখেন।

একটু বেশিই রাখি। জোয়ারদার কিছুদিন নিউইয়র্কে ছিল জানেন?

জানি। বেড়াতে গেছিল।

আজ্ঞে না। কারবার করতে গেছিল। কুল ড্রিঙ্কস-এর নাম শুনেছেন?

নিশ্চয়।

দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে পৃথিবী বিখ্যাত এই কোম্পানি আবার ইন্ডিয়ায় ব্যবসা করার জন্যে লাইসেন্স চেয়েছে। এখন ইন্ডিয়ায় সফট ড্রিঙ্কস এর যা টোট্যাল মার্কেট—তার সবটুকু মিটোনোর মতো প্ল্যান্ট ক্যাপাসিটি চেয়ে দরখাস্ত করেছে। অথচ ইন্ডিয়ায় এই টোট্যাল মার্কেটটা ধরে রেখেছে তিনটে কোম্পানি। তাদের নাম বলার দরকার আছে কি?

না। বলে যান।

বলে গেল অরুণাভ, এই তিনটে কোম্পানির তিন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যাপ্রোচ করেছে গভর্নমেন্টকে, লাইসেন্স যেন ইস্যু করা না হয়। পেল্লায় আমেরিকান কোম্পানির দাপটে ধুলোয় মিশে যাবে তিন-তিনটে ইন্ডিয়ান কোম্পানি। ক্লিয়ার?

ও ইয়েস, তারপর? নস্যি নিল গজানন।

নস্যির ডিবের দিকে তৃষ্ণার্ত চোখে চেয়ে অরুণাভ বললে, আমাকেও দিন।

খুশি হল গজানন। নস্যি-কালচার সিক্রেট এজেন্ট মহলেও তাহলে ঢুকে পড়েছে! গুড! বাড়িয়ে দিল ডিবেটা—তারপর?

তারপর-এর কথাটা নস্যি নেওয়ার পরে বলল অরুণাভ। এই তিন জনের দুজন সুইসাইড করেছে। কাগজে ছবিও বেরিয়েছে।

কিন্তু জোয়ারদার তো এসবের মধ্যে ছিল না।

মশায় গজানন, আই মীন, মাই ডিয়ার গজাননবাবু, হার্বস বেচতে জোয়ারদার নিউইয়র্কে গেছিল ঠিকই, কিন্তু তাকে মোটা রকমের শেয়ার অফার করা হয়েছিল কুল ড্রিঙ্কস-এর তরফ থেকে যাতে ইন্ডিয়ায় জবর ঘাঁটি গড়ে তোলা যায়। জোয়ারদারের আসল জোর কোথায় ছিল জানেন তো?

সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে।

রাইট। জোয়ারদার অফার অ্যাকসেপ্ট করেনি। তিন-তিনটে ইন্ডিয়ান কোম্পানির সর্বনাশ করতে চায়নি, এই তার অপরাধ।

কিন্তু জোয়ারদার তো পাগল হয়ে গেছিল।

বেঁটে মোটা কালো শরীরখানা দুলিয়ে-দুলিয়ে কিছুক্ষণ ধরে অট্টহাসি হাসল অরুণাভ। হাসির মধ্যেও যেন ব্যাটারির চার্জ।

বললে, ইন্ডিয়ার পয়লা সারির বিজনেস ম্যাগনেটগুলো হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করছে, মনে একটুও ধন্দ লাগছে না?

তা ইয়ে...খটকা একটু লাগছে বইকী।

সফট ড্রিঙ্কস ম্যানুফাকচারারদের তিন ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের মধ্যে বাকি আছে একজন, রাম সিং। এই মুহূর্তে দার্জিলিংয়ে।

আই সী।

ইয়েস, নাউ ইউ সী। হাসল অরুণাভ। যেন কালো মেঘের মধ্যে থেকে ঝিলিক দিল বিদ্যুৎ। এই রাম সিংকে প্রোটেকশন দিতে হবে আপনাকে। তক্কে-তক্কে থাকলে মিস্ট্রিটা সলভ করে ফেলতেও পারেন।

বাট, বাট আপনাদের এত বড় সংগঠনের কাউকে না পাঠিয়ে হোয়াই আমাকে...

বিকজ আপনার একজন ক্লায়েন্টের মুখ চিরকালের মতো বন্ধ করা হয়েছে বলে। বিকজ আরও অনেকের মুখ এভাবে বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে বলে। বিকজ আপনাকে কাউন্টার স্পাই হিসেবে লাগাতে চাই বলে।

কা-কাউন্টার স্পাই!

ইয়েস মাই ডিয়ার মিস্টার গজানন। ত্রিশূল সংগঠনের কেউ ওঁখানে নেই, একবারও কি আপনাকে তা বলেছি? বলিনি। তা সত্ত্বেও আপনাকে পাঠাতে চাই—ডবল এজেন্ট

হিসেবে। আপনি তার ওপরেও নজর রাখবেন—রাম সিংকেও দেখবেন। হাসল অরুণাভ—লাইনটা খারাপ জানেন তো। টাকার টোপ বড় সাংঘাতিক জিনিস। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে আমাদের রিপোর্ট অন্যরকম। আপনি জান দেবেন, তবু মান দেবেন না।

থ্যাংক ইউ ফর দ্য কমপ্লিমেন্টস, ডাঃ বক্সীর কাছে শেখা উচ্চারণে চোস্ত ইংরেজিটা ঝেড়ে দিল গজানন। এ রকম গোটা বারো বাঁধা গৎ তার মুখস্থ। বিজনেস চালাতে গেলে একটু দরকার বইকী।

বললে—ত্রিশূল এজেন্টের নাম?

চেহারাটাই দেখিয়ে দিচ্ছি। চিনতে সুবিধে হবে, বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল অরুণাভ। ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে লাগানো ছোট ড্রয়ার ক্যাবিনেটের ওপরের ড্রয়ারটা খুলল চাবি ঘুরিয়ে। ভেতর থেকে বার করল ছোট্ট একটা রূপোর কার্ড। কমপিউটার কার্ড যেভাবে পাঞ্চ করা থাকে, রূপোর এই কার্ডও সেইভাবে পাঞ্চ করা। কার্ডটা হাতে নিয়ে গেল পেছনের দেওয়ালে লাগানো ফাইলিং ক্যাবিনেটের সামনে। রূপোর কার্ডটা ঢুকিয়ে দিলে ক্যাবিনেটের গায়ে সরু ফোকর দিয়ে। কালো ইস্পাত ক্যাবিনেট মসৃণগতিতে সরে গেল একপাশে—দেখা গেল দেওয়ালের ভেতরে বসানো চৌকো স্টিল সিন্দুক।

গজাননের চোখ তখন ছানাবড়া সিন্দুকের ঠিক মাথার লেন্সটা দেখে। শরীরের প্রতিটি পেশি টান-টান হয়ে উঠেছে আপনা থেকেই। এ দৃশ্য সে আগেও দেখেছে এবং দেখেছে বলেই প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে এই মুহূর্তে টেনে লম্বা দেওয়ার। ত্রিশূল সঙ্ঘের টপ-সিক্রেট ডকুমেন্টস আছে এই সিন্দুকে। সেই সঙ্গে আছে বিস্তর বিস্ফোরক। শুধু এই ঘরখানা কেন, পুরো বাড়িটাকে পাউডার করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ত্রিশূল সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতারা ভারতের বড় বড় সংস্থার মালিক। সারা পৃথিবীতে ছাড়ানো ব্যবসার জাল। দুর্নীতি চক্র রোধ করার জন্যে নিজেদের স্বার্থে বেসরকারি এই সিক্রেট-এজেন্ট অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানী করে আশ্চর্য কৌশলে।

ত্রিশূল তাই একটা বিভীষিকা—ভারত-শত্রুদের কাছেও।

সিন্দুকের পাশে একটা লিভারে অরুণাভ চাপ দিতেই আচমকা ফ্ল্যাশে চোখ ধাঁধিয়ে গেল গজাননের। পিলে চমকে উঠলেও স্বস্তি পেল প্রাণটা এখনও যায়নি দেখে। সিন্দুকের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা অরুণাভর ফটো তুলে নিল লেন্স। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গজানন তফাতে। দাঁড়িয়ে আছে অরুণাভও। লেন্স তার কাজ করে চলেছে। কমপিউটারের মেমারি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অরুণাভর ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখছে। দাঁড়িয়ে থাকা অরুণাভর ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখছে। দাঁড়িয়ে থাকা অরুণাভর শরীরের প্রতিটি লাইনের সঙ্গে ফটোর অরুণাভর প্রতিটি লাইন মিলে যাওয়া চাই। না মিললেই অনর্থ ঘটবে। কমপিউটারের সঙ্গে সরাসরি লাগানো রয়েছে ডিটোনেটর যন্ত্রপাতি বিস্ফোরণ ঘটবে এক্ষুনি।

এত আধুনিকতা ভালো নয়, মনে-মনেই বলে গজানন। আরে বাপু, অরুণাভর একটা চুলও যদি পেকে গিয়ে থাকে এবং সেই পাকা চুলের চিহ্ন যদি ফটোতে না পাওয়া যায়, বেআক্কেলে যন্ত্রদানব বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বসবে এখুনি। অথবা যদি তাড়াহুড়োয় দাড়ি কামাতে ভুলে যায়, তাহলেও রক্ষে নেই।

তাই ভেতরে-ভেতরে ঘেমে ওঠে গজানন দ্য গ্রেট।

কিন্তু সন্তুষ্ট হয়েছে কমপিউটার। নিঃশব্দে খুলে গেল সিন্দুকের পাল্লা। ভেতর থেকে

একটা ফাইল বার করে আবার লেন্সের সামনে দাঁড়াল অরুণাভ। চাপ দিল লিভারে। আবার দেখা গেল ফ্ল্যাশ। বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা। ফাইলিং ক্যাবিনেট পিছলে এল সিন্দুকের সামনে।

চেয়ারে এসে বসল অরুণাভ। ফাইল খুলে মেলে ধরল গজাননের সামনে।

ভারি মিষ্টি চেহারার একটি মেয়ের দিকে অপলকে চেয়ে রইল ট্রিপল জি। পরনে টাইট জিনস প্যান্ট। হাফ হাতা ঢিলে শার্ট। গলায় একটা লকেট। ছোট করে ছাঁটা চুল। অনেকটা ছেলে-ছেলে চেহারা হলেও মুখের লাবণ্যের জন্যে বোঝা যায় মেয়ে। ঠোঁট দুটো কিন্তু পুরু এবং শক্ত। ওই ঠোঁট আর বেশবাস দেখে গজাননের ধারণা হয়ে গেল, এ মেয়ে লবঙ্গলতিকা নয় মোটে—রীতিমতো ব্যায়াম বীরাঙ্গনা।

সে অভিজ্ঞতাও হয়েছিল যথাসময়ে।

বললে চোখ তুলে—চিনে নিলাম। কিন্তু সে আমাকে চিনবে কী করে?

আপনার চেহারার ডেসক্রিপসন একটু পরেই ওয়্যারলেসে চলে যাবে।

নাম?

অনিমা।

বাঙালি?

অবাক হচ্ছেন কেন? আপনার সাগরেদ পুঁতিবালাও তো বাঙালি।

তা ঠিক। তবে আপনাদের তথ্যের একটু ভুল আছে। পুঁতিবালা নামটা যাচ্ছেতাই বলে ওর একটা বেটার নেম আমি দিয়েছি।

প্রীতিবল।

মাই গড! চোখ কপালে তুলে ফেলে গজানন—তাও জানেন? হাসল অরুণাভ। সেই ব্যাটারি চার্জড শক্তিমানের হাসি।

বললে, কত নেবেন?

কত দেবেন?

এখন বিশ হাজার। ক্যাশ। অন্য খরচ আমাদের।

কাজ শেষ হলে?

কাজের শেষটা কী হয় দেখা যাক, আবার সেই ব্যাটারি চার্জড হাসি। এবারে রীতিমতো নিগূঢ়। অর্থাৎ বেঁচে ফিরে আসো কিনা দেখি? এক লাখেও পৌঁছতে পারে।

খুব কম।

ডোন্ট বারগেন, একটু কর্কশ শোনায় অরুণাভর স্বর। চোয়ালও কঠিন। চোখের স্পার্ক দ্বিগুণ-ত্রিশূলের একটা কাজ করলেই সারাজীবন পায়ের ওপর পা তুলে বসে কাটিয়ে দেওয়া যায়।

জানি, হাসল গজাননও। বেলেঘাট্টাই হাসি—বাজিয়ে নিলাম। ডোন্ট মাইন্ড।

॥ বাঘের গুহায় ॥

কিন্তু বাঁচানো গেল না রামসিংকে। হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে পুঁতিবালা ওরফে প্রীতিবল যে খবর দিল তা সাংঘাতিক।

লাশ দেখে আর লাভ কী? বিশ হাজার নগদ নিয়ে ত্রিশূলের পয়সায় দার্জিলিং-এর মতো জায়গায় এত লপচপানি করে শেষে এই হল? অরুণাভ যা টেঁটিয়া লোক, এবার জানে না মেরে দেয়।

মুখের ভেতরটা বেশ গরম-গরম লাগছে। আমেরিকান ট্যাবলেটের কারবারই আলাদা। মাথার ভেতরকার ভোঁ-ভোঁ ভাবটাও একটু কেটেছে। মনে-মনে ডাঃ বক্সীকে স্মরণ করল গজানন। লোকটা নির্ঘাত দেবতা। আপদে-বিপদে অলক্ষিতে এমন বাঁচিয়ে দেয়। এই ট্যাবলেট যদি সঙ্গে না থাকত, মেনট্যাল শকেই আবার মেনট্যাল হোমে দিন কাটাতে হত।

মেজাজ খিঁচড়ে গেলে গ্রেট গজানন পুঁতিবালার ওপরেই ঝাল ঝাড়ে। পুঁতিবালা যদিও এখন আর সেই পুঁতিবালা নেই। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়েছিল বলে শরীরেও গ্লানি জমা হয়েছিল। এখন তার চেহারা ঝকঝকে, চোখ চকচকে, রং টকটকে। তবুও গজাননের কাছে আগুনের শিখা এই প্রীতিবল-নুয়ে পড়ে আগেকার পুঁতিবালার মতোনই।

তেড়ে বললে গজানন, তোকে যে বলেছিলাম, রাম সিং-এর সঙ্গে ফ্লার্ট করতে। করেছিলি?

মুচকি হেসে পুঁতিবালা বললে, তা আর করিনি। মনে রং ধরিয়ে তবে ছেড়েছি।

তবে মরতে গেল কেন?

পাগল হয়ে যাচ্ছিল যে।

হয়ে যাচ্ছিল! চোখ বড় হয়ে যায় গজাননের।—এতদিন বলিসনি কেন?

মুখের সামনে দু-হাত ঘুরিয়ে বুড়ি খুকির মতো বললে পুঁতিবালা—কখন বলব গো? যখনই অমি একা হই, তখনই দেখি তুমি দোকা।

শাট আপ।

ফিক করে হেসে ফেলে পুঁতিবালা—বেড়ে মেয়েটা, না দাদা? বিয়েই করে ফ্যালো না।

আমাদের লাইনে কেউ বিয়ে করে না। করলেই ফ্যাঁস—গলায় ছুরির কোপ দেখানোর ভঙ্গিমা দেখিয়ে। —অথবা দুম! —রগে পিস্তল ছোঁড়ার অভিনয় করে। —তোকেই বলছি, বিয়ে ফিয়ের কথা মনেও আনবি না। বুঝেছিস?

দাদা গো দাদা, তা আর বুঝিনি। হাড়ে-হাড়ে বুঝছি। কিন্তু দাদা, প্রথম দিন যেদিন ম্যালে গিয়ে ঘোড়া নিলে। অনিমা বউদি—।

বউদি!

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। অনিমাদির ঘোড়ায় চড়াটা লাভলি, তাই না?

গেছো মেয়ে নাম্বার ওয়ান।

গোছো মেয়েই আমার ভাল্লাগে, মুখ গোল করে বললে পুঁতিবালা—তা দুটিতে জলাপাহাড়ে গিয়ে কী করলে গো?

গেট আউট!

পুঁতিবালা তো গেট-আউট হলই না, উলটে আরও বেশি 'ইন' হয়ে গেল। অর্থাৎ সোফায় ঝপ করে শুয়ে পড়ে পায়ের ওপর পা তুলে নাচাতে লাগল। আড়চোখে কিন্তু তাকিয়ে রইল গজাননের দিকে।

গজাননের মাথায় তখন চিন্তার তুফান। প্রথম দিনেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট মতো ম্যালেতে চিনে ফেলেছিল অনিমাকে। ঘোড়ায় চড়ে জলাপাহাড়ে যেতে-যেতে কথাও হয়েছে। ঠিক হয়েছে গোপনে দেখাশুনো হবে বোটানিক্যাল গার্ডেনে, দিনের আলোয়, গাছপালার আড়ালে। প্রতিদিনই দুপুর দুটোর সময়ে একবার দেখা হবেই।

তা দুদিন দেখা হয়েছে বইকী। জানা গেছে অনেক কথা। গজানন আর পুঁতিবালা টুরিস্টের ভিড়ে এখনও মিশে আছে বলে রক্ষে, কিন্তু বেশিদিন থাকলেই সজাগ হবে অদৃশ্য চক্ষুরা। অনিমার সে ভয় নেই। স্কুলের শিক্ষয়িত্রী সে। থাকে লেডিজ হোস্টেলে। প্রতি সন্ধ্যায় যায় ভিডিও গেমের জুয়োর আসরে।

এবং ওইখানেই রয়েছে সন্দেহজনক কিছু লোকের আনাগোনা।

ভাবতে-ভাবতেই মতলব স্থির হয়ে যায় গজাননের। প্রাণ নিয়ে টানাটানির গেম-এ নেমে প্রাণটাকেই পণ করে এবার খেলায় নামা যাক। মরতে ভয় পায় না গজানন। কিন্তু কোন...বাচ্চারা রামসিং এবং আরও তিনজনকে পাগল বানিয়ে আত্মহত্যা করাচ্ছে, কীভাবে পাগল বানাচ্ছে, তা না জানলে গজানন নিজেই তো ফের পাগল হয়ে যাবে। তার চাইতে বাঘের গুহাতেই ঢোকা যাক। যা থাকে কপালে।

পুঁতিবালা, আই মীন, প্রীতিবল—গম্ভীর স্বর গজাননের। দ্বিধা কাটিয়ে উঠেছে। সঙ্কল্পে পৌঁছেছে। গলার স্বর পালটে গেছে।

বুঝল পুঁতিবালাও। গজাননকে সে চিনে ফেলেছে। অসম্ভব ডেয়ারিং। আর অসম্ভব গোঁয়ার। গজানন নিজেও বলেছিল একদিন, ওর নাকি অবসেসন্যাল পার্সোন্যালিটি আছে। যা ধরবে, তা করে তবে ছাড়বে। পুঁতিবালা বলেছিল, শুওরের গোঁ বললেই হয়। খেপে গেছিল গজানন।

কিন্তু আজকে আর টিটকিরি দেওয়ার সাহস হল না পুঁতিবালার। গ্রেট গজাননের মুখ থমথম করছে। ভুরু কুঁচকে গেছে। চোখ আর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। বেলেঘাট্টাই গজানন জাগছে ট্রিপল জি-এর মধ্যে।

বলো দাদা—মিনমিনে গলায় বললে পুঁতিবালা।

রিভলভারটা দে।

সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল পুঁতিবালা। সুবোধ বালিকার মতো বালিশের তলা থেকে হোলস্টার সমেত রিভলভার এনে দাঁড়াল গজাননের সামনে। গজানন ততক্ষণে বুশশার্ট খুলে ফেলেছে। দু-হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। নিপুণ হাতে কাঁধে আর বগলের তলা দিয়ে চামড়ার বেল্ট বেঁধে আগ্নেয়াস্ত্র ঝুলিয়ে দিল পুঁতিবালা। হাত নামিয়ে বুশশার্ট পরে নিল গজানন। ঘড়ি দেখল। দুপুর একটা।

বলল—দুটোর সময়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে দেখা হবে অনিমার সঙ্গে। সন্ধ্যায় যাব ভিডিও গেমের আড্ডায়। খুঁচিয়ে ঘা করে ধরা দেব। নিয়ে যাক ওদের ঘাঁটিতে। তারপর এসপার কি ওসপার। দাঁত কিড়মিড় করে গজানন—শালা—বাচ্চা! দেখি তোদের কত মুরোদ।

গজাননের চেহারা এক্কেবারে পালটে গেছে। প্রমাদ গণে পুঁতিবালা। গান ডুয়েলের জন্যে তৈরি হয়েই বেরোচ্ছে গজানন। রক্ত ঝরাবে। নিজেও মরতে পারে। তারপর?

আমার কী হবে? ককিয়ে ওঠে পুঁতিবালা।

শাট আপ! সন্ধ্যার পর নজর রাখবি ভিডিও গেমের আড্ডায়। ভেতরে ঢুকবি না। খবরদার! আমাকে নিয়ে গেলে পেছন নিবি না। চোপরাও। কোনও কথা না। কাল সকালে না ফিরলে পুলিশে খবর দিবি। নিজে থেকে ওস্তাদি মারতে যেও না, বুঝেছ? গেছো মেয়ে অনিমা থাকছে সঙ্গে, ভয় কী? সস্নেহে পুঁতিবালার মাথা চাপড়ে দেয় গজানন, এ লাইনে সে অনেক বেশি এক্সপার্ট। বায়-বায়, মাই সিস্টার। বলেই ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে

গেল গজানন দ্য গ্রেট। কিন্তু হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে-পড়তে বেঁচে গেল বাইরে গিয়েই। টুরিস্ট এসেছে। মালপত্র নামাচ্ছে। একটা বড় প্যাকেট ছিল গজাননের গমন পথে। বেশ বড় প্যাকেট। ট্রিপল-জি তাতেই হোঁচট খেয়েছে।

এমনিতেই মেজাজ সপ্তমে চড়ে। তার ওপর এই প্যাকেট। বেরোচ্ছে একটা শুভ কাজে, প্রথমেই বাধা। গজানন আবার এগুলো মেনে চলে। হাঁচি, কাশি, টিকটিকির সঙ্কেতকে বিলক্ষণ পাত্তা দেয়। তাই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেও সুড়সুড় করে ফিরে এল ঘরে। এসেই দেখল সোফায় শুয়ে খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে চোখ বড়-বড় করে উঠে বসেছে পুঁতিবালা।

গজাননকে ব্যাজার মুখে ফিরে আসতে দেখেও চোখ নামিয়ে নিয়ে খবরের কাগজ পড়ে যাচ্ছে দেখে ট্রিপল-জি-এর আর সহ্য হল না। দুন্দুভি কণ্ঠে হুঙ্কার ছেড়ে বললে, সিনেমার পেজ নাকি?

পড়া হয়ে গেছিল পুঁতিবালার। বিস্ফারিত চোখে কাগজখানা দিল গজাননের দিকে, পড়েছ?

পুঁতিবালা এরকম করে কেন? মরতে চলেছে গজানন, এখন কি খবরের কাগজ পড়ার সময়? কিন্তু কী আছে কাগজটায়?

হ্যাঁচকা টানে কাগজ টেনে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরল গজানন। কোন খবরটা? কাগজটা তো দেখা যাচ্ছে বাংলা। কলকাতার অফসেটে পি টি এস টাইপে ছাপা।

সোফা ছেড়ে পুঁতিবালা উঠে এসে আঙুল দিয়ে দেখাল—এই বিজ্ঞাপনটা।

পড়ল গজানন।

মানুষের মগজে দশহাজার কোটির ওপর নিউরোণ রয়েছে। কিন্তু এগুলোর দশ ভাগের এক ভাগেরও বেশি নিষ্ক্রিয় থাকে। এই নিষ্ক্রিয় নিউরোণগুলোর মধ্যে মানুষের পূর্বজন্ম আর অতীতের বহু জন্মের পঞ্চেন্দ্রিয় আর মন দিয়ে অর্জিত সমস্ত অভিজ্ঞতা স্মৃতির আকারে ধরা থাকে। নিষ্ক্রিয় নিউরোণগুলোকে সক্রিয় করলেই পূর্বজন্মের ও অতীতের বহু জন্মের স্মৃতি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

মাত্র তিনমাসের মধ্যে যে-কোনও মানুষের পূর্বজন্মের স্মৃতিকে সক্রিয় করা হয়। সম্পূর্ণ চিকিৎসা ব্যয় পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার। অগ্রিম দশ হাজার ডলার। বুকিং চলছে। যোগাযোগ ঃ

নিচের নাম ঠিকানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল গজানন। এ যে কলকাতার ঠিকানা। কলকাতায় এজেন্ট বসিয়ে আমেরিকার এক্সপার্ট ব্রেনসেলে অ্যাকটিভিটি জাগিয়ে মানুষকে জাতিস্মর করে তুলছে!

ব্রেন সেল! আমেরিকান এক্সপার্ট! অকস্মাৎ বিজনেস ম্যাগনেটদের পাগল হয়ে আত্মহত্যার হিড়িক। প্রত্যেকেই আমেরিকান কুল ড্রিঙ্কস কোম্পানির বিষনজরে ছিল।

ফ্যালফ্যাল করে বিজ্ঞাপনটার দিকে চেয়ে থাকে গজানন। দশহাজার কোটিরও বেশি নিউরোণ-এর দশ ভাগের ন'ভাগ নিষ্ক্রিয়। তাদের খাটিয়ে নিলে পূর্বজন্মের স্মৃতি ফিরে পাওয়া যায়। কোটি-কোটি নিষ্ক্রিয় নিউরোণের মধ্যে আরও অনেক ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে, যা এই জন্মেরই ব্যাপার। পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগানোর আগে এই জন্মের অকল্পনীয় সেই শক্তিগুলো কি জেগে উঠছে না? সেই শক্তি দিয়ে একটার-পর-একটা সুস্থ মানুষকে পাগল করে দেওয়া কি খুব কঠিন?

বোঁ-বোঁ করে মাথা ঘুরতে লাগল গজাননের। কাগজটা মাটিতে ফেলে দিয়ে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাধা পেলে যে একটু বসে যেতে হয়, তাও ভুলে গেল।

॥ অ্যাকশন ॥

ঠিক দুটোর সময়ে বিশাল পাইন গাছটার তলায় পৌঁছল গজানন। দূরে-দূরে কিছু কপোত-কপোতী প্রেমালাপে বিভোর। গজাননের মাথার মধ্যে তখন এমনই গোলমাল চলছে যে, এদিকে ওদিকে কৌতুকী চাহনি নিক্ষেপ করবার মতো মেজাজও নেই।

কিন্তু অনিমা মেয়েটা গেল কোথায়? পরপর দুদিন এল, আজকেই আরও বেশি করে আসা দরকার। কেননা রাম সিং পটল তুলেছে। রহস্য আরও বেশি গভীর হয়েছে। চোখের সামনে অরুণাভর কালো পাথরের চকচকে মুখ আর বিরাট টাক ভেসে উঠছে। দু-চোখের স্পার্ক যেন কলকাতা থেকে ছুটে এসে গায়ে ছ্যাঁকা দিচ্ছে। মনের অবস্থা খুবই খারাপ। অনিমাটার সঙ্গে শলাপরামর্শ করে নেওয়া খুবই দরকার। কিন্তু বেআক্কেলে মেয়েটা ঠিক আজকেই ডুব দিল?

ত্রিশূলের কারসাজি নয় তো? নির্দেশ বেতারে—অ্যাসাইনমেন্ট ফেলিওর—লিকুইডেট গজানন!

আপনা থেকেই হাতটা চলে যায় বগলের তলায়। কে জানে এই মুহূর্তে কোন ঝোপে রিভলভার তাগ করছে অনিমা। অথবা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল। গোর্খাল্যান্ড নিয়ে যে হাঙ্গামা হয়ে গেল সম্প্রতি, বোটানিক্যাল গার্ডেনে একজনের লাশ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।

গাছের গুঁড়ির দিকে সরে যায় গজানন। গুঁড়িতে পিঠ লাগিয়ে বাঘের মতো তাকায় আশেপাশে। ঠিক এই সময়ে পায়ের তলায় কী খচমচ করে উঠতেই লাফিয়ে ওঠে হরিণের মতো।

রিভলভার চলে এসেছে হাতে, গুলিও বেরিয়ে যেত আর একটু হলে। কিন্তু কাকে গুলি করবে গজানন? ওই খবরের কাগজটাকে? পা দিয়ে মাড়িয়ে ফেলেছে বলে?

কিন্তু একটুকরো পাথর দিয়ে কাগজটা চাপা দেওয়া কেন? পাছে উড়ে যায় বলে? এত যত্ন করে কে কাগজ রেখে গেল এখানে?

গুটি-গুটি এগিয়ে গেল গজানন। বলা যায় না কাগজের তলায় হয়তো বিস্ফোরক আছে। কাগজ তুললেই ফাটবে প্রলয়ঙ্কর শব্দে। ত্রিশূলের অসাধ্য কিছু নেই।

কাছে এসে হেঁট হল গজানন। আরে, এ যে সেই বাংলা কাগজটা, একটু আগেই পড়তে দিয়েছিল পুঁতিবালা। পাথরটা যেখানে চাপা দেওয়া রয়েছে, তার ওপরের লাইন কটা পড়া যাচ্ছে ঃ মানুষের মগজে দশহাজার কোটির বেশি নিউরোণ....

নিচের ঠিকানাটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

তবে কী, তবে কী, এই খবরটাতেই দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে এক কপি খবরের কাগজ এখানে চাপা দিয়ে রেখে যাওয়া হয়েছে? রেখেছে কে?

নিশ্চয় অনিমা। ত্রিশূল এজেন্ট।

বিদিগিচ্ছিরি এই কেসটার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কি তাহলে কোটি-কোটি নিউরোণ-এর রহস্য?

মাথা ঘুরে যায় গজাননের। আস্তে-আস্তে বসে পড়ে ঘাসের ওপর। পাখির ডাক শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে এক সময়ে। এটা ওর একটা গ্রেট ক্যাপাসিটি। মনের সেফটি মেক্যানিজম। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা চরমে পৌঁছালে আপনিই ঘুম এসে যায়। মন শান্ত হয়ে যায়।

ঘণ্টাখানেক দিবানিদ্রা দিয়েই ধড়মড় করে উঠে পড়ল গজানন। আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পৌঁছতে হবে ভিডিও গেম আসরে।

এবং পৌঁছল ঘড়ি ধরেই। তখন রোদ্দুর একটু-একটু করে মুছে যাচ্ছে দার্জিলিং-এর বুক থেকে। বড়-বড় ছায়া এগিয়ে আসছে একটার-পর-একটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে।

আড্ডা এর মধ্যেই সরগরম। ঘর বুঝি ফেটে যাচ্ছে অনেকগুলো ভিডিও গেম-এর সম্মিলিত মিউজিক আর আওয়াজে। এক কোণে চলছে জুয়া।

তার পাশেই ওই হট্টগোলের মধ্যে চেয়ার টেবিল পেতে মদ্যপান করে চলেছে কিছু লোক। আজকের সাজগোজ আরও উগ্র। কামনা জাগানো। নিতম্ব কামড়ে ধরা ব্লু জিনস-এর তলায় টাইট গেঞ্জি গোঁজা। কোমরে চওড়া চকচকে বেল্ট। গেঞ্জির ওপর লেখা আই লাভ ইউ। দুই বক্ষ চূড়ার ওপর ঢেউ খেলানো অবস্থায় লেখাটা যেন জীবন্ত হয়ে দুলে-দুলে হাতছানি দিচ্ছে লুব্ধ পুরুষদের।

পুরুষগুলো কেউ নিচু ক্লাসের নয়। এই ধরনের জুয়োর আড্ডায় আর মদের আসরে পকেট ভারি না থাকলে কাউকে ঢুকতেও দেওয়া হয় না। গজাননকেও দশ টাকার টিপস দিতে হয়েছে গেটম্যানকে। তাছাড়া ওর চালচলনেও যে এখন নবাবিয়ানা—যে লাইনের যে দস্তুর।

অনিমার দিকে তাকানো, তাকে নিয়ে হাসাহাসি করা, এমনকী তার সঙ্গে কথাও বলা হচ্ছে। পুরু ঠোঁট বেঁকিয়ে অনিমাও হাসছে এবং লাস্যময়ীর মতোই অভিনয় করে চলেছে। কে বলবে এই মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী।

গজানন গুটিসুটি গিয়ে বসে পড়ল মদের আড্ডায়। অনিমা ওকে দেখেও দেখল না। প্রথমে হুইস্কির অর্ডার দিল। যে-সে হুইস্কি নয়—ভুটানি হুইস্কি হওয়া চাই। যার জোর আরও বেশি। পরপর তিন পেগ যখন শেষ হয়েছে, পাশের টেবিল থেকে কালো চশমা পরা মজবুত চেহারার লম্বামতো একটা লোক এসে বসল ওর টেবিলে। লোকটার কালো গোঁফ দু-দিকে পাকানো এবং ছুঁচাল। গজাননের দিকে তাকিয়ে সে হাসতেই গজাননও হাসল। ভুটানি মদ্য রক্তে এনেছে বেপরোয়া ভাব। হেসেই বললে ইংরেজিতে, রাত্রে কেউ গগলস পরে? চোখের দোষ আছে বুঝি?

ঠিক ধরেছেন। একটা চোখ কানা। চশমা খুলে দেখাল লোকটা—নতুন এসেছেন?

হ্যাঁ।

গেমস খেলবেন?

জানি না কী করে খেলতে হয়।

শিখিয়ে দিচ্ছি। আসুন।

এইটাই চাইছিল গজানন। তক্ষুনি উঠে গেল জুয়োর আড্ডায়। সবক'টা খেলাতেই সে পোক্ত। কিন্তু এমন ভান করে গেল যেন এক্কেবারে আনাড়ি। ফলে হারতে লাগল প্রতি গেমে। আধঘণ্টাও গেল না। পাঁচ হাজার দশ টাকা হেরে বসল গজানন।

কাগজে হিসেব রাখছিল কালো চশমাধারী। স্পষ্টত খেলানো এবং খেলিয়ে পথে

বসানোই এর কাজ। সব জুয়োর আড্ডায় এরকম একজন বুদ্ধিমান মাস্‌লম্যান থাকে। কাগজের হিসেব দেখে সে বললে—পাঁচহাজার দশ। মিস্টার, টাকাটা রাখুন, তারপর খেলবেন।

আকাশ থেকে পড়ল গজানন—অত টাকা কোথায় পাব?

তবে খেলতে এলেন কেন? শক্ত গলা কালো চশমাধারীর।

টাকা চাইলেই পাব বলে।

চাইলেই পাবেন? কে দেবে?

রাম সিং, জড়িত স্বর গজাননের, একটা কাগজ দিন চিঠি লিখে দিচ্ছি। গিয়ে নিয়ে আসুন। না পারলে আমার সঙ্গে চলুন। জ্বালাবেন না মাইরি।

কালো চশমার আড়ালে একটা চোখ ঈষৎ চমকে উঠলেও মুখের ভাবে তা প্রকাশ পেল না। গজাননের ডাইনে-বাঁয়ে পেছনে তিনজন গাঁট্টাগোট্টা নেপালি এসে দাঁড়িয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে।

কালো চশমাধারী চেয়ে আছে তো আছেই। গজাননের মুখের প্রতিক্রিয়া দেখছে। না, লোকটা খবরই রাখে না রাম সিং সুইসাইড করেছে আজই সকালে। মুখ ভাবলেশহীন, বরং একটু ক্ষুব্ধ টাকা নিয়ে চাপ দেওয়ায়। কিন্তু রাম সিং-এর সঙ্গে যার এত দোস্তি, তাকে তো চট করে ছাড়া যায় না।

রাম সিং আপনার কে হন?

দুম করে রেগে যায় গজানন (মানে রাগার ভান করে)—তাতে আপনার দরকার কী?

কালো চশমাধারী আর কথা বাড়ায় না। কলম আর প্যাডটা এগিয়ে দিয়ে বলে, লিখুন।

ঝড়াঝড় করে ইংরেজিতে লিখে দিল গজানন ঃ

মাই ডিয়ার রাম সিং,

আই অ্যাম ইন এ ফিক্স। কাইন্ডলি হ্যান্ডওভার ফাইভ থাউজ্যান্ড টু দ্য বেয়ারার অফ দিজ লেটার। আই শ্যাল মীট ইউ টুমরো। ইওরস—জ্ঞানপান।

প্যাড থেকে চিঠি ছিঁড়ে নিয়ে কালো চশমাধারী পকেটে পুরতে-পুরতে বললে, কোথায় আছেন আপনার রাম সিং?

মনে-মনে বলল গজানন, শালা, বাজিয়ে নিচ্ছ আমাকে? মুখে বললে—লোহিয়া প্যালেস, জলাপাহাড়। কুইক। বেরিয়ে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেল কালো চশমাধারী। গজানন তখনও চেঁচিয়ে চলেছে—হেই, গেট মী মোর ড্রিঙ্কস। আই ওয়ান্ট টু ড্যান্স। হু উইল ড্যান্স উইথ মী?

বলেই এদিক-ওদিক চাইল গজানন। হাত বুলিয়ে নিলে বাঁ-গালের কাটা দাগটার ওপর। বডি থ্রো করার আগে এটা করা ওর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। ক্রিকেট মাঠে বল করার আগে প্যান্টে বল ঘষে নেওয়ার মতো। গজাননের হাতে-পায়ে বিদ্যুৎশক্তির আধারগুলো পটাপট ছিপিখোলা হয়ে যায় গালের ওই পুরোনো ক্ষতস্থানে হাত বুলোলেই।

অনিমা ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে আছে ওর দিকে; চোখে বিজাতীয় দৃষ্টি। বন্ধুত্বর বাষ্পটুকুও নেই। ঘর থেকে সটকান দেওয়ার একটাই পথ। দরজার ঠিক পাশেই দুঁ-হাত বুকের ওপর জড়ো করে দাঁড়িয়ে যেন পাথরপ্রতিমা, শরীরী বিস্ময়।

গাল থেকে হাত নামাল গজানন এবং দু-হাতের দুই ঝটকায় ডাইনে-বাঁয়ের দুই নেপালী পুঙ্গবকে দশ হাত দূরে ছিটকে ফেলে দিয়ে কামানের গোলার মতো ধেয়ে গেল দরজার দিকে।

গজানন দ্য গ্রেটের এ হেন আচমকা ছিটকে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিল না কেউই। সেই ফাঁকেই দরজায় পৌঁছে গেল গজানন। চাপা গলায় অনিমার দিকে না চেয়ে শুধু বললে— ল্যাং মার আমাকে।

অনিমা মেয়েটি সাঙ্ঘাতিক ধুরন্ধর। মুখখানায় একটু মঙ্গোলিয়ান ধাঁচ আছে বলেই মনের কথা মুখে ফোটে না। কিন্তু চকিতের মধ্যে বুঝে নিল একঘর বিমূঢ় শত্রুর আস্থা কুড়োতে গেলে গজাননের নির্দেশ অতি উত্তম।

অতএব অতি উত্তমভাবে ডান পা-টা সামনে বাড়িয়ে ল্যাং মাড়ল অনিমা। লিখতে যেটুকু সময় গেল, তার অনেক কম সময়ের মধ্যে ঘটে গেল সমস্ত ব্যাপারটা। এক ফুট দূর থেকে গজানন বললে ল্যাং মারতে, এক ফুট এগিয়ে আসতেই ল্যাং মারল অনিমা এবং দশ ফুট দূরে মুখ থুবড়ে পড়ল ট্রিপল-জি।

হই-হই করে তেড়ে এল পেছনকার জুয়ারিরা। লাফিয়ে পড়ল গজাননের ওপর। গোলমালের মধ্যে দরজা দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল অনিমা।

ঘা কতক খেয়ে মনে হল নেশা ছুটে গেছে গজাননের। বিরাশি সিক্কা ওজনের একটি চড় পড়ল কাটা গালটার ওপর—ব্লাইটার। যার গাল এরকম কাটা, সে যে সাধুপুরুষ নয়, আগেই বুঝেছিলাম। বল তুই কাদের এজেন্ট?

এজেন্ট? ককিয়ে ওঠে গজানন, কারবার-টারবার কিছুই নেই আমার, এজেন্সি নিতে যাব কেন? কোঁক! ঘুসি পড়েছে তলপেটে। দম আটকে আসে গ্রেট গজাননের। মনে কিন্তু খুশির ফেয়ারা। কাজ ভালোই এগুচ্ছে। এবার বডি সার্চ করুক। রিভলভারটা বেরিয়ে যাক। নিয়ে যাক ওদের ঘাঁটিতে...

ঠাস্!

মাথা ঘুরে যায় গজাননের। সেই সঙ্গে ছিটকে পড়ে চেয়ার থেকে। বুকের ওপর জুতোর হিল ঘষছে একজন। আর একজন ঠিক কণ্ঠার ওপর। আর একজন দ্রুত বডি সার্চ করে হোলস্টার থেকে বার করে ফেলেছে রিভলভারটা।

রিভলভার এখন কালো চশমাধারীর হাতে। মুখ তার ক্রুর, করাল। কণ্ঠে শঙ্খচূড়ের রক্ত হিম করা গজরানি, আগেই বুঝেছিলাম। থাক এখানে। আসছি আমি।

গজাননও তাই চায়!

॥ মনের শক্তি ॥

দার্জিলিং শহর থেকে যে রাস্তাটা নেপালের পশুপতি মন্দিরের দিকে গেছে, যে পথ দিয়ে অবাধে নেপাল থেকে বিদেশি সামগ্রী কিনে আনে পর্যটকরা, সেই পথের বেশ কয়েক জায়গায় দু-পাশে গভীর পাইন অরণ্য নেমে গেছে ঢালু পাহাড় বেয়ে, কোথাও বা উঠে গেছে মেঘলোকের দিকে।

কালো চশমাধারী হেঁটেই বেরিয়ে এল শহর থেকে। হাঁটছে লম্বা-লম্বা পা ফেলে। অন্ধকারে আর কুয়াশায় বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না। পেছন ফিরে তাকালেও তাই সে দেখতে পেত না অনিমাকে। চিতাবাঘের মতো নিঃশব্দে সে আসছে পেছন-পেছন।

জঙ্গলে ঢুকে পড়ল কালো চশমাধারী। বড়-বড় গাছের তলা দিয়ে সরু পায়ে-চলা রাস্তা। শেষ হয়েছে একটা দোতলা কটেজ প্যাটার্নের বাড়ির সামনে।

ফ্যান-লাইটের তলায় গিয়ে দাঁড়াতেই খুলে গেল সদর দরজা। ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিতেই সামনে এসে দাঁড়াল সুবেশ সুন্দর এক পুরুষ। গালে চাপ দাড়ি। চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। কিন্তু সারা মুখে যেন নিষ্ঠুরতা মাখানো। ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা হাসিটাও নির্মম।

নির্মম হাসি হেসেই বললে লোকটা—সমসের, কী ব্যাপার? হঠাৎ এলে কেন?

রাম সিং-এর এজেন্ট জালে পড়েছে। গেমস-এর আড্ডায় এসেছিল। আনব এখানে?

ম্যাডামকে জিগ্যেস করতে হবে। একা এসেছ?

হ্যাঁ।

ইউ ফুল। স্পাই এনেছ পেছন-পেছন।

স্পাই!

ওই দ্যাখো। দেওয়ালের গায়ে ক্লোজড সার্কিট টিভি স্ক্রিনের দিকে আঙুল তুলে দেখায় নিষ্ঠুর-বদন ব্যক্তি। রঙিন পরদায় দেখা যাচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে থেকে পা টিপে-টিপে এদিক ওদিক তাকাতে-তাকাতে বেরিয়ে আসছে চাবুক চেহারা একটি মেয়ে। টাইট গেঞ্জিতে বুকের ওপর লেখা—আই লাভ ইউ।

অনিমা ভাবতে পারেনি শহরের এত কাছে স্কাউন্ড্রেলগুলো ঘাঁটি গেড়েছে। এই পথ দিয়ে গাড়ির স্রোত বয়ে যায় সকাল সন্ধ্যা। কিন্তু রাস্তা থেকে দেখাই যায় না জঙ্গলের ভেতরকার এই নিরালা বাড়িটাকে।

ভেতরে কোনওমতে যদি ঢুকতে পারা যেত...

আগে বাড়িটাকে এক পাক ঘুরে দেখে নেওয়া যাক। পথ নিশ্চয় আছে। জঙ্গলের মধ্যে পাহারার কড়াকড়ি নাও থাকতে পারে।

পেছন দিকে এসে কিন্তু ভুলটা ভাঙল। দরজা খুলে বেরিয়ে এল কালো চশমাধারী সেই লোকটা। হাতে রিভলভার। মোলায়েম গলায় বললে—ভেতরে এসো সুন্দরী। বাইরে বড় ঠান্ডা।

বড় ঘরটায় চেয়ারে বসে অনিমা। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। টাইট গেঞ্জি লুটোচ্ছে মেঝেতে। নিষ্ঠুর বদন ব্যক্তির একটা হাত তার বাম স্তনে মোচড় দিচ্ছে, এখনও বলো মহারানি তুমি কাদের এজেন্ট?

বলব না।

খুব মিষ্টি স্বর ভেসে এল করিডরের দরজার কাছ থেকে, রূপকুমার, ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। তোমরা পাবে পরে।

দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাস্য রকমের স্থূলকায়া এক মহিলা। চর্বি ঝুলে পড়েছে সারা দেহে, গালে চিবুকে। মাথার চুল ঝুঁটি করে ওপরে বাঁধা। আরও কুৎসিত দেখাচ্ছে ঠোঁটে লাল রং মেখে থাকায়। ফরসা গাল এমনিতেই লালচে। শুধু একটা ব্লাউজ আর স্কার্ট শরীরের কদাকার মেদবহুল অংশগুলোকে প্রকটতর করে তুলেছে।

থপথপ করে অতি কষ্টে গুরুভার দেহটাকে অনিমার সামনে নিয়ে এল চর্বির এই সচল পাহাড়টি। লাল ঠোঁট বেঁকিয়ে গা ঘিনঘিনে হাসি হেসে বললে, তুমি কাদের বাড়ির মেয়ে গো?

যমের বাড়ির—গা রি-রি করছে অনিমার। বুকটাও টনটন করছে শয়তানটার কদর্য হাতের নিষ্পেষণে। মুখ দিয়ে ভালো কথা বেরোয়?

নোংরা হাসি আরও একটু নোংরা হল প্রৌঢ়ার মুখে, বড় কষ্ট দিচ্ছে এরা, না? মেয়ে মানুষই মেয়ে মানুষের দুঃখ বোঝে। রূপ থাকা বড় জ্বালা, বাছা। হাত ধরে অনিমাকে চেয়ার থেকে উঠাল চর্বির পাহাড়। অনিমাও টুক করে মেঝে থেকে উলের গেঞ্জিটা কুড়িয়ে নিয়ে পরে নিল মাথা গলিয়ে। বুকে ঢেউ খেলে গেল লেখাটা—আই লাভ ইউ।

সে কী হাসি প্রৌঢ়ার, ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস, আই লাভ ইউ। কাম উইথ মী। সমসের, রূপকুমার, তোমরা এখানেই থাকো।

ম্যাডাম, আর একজন রয়েছে গেমস-এর আড্ডায়।

সমসেরের কথায় কান দিল না ম্যাডাম।

ছোট ঘর। প্রায় অন্ধকার বললেই চলে। একটা শুধু ঘেরাটোপ দেওয়া টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে বড় সোফার পাশে।

অনিমাকে নিয়ে পাশাপাশি বসে আছে ম্যাডাম। দৃশ্যটা বিচিত্র। একজনের দেহের যৌবনের বন্যাকে আঁটসাঁট পোশাকে বাগে রাখার চেষ্টা; আরেকজনের চেষ্টা চর্বির বোঝাকে বেঁধেসেঁধে রাখার।

ম্যাডাম চেয়ে আছে অনিমার দিকে। কৌতুকভরা ছোট চোখ। অনিমার কিন্তু কেন জানি না অস্বস্তি লাগছে চোখে-চোখে চাইতে। চোখ নামিয়ে নিতেই অদ্ভুত ঘড়ঘড়ে গলায় হাসল ম্যাডাম—নাম কী তোমার?

বলব না।

আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছ না কেন?

ঘেন্না হচ্ছে বলে।

তাকাও—আচম্বিতে কর্কশ হয়ে ওঠে ম্যাডামের স্বর। আরও শক্ত হয়ে যায় অনিমা।

তাকাও—অদ্ভুত একটা অনুভূতি জাগে অনিমার মস্তিষ্কের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। নিজেকে এলিয়ে দিতে ইচ্ছে যাচ্ছে, আলগা হয়ে যেতে ইচ্ছে যাচ্ছে।

তাকাও। অদৃশ্য একটা শক্তি ওর চাহনিকে টানছে, টানছে, টানছে, ম্যাডামের দিকে!

চোখ তোলে অনিমা।

ম্যাডাম চেয়ে আছে। ছোট চোখ দুটো এখন অগ্নিগর্ভ। যেন দু-দুটো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। ভলকে-ভলকে অদৃশ্য শক্তিধারা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ শক্তি চোখে দেখা যায় না। শক্তির উৎস কিন্তু এই দুটো চোখ। চোখ না চুম্বক? দৃষ্টি সরাতে পারছে না কেন অনিমা? শুধু ওই চোখ ছাড়া আশেপাশে যেন আর কিছুই নেই। অনিমা নিজেও যেন আর নেই। ওই চোখ। ওই চোখ তাকে গিলে নিয়েছে!

ভালো লাগছে?—অনেক দূর থেকে যেন ভেসে-ভেসে আসে ম্যাডামের মধুর স্বর। ঠিক যেন মা কথা বলছে। অনেক, অনেক বছর আগে হারিয়ে যাওয়া মা।

হ্যাঁ।

প্রাণ খুলে কথা বলো। এককেবারে গোড়া থেকে বলো। যখন স্কুলে পড়তে, যখন ছোট্ট ছিলে, তখন থেকে।

বলব, সব বলব, মানসিক চাপ, ভীষণ, অসহ্য, মন খুলে কথা বলার কেউ ছিল না।

আমাকে বলো।

বলছি।

॥ গজাননের পরীক্ষা ॥

গজানন গ্যাঁট হয়ে বসেছিল চেয়ারে। গেমস-এর আড্ডা এখন খালি। মেশিনগুলো নিস্তব্ধ। ছ'জন ভদ্রবেশি গুন্ডা তাকে ঘিরে বসে সিগারেট টানছে। আর সকৌতুকে দেখছে গজাননের নস্যি নেওয়া। নৈঃশব্দ্য খান-খান হয়ে যাচ্ছে এক-একটা টিপ নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে।

কালো চশমাধারী ঢুকল ঘরে। মুখভাব অনেক নরম—চলো হে টিকটিকি।

টিকটিকি! আশেপাশে তাকায় গজানন; কোথায় টিকটিকি?

এতক্ষণ যারা নস্যি নেওয়ার ধরন দেখে অতিকষ্টে হাসি চেপে রেখেছিল, এবার তারা হেসে উঠল ঘর কাঁপিয়ে।

মুখ শক্ত হয়ে যায় কালো চশমাধারীর, মস্করা হচ্ছে? এসো।

কোথায়?

আমার বস্-এর কাছে।

ও! চলো! যেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাল ছেড়ে দিয়ে কাঁধ নাচায় গজানন। মনটাও নেচে ওঠে সঙ্গে-সঙ্গে। তখন যদি জানত অদৃষ্টে ওর কী আছে, কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটিয়ে পিঠটান দিত ওইখান থেকেই।

জঙ্গলের মধ্যে নিরালা বাড়িটার সদর দরজা খুলেই দাঁড়িয়েছিল রূপকুমার। যেন যাত্রার হিরো। পেছনে থেকে আচমকা গজাননের কাঁধে রাম রদ্দা মারল সমসের। হুড়মুড় করে ভেতরে ঠিকরে গেল ট্রিপল-জি।

সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্য সামলে নিল নিজেকে। কণ্ঠে জাগল চিল-চিৎকার, বলি, ব্যাপারটা কী? এইটুকু রাস্তা গাড়ি করে জামাই-আদরে এনে—

কথা আটকে গেল বিদ্রূপতরল একটি কণ্ঠস্বরে। বিদ্রূপের সঙ্গে মেশানো রয়েছে বেশ খানিকটা পৈশাচিকতার গরল।

গজানন নাকি? এসো, এসো, আমি বলেছিলাম বলেই তো অত খাতির করে এনেছে তোমাকে?

লাট্টুর মতো ঘুরে যায় গজানন। থিরথির করে কাঁপে গালের কাটা দাগটা।

দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে মেদবিপুলা এক প্রৌঢ়া। দু-কানের লতিতে দুটো সোনার রিঙ। ঠোঁটে থ্যাবড়া করে লাগানো লাল রং। মাথার চুল উঁচু করে খোঁপা বাঁধা। ডাইনি নাকি? মনে-মনে বলে গজানন।

মুখে বলে বিষম বিস্মিত স্বরে—আপনি?

নিরীহ একটি মেয়েছেলে, বাবা। সাতে নেই, পাঁচে নেই।

কিন্তু এই গুন্ডাগুলোর ব্রেন আপনিই?

রক্ত মাখানো ঝুলে পড়া ঠোঁট দুটো অদ্ভুত ভঙ্গিমায় বেঁকে যায় হাসতে গিয়ে। হ্যাঁ, আমি। শুনলাম, তুমি নাকি কি সব দুষ্টুমি করেছ। এসো, এসো, কাছে এসো।

দুষ্টুমি? পকেটে পয়সা নেই বলে রাম সিং-এর কাছে চিঠি পাঠানো—

তুলতুলে নরম হাতে গজাননের দু-হাত চেপে ধরে ম্যাডাম। ছোট চোখে আর ভিজে ঠোঁটে দুর্জ্ঞেয় সেই হাসি—রাজপুত্তুরের মতো চেহারা! আহা! মেয়েরা নিশ্চয় জ্বালাতন করে?

নরম ছোঁয়াটার মধ্যে কী যেন ছিল। গা শিরশির করে ওঠে গজাননের। কণ্ঠস্বর স্খলিত হয়, জুয়ো, আনাড়ি তো, তাই—

কথা বলতে গেলেই চোখের দিকে তাকাতে হয়। গজাননও তাকিয়েছিল। সঙ্গে-সঙ্গে শরীরের প্রতিটি অণুপরমাণু দিয়ে অনুভব করল অদৃশ্য শক্তির একটা ঝাপটা যেন ওকে টলিয়ে দিয়ে গেল। ভয়াবহ শক্তি। চোখে দেখা যায় না, কিন্তু যেন দুরমুশের ঘা লাগল সমস্ত সত্তায়।

মিহি গলায় বিমূঢ় গজাননের চোখে চোখ রেখে বললে ম্যাডাম—সত্যি? বুড়িকে মিথ্যে বলতে নেই, বাবা।

নিস্তেজ গলায় বলে গজানন—সত্যি।

ছোট চোখ দুটোকে আরও কাছে নিয়ে আসে ম্যাডাম। তারকা-রন্ধ্রে ও কীসের শিখা। আচমকা বিস্ফারিত হয়ে ওঠে দুই চক্ষু। গজাননের দৃষ্টিপথে এখন কেবল ওই চোখ, ভয়াল, ভয়ংকর, পৈশাচিক, মোহময়!

গজানন, ও গজানন, মন খুলে বলো; স-ব কথা বলো।

ব-বলেছি তো; জুয়ো খেলতে এসেছিলাম, পকেটে...পকেটে...

আচমকা শিথিল হয়ে গেল ম্যাডামের চাহনির বজ্র আঁটুনি। গজাননের হাত ছেড়ে দিয়ে বললে কর্কশ গলায়—মিথ্যে কথা! জুয়ো খেলাটা তো একটা দুর্বলতা। অনেক বেশি শক্তিমান তুমি।

মা-মানে?

তোমার চোখের মধ্যেই রয়েছে অনেক কথা। অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ তুমি, গজানন। গজানন, গজানন, তোমার চোখেই দেখেছি যে আমার প্রতিবিম্ব।

অত কথার দরকার কী? রাম সিং-র কাছে চিঠিটা পাঠান, টাকা এসে যাবে। আমাকে রেহাই দিন।

সোফায় বসল ম্যাডাম। দু-হাত একত্র করে থলথলে মুখখানা ফিরিয়ে রইল গজাননের দিকে, ইন্টারেস্টিং। অনেক কিছুই জানো দেখছি।

হ্যাঁ, জানি, হঠাৎ খেপে যায় গজানন, কী জানি বলুন তো? মুরোদখানা দেখা যাক।

মুরোদ দেখতে চাও? হাসছে ম্যাডাম। সেই রকম শিথিল ঠোঁট বেঁকিয়ে বিকৃত হাসি, গা ঘিনঘিন করে গজাননের—বৎস গজানন, যদি বলি তুমি একটা জঘন্য নোংরা স্পাই? এসেছ আমার কাজে নাক গলাতে?

বললেই হল?

কিম্ভূতকিমাকার ম্যাডাম শুধু ইশারা করল হাত নেড়ে। সমসের খুলে দিলে একটা দরজা। পায়ে-পায়ে ঘরে ঢুকল অনিমা।

আচ্ছন্ন অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে গজানন প্রাণপণে। দু-হাত দু-পাশে ঝুলিয়ে অমন পুতুলের মতো হাঁটছে কেন অনিমা? টগবগে ঘোটকীর মতো যে তেজস্বিনী, তার আপাদমস্তকে এ ধরনের আড়ষ্টতা কেন?

বিদ্রূপের ছুরি ঝলসে ওঠে ম্যাডামের তীক্ষ্ণ স্বরে,—চেনা-চেনা মনে হচ্ছে তাই না? একই দলের দুই স্পাই, তাই না?

তুখোড় গজানন তখন নির্নিমেষে চেয়ে আছে অনিমার দারুপুত্তলিকার মতো

দেহবল্লরীর পানে। তাই চাবুকের মতো জবাবটা জিভে এসেও জড়িয়ে গেল,—জীবনে দেখিনি।

মেপে-মেপে পা ফেলে আরও একটু এগিয়ে এল অনিমা। মিশরের মামী নাকি? গজানন চোখ কুঁচকে চেয়ে আছে। কোথায় যেন বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার ঘটে গেছে! অনিমা অমন শূন্য চাহনি মেলে রয়েছে কেন তার দিকে? চোখের মণি দুটো দু-টুকরো আয়নার মতো চকচক করছে না তো, ঠিক যেন ঘষা কাচ!

গজাননের বুকে বুক ঠেকিয়ে বললে অনিমা, যে স্বরে বললে তাতে উত্থান নেই, পতন নেই, প্রাণ নেই, উত্তাপ নেই; ঠিক যেন একটা যন্ত্র কথা বলে গেল যান্ত্রিক স্বরে—চিনি, একে আমি চিনি, ত্রিশূলের এজেন্ট। এর সঙ্গেই দেখা করতে বলা হয়েছিল আমাকে।

গজানন কি অজ্ঞান হয়ে যাবে?

সোফায় বসে মিটিমিটি হাসছে ম্যাডাম।

না, অজ্ঞান হয়ে যায়নি গজানন। সে পাত্রই সে নয়। ব্রেনটা কিন্তু নিমেষে তরতাজা হয়ে উঠেছিল। বুঝে ফেলেছিল কীসের প্রভাবে অনিমা আর নেচে বেড়াচ্ছে না, হেঁকে-হেঁকে কথা বলছে না, তেড়েমেড়ে ল্যাং মারছে না!

হিপনোটিজম্! ম্যাডাম ডাইনি তার ওপরেও সম্মোহনের ম্যাজিক দেখাতে গেছিল। ল্যাজেগোবরে হয়েছে। অনিমা বেচারা হাজার হোক মেয়ে তো, ডাইনির খপ্পরে পড়েছে।

নিবিড় চোখে অনিমা চেয়ে রয়েছে ওর দিকে, ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে। চাহনির মধ্যে নেই সেই প্রাণময়তা।

সোফায় বসে মাথা তুলে বললে ম্যাডাম,—কী গো গজানন, এবার কথা শোনো, খুলে বলো কী মতলবে আসা হয়েছে? মিছে বলে লাভ নেই দেখতেই তো পাচ্ছ।

চোয়ালের হাড় কঠিন হয়ে ওঠে গজাননের,—যা বলবার তা বলা হয়ে গেছে। অত সহজে আমাকে ঘায়েল করা যাবে না।

ঘড়ঘড় শব্দে হেসে ওঠে ম্যাডাম। হাসির আওয়াজ যে এমন বিকট বিদিগিচ্ছিরি হয়, জানা ছিল না গজাননের।

ম্যাডামের চোখ আবার ছোট হয়ে এসেছে। ভিজে লাল ঠোঁটের ফাঁকে সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে—সবাই তাই বলে, গজানন। তারপর ন্যাতা হয়ে পড়ে থাকে আমার কাছে। বিরাট পাঁজর খালি করা দীর্ঘশ্বাসে যেন ভেঙে খানখান হয়ে যায় ম্যাডাম,—বেচারারা!

অবাক হয় গজানন। একই গলায় কতরকমই আওয়াজ শোনা গেল এইটুকু সময়ের মধ্যে। একটু আগেই কদর্য হাসি আর কর্কশ হুমকি। আবার এখন তা মখমল কোমল, কবোষ্ণ, স্নেহময়।

রূপকুমার আর সমসের মিটিমিটি হাসছে গজাননের দিকে চেয়ে। অনিমার চোখের পাতা পড়ছে না। চর্বির পাহাড় দুলিয়ে অনামিকা নাড়িয়ে বলছে ম্যাডাম—গজানন, কী চাও। মেয়েমানুষ না মদ? ক্ষমতা না টাকা? খারাপ চাও তো, তাও পাবে। সব ব্যাপারেই সাহায্য পাবে আমার। মনের গোপনে লুকিয়ে থাকা স্বপ্নগুলোকে যদি ভোগ করতে চাও—

কিছু চাই না। যা বলবার বলেছি, বলেই ঘুরে দাঁড়ায় গজানন। পা বাড়ায় সদরের দিকে। কিন্তু রূপকুমার আর সমসের তো সেখানে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খোলা দরজা দিয়ে আরও এক মস্তান চেহারার মাসলম্যান এসে লোলুপ চোখে তাকিয়ে রয়েছে

গজাননের দিকে। যেন কতদিন পেটাই-কর্ম হয়নি। হাত নিশপিশ করছে। সারা মুখে বসন্তর ক্ষত, চোখ দুটো কটা আর বাঘের চোখের মতো পাশবিক।

পেছন থেকে ভেসে আসে ম্যাডামের মোলায়েম হাসি-উচ্ছল স্বর।

গজানন, জানি না কেন তোমাকে দেখেই আমার ভালো লেগে গেছে। নিশ্চয় একটা-না-একটা দুর্বলতা তোমার ভেতরেও আছে। যদি না-ও থাকে, বানিয়ে দেব আমি। রূপকুমার, বেরোতে দিও না!

রাইট, ম্যাডাম, এগিয়ে আসে তিন চক্রী এক সাথে।

গজানন এখন কী করবে?

॥ ছুঁচের মহিমা ॥

ছোট্ট ঘরটায় শুইয়ে ফেলা হয়েছে গজাননকে। পাশবিক হাসি হাসতে-হাসতে বসন্ত ক্ষত আকীর্ণ লোকটা চেপে রয়েছে ওর দুটো হাত। রূপকুমার ধরেছে দুটো পা। মাথাটা ঠুসে ধরেছে সমসের। গজানন নিরুপায়। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে একটা অ্যাম্পুল থেকে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জে ওষুধ টেনে নিচ্ছে ম্যাডাম।

গর্জে ওঠে গজানন—এই মুরোদ! হিপনোটিজমের ক্ষমতা নেই, আরক দিয়ে ঘুম পাড়াতে চান?

জলহস্তীকে কখনও হাসতে দেখা যায় শব্দ না করে? না। পশুরা হাসতে পারে না। কিন্তু মানুষ পারে। ম্যাডামের মুখে এখন যে হাসিটা দেখা গেল, তা জলহস্তীরা দেখলে তাজ্জব হয়ে যেত।

বৎস গজানন, তোমার মতো কুঁচো চিংড়িকে আমার পুরো মুরোদটা দেখাতে চাই না, তাই এই ইঞ্জেকশন। ঠান্ডা মেরে আনবে, বড় ক্ষতি হবে না।

বড় ক্ষতি মানে?

অব্যাহত রইল জলহস্তী হাসি—মানে, তোমার ইচ্ছেটাকে জোর করে যদি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই—তা হলে, তা হলে পাগল হয়ে যাবে, গজানন। আমি চাই তোমাকে আমার গোলাম, আমার প্রেমিক, আমার পুত্র বানিয়ে রাখতে। নানাভাবে তোমার ওই মজবুত শরীরটাকে চাই কাজে লাগাতে।

শয়তানী! তুই-ই তাহলে জোয়ারদারকে পাগল করেছিস?

বেশি জেনে ফেলেছ, গজানন।

তুই পারিস আমাকে জাতিস্মর করে তুলতে?

চমকে উঠল ম্যাডাম। চমকে উঠেছে সমসেরও। হাত শিথিল হয়ে গেছে। গজানন ঘাড় বেঁকাতে পারছে। গনগনে চোখে ম্যাডাম চেয়ে আছে তার দিকে।

গজানন, জাতিস্মর হতে চাস?

হ্যাঁ, চাই।

কিন্তু কীভাবে জানলি আমার সে ক্ষমতা আছে?

আছে না কচু। আমেরিকায় গিয়ে পঞ্চাশ হাজার ডলার খরচ করলেই ব্রেনের ন'হাজার কোটি নিষ্ক্রিয় নিউরোণকে সক্রিয় করতে গিয়ে হয়তো মনের শক্তি একটু বেড়ে গেছে। পূর্বজন্মের স্মৃতি ফিরিয়ে আনা অত সোজা নয়। পারে শুধু মুনি-ঋষিরা।

গজানন!

চোপরাও মাগী! গজানন এবার ফ্রি ল্যাংগুয়েজ ছাড়তে থাকে—আমেরিকার কোটিপতিদের টাকা খেয়ে ইন্ডিয়ার লাখোপতি কোটিপতিদের খতম করে চলেছিস একে-একে। তোর মুখে থু-থু দিতে ইচ্ছে যাচ্ছে।

তাই নাকি? তাই নাকি? টকটকে লাল হয়ে ওঠে ম্যাডামের মুখমণ্ডল—সমসের! রূপকুমার! পঞ্চানন! কিল হিম! কিল হিম! খুব বেশি জেনে গেছে! অ্যাট ওয়ান্স!

॥ ত্রিশূল ॥

অন্য ঘরে খাবার টেবিলে বসেছিল অনিমা। ছুরি কাঁটাচামচের দিকে চেয়ে রয়েছে নির্নিমেষে। পুতুলের মতো হাত বাড়িয়ে তুলে নিল। এক হাতে ছুরি, আর এক হাতে কাঁটা চামচ। এবার কেক কাটবে। খাবে।

কিন্তু চোখ আটকে গেল কাঁটা চামচে। চেয়েই রইল। চোখ আর সরে না। চোখের পাতাও পড়ে না।

ঈষৎ সঙ্কুচিত হল চক্ষুতারকা। সম্মোহিত হওয়ার পর এই প্রথম চোখ কুঁচকোচ্ছে সে। কারণ কাঁটাচামচের তিনটে মাত্র কাঁটার গড়নটা তার যেন চেনা-চেনা লাগছে।

কোথায় যেন দেখেছে...

মন ছেয়ে ফেলছে ওই তিনটে কাঁটা, মিলেমিশে যাচ্ছে আরও তিনটে সূচীতীক্ষ্ণ শলাকার সঙ্গে।

ত্রিশূল!

যেন বজ্রালোকে ঝলকিত হল অনিমার মস্তিষ্কের অভ্যন্তর। অব্যাখ্যাত এক দীপ্তি নিমেষ-মধ্যে ঘুচিয়ে দিল সম্মোহনের নিরন্ধ্র তমসা।

ত্রিশূল!

কাঁটাচামচটা দেখতে ত্রিশূলের মতো।

সে ত্রিশূলের এজেন্ট।

এখন কোথায়? শত্রুপুরীতে। ত্রিশূলের আর একজন এজেন্ট গজানন কোথায়? শত্রুদের হাতে!

কাঁটাচামচ টেবিলে রেখে উল্কাবেগে দরজা দিয়ে করিডরে বেরিয়ে গেল অনিমা। সামনেই সেই ছোট ঘর। ঘরের মধ্যে বিদিগিচ্ছিরি গলায় চেঁচাচ্ছে ম্যাডাম—কিল হিম! কিল হিম! খুব বেশি জেনে গেছে। অ্যাট ওয়ান্স!

অনিমা যেন সাইক্লোন হয়ে গেল মুহূর্তে। দমকা বাতাসের মতো ঢুকল ঘরে। রূপকুমার রিভলভার বার করেছে, তুলছে গজাননের খুলি লক্ষ্য করে।

শূন্যপথে ধেয়ে গেল অনিমার পেটাই শরীর। দু-পায়ের মধ্যে রিভলভারটা মুঠো থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অবতীর্ণ হল খাটের ওপাশে, পরমুহূর্তেই পায়ের ফাঁক থেকে রিভলভার তুলে নিয়ে বিনা দ্বিধায় পরপর গুলি করে গেল সমসের, পঞ্চানন আর রূপকুমারকে। হতভম্ব তিনজনেরই খুলি গেল উড়ে, নিষ্প্রাণ দেহগুলো লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

লুটিয়ে পড়ার আগেই অবশ্য তড়িৎ গতিতে শয্যা থেকে উঠে পড়েছে গজানন। একটি মাত্র হনুমান লম্ফ দিয়ে গিয়ে পড়েছে ম্যাডামের ওপর। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শূন্যপথে উড়ন্ত মানবী, গুলিবর্ষণ এবং হনুমান লম্ফ দেখে জলহস্তিনী ম্যাডাম ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছিল। হাত থেকে সিরিঞ্জটা কেড়ে নিয়ে প্যাঁট করে বাহুমূলে বিঁধিয়ে দিল গজানন।

বললে আকর্ণ হেসে—ঘুম, ঘুম, টানা ঘুম এবার। ম্যাডাম, চোখ মেললেই দেখতে পাবে খাঁচাঘর। গুড নাইট!

ঘুমিয়ে পড়ল ম্যাডাম।

তারপর?

গোপন সে কাহিনি এখানে লেখা যাবে না।

** 'ঘরোয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত। (শারদীয় সংখ্যা।)*

জিরো জিরো গজানন রেগেছে

॥ ১ ॥

বেপারীটোলা লেনের এয়ারকন্ডিশনড চেম্বারে বসে 'দৈনিক হযবরল' কাগজের একটা খবর পড়েই সোজা হয়ে বসল গজানন।

পুঁতিবালা।

নিস্তব্ধ ঘরে আচমকা বাজখাঁই ডাক শুনেই চমকে উঠল বেচারা পুঁতিবালা। হাতে কোনও কাজকর্ম নেই। কাত হয়ে বসে তাই আদিরসাত্মক ছবির বই দেখছিল, এমন সময়ে ব্রেনের ওপর এক ধাক্কা।

হাত থেকে বইটা ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

সটান হয়ে বসে থাকা গজাননের চোখ গিয়ে পড়ল মলাটে।

চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। সেকেন্ড কয়েক চেয়ে থেকেই যেন সভয়ে চোখ বন্ধ করল গ্রেট স্পাই।

বলল বজ্রগর্জনে, বইটা মুড়ে রাখ।

চোখ মুদেই বললে কিছুক্ষণ পরে—রেখেছিস?

ভেসে এল পুঁতিবালার করুণ স্বর—হ্যাঁ।

চোখ খুলল গজানন। চোখে রক্তের ছিটে। প্রমাদ গুণল পুঁতিবালা। পুঁতি, আবার ওইসব ছাইপাঁশ দেখছিস?

সময় কাটছিল না।—

ড্যাম ইওর সময়। গোল্লায় যাচ্ছে দেশটা...গোল্লায়! একদল ছেলেমেয়ে হেরোইন খেয়ে মরছে—আর একদল পর্নোগ্রাফি নিয়ে মাতছে। ছ্যাঃ...ছ্যাঃ...ছ্যাঃ!

শরমে মরে গেল পুঁতিবালা। যৌবনের পাখা যখন ফুরুক-ফুরুক করে সবে বেরোতে আরম্ভ করেছে, তখন অভাবের জ্বালায় সেই যে স্বভাবটা নষ্ট করে ফেলেছিল, এখনও তার ছিটেফোঁটা রয়ে গেছে ভেতরে-ভেতরে। চড়া দুনিয়া আর কড়া গজানন'দাকে লুকিয়ে মাঝেমধ্যে একটু-আধটু এদিক-ওদিক করে ফ্যালে—কিন্তু এরকম হাতেনাতে ধরা পড়েনি কখনও।

পুঁতিবালার লজ্জারাঙা অবনত নয়ন মুখখানার দিকে চেয়ে মায়া হল গজাননের। অমনি জল হয়ে গেল চিড়বিড়ে রাগটা।

'হযবরল' কাগজটা পুঁতিবালার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে গলার স্বর নামিয়ে বললে গ্রেট গজানন—পাপিষ্ঠা। খবরের কাগজ না পড়লে স্পাইগিরি করা যায় না—কতবার আর বলব?

'পাপিষ্ঠা' গালাগালটা গজাননের নরম মুডের গালাগাল। বুকের ধড়ফড়ানিটা একটু কমল পুঁতিবালার। একে তো ওই বাবরি চুল—ঝাঁকাল বটগাছ বললেই চলে—তারপর কটমট চাউনিতে যদি রক্তের ছিটে দেখা যায়—হৃৎপিণ্ডটা মনে হয় যেন সাঁৎ করে তলপেটেই গেল নেমে। মা দুর্গার অসুরকে দেখেও এত ভয় হয় না।

চোখ তুলে মিঠে সুন্দরী পুঁতিবালা প্রথমে দেখল ছুঁড়ে ফেলে-দেওয়া কাগজটার দিকে। তারপর আড়চোখে দেখে নিল গজাননের চোখ দুটো।

না। রক্তের ছিটে নেই, চোখও আর পাকানো অবস্থায় নেই।

ধাতস্থ হয়ে কাগজটা তুলে নিল পুঁতিবালা।

কাষ্ঠ হেসে বললে, কোন পৃষ্ঠায়? কত নম্বর কলমে?

এঃ! বিদ্যে জাহির করা হচ্ছে আবার! দে, দে, দেখিয়ে দিচ্ছি। কাগজ হাতে উঠে গেল পুঁতিবালা লীলায়িত ভঙ্গিমায়—দেখেই আবার খেঁকিয়ে ওঠে গজানন—এটা কি নাট্যশালা? অ্যাঁ? বৈজয়ন্তীমালার নাচ হচ্ছে নাকি?

ফিক করে এবার হাসল পুঁতিবালা। লিপস্টিক রাঙানো পাতলা ঠোঁট জোড়ার তলায় যেন লাইনবন্দি কমল হিরে ঝিলমিলিয়ে উঠল।

বলল, মাগো! কী ব্যাকওয়ার্ড! বৈজয়ন্তীমালা এখন আর নাচে না—রিটায়ার করেছে। এম-পি হয়েছে জানো না?

হয়েছে নাকি? ঢোক গেলে গ্রেট গজানন। স্পাই বিজনেসে এসে ইস্তক সিনেমা-টিনেমাগুলোও রেগুলার দেখা হচ্ছে না। দেখলেই তো সময় নষ্ট। দেওয়ালের পোস্টারটা এক ঝলক দেখেও নিল। বড়-বড় হরফে সেখানে লেখা আছে—টাইম ইজ মানি। সময়ই হল গিয়ে টাকা।

কই? কোন খবরটা গজাননদা?

চমকে ওঠে গজানন—এই তো এইটা!

খবরটা পড়ল পুঁতিবালা। সঙ্গে-সঙ্গে কালো-কালো চোখ দুটো কীরকম যেন হয়ে গেল।

বললে অস্ফুট গলায়, শম্ভু নায়েক মানে সেদিন যে এসেছিল?

হ্যাঁ। সেই শম্ভু নায়েক। হেরোইন নেশার টাকা জুগোতে-জুগোতে যে ফতুর হয়েছিল—

আত্মহত্যা করার আগে হিরোইন স্মাগলার যেন ধরা পড়ে তোমাকে কাকুতিমিনতি করে বলে গেছিল।

সেই শম্ভু নায়েকই ফট করে আত্মহত্যা করে বসল।

অথচ হিরোইন স্মাগলার ধরা পড়ল না।

পুঁতিবালার ফুটুনি স্তব্ধ হতে না হতেই বাজল লাল টেলিফোন। অর্থাৎ 'কল' এসেছে 'ত্রিশূল' দপ্তর থেকে।

॥ ২ ॥

গজাননের কীর্তিকলাপ যাঁরা এর আগে পড়েছেন, তাঁরা জানেন 'ত্রিশূল' কী জিনিস। শিবের হাতে যে অস্ত্রটি দেখা যায়, এ সে বস্তু নয়, যদিও মহিমায় শিবের হাতিয়ারের সমান যায়।

আজ্ঞে হ্যাঁ, এই সেই গুপ্ত সংস্থা—ভারতের স্বার্থরক্ষায় যার জন্ম, ভারতের মানুষ, ভারতের মাটি, ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে যার দাপটে বহু বিদেশি গুপ্তচর সংস্থারও ঘিলু নড়ে উঠেছে বিলক্ষণ।

'ত্রিশূল' সেন্ট পারসেন্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। কোটি-কোটি মুদ্রার খেলা চলছে 'ত্রিশূল'-এর রক্তচক্ষু অতন্দ্র রাখার জন্যে।

রামভেটকি মুরকিওয়ালা এই ভয়ঙ্কর প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় মাথা। পাঠকপাঠিকারা অনেকেই জানেন, রামভেটকিকে দেখলে মানুষের শাখামৃগ পূর্বপুরুষদের কথা মনে পড়ে, কম্যান্ডো থাকার সময়ে বেমক্কাগুলি খেয়ে সে হাঁপানি রোগে ভোগে এবং এন্তার তাড়ি খায় (হাঁপানির ওষুধ বলে)! প্রতাপে আর ব্যক্তিত্বে, নিষ্ঠুরতায় আর বিচক্ষণতায় সে কিন্তু অদ্বিতীয়।

এহেন রামভেটকির কর্কশস্বর ধ্বনিত হল গজাননের কর্ণরন্ধ্রে লাল টেলিফোনের রিসিভার কানে লাগাতেই।

জিরো জিরো গজানন?

আই, আই, স্যার, মার্কিন সিনেমা দেখে এই বুকনি সম্প্রতি রপ্ত করেছে গজানন।

হেরোইন মানে নায়িকা নয়...জানা আছে তো?

আই অ্যাম নট সো ফুল, স্যার।

জানি, জানি, গজানন। হেরোইন যে দেশটাকে জাহান্নমে নিয়ে যাচ্ছে, তাও নিশ্চয় জানো।

সেই কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ। শম্ভু নায়েক সুইসাইড করেছে।

ওটা সুইসাইড নয়—হোমিসাইড।

মা...মানে?

মার্ডার। হেরোইন স্মাগলারের ঠিকানা বের করার চেষ্টা করেছিল শম্ভু নায়েক, তাই তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।

কপালের শিরা ফুলে ওঠে গজাননের—নাম কী ব্যাটাচ্ছেলের?

তার আসল নাম কেউ জানে না। হেরোইন কিঙ নামেই তার নাম ডাক নেশারু মহলে।

হেরোইন কিঙ!

ইয়েস, মাই ডিয়ার গজানন—

জিরো জিরো গজানন।

অফকোর্স, অফকোর্স—জিরো জিরো গজানন। আমার এক এজেন্ট তার হাতে গতকাল খুন হয়েছে।

আপনার এজেন্ট?

ডাবল এজেন্ট বলতে পারো। হেরোইন কিঙের এজেন্টকে আমারও এজেন্ট বানিয়েছিলাম। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা বলতে পারো। কিন্তু ধুরন্ধর 'কিঙ' তাকে গতকাল শেষ করে দিয়েছে।

কোথায়? কীভাবে?

বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু মাল আসছিল। এই এজেন্টকে ভার দেওয়া হয়েছিল। আর আমি তাকে ভার দিয়েছিলাম, ওই সূত্র ধরে কিঙকে কাত করতে। কিন্তু...

কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছিল অন্যরকম। রামভেটকি সুরকিওয়ালা নিজেও তা জানে না।

বিজু সেন ন'মাসে ছ'মাসে একবার ফিল্ডে নামে, মানে মাল পাচার করে। মোটা মুনাফা লুটে হাওয়া হয়ে যায় মাস কয়েকের জন্যে। শিলং থেকে গোয়ার নানান খানদানি হোটেলে তাকে দেখা যায় বিভিন্ন 'বিউটি'র সঙ্গে, দামি সুরা আর দামি গাড়ি নিয়ে মেতে থাকে মাসের পর মাস।

সে একা। একেবারে একা। প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার আসরে সঙ্গী নেওয়া বিপজ্জনক। তাই সে একা।

মাথায় সে খুব লম্বা নয়, খুব বেঁটেও নয়। কিন্তু পেটাই চেহারা। নাক-মুখ-চিবুকের গড়ন দেখে মনে হয় বুঝি মার্কিন মুলুকে তার জন্ম। বিশেষ করে তার টকটকে গায়ের রং আর কোব্যাল্ট ব্লু চোখ দেখে ভুল করে অনেকেই।

বিদেশিনী মা আর ভারতীয় বাবার মিশ্র শোণিত ধমনীতে ধারণ করেই সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তাই তার চেহারায় সাগরপারের ছাপ এত বেশি।

চরিত্র? অতীব নিষ্ঠুর। টাকা ছাড়া সে আর কিছু বোঝে না। এই দুনিয়ায় টাকা থাকলেই সব থাকে—নইলে সব ফক্কা। নিকষ এই তত্ত্ব এবং জীবনদর্শন বিজু সেনকে অমানুষ করে তুলেছে কৈশোর থেকেই।

ইছামতী নদীর ধারে এই বিজু সেনকেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছিল গত রাতে—এ কাহিনি যখন শুরু হচ্ছে, ঠিক তার আগের রাতে।

নদীর ওপারে বসিরহাটের আলো দেখা যাচ্ছে। টর্চের নিশানা করতে হবে এপার থেকে। নৌকো চলে আসবে তক্ষুনি। তিরিশ কিলো সাদা গুঁড়ো নিয়ে সেই নৌকোয় চেপে বসবে বিজু সেন।

তিরিশ কিলো! ছেষট্টি পাউন্ড। খাঁটি সাদা গুঁড়ো। হেরোইন। পলিথিন প্যাকেটে মোড়া রিফাইনড হেরোইন। প্রায় ষোলো কোটি টাকার মাল। খুচরো বাজারে গেলে দশগুণ দাম।

জীবনে এত টাকার মাল পাচারে নামেনি বিজু সেন। চার মাস ঘাপটি মেরে থেকেছে সে এইরকম মোটা একটা দাঁও পেটার জন্যে। ছেষট্টি পাউন্ড হেরোইন পাচারই অবশ্য তার মূল লক্ষ্য নয়।

বিজু সেন খুন করতে চায় হেরোইন কিঙ-কে। স্মাগলার নৃপতিকে স্বহস্তে নিধন করে সে নিজেই রাজ সিংহাসন দখল করতে চায়। চার মাস ধরে সেই প্রস্তুতিই চালিয়ে এসেছে সে।

আকাঙ্ক্ষা তার আকাশচুম্বী—স্বপ্ন ছুঁয়ে যায় স্বর্গকে। হেরোইন কিঙ-এর অনেক মাল সে পাচার করেছে, লুটেছে অনেক টাকা, জেনেছে অনেক গলিঘুঁজির খবর—হেরোইন আমদানির কারবারে যা নিতান্তই দরকার।

এবার তাই সরে যেতে হবে স্বয়ং রাজামশায়কে। রাতের অন্ধকারে নীলকান্তমণির

মতো জ্বলছে বিজু সেনের কোব্যাল্ট ব্লু নয়নযুগল। বুকে ঝুলছে হাইপাওয়ারড্ বাইনোকুলার। ইনফ্রারেড লেন্স লাগানো দূরবীন। যাতে রাতের অন্ধকারেও হাজার গজ দূর থেকে সামান্যতম নড়াচড়াও চোখ না এড়ায়।

ঢিলে শার্টের তলায় বগলের ফাঁকে চামড়ার ফিতেতে ঝুলছে পয়েন্ট থ্রি এইট ক্যালিবারের রিভলভার। হয়তো দরকার হবে না। বিপদ এলে অস্ত্র চালানোরও সুযোগ মিলবে না। রাইফেল আনেনি সেই কারণেই...

হিপ পকেটের টর্চটাই কাজে লাগাবে নৃপতি-নিধনের পর। ইস্পাতকঠিন ঠোঁট বেঁকিয়ে মৃদু হাসে বিজু সেন।

ধুরন্ধর কিঙ কিন্তু একাজের ভার তাকে দেয়নি। মজাটা এইখানেই। ছেষট্টি পাউন্ড হেরোইন পাচার হবে বাংলাদেশের বর্ডারের ওপর দিয়ে—

এ খবরটা তাকে দিয়েছে একজন পুলিশ দারোগা।

বিজু সেনের অন্তরে তাই সামান্য সংশয় আছে বইকী। দারোগা যে খবর জানে—সে খবর নিশ্চয় আরও অনেকে জেনে বসে আছে। 'কিঙ' বরাবর কাজ করে নিখুঁতভাবে—এবারে বিজু সেনকেও সে জানায়নি। কিন্তু জেনেছে দারোগা।

রাত দশটা। সময় হয়েছে। কয়েকশ গজ চওড়া এই ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে এখুনি আসবে কিঙ। মাঠের ওপারে নারকেল গাছগুলোর তলা দিয়ে আবির্ভূত হবে তার মূর্তি।

ঝোপের মধ্যে গুঁড়ি মেরে বসল বিজু সেন।

মিনিট পনেরো পরেই দেখা গেল একটা ছায়ামূর্তিকে। পরনে লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি। হাতে একটা ব্যাগ। হনহন করে মাঠ পেরিয়ে আসছে।

দূরবীন কষতে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসতে হয়েছিল বিজু সেনকে। দুলে উঠেছিল ঝোপটা। তারার আলোর ঝিকিমিকিও নিশ্চয় দেখা গেছিল দূরবীনের লেন্সে।

জীবনমরণের খেলায় সামান্য ওই ভুলটুকুই যথেষ্ট।

মাঠের ওপারে কয়েকশ গজ দূরে ঝোপের মধ্যে লক্ষ্য স্থির হয়ে গেল শক্তিশালী ম্যাগনান আগ্নেয়াস্ত্রের—টেলিস্কোপিক নাইট-শাইট ফিট করা মারণাস্ত্রের বুলেটটা নিক্ষিপ্ত হল নির্ভুল লক্ষে।

বিজু সেনের টুঁটি উড়ে গেল। বিশাল গর্ত দিয়ে কলকল করে বেরিয়ে এল রক্ত।

মাঠের মাঝে লুঙ্গি পরা লোকটা চমকে উঠল আওয়াজ শুনে। দশটা টাকা তাকে দেওয়া হয়েছে ব্যাগটাকে মাঠ পার করে দেওয়ার জন্যে। নদীর ধারেই নাকি লোক দাঁড়িয়ে আছে। বর্ডার পেরোলেই...

কিন্তু গুলি ছুঁড়ল কে? কার দিকে?

ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে যাচ্ছে নিরীহ মানুষটা, মারণাস্ত্র থেকে ছুটে এল লক্ষ্যভেদীর আর একটা বুলেট। হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল মৃত্যুদূত।

ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে গেল হেরোইন কিঙ। বিজু সেন যে ডাবল এজেন্টের কাজ নিয়ে তাকেই নিকেশ করে হেরোইন-সম্রাট হওয়ার স্বপ্ন দেখছে—এখবর পেয়েই জাল পাততে হয়েছিল কিঙকে। টোপ ফেলেছিল অনেক কায়দা করে।

রামভেটকি সুরকিওয়ালা কল্পনাও করতে পারেনি পুরো প্ল্যানটা কিঙ-এর—দারোগাও তার হাতের পুতুল। অজান্তে কবর রচনা করে ফেলেছে বিজু সেনের।

॥ ৩ ॥

গজানন, কী বুঝলে? রামভেটকির প্রশ্নটা টেলিফোনের তারের মধ্যে দিয়ে এসে কিলবিলিয়ে ওঠে গ্রেট গজাননের ব্রেনের মধ্যে।

দাঁতে দাঁত পিষে বাজনা বাজানোর চেষ্টা করল গজানন। দেখে মুখ টিপে হেসে ফেলে পুঁতিবালা। কিড়মিড় আওয়াজের বদলে একটা বিচ্ছিরি আওয়াজ গিয়ে পৌঁছল রামভেটকির কানে।

গজানন, এটা কিসের শব্দ?

আমি রেগেছি।

রেগেছ? জিরো জিরো গজানন রেগেছে! তবে আর কী, কিঙ এবার কঙ হবে।

কিঙ কঙ হবে?...

মানে, কিঙ কঙের যে দশা হয়েছিল, তাই হবে। মানে, পটল তুলবে। তাই তো?

ইয়েস, বস্। গজানন তার মুন্ডু ছিঁড়বে। গেণ্ডুয়া খেলবে। কিন্তু তাকে পাব কোথায়?

সেটাই তোমার কাজ। খুঁজে নিতে হবে।

খুঁজব কোন চুলোয়?

ল্যাঙ্গুয়েজ!...ল্যাঙ্গুয়েজ!...মাই ডিয়ার গজানন, তুমি হলে ভীষণ ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড টঙ্কার—ত্রিশূলের বাণ নিয়ে ধ্বংসের মন্ত্র কপচাতে-কপচাতে যাচ্ছ অভুভ প্রলয়কে অঙ্কুরে বিনাশ করতে। তোমার মুখে 'চুলোয়' শব্দটা মোটেই খাপ খায় না।

বসো, আমার মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে আপনার ল্যাং...ল্যাং...

ল্যাঙ্গুয়েজ শুনে—এই তো? বৎস গজানন, বৎস বললাম বলে ফির ভি রেগে যেও না। তুমি যাচ্ছ সেই খাঁটি বাংলাভাষার দেশে—

আই মীন বাংলাদেশে?

ইয়েস, ইয়েস, মাই বয়, গ্রেট হারামজাদা কিঙ এখন রয়েছে বাংলাদেশে।

হেরোইন নিয়ে আসেনি ইন্ডিয়ায়?

বড্ড হুঁশিয়ার যে! ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েই পিছু হটে গেছে। বিবরে প্রবেশ করেছে।

স্যার, বিবর না কবর—কী বললেন?

ননসেন্স! বেলেঘাটায় থেকে তোমার কালচারটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে দেখছি।

এইবার আঁতে ঘা লাগে গজাননের। মাতৃভূমির নিন্দে শুনলে যে কোনও স্বদেশপ্রেমীরই গোঁসা হয়। আমাদের গ্রেট গজাননও বেলেঘাটার মাটিকে ভালোবাসে।

অতএব সে গর্জে উঠল তৎক্ষণাৎ—মিঃ রামভেটকি সুরকিওয়ালা!

ভড়কে গেল রামভেটকি—কী...কী হল?

আপনি জানেন, যার আছে অনেক টাকা, সেই থাকে বেলেঘাটা?

তা-আমি তো জানতাম, যার নেই পুঁজিপাটা, সেই থাকে বেলেঘাটা।

ওটা আগেকার কথা। এখন দিন চেঞ্জ হয়েছে। এটাও কি জানেন, যার আছে অনেক টাকা, তার থাকে ইজ্জৎ, কালচার?

তা...হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, গজানন।

তাহলে কথা ফিরিয়ে নিন। বলুন•বেলেঘাটায় থেকে গজাননের কালচার একেবারে ভালচার হয়ে গেছে।

ভা...ভা...ভালচার! কিন্তু ভালচার মানে তো—

শকুনি। আমিও তাই। স্পাইরা শকুনি ছাড়া আর কী? অনেক উঁচুতে উড়লেও নজর থাকবে ঠিক ভাগাড়ের দিকে—যেখানে দেখিবে মড়া, ঠোকরাইয়া দ্যাখো তাই।

গজানন, ইউ আর গ্রেট।

আই অ্যাম! আই অ্যাম! গোঁফ নেই, তবু গোঁফে তা দিয়ে নেয় গজানন। কালচারের সঙ্গে ভালচারের মিলটা ফটাং করে মাথায় এসে গেল। সত্যিই, কী রহস্যময় ব্রেন।

পুঁতিবালা পর্যন্ত অবাক হয়ে দেখছে গজাননকে। কী অপূর্ব কালচার! ভালচার না হলে আদর্শ স্পাই তো হওয়া যায় না। মাতাহারির কথা মনে পড়ে যায় পুঁতিবালার। মাতাহারিকে যদিও ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল। রাইফেলের নলচেগুলো কিন্তু লক্ষ্যস্থির করতে পারেনি। সমানে বুক দুলিয়ে গেছিল মাতাহারি—ট্যারা করে ছেড়েছিল রাইফেলধারীদের।

কী দুর্জয় সাহস। মৃত্যু সামনে—অথচ বুক দোলাচ্ছে মাতাহারি। আপন মনেই নিজের পীন পয়োধরা একবার দুলিয়ে নেয় পুঁতিবালা।

পরক্ষণেই মাতাহারির স্বপ্ন টুটে যায় গজাননের আচমকা চিৎকারে, কী বললেন? কিন্তু এখন—

টেলিফোনে ভেসে এল কড়া ধমক—গজানন, আর কোনও কথা নয়, শহরটার নাম টেলিফোনেও বলা ঠিক নয়। বড্ড ক্রশ কানেকশান হচ্ছে আজকাল। কোড ল্যাঙ্গুয়েজে যা বললাম। তা মনে রেখো। ঠিক দু-ঘণ্টা পরে একটা লাল রংয়ের পনটিয়াক গাড়ি যাবে বেপারীটোলা লেনে। তোমাকে সটান বর্ডার পার করে ঠিক সেই জায়গাটায় পৌঁছে দেবে। গাড়ি থাকবে তোমার হেপাজতে। বাংলাদেশের ড্রাইভার্স লাইসেন্স করা আছে—তোমার পাশপোর্ট হচ্ছে মহম্মদ হোসনের নামে। ইন্ডিয়ান টুরিস্ট। বুঝেছ?

জি হ্যাঁ।

পুঁতিবালাকে নেওয়া যাবে না।

যাবে না?

না। বড় ডেঞ্জারাস গেম, গজানন। কিঙ ওই শহরেই আছে খবর পেয়েছি। সাদা গুঁড়োও তার কাছে। তুমি তাকে খুঁজে বের করবে, মুন্ডু ছিঁড়বে—

গেণ্ডুয়া খেলব।

যা খুশি। যদি তার আগে তোমার মুন্ডু ছেঁড়া যায়?

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলোরে!

ননসেন্স!

লাইন ডেড হল। গজানন প্রোজ্জ্বল চোখে পুঁতিবালার দিকে চাইল। বলল, এই ছুঁড়ি, এবারকার অ্যাডভেঞ্চারে তোর ঠাঁই নেই।

পুঁতিবালা কিচ্ছু বলল না। একটা কথাও না।

কিন্তু পুঁতিবালা যে কী চীজ, তা গজাননও জানত না। মেয়েরা যখন গুপ্তচরী হয়, বাঘিনীদেরও হার মানায়। পুঁতিবালা যে লাইন থেকে এসেছে, সে লাইনে মোহিনী হওয়ার ছলাকলা শিক্ষার বিলক্ষণ স্কোপ ছিল। পুঁতিবালা এই মস্ত আর্ট-টি রপ্ত করেছে।

বাকিটা তার বডি খেলিয়ে ঠিক ম্যানেজ করে নেয়।

ফলে, বাংলাদেশের সেই শহরটিতে গজানন যখন ঢুকল তার গাড়ি নিয়ে—অনেক পেছনে একটা ট্যাক্সিতে বোরখাপরা একটা মেয়েকেও দেখা গেল—ফলো করছে গজাননকে।

গজানন গিয়ে উঠল একটা ফাইভ স্টার হোটেলে, পুঁতিবালাও (বোরখা পরিহিতা) উঠল সেখানে। রেজিস্টারে গজানন নাম লেখালো মহম্মদ হোসেন। পুঁতিবালা লিখল সুলতানা রাজিয়া। তারপর কী অপূর্ব কৌশলে, কী দৈবক্রমে জানা নেই—দু-জনেরই ঘর পড়ল পাশাপাশি—একই করিডরে।

তখন রাত হয়েছে। হোটেলের ঘরেই ধড়াচূড়ো পালটে নিল গজানন। রিভলভারটা নেবে কি নেবে না ভাবল সেকেন্ড কয়েক। তারপর না নেওয়াটাই ঠিক করল। যাচ্ছে তো খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজতে। সিকিউরিটিতে রিভলভার ধরা পড়লেই যাবে সব গুবলেট হয়ে।

এদিকে পাশের ঘরে পুঁতিবালা কী করছে?

বোরখা ছুঁড়ে ফেলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে। পটাপট ব্লাউজ খুলে সড়াৎ করে শাড়ি আর সায়া খুলে—(না...না...অতটা সে যায়নি!)...পরনের একটি মাত্র জাঙ্গিয়ার মতো পরিধেয়কে লোলুপ নয়নে দেখছে। একবার নিতম্ব নাচিয়ে দেখে নিল সব ঠিকঠাক আছে কিনা।

আছে, আছে। পুঁতিবালা এখনও মরেনি। মাতাহারিও বোমকে যাবে তার এই অপ্সরী মূর্তি দেখলে। বুকের এক চিলতে আবরণী থাকুক—দরকার হলে টান মেরে খুলে ফেলা যাবে।

রাইফেল, রিভলভার, চাকু, হাতবোমকেও এখন আর ভয় পায় না পুঁতিবালা। মুখের রং-টঙগুলো আর একবার ফ্রেস করে নিল গজাননের চ্যালা। কিঙকে রং নিয়েও যদি ঘায়েল করতে না পারা যায়—তাহলে পুঁতিবালার লাইন ছেড়ে দেওয়া উচিত।

বোরখাটা মাথা দিয়ে গলিয়ে নিয়ে দরজা ফাঁক করে দাঁড়াল পুঁতিবালা।

আর ঠিক সেই সময়ে ঝাঁকরাচুলো গজানন গ্যাটর-গ্যাটর করে বেরিয়ে গেল ওর ঠিক নাকের ডগা দিয়ে। নাকে এল আতরের গন্ধ।

গজাননদা আতর মেখেছে। বলি ব্যাপারটা কী!

নীরস কাঠখোট্টা গজাননদা গন্ধদ্রব্য কস্মিনকালেও দু-চক্ষে দেখতে পারে না—নাকে শুঁকে ফেললে পচা গোবর শুঁকে ফেলেছে, এমনিভাবে নাক সিঁটকোয়।

সেই মানুষটা কিনা সারা গায়ে আতর মেখে পাঁচতারকা হোটেলের অলিন্দ পথ হাঁটছে। মতলবটা কী দেখতে হচ্ছে তো!

সুরুৎ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল পুঁতিবালা। গটগট করে চলল গজানন ওরফে মহম্মদ হোসেনের পেছন-পেছন। উঠল একই লিফটে। একতলায় নামল একইসঙ্গে। চোখ পাকিয়ে জিরো জিরো গজানন একবারটি দেখেছিল পাশের বোরখাধারিণীকে। সন্দেহ করেনি। করবেটা কী করে? বোরখা ফুঁড়ে দেখবার ক্ষমতা তো নেই। থাকলে দেখতে পেত হেসে কুটিপাটি হচ্ছে পুঁতিবালা। আর মনে-মনে বলছে—বটে! বটে! গজাননদা! বিদেশে এসে শেষকালে কামিনীকাঞ্চনে মজবে! আমি থাকতে তা হতে দেব না। সাধনার ব্যাঘাত ঘটতে দেব না!

একতলায় লিফট থেকে বেরিয়ে গজানন জিগ্যেস করে নিল, গেমরুম কোথায়। গেমরুম মানে জুয়ো খেলার আড্ডাঘর। এ হোটেলে সে ঘর আছে একতলারও নিচে—মানে পাতালঘরে।

গজানন চলল সেই দিকে। পকেটে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকায় একবার হাত বুলিয়ে নিল। টাকার বান্ডিলে হাত বুলোলে নার্ভ-টার্ভগুলো বেড়ে ঠান্ডা হয়ে যায়!...তারপরেই জমাটি

ঠেঙানি শুরু করা যায় শীতল মস্তিষ্কে।

কে জানে পাতাল ঘরে এখুনি তাই শুরু হবে কিনা! এসে গেছে গেমরুম। পুরো করিডরটা এয়ারকন্ডিশন করা। গেমরুমের দরজায় খেলাটেলার ছবি থাকলে বোঝা যেত ঘরটায় কী হয়।

কিন্তু যে ছবি রয়েছে, তা দেখলে ভুল ধারণা ঢুকে যায় মগজে।

একটা মেয়ের ছবি। ঘূর্ণমান গ্যালারি থেকে রাশি-রাশি নক্ষত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে সে যেন নেমে আসছে মর্ত্যে। অহো! অবতীর্ণ হওয়ার কী অপূর্ব ছন্দ! মনোমুগ্ধকর নিঃসন্দেহে। অবশ্য সেইরকম মনই মুগ্ধ হবে এই তিলোত্তমাকে দেখলে।

কেননা, প্রথম মানব আদম প্রথম মানবী ঈভকে পরিধেয় আবিষ্কারের বহু আগে যে সজ্জায় দেখেছিল—কটাক্ষময়ী এই ললনাও যে রয়েছে সেই সজ্জায়।

দেখেই সভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল গজানন। সামলে নিল অবশ্য মুহূর্তের মধ্যেই। এসব মামলা হাতে নিলে চোখ খোলা রাখা দরকার—চোখের সামনে যা-ই পড়ুক না কেন—দেখতেই হবে।

অতএব খুঁটিয়ে দেখল গজানন। কোথায় যেন পড়েছিল, ভালো করে চোখ মেলে দেখার নাম পর্যবেক্ষণ, তাই পর্যবেক্ষণ করল অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে।

খুব একটা খারাপ লাগল না। নারীদেহ বরাবরই তার কাছে একটা অজ্ঞাত মহাদেশ অথবা মহাসমুদ্র—হারিয়ে যাওয়ার চান্স এত বেশি...

কিন্তু এই রূপসিটির অধরে, ললাটে, নয়নে, গ্রীবায় এবং সেখান থেকে পদযুগল পর্যন্ত প্রদেশগুলিতে এমন-এমন সব পেলব সৌন্দর্য আছে যা অচল মনকেও সচল করে দিতে পারে!

একদা মানসিক ক্লিনিকবাসী গজাননেরও ব্রেনের কোষগুলো অদ্ভুতভাবে সচল হয়ে ওঠে।

দরজার সামনে টুলে বসেছিল হোটেলের লোক। সাধারণ কর্মচারী নয়। লড়াকু চেহারা। চুল এত ছোট করে কাটা যে মুঠো করে ধরা সম্ভব নয়। চোখ দুটি মার্বেলগুলির মতো গোল-গোল। গায়ে সিকি ছটাক চর্বিও নেই। জামাটা মোটা কাপড়ের—অনেকটা ফতুয়ার মতো দেখতে, প্যান্টটা তো পাছা কামড়ে রয়েছে।

ঠোঁট ফাঁক করে অত্যন্ত অমায়িক হাসি হেসে-হেসে গজাননের পর্যবেক্ষণ পর্ব অবলোকন করছিল লোকটা। হাসিটাকে অনেক ট্রেনিং দিয়ে অমায়িক করবার চেষ্টা করেও পারছিল না। মনে হচ্ছিল যেন একটা হিংস্র হায়না দাঁত খিঁচিয়ে আছে।

গজাননের পর্যবেক্ষণ পর্ব প্রলম্বিত হচ্ছে দেখে সে টুল. ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

বললে, ভেতরে যাবেন?

চমকে ওঠাটাকে বিউটিফুলি ম্যানেজ করে নিল গজানন। আদি জেমস বন্ড মানে সীন কোনারির চার্মিং হাসি হাসল।

বললে—অফ কোর্স।

আমি সিকিউরিটি স্টাফ। আপনাকে নতুন দেখছি, সার্চ করব।

হোয়া-ট!

অবিচল কণ্ঠ সিকিউরিটি স্টাফের—নিয়মিত এলে আর করব না। ঝুঁকি নিতে চাই না। অনেক ধরনের লোক তো এখানে আসে।

অনেক ধরনের লোক এখানে আসে! এবং এই জন্যেই তো গজাননের আবির্ভাব এই নির্বান্ধব পুরীতে। পাঁচতারা হোটেলের গেমরুমে লাখ টাকার খেলা দেখাতে যারা আসে, তাদের লাখ টাকা সাদাপথে আসে না কখনওই। কালোপথে পাথর পথিকদের পেট থেকেই তো খবর পাওয়া যাবে 'কিঙ' মহাপ্রভুর।

বুক চিতিয়ে বললে বেলেঘাট্টাই মস্তান (প্রাক্তন)—ও ইয়েস। ভাগ্যিস, রিভলভার আনেনি সঙ্গে!

দরজা খুলে ধরল গাঁট্টাগোট্টা লোকটা। ছোট্ট একটা চেম্বার। তার পরের দরজাটা খুললে গেমরুমে ঢোকা যায়। পৃথিবীর সবরকম কান ফাটানো শব্দ বোধহয় সেখানে মিশেছে। ছোট্ট চেম্বারে তার রেশ ভেসে আসছে গুমগুম করে।

কম্যান্ডোর চাকরি করত নাকি কদমছাঁট এই মর্কটটা? দ্রুত হাত বুলিয়ে গেল গজাননের সর্বাঙ্গে। বাহুমূল, উরুসন্ধি—কিচ্ছু বাদ গেল না।

কপট অমায়িক হেসে বললে, যান। খুলে ধরল দরজা গেমরুমের।

কান ঝালাপালা আওয়াজে প্রথমটা মাথা ধাঁধিয়ে গেল গজাননের। কীরকম যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মনে হল। তারপরেই তেড়েমেড়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

বোরখাপরা পুঁতিবালা দাঁড়িয়েছিল করিডরে। বোরখাটা খুলবে কিনা তাই নিয়ে ভাবছিল। গজাননদার সামনে খোলা মানেই কেলেঙ্কারি। অথচ মন চুলকোচ্ছে বডিখানা কাউকে দেখাতে—স্বভাব যায় না মলে।

এসে গেল সেই সুযোগ। গজাননকে গেমরুমে চালান করে দিয়ে করিডরের দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল কদমছাঁট লোকটা।

বোরখার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে রুক্ষ কণ্ঠে—ফরমাইয়ে?

দরজাটা খুলুন, কাটকাট কথা পুঁতিবালার।

বোরখা পরে ভেতরে যাওয়া যায় না।

তাই নাকি? তাই নাকি? কেন যাওয়া যায় না শুনতে পারি?

সার্চ করিয়ে যেতে হয়।

তাই বলুন। সার্চ করিয়ে গেলেই হবে। তা করুন না।

বোরখা খুলতে হবে।

তাই নাকি? তাই নাকি? এই খুললাম, বলেই হ্যাঁচকা টানে মাথা গলিয়ে বোরখা খুলে যেন হাওয়ায় উড়িয়ে দিল পুঁতিবালা। দুই হাত দু-পাশে ছড়িয়ে সশব্দে তুড়ি দিয়ে কবজি ঘুরিয়ে বললে সে এক অপরূপ কায়দায়—কী সার্চ করবেন, মিঃ সার্চম্যান? কী আছে আমার—এই বডিখানা ছাড়া। বলতে-বলতেই মোক্ষম মোচড় দিল বক্ষ শোভায় মাতাহারি-স্টাইলে।

চোখের মধ্যে আলপিন ফুটিয়ে দিলেও বোধহয় এত তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করত না দ্বাররক্ষক। আঁতকে উঠে দরজা খুলে দিয়ে বললে—কী হচ্ছে কী খোলা জায়গায়! যান ভেতরে।

বিজয়িনী পুঁতিবালা এক পা দিল ছোট্ট চেম্বারে।

বললে ঘাড় ঘুরিয়ে—মিঃ সার্চম্যান, সার্চ করবেন কি বন্ধ জায়গায়? আসুন, আসুন, কতক্ষণই বা আর লাগবে।

ভেতরের দরজা খোলার জন্যে বেগে ছোট্ট চেম্বারে প্রবেশ করতে যাচ্ছে কদমছাঁট—

গায়ে গা ঘষটে যেতেই এককালের বাজারি মেয়ে পুঁতিবালা দেখিয়ে দিল তার 'ফর্ম'টা।

ঝাঁ করে জাপটে ধরল বেঁটে লোকটাকে। সশব্দে চুম্বন করল ঠিক ঠোঁটের ওপর। সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল বাইরে। করিডর থেকে বোরখাটা তুলে নিয়েই পরে নিল চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে। ফিরে এল চেম্বারে। মূহ্যমান কদমছাঁটকে বললে দেবী চৌধুরানির গলায়—খুলুন দরজা।

'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' গোছের শুকনো হাসি হেসে দরজা খুলে ধরল কদমছাঁট। দৃপ্ত ভঙ্গিমায় পুঁতিবালা ঢুকে গেল ভেতরে।

বোরখার মধ্যে থেকে কিন্তু তার চোখ ঘুরছে মস্ত বড় ঘরটার এদিকে থেকে সেদিকে। জগঝম্প আওয়াজে কানের পরদা ফুটিফাটা হলেও আশ্চর্য হবে না পুঁতিবালা। এ কী পাগলের কারখানা রে বাবা! একদিকে সারি-সারি ভিডিও গেম নিয়ে বিকট বাজনা বাজিয়ে জুয়ো খেলে যাচ্ছে একপাল পুরুষ এবং মহিলা। যত না খেলছে, চেঁচাচ্ছে তার চাইতে বেশি। আর এক পাশে একটা হাঁটু সমান উঁচু মঞ্চে উল্লোল নাচ নাচছে একটি ষোড়শী, গেমরুমের সামনের দরজায় আঁকা ছবির সঙ্গে তার মিল আছে শুধু একটি ব্যাপারে...পাঠক-পাঠিকাদের অনুমানের ওপরেই সে ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া গেল।

মঞ্চের সামনে বেশ কিছু চৌকোনা টেবিল আর প্রতিটা টেবিলের চারদিকে চারখানা চেয়ারে বসে নানা বয়সি পুরুষরা উৎকট উল্লাসে ফেটে পড়ছে আদিম নৃত্য দেখে—ষড়রিপুর প্রথম রিপুকে যা প্রজ্বলন্ত করার পক্ষে যথেষ্ট।

একজন তরুণ আর সইতে পারল না প্রথম রিপুর অগ্নিদহন। ছিটকে গেল মঞ্চের ওপর! যেন তৈরি হয়েই ছিল ষোড়শী। আঁকাবাঁকা বিজলী রেখার মতো মঞ্চের ওপর তরুণটিকে খেলিয়ে নিয়ে উন্মত্ত অট্টরোল সৃষ্টি করে সাঁৎ করে অদৃশ্য হল পেছনের দরজায়—তরুণটিও তিন লাফ মেরে ঢুকে গেল ভেতরে।

বন্ধ হয়ে গেল দরজা। পরমুহূর্তে আর একটি ললনা পাশের দরজা দিয়ে ছুটে এল মঞ্চে—যেন গেমরুম-এর দরজায় আঁকা ছবির অনুরূপ একটি মূর্তি...শুরু হয়ে গেল হাসি মুখে মদির চোখে আদিম নৃত্য...

এতক্ষণে দম আটকে দেখছিল পুঁতিবালা। বহুবল্লভা পুঁতিবালা! কিন্তু, এ হেন রাধাবল্লভী নাচ তাকেও কখনও নাচতে হয়নি।

তোবা! তোবা! বেশ বোঝা যাচ্ছে এই খেলাই চলবে সারারাত। কিন্তু জিরো জিরো গজানন গেল কোথায়? পুঁতিবালা আসবার আগেই গ্রীনরুমে উধাও হয়নি তো একটা চলমান ছবির পেছন-পেছন?

বড্ড উৎকণ্ঠা হয় পুঁতিবালার। বড় আনাড়ি এই দাদাটি। তাই তো একলা ছেড়ে দেওয়া যায় না। সঙ্গে-সঙ্গে থাকতে হয়,—আড়ালে থেকে রক্ষা করতে হয়।

ওই তো...ওই তো গজাননদা! কিন্তু সামনে ওই মেয়েছেলেটা আবার কে? গজাননদার ঝাঁকড়া চুল দেখেই মজেছে মনে হচ্ছে। খুব যে হেসে-হেসে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে কথার রঙ্গ হচ্ছে! ওই তো চেহারা! কালো! তবে হ্যাঁ, চেহারায় চটক আছে বটে। কালো মেয়েরা একটু 'সেক্সি' হয় ঠিকই। কিন্তু এই ঢলানিটা যেন একটু বেশি রকমের সেক্সি। যৌনতা বুঝি উপচে-উপচে উঠছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত—গড়িয়ে-গড়িয়ে নামছে শরীরের খাঁজ খোঁদল বেয়ে পাহাড়ি ঝরনার মতো!

গজাননদা পটে গেল নাকি? মরেছে! তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় পুঁতিবালা, এমন

জায়গায় দাঁড়িয়ে উদ্দাম নাচ দেখতে থাকে, যেখানে গজাননের চোখ যাবে না—কিন্তু ওদের কথা কানে ভেসে আসবে।

বলছে কী হারামজাদী? অ্যাঁ! নেমন্তন্ন করছে গজাননদাকে। বলছে ছেনালিগলায়—মিঃ ওয়ান্ডারম্যান, আপনার জন্ম কি হারকিউলিসের ঔরসে? চলুন আমার ঘরে।

পুঁতিবালার ইচ্ছে হল তেড়ে গিয়ে ঠাস করে একটা চড় কষায় আন্নাকালীর গালে। আস্পর্ধা তো কম নয়। গজাননদা বোঝে কি এ সবের? হারকিউলিসের সঙ্গে বাপের তুলনা! এই রাত্রে তাকে ঘরে তোলার মতলব? গজাননদা, গজাননদা, কথার ফাঁদে পা দিও না—মরবে বলে দিলাম। ওই আন্নাকালী তোমাকে খেয়ে ফেলবে।

কী বলছে গজাননদা? হাসছে। হাসিটা কিন্তু বেশ প্যাঁচাল ধারাল। হাজার হোক জিরো জিরো গজানন তো। কায়দা কানুনগুলো প্র্যাকটিস করছে ভালোই।

বলছে হেসে-হেসে—ডার্লিং, আপনার হাজব্যান্ড অ্যাংরি হতে পারেন।

ওঃ! আবার ইংলিশ ছাড়া হচ্ছে! স্বামী মহাশয় রাগ করবেন বলেই যাওয়ার ইচ্ছে নেই। রাগ না করলেই সুড়-সুড় করে চলে যেতে, তাই না গজাননদা? মাইরি, তোমাদের এই পুরুষ জাতটাকে 'দেবা ন জানন্তি—'

বলে কী কেলে মেয়েমানুষটা? উৎকর্ণ হয় পুঁতিবালা।

আন্নাকালী বলছে, আমার হাজব্যান্ড এখন ডিউটিতে।

এত রাতে?

সারা রাতই তো ওর ডিউটি। তাই সারারাত আমার বড় একা-একা লাগে—ঘরে তো আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই। চলুন না—

ডার্লিং, আমি এসেছি দেশ দেখতে—

ও নটি বয়! নতুন দেশের নতুন মেয়েদের আগে দেখতে হয়। আমার দেশকে ভালোবাসি বলেই তো এত ডাকাডাকি, মিঃ সন অফ হারকিউলিস!

আরে বাস্! এ যে দেখছি ছেনালিপনায় মহারানি। গজাননদা, গজাননদা, অমন করে আন্নাকালীর মুখের দিকে চেয়ে আছে কেন?

তারা! তারা! ব্রহ্মময়ী! গজাননদা, তুমিও? তুমিও ওই মেয়ে হ্যাংলাদের দলে?

বিড়বিড় করে আবার কী বলা হচ্ছে আন্নাকালীকেও। পুঁতিবালার কানকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না, গজাননদা, যত আস্তেই বলো না কেন।

কেয়াবাত! গজাননদা, তোমার চোখ এত ধারালো?

খুব আস্তে বললেও কথাগুলো সুস্পষ্ট ধ্বনিত হল পুঁতিবালার কানে—আপনি ড্রাগ অ্যাডিক্ট? হেরোইন খান?

চোখের তারা খুব একটা কাঁপল না আন্নাকালীর।

বললে একই রকম নিনাদী কণ্ঠে—ওটা তো স্ট্যাটাস সিম্বল, মিঃ...মিঃ..

হোসেন। মহম্মদ হোসেন।

বুঝলেন কী করে?

আপনার চোখের তারা দেখে। আসলে আন্দাজ মিশিয়ে ঢিল ছুঁড়ছিল গজানন—লেগেছে ঠিক জায়গায়। আমারও ইচ্ছে যায় জিনিসটা চেখে দেখতে।

ও মাই মিঃ ওয়ান্ডারম্যান। তাহলে চলে আসুন আমার ঘরে। ভয় নেই, আমার গাড়িই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাবে হোটেলে।

গেল! গেল! সব গেল! পুঁতিবালা ইচ্ছে করে বোরখার ভেতর থেকেই হাউমাউ করে ওঠে। গজাননদা, ও গজাননদা, তোমার এতটা মতিচ্ছন্ন হয়েছে, জানা ছিল না তো! হেরোইন খাওয়ার শখ হয়েছে! অ্যাঁ! হেরোইন কিঙকে ধরতে এসে হেরোইন চেখে দেখবার শখ হয়েছে! কী চাখতে চাও, গজাননদা! কষ্টিপাথরের মতো কালো ওই ঢলানিটাকে? ওটা তো বাজারের মেয়েরও অধম—ঘরে স্বামী থাকতে পরপুরুষ নিয়ে—ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ।

ও কী! একি কাণ্ড! গজাননদা যে ঢলানিটার পেছন-পেছন চলল গো! ওমা কী হবে গো! ওরা যে গাড়ি করে যাবে। পুঁতিবালা সঙ্গে যাবে কেমন করে?

হিল্লে একটা হবেই। পুঁতিবালাও মেয়ে কম নয়। কোথাকার কে এসে গজাননদাকে বাগিয়ে নিয়ে যাবে—সেটি হতে দেওয়া চলবে না।

আন্নাকালীর পেছন-পেছন গ্রেট-গজানন যাচ্ছে অন্য দরজার দিকে। যে দরজা দিয়ে ভেতরে এসেছে—সে দরজা দিয়ে নয়। কেলে ঢলানি এখানকার সব খবরই রাখে তাহলে। ইস। আবার তাঁতের শাড়ি পরা হয়েছে। কালচার তো কচু! পরপুরুষকে নিয়ে রাত কাটাস। তবে হ্যাঁ, শাড়িটা চমৎকার। পছন্দ আছে বটে ঢলানির।

আগে বেরিয়ে যাক দুজনে, ওঃ! হাঁটছে দ্যাখো, ঠিক যেন কপোত-কপোতী। ঝাড়ু মার পুরুষ জাতটার মুখে। গজাননদার এতখানি অধঃপতন হবে, ভাবতেই পারেনি পুঁতিবালা।

বেরিয়ে গেছে ওরা। বেরোবে পুঁতিবালা। না কোথাও বাধা নেই। হোটেলের পেছনদিকটা যে এত অন্ধকার, কে জানত। অন্ধকারই বা হবে না কেন। যা কাণ্ডকারখানা চলেছে ভেতরে—তাদের জন্যেই তো দরকার অন্ধকারের যবনিকা।

গেল কোথায় দুশ্চরিত্র দুটো? ওই তো...ওই...ওই কিন্তু একটা ছায়া কেন? হরি! হরি! দুজনে গায়ে গা দিয়ে এক হয়ে গেছে। গজাননদাকে হয় হারামজাদী চুমু খাচ্ছে, নয় তো গজাননদাই—

আচম্বিতে গাছের আড়াল থেকে ধেয়ে এল দুটো ছায়ামূর্তি।

ছিটকে সরে গেছে গজাননদা আর আন্নাকালী। আন্নাকালী ছুটছে হরিণীর মতো। কোথায় যাচ্ছে? ওহো। গাড়ি এনেছিল। সেই গাড়িতে উঠে বসে ঝড়ের মতো চালিয়ে দিয়েছে। হেডলাইটের ডবল আলোয় অন্ধকার ছিঁড়েখুঁড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে দূর হতে দূরে।

গজাননদাকে দুদিক থেকে ঘিরে ধরেছে দুই আগন্তুক। ঠিক হয়েছে।

বিদেশে এসে বিদেশিনীকে আস্বাদনের বড় শখ হয়েছিল। এখন ঠেলা সামলাও।

বোরখাটা খুলে অলিম্পিক স্পিড দেওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে পুঁতিবালা—প্ল্যান কষা হয়ে গেছে কীভাবে ক্যারাটে ঝেড়ে দুদিকে ছিটকে দেবে দুই হানাদারকে, এমন সময়ে...

গম্ভীর গলায় বললে একজন আগন্তুক—মানিব্যাগটা বার করুন।

ব্যাগ বের করে ছুঁড়ে দিল গজানন। সঙ্গে-সঙ্গে ছুঁড়ে দিল নিজেকেও। মরি! মরি! এ সেই বিখ্যাত গজানন লম্ফ। হনুমানও যা দেখে লজ্জা পায়!

মানিব্যাগ লুফবে, না গজাননকে রুখবে? শূন্য পথে ধেয়ে আসছে যে দুটোই। চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতেই ভ্যাবাচ্যাকা আগন্তুকের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ল গজানন, তারপর গোঁ-গোঁ একটা আওয়াজ শোনা গেল।

নেতিয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে লোকটা। হাত-টাত ভেঙে দিল নাকি গজাননদা? গুণের তো শেষ নেই তোমার। রাগলে চণ্ডাল! উন্মাদ। কী করছ তখন আর খেয়াল থাকে না।

দ্বিতীয় লুঠেরাটা মহা ধড়িবাজ তো! ধরাশায়ী দোস্তের বুকের ওপর থেকে গজাননদা

উঠে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই তীরের মতো ছুটে এসে অন্ধকারেই ছোঁ মেরে মাটি থেকে কী তুলে নিয়ে ভোঁ দৌড় দিল অন্ধকারে।

কাওয়ার্ড! দুটো মার খেয়ে গেলি না গ্রেট গজাননের হাতে? বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দিত।

একী! গজাননদা 'আমার মানিব্যাগ' বলে অন্ধকারে বিলীয়মান মূর্তিটার পেছনে তেড়ে যেতেই ভুলুণ্ঠিত আহত লোকটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

রাম! রাম! এত ভীতু! জিরো জিরোর আসল খেল না দেখেই চম্পট দিলি! এখনও তো তার অ্যাসিস্ট্যান্ট নামেনি আসরে। নরম হাতের গরম ধোলাইয়ে পিত্তি ছরকুটে যেত তোদের!

বোরখাটা পরে দিল পুঁতিবালা। বডি খেলানোর যাও-বা একটা চান্স পাওয়া গেল—মিস্ড হয়ে গেল।

গজাননদা ফিরে আসছে। পলাতকদের পালাতে দিয়ে ফিরে আসছে।

অন্ধকারে গা-ঢাকা দিল পুঁতিবালা।

দরজা খুলে গেমরুমে ঢুকে গেল গ্রেট গজানন। কিছুক্ষণ পরে ঢুকল পুঁতিবালা। কিন্তু গজাননকে দেখতে পেল না।

বেরিয়ে এল সামনের দরজা দিয়ে। ওই তো করিডোরের মোড় ঘুরে হোটেল অফিসের দিকে যাচ্ছে গজাননদা।

যাক। মানিব্যাগের জন্যে হাল্লাক হয়ে মরুক। যাচ্ছে তো নালিশ ঠুকতে। পুলিশকে খবর দেবে কি?

॥ ৪ ॥

দিতেও পারে। দাদার প্ল্যানটা ঠিক বুঝে ওঠা যাচ্ছে না। কিঙ-য়ের শহরে পা দিতে না দিতেই এই যে হামলা, একি শুধু মানিব্যাগের লোভে?

মনে তো হয় না।

আড়াল থেকে সব দেখল পুঁতিবালা। অফিস থেকে পুলিশ অফিসেই টেলিফোন করল গজাননদা। তারপর গটগট করে লিফটে চড়ল। পুঁতিবালাও উঠল লিফটে। আড়চোখে তাকে একবার দেখে নিল গজানন। কটমটে চাহনি দেখে মনে-মনে হেসে কুটিপাটি হল পুঁতিবালা। লিফট থেকে সটান নিজের ঘরে ঢুকল গ্রেট গজানন। পুঁতিবালা নিশ্চিন্ত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল একতলায়। সেখান থেকে পাতাল ঘরের গেমরুমে।

আসল গেমটাই যে এখনও খেলা হয়নি।

কদমছাঁট এবার তাকে দেখেই একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে শুধু বললে—আবার?

কী আবার? প্রচণ্ড মুখ ঝামটানি দেয় পুঁতিবালা—সার্চ হবে নাকি আবার?

না, না, না, না, বলতে-বলতে দরজা খুলে ধরে পাংশু মুখে বললে কদমছাঁট—যান।

যাব তো বটেই, কিন্তু বোরখাটা রইল এখানে। যাওয়ার সময়ে নিয়ে যাব, কেমন?

—বলেই বোরখা খোলা হয়ে গেল পুঁতিবালার। ছোট্ট চেম্বারে পুঁটলি পাকিয়ে ফেলে ঝাঁ করে ঢুকে পড়ল গেমরুমে।

সত্যিই! শেষ নেই ওই আদিম নাচের! এখনও মঞ্চে চলছে সেই একই উদোম লীলা। জঘন্য!

ওভাবে পুরুষ মজাতে সবাই পারে। পারবি পুঁতিবালার মতো? এই দ্যাখ!

কটিতে আর বক্ষদেশে যার সামান্যতম বস্ত্রের আবরণ, এহেন লাস্যময়ীর দিকে মুনি ঋষিরও দৃষ্টি চলে যায়। পুঁতিবালাও চুম্বকের মতো ঘরসুদ্ধ লোকের নজর কেড়ে নিল চক্ষের নিমেষে।

কিন্তু পুঁতিবালার নজর কাড়ল কে?

একজন পুলিশ অফিসার। বয়েস চল্লিশের ওপরে। সেই কারণেই শিকার ভালো।

তাছাড়া পুলিশের লোক। হাতে রাখাও দরকার।

বার কাউন্টারে হাতে স্কচ হুইস্কি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ব্রোঞ্জ মূর্তির মতো সেই অফিসার। বেশ চেহারা। পছন্দ হয় পুঁতিবালার।

চোখে-চোখে আমন্ত্রণ বিনিময় হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ। কাছে এগিয়ে যায় পুঁতিবালা।

এক গেলাস 'জিন উইথ লাইম অ্যান্ড বিটার' চেয়ে নিয়ে চুমুক দিয়ে চোখ রাখে পুলিশ অফিসারের চোখের ওপর।

নেশা জড়ানো চোখ নয়। বেশ হুঁশিয়ার। কর্তব্যেনিরত নিঃসন্দেহে।

গেলাসটা চোখের সামনে তুলে ধরে মদিরার ফিকে হলুদ রংটা দেখতে-দেখতে যেন আপনমনেই বলে পুঁতিবালা—আমার নাম রাজিয়া সুলতানা। আজ এসেছি। তিনশো দু-নম্বর ঘর। একা। সঙ্গ পেলে বাঁচি।

যাচ্ছি, বলে গেলাসটা এক চুমুকে শেষ করে দিল পুলিশ অফিসার। খর নজর কিন্তু পুঁতিবালার ওপর।—আমার নাম আমিনুল হক। ডি আই জি। চলুন।

এক চুমুকে গেলাস শেষ করে দিয়ে কাউন্টারে রুম নাম্বারটা বলে দিল পুঁতিবালা। পেমেন্ট হবে বিলে। বড়ি খেলানোর সুযোগটাকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর উদগ্র অভিপ্রায় নিয়ে অগ্রসর হল দরজার দিকে।

ছোট্ট কোর্টশিপ। পাঠক-পাঠিকারা ক্ষমা করবেন। পুঁতিবালার মতো মেয়েরা এসব মামুলি ব্যাপারে নাহক সময় খরচ করতে রাজি নয়।

পরের দিন ডি আই জি আমিনুল হকের সামনে এসে বসল গ্রেট গজানন।

বলল—আমিই ফোন করেছিলাম আপনাকে। আমার মানিব্যাগ চুরি গেছে কাল রাতে।

গম্ভীর গলায় বললে, ব্রোঞ্জ মূর্তি—হোটেল অফিস থেকেও কমপ্লেন এসেছে। কিন্তু আপনি হোটেলের পেছনে গেছিলেন কেন?

ব্যক্তিগত ব্যাপার।

মৃদু কঠিন হাসল, ব্রোঞ্জ মূর্তি—তাহলে আপনার মানিব্যাগ খোয়া যাওয়ার ব্যাপারটাকেও ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ধরতে পারেন। সরি, আপনি আসতে পারেন।

গ্রেট গজাননের মাথায় চড়াত করে রক্ত উঠে গেল কথাটা শুনেই। তারপরের কথাটা শুনেই কিন্তু রক্ত নেমে গেল মুখ থেকে।

কেটে-কেটে বললে, ব্রোঞ্জ মূর্তি—জিরো জিরো গজানন, ছেষট্টি পাউন্ডের অর্ধেক যদি আমাকে দিয়ে যান, তাহলে আপনাকে হেল্প করতে পারি।

কিছুক্ষণ সব চুপ। চোখে-চোখে চেয়ে দুই বড় খেলোয়াড়।

তারপর আশ্চর্য শান্তগলায় বললে গজানন—

সব জানেন?

জানাটাই আমার কাজ।

কিঙয়ের ঠিকানা?

এখনও জানি না। তবে জানতে পারব। আপনার পেছনে লেগে থাকলেই জানতে পারব। কেননা, কিঙ আপনার পেছনে লেগেছে।

এত তাড়াতাড়ি?

তাই তার নাম কিঙ। আপনার নিস্তার নেই, গ্রেট গজানন। মরবেনই। হয় তার হাতে, আর না হয়—একটু থেমে খুব আলতোভাবে—আমার হাতে।

চেয়ে রইল গজানন। সর্ষের মধ্যেই ভূত থাকে—সুতরাং তার চোখের পাতা কাঁপল না।

বললে, ছেষট্টি পাউন্ডের অর্ধেক দেব না। দশ পাউন্ড বড় জোর।

তেত্রিশ পাউন্ড।

না।

তাহলে আগে পুঁতিবালার নাচ দেখবার জন্যে তৈরি হোন।

পুঁতিবালা। এবার কিন্তু আর চমকানি আটকাতে পারে না গজানন—সে কোথায়?

এখন বলা যাবে না। তেত্রিশ পাউন্ড।

বিশ পাউন্ড।

তেত্রিশ পাউন্ড।

ও-কে, ও-কে। রাজি। পুঁতিবালা কোথায়?

এখন বলা যাবে না।

কিঙ কোথায়?

আগে বলুন হোটেলের পেছনে কেন গেছিলেন?

এক মহিলার আমন্ত্রণে।

কী নাম তার? কীরকম দেখতে?

খুব কালো। দারুণ স্মার্ট। বিউটিফুল ফিগার। হেরোইনের নেশা আছে। তাই তার সঙ্গ ধরেছিলাম।

খুব কালো! দারুণ স্মার্ট! বিউটিফুল ফিগার! হেরোইনের নেশা আছে! নাম কী বলেছিল?

মমতাজ সিরাজ!

বিসমিল্লা!

চেনেন?

আপনি যে হোটেলে উঠেছেন, তার মালিকের বেগম।

জয় মা কালী!

গ্রেট গজানন।

জিরো জিরো গজানন।

ইয়েস, ইয়েস, আপনি আজ রাতে আবার গেমরুমে যাবেন?

সে কি আর আসবে?

দেখা যাক।

তা এল বইকী মমতাজ। স্বপ্নিল চোখে হেরোইনের আভাস ফুটিয়ে সে আবার আমন্ত্রণ করল গজাননকে। গতরাতের ঘটনা প্রসঙ্গে শুধু বললে, ভয়ে পালিয়ে গেছিলাম, মিঃ ওয়ান্ডারম্যান! অন্ধকারের উৎপাতদের আমার বড় ভয়।

কাজেই মমতাজের গাড়ি চেপে গজানন গেল শহর থেকে দূরে নিরালা একতলা বাড়িটায়।

পুঁতিবালা তখন কোথায়?

ফাইভ স্টার হোটেলে অন্তত নেই। ব্রোঞ্জ মূর্তি যখন একটু ঘুমিয়ে ছিল, তখন ঘুমের ঘোরে সে উচ্চারণ করেছিল শুধু একটি কথা—পুঁতিবালা, মার্ভেলাস!

ব্যস, ভোর হতেই বিদেয় হল পুলিশ অফিসার। তারপর হাওয়া হয়ে গেল পুঁতিবালা।

হে পাঠক! হে পাঠিকা! আসুন এবার গজাননের পেছনে। দেখুন তার আজব কীর্তি।

মমতাজ গাড়ি চালায় ভালো। বাংলাদেশে বিলিতি গাড়ির ছড়াছড়ি এখন। মমতাজের গাড়ি নির্মিত জাপান দেশে। টয়েটা।

দরজা খুলে প্রথমে গজানন উঠেছিল ভেতরে। উঠেই দেখে নিয়েছিল সিটের তলায় খাঁজের মধ্যে, পয়েন্ট থ্রি এইট স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন রিভলভারটা গোঁজা আছে কিনা।

আছে। নিশ্চিন্ত হয়েছিল গজানন। এ কাজটা তাকে করতে হয়েছে মমতাজের অজান্তে। গেমরুমে রিভলভার নিয়ে ঢোকা অনুচিত। ধরা পড়ে যেতে পারে। তাই টয়লেটে ঘুরে আসার নাম করে সটান গেছিল নিজের ঘরে। রিভলভারটা নিয়েই দৌড়ে গেছিল হোটেলের পেছন দিকে—যেখানে আছে মমতাজের গাড়ি। গাড়িটা কী ধরনের গত রাতেই তা দেখে রেখেছিল গ্রেট গজানন। দরজায় চাবি লাগানোর অভ্যেস নেই মমতাজের, তাও লক্ষ করেছিল চকিতে। দুই আততায়ী তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে মমতাজ ছুটে গিয়ে এক ঝটকায় দরজা খুলে উঠে বসেছিল সিটে—সবই দেখেছে জিরো জিরো। তাই রিভলভার লুকিয়ে রাখার প্ল্যানটা আগে থেকেই রেখেছিল মগজের মধ্যে।

নিজে যে সিটে বসবে এখুনি, সেই সিটের তলায় রিভলভার আর কিছু বাড়তি বুলেট রেখে অন্ধকারেই ফের মিশে গেছিল গজানন। ফিরে এসেছিল গেমরুমে।

তারপর সেই একই কথার চর্বিতচর্বণ। একই কথার ছেনালিপনা। একই কথা নিয়ে ঢলাঢলি। উস্কে দিয়েছে গজানন এবারে। মমতাজ সে রাতে ডিপ ব্লু শাড়ি পরেছে। খুবই মিহি শাড়ি। অত্যন্ত হালকা। তার আশ্চর্য কালো তনু ঘিরে গাঢ় নীল বসন আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে যৌনতাকে। হেরোইন সেবন কি আজ মাত্রা ছাড়িয়েছে? যেন একটু বেশি বকছে মমতাজ। একটু যেন বেশি প্রগলভা। ক্ষণে-ক্ষণে গজাননের গায়ে গা দিচ্ছে, গালে গাল ঠেকাচ্ছে, চোখের সঙ্কুচিত তারা কাম-টু-দ্য-বেড আমন্ত্রণ জানিয়ে চলেছে।

গজানন ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুমান করেছে, অভিযান পৌঁছেছে সম্ভবত অন্তিম পর্বে। আমিনুল হক নামধারী পুলিশ অফিসার যখন হিরোইন কারবারে লিপ্ত এবং কিঙয়ের হদিশ জানতে আগ্রহী—তখন হোটেল মালিকের ব্যাভিচারিণী বউকে নিয়ে তার নিরালা আলয়ে গেলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়তে পারে।

প্রাণ দিতে প্রস্তুত গজানন। মেন্ট্যাল ক্লিনিকের ডাক্তারবাবু শাঁখের আওয়াজের মতো

গলাবাজি করে তাকে বলেছিলেন—গজানন, দেশের জন্যে তোমার ট্যালেন্টকে কাজে লাগিও—নিজের জন্যে নয়।

গজানন আজ তাই একেবারে বেপরোয়া। যে নরাধমরা হেরোইন প্রবেশ করাচ্ছে, ইন্ডিয়ার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, যুবসমাজকে মেরুদণ্ডহীন করে ছাড়ছে—তাদের পালের গোদাকে সে জবাই করবে নিজের হাতে। একটার পর একটা খুন করে যাবে। সে যে রেগেছে, তার প্রমাণ রেখে দেবে রক্তগঙ্গার মধ্যে। যদি নিজের রক্তও মিশে যায় তার মধ্যে—মিশুক। কেউ তো কাঁদবে না। এক-আধফোঁটা চোখের জল হয়তো ফেলত পুঁতিবালা, সে ছুঁড়িও তো নিপাত্তা। কেনই বা এসেছিল পেছন-পেছন। আমিনুল যদি তাকে কবজা করে থাকে—তাহলে সর্বনাশ।

গজানন সে চেষ্টাও করবে বলে ঠিক করেছিল, আমিনুলের কাছ থেকে ঠিকানা বের করবেই পুঁতিবালার।

কিন্তু তার আর দরকার হয়নি।

পুলিশ অফিস থেকে ফিরে হোটেলে ঢুকতে যাচ্ছিল গজানন—আজই সকালবেলা। গাড়ি পার্ক করার জায়গায় ঝাড়ন হাতে দাঁড়িয়েছিল একটা ছেলে। ময়লা গাড়ি ঘষে সাফ করে দেয়। বিনিময়ে নেয় সামান্য দক্ষিণা।

গজানন গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াতেই ছেলেটা একগাল হেসে দাঁড়াল সামনে।

হাসি দেখে পিত্তি জ্বলে গেছিল গজাননের—কী চাই? গাড়ি মুছতে হবে না।

নীরবে একটা চিরকুট এগিয়ে দিয়েছিল ছোকরা। তাতে মেয়েলি হাতে লেখা—দাদা গো দাদা মমতাজকে নিয়ে কাদা! আমিনুলকে সাবধান—সে জানে তোমার নামধাম!

ছড়া পড়েই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল গ্রেট গজানন। ছড়া লেখা হচ্ছে! ছড়া লেখবার সময় এটা! ফাজিল ডেঁপো মেয়ে কোথাকার! কোথায় একটু পাশে এসে দাঁড়াবে, তা না আড়ালে টিটকিরি দিচ্ছে মমতাজকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করা হচ্ছে বলে। বেশ করছে গজানন, আলবত করবে, একশোবার করবে। তুই পুঁতিবালা, তুই কি কম যাস? কাজের ফিকিরে যত অকাজ আছে—সবই তো করিস। গজানন না হয় দেশের জন্যে, দশের জন্যে মমতাজকে নিয়ে একটু খেলবে।

কিন্তু কোথায় গেল ফচকে মেয়েটা? চোখ পাকিয়ে ছোকরাকে শুধোয় গজানন—চিঠি কার কাছে পেলি?

ওই তো ওখানে দাঁড়িয়ে...যাঃ! চলে গেছে। আপনাকে তো চিনিয়ে দিল।

ননসেন্স! বলে হনহন করে হোটেলে ঢুকে গেছিল গজানন। নিশ্চিন্ত হয়েছিল অবশ্য পুঁতিবালার ব্যাপারে। আমিনুল তার টিকি ধরতে পারেনি নিশ্চয়। স্রেফ হুমকি দিয়েছিল গজাননকে।

পুঁতিবালা এই মুহূর্তে স্বাধীন। ও মেয়ে সব করতে পারে। ওর কাছে বিদেশের মাটি আর স্বদেশের মাটির মধ্যে কোনও তফাত নেই। ও জানে শুধু পুরুষ মানুষ আর নিজের বডির যাদুশক্তি। ভক্তি-শ্রদ্ধা, এমনকী একটু ভয়ও করে বটে—এই দাদাটিকে। গজাননদার অকল্যাণ হবে জানবে তা রুখতে দুনিয়ার হেন অপকর্ম নেই—যা ওর অসাধ্য।

মমতাজ চালিত টয়োটায় বসে এইসব কথাগুলোই আর একবার ভেবে নিল গজানন। অ্যাসিস্ট্যান্ট একটা বানিয়েছিল বটে। গুরুকেও বোকা বানায়। বেপারীটোলা লেনে যদি জান নিয়ে ফিরতে পারে, কান ধরে এমন একটা চড় লাগাবে...

ব্যাকভিউ আয়নায় দেখা গেল একটি গাড়ির সাইডলাইট। বেশ দূরত্ব বজায় রেখে আসছে গাড়িটা। ফলো করছে কে? আমিনুল না পুঁতিবালা? গেমরুমে আজকে ব্রোঞ্জমূর্তিটাকে দেখা যায়নি। তাই বলে গজাননকেও নিশ্চয় নজর ছাড়া করেনি। হেরোইন কিঙের ঠিকানার লোভে হয়তো আসছে পেছন-পেছন।

গজানন যদি দূরদর্শনের শক্তি লাভ করত সেই মুহূর্তে, তাহলে অবশ্য দেখতে পেত অন্য দৃশ্য।

চুপি-চুপি গাড়ি চালিয়ে আসছে তারই সাকরেদ পুঁতিবালা!

আমিনুল হক ওঁৎ পেতে আছে বনানীর মধ্যে সেই নিভৃত আলয়ে—যেখানে বৃন্দাবনলীলা চলেছে প্রতি রাতে। মমতাজ সুন্দরী যেখানকার অকথ্য নায়িকা।

গাড়ি চালাচ্ছে এই অতৃপ্ত কামনাময়ী। শ্যাম্পু করা ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল উড়ছে হাওয়ায়। সারি-সারি মিটার থেকে বিচ্ছুরিত আলো পড়েছে তার চিবুকের নিচ থেকে ওপরের দিকে। আলো আর ছায়ায় নিখুঁত কালো মুখটা অপরূপ শুধু নয়, আশ্চর্য লাবণ্যে ভরা বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু পাতলা কাজল ছাওয়া চোখে সে যখন মদির কটাক্ষ হানছে, ঈষৎ স্ফীত নাসারন্ধ্র আর উত্তাল বুকে অবদমিত বাসনাকে জাগ্রত করছে—তখন আর শুধু তাকিয়ে দেখা যায় না তাকে...ইচ্ছে যায়...

ইচ্ছে যায়...

এই প্রবল ইচ্ছেটাকেই প্রবলতম সংযম দিয়ে রুখতে-রুখতে চলেছে বেচারা গজানন। খাই-খাই মেয়েমানুষদের সামাল দেওয়া যে কঠিন হাড়ে-হাড়ে তা মালুম হচ্ছে। একে তো ব্যাচেলার তার ওপর লেডি কিলারদের পাঠশালাতেই পড়েনি। সুতরাং নিজেকে সামলে রাখতে গিয়ে মাথা গরম করে ফেলছে। মাথা গরম হয়ে গেলেই ভায়োলেন্ট হতে ইচ্ছে যাচ্ছে। তাতেও তো সুস্থ বোধ করে গজানন। ভগবান কেন যে মেয়েমানুষ জাতটাকে সৃষ্টি করেছিল। দূর। দূর!

বনের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে গাড়িটা চলেছে কোথায়? সতর্ক হয় গজানন।

ভুজঙ্গিনী ভঙ্গিমায় ঘাড় বেঁকায় মমতাজ—ভয় করছে, মিঃ ওয়ান্ডারম্যান?

না। ভাবছি, এতটা পথ আপনিই আবার ড্রাইভ করে হোটেলে ছেড়ে দিয়ে আসবেন তো?

অসুবিধে নেই। রাত জাগার অভ্যেস আছে আমার।

আমার নেই।

একরাশ কাচের বাসন ভেঙে গেল যেন। বাব্বা। কি হাসি। বুক ছলাৎ করে ওঠে।

গাড়িটাও ব্রেক কষল সঙ্গে-সঙ্গে—আসুন মিঃ ওয়ান্ডারম্যান, এই আমার কুটির।

গাড়ি থেকে নেমে তাকিয়ে দেখল গজানন। চারপাশে বড়-বড় গাছ। মাঝে একটু ফাঁকা জায়গা। তার মাঝে একতলা বাড়ি। একদম সাদা। ঠিক যেন ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবি।

অন্ধকার যে, মৃদুস্বরে বলে গজানন—ইলেকট্রিসিটি নেই?

জেনারেটর আছে। চলুন।

নুড়ি মাড়িয়ে গেট খুলে মমতাজ সুন্দরী গেল আগে-আগে—পেছনে অতি হুঁশিয়ার গজানন। চোখ ঘুরছে ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে। যে-কোনও মুহূর্তে একটা বুলেট উড়ে আসতে পারে—গজাননের ভবলীলা সাঙ্গ হতে পারে। বনেবাদাড়ে কে আসছে খোঁজ করতে?

গজানন না জানলেও যে আসবার সে ঠিক এসে গেছিল।

পুঁতিবালা। দূরে গাড়ি রেখে বনের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দ সঞ্চারে ছুটেও এসেছিল। আর...

সতর্ক চাহনি মেলেও গ্রেট গজানন যাকে দেখতে পায়নি—তাকে ও দেখেছিল।

আমিনুল হক। সেই ব্রোঞ্জ মূর্তি। অন্ধকারেই চিনেছে পুঁতিবালা। অন্ধকারেই তো চিনবে। অন্ধকারেই তো মানুষ চেনা যায়। অন্তত পুঁতিবালারা চিনতে পারে।

তাই আমিনুল হকের পেটাই মুখাবয়ব দেখেই গা শিরশির করে উঠেছিল পুঁতিবালার। ভয়ে নয়,—রোমাঞ্চে। সুখকর স্মৃতির রোমাঞ্চে!

দূর থেকে চোখ রাখল দুই পুরুষের ওপর। গজানন আর আমিনুল। কালো কষ্টিপাথরটাকে অত না দেখলেও চলবে। হারামজাদী ভুলিয়ে ভালিয়ে ঠিক নিয়ে এসেছে জিরো জিরোকে। শয়তানি ঢলানি! ফুলে-ফুলে মধু খাও বলে গজাননদাকে ধরে পার পেয়ে যাবে ভেবেছ?

আর গজাননদা, তোমাকেও বলিহারি যাই। হেরোইন অন্বেষণে এসে মানবী-হেরোইনের ফাঁদে ধরা পড়লে। ও রাক্ষসী তোমাকে যে গিলে ফেলবে।

তবে হ্যাঁ, পুঁতিবালা যখন এসে গেছে—

আলো জ্বলে উঠেছে বাংলোবাড়িটায়। জেনারেটরের আওয়াজ হচ্ছে। আলো জ্বলছে শুধু একতলার ঘরটায়। আমিনুল হক গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে আলোকিত জানলার দিকে।

মরণ আর কী! উঁকি মেরে দেখার শখ হয়েছে। কাল রাতেও কি শখ মেটেনি। মুখে ঝাড়ু তোমার...

গজানন আর মমতাজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। হেরোইনের নেশা বেশ চেপে বসেছে সুন্দরীর মগজে। চোখের আবেশ অতন্দ্র সমুদ্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কালো সমুদ্র।

হুঁশিয়ার হয়েছে গজানন। এ মেয়ে এই মুহূর্তে সব করতে পারে।

স্খলিত শাড়ির দিকে নজর নেই মমতাজের। কাঁধের ওপর থেকে কোনওকালে আঁচল খসে পড়ে লুটোচ্ছে পায়ের কাছে। পীবর বুক মিশিয়ে দিয়েছে গজাননের কপাট বুকে। দুই হাত তার গজাননের দুই কাঁধে। ঠোঁট উঁচিয়ে ধরেছে গজাননের ঠোঁটের কাছে। চোখের তারায় আকুল আমন্ত্রণ।

কিস মি, ওয়ান্ডারম্যান, কিস মি। গলার মধ্যে ঝোড়ো হাওয়ার চাপা হাহাকার।

গজাননকে এখন একটু অ্যাকটিং করতে হবে। উপায় নেই। এই একটি সূত্র ধরেই তাকে এগোতে হচ্ছে। এখানে না হলে অন্যত্র চেষ্টা চালাবে।

মমতাজ, উত্তমকুমার ঢঙে বললে গজানন। কণ্ঠস্বরটা বেশ গুরুগম্ভীর শোনাচ্ছে বটে।

হোসেন সাব।

জানি। সাদা গুঁড়ো চাখবে।

আছে—সামান্য।

সামান্য কেন?

আমার কাছে তো থাকে না।

তবে কার কাছে থাকে?

সোজা জবাব দিতে গিয়েও কথা ঘুরিয়ে নিল মমতাজ—

তার কাছ থেকে নিয়ে আসতে হয়। না গিয়েও পারি না। নেশা ধরিয়েছে সে—চালান দেবেও সে—বিনিময়ে নেবে আমার সর্বস্ব।

সে কে?

সে কে? অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে—সে আমার সব।

নাটক রাখো মমতাজ, সামান্য কড়া হয় গজানন—আমি যদি নেশায় পড়ি—পড়তেই তো চাই—ব্যাচেলারের একটা নেশা তো চাই। তখন কে জোগান দেবে আমাকে?

আমি, নিবিড় হয় মমতাজের বাহুবন্ধন। আমি গো জানি। আমার মধ্যে থেকেই তুমি পাবে সব সুখ, সব শান্তি, সব নেশা।

যদি সে চালান বন্ধ করে দেয়?

তোমাকে দিলেও আমাকে না দিয়ে পারবে না। মমতাজের গলার স্বর ক্রমশ আরও মথিত হচ্ছে। চোখের তারায় অমানিশা গাঢ়তর হচ্ছে!

স্বর তীব্র করে গজানন—কেন, তুমি কি তার হাতের পুতুল?

একরকম তাই। নাও, স্টার্ট।...

হাত দিয়ে মমতাজের চিবুক ঠেলে সরিয়ে দিল গজানন—তোমার মতো ব্ল্যাক বিউটিকে হাতের পুতুল করতে পারে—সে কে?

সে যে আ-মার গড, এক হাত গজাননের কাঁধ থেকে নামিয়ে নিজের শাড়ি ধরে মমতাজ। শক্ত মুঠিতে হাতের কবজি চেপে ধরে গ্রেট গজানন।

তোমার গড তো একজনই—তোমার স্বামী।

গডফাদার...গডফাদার—

ঠিক এই সময়ে ঝপ করে নিভে গেল ঘরের আলো। স্তব্ধ হল জেনারেটরের শব্দ। সবলে গজাননকে জাপটে ধরে জড়িত ভয়ার্ত স্বরে মমতাজ বলে উঠল—নুরুল হাসান এসে গেছে। ও গড।...

সে কী আলিঙ্গন। অন্ধকারে ঝটাপটি। নাগিনীর বাহুপাশ থেকে মুক্তি পাওয়ার আপ্রাণ প্রয়াস। এরই মাঝে ঘটে গেল অঘটন।

মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল গজাননের। জ্ঞান হারাল সঙ্গে-সঙ্গে।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে গজানন দেখল, আমিনুল হকের ব্রোঞ্জ মূর্তি ঝুঁকে রয়েছে তার ওপর। গজানন চোখ মেলতেই সরে গিয়ে বসল একটা চেয়ারে। হাতে রিভলভার।

গজানন পড়ে মেঝেতে। মাথার ওপর জ্বলছে আলো, আওয়াজ শোনা যাচ্ছে জেনারেটরের।

গজানন বললে, কী ইয়ার্কি হচ্ছে? মাথায় মারল কে? আপনি?

হাতের রিভলভারের কুঁদো দেখাল আমিনুল—মুখে কিছু বলল না।

গজানন বললে, ভারি চোয়াড়ে লোক তো আপনি। অমনি করে মাথায় মারে? ভাগ্যিস একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম—নইলে দেখতেন খেলাটা।

মাথায় চোট পড়লেই বুঝি আপনি খেলেন ভালো? ক্রুর হেসে বলল ব্রোঞ্জ মূর্তি।

লোকে তাই বলে। তখন আমার আর কিছু মনেই থাকে না।

বটে! বটে! মাথায় চোট পড়লে আর কিছু মনে থাকে না। তাই না?

তাই তো বললাম, মিঃ ফোর টোয়েন্টি।

ফোর টোয়েন্টি। আমি?

তা ছাড়া আর কে?

মমতাজ মাথায় চোট মেরেছিল নাকি?

না তো...।

নিশ্চয় মেরেছিল। তারপর আর কী করেছেন, মনে নেই।

কী করেছি? কী মনে নেই? শঙ্কিত হয় গজানন। মেন্ট্যাল ক্লিনিক থেকে বেরোনোর পর ইস্তক এমন অঘটন তো আকছার ঘটছে। না জানি কী করে ফেলল এখানে। অন্ধকারে ঝটাপটির সময়ে অবশ্য হাত চালিয়েছিল গজানন—মমতাজও কী হাত চালিয়েছিল? মাথায় কি মেরেছিল?

গুলগুল চোখে তাকায় গজানন—কী হয়েছে বলুন তো?

জানেন না?

এক্কেবারে না?

লায়ার! মিথ্যুক! উঠে পড়ুন। বেচাল দেখলেই গুলি চালাব। ক্র্যাকশট আমিনুল হক ন'টা মেডেল পেয়েছে গুলি চালানোয়—খেয়াল থাকে যেন।

থাকবে, থাকবে, ভূমিশয্যা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললে গজানন—কী করে ফেলেছি, আগে দেখান।

পাশের ঘরের দরজা খোলা আছে। চৌকাঠ থেকে দেখুন, ভেতরে ঢুকবেন না।

তিন পা যেতেই পাশের ঘরের দরজা। উঁকি মারবারও দরকার হল না। বীভৎস দৃশ্যটা অতিশয় প্রকট দরজার বাইরে থেকেই।

মেঝে থেকে ইঞ্চি ছয়েক উঁচু একটা লাল রঙের ডিভান জাতীয় মখমল শয্যা। তার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে মমতাজ। দু-পা দু-পাশে ছড়ানো। চোখের তারা খোলা।

ডিপ ব্লু শাড়িটা দিয়ে তার দেহটাকে ঢাকা দেওয়া হয়েছে। স্পষ্টত ওই আবরণ ছাড়া তার দেহে আর কোনও আবরণ নেই।

শিউরে ওঠে গজাননের মতো মানুষও। এই তো কিছুক্ষণ আগে প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত ছিল ছন্দমাধুরীতে ভরা ওই দেহটা।

এইটুকু সময়ের মধ্যে প্রাণপাখি উড়ে গেল দেহপিঞ্জর ছেড়ে। কীভাবে? কেন?

অনুক্ত প্রশ্নের জবাবটা এল পেছন থেকে—ধর্ষণ এবং মৃত্যু। জিরো জিরো গজানন, এই একটা চার্জেই আপনাকে আমি ফাঁসাব।

আস্তে-আস্তে ঘুরে দাঁড়াল গজানন। চোখমুখ হাত-পা সব প্রশান্ত।

আমি করেছি?

প্রত্যক্ষ প্রমাণ আদালতে হাজির করব।

তেত্রিশ পাউন্ড পেলেও?

পথে আসুন। কিঙ-এর ঠিকানা?

জানি না।

নির্নিমেষে চেয়ে রইল ব্রোঞ্জ মূর্তি—ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখেছি মানিব্যাগের মধ্যে।

মানিব্যাগ পেয়েছেন?

কথার জবাব দিল না ব্রোঞ্জ মূর্তি—গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে চলুন।

টয়োটা?

হ্যাঁ।

চলুন।

জেনারেটর নিভিয়ে দিয়ে গজাননের পেছন-পেছন বেরিয়ে এল আমিনুল হক। জিরো জিরো বোকা নয়। ক্র্যাকশট এবং ন'টা মেডেল পাওয়া বন্দুকবাজের সঙ্গে চ্যাংড়ামি করতে যাওয়া হঠকারিতা, তা কি সে জানে না!

তা ছাড়া, টয়োটার সিটের তলায় আছে তার পয়েন্ট থ্রি এইট। সিটটায় আগে বসতে হবে, তারপর...

বাড়ি এখন অন্ধকার। টয়োটার পেছনের সিটে আগে উঠে বসল আমিনুল হক। তারপর রিভলভার নির্দেশে সামনের সিটে ওঠাল গজাননকে। দুহাত মাথার ওপর তুলে বসল স্টিয়ারিং হুইলের সামনে। কলের পুতুলের মতো আমিনুলের হুকুম তামিল করে গাড়ি বের করে আনল বনের মধ্যে থেকে। হাইওয়েতে উঠে গাড়ি যখন স্পিড নিয়েছে, তখন পেছন থেকে বললে আমিনুল—মমতাজের লাশের কাছাকাছি আপনার লাশ ফেলাটা ঠিক হত না। ঘরের মধ্যে রক্ত ছড়াতেও চাইনি। এবার তৈরি হতে পারেন।

আমার অপরাধ। তৈরি হয়েই বললে গজানন। তবে সে তৈরিটা কী ধরনের, আমিনুল যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারত...

কুকর্মের সঙ্গী রাখতে নেই, জানেন তো?

ভালো করেই জানি। আমিও একা অপারেট করি।

এবার একাই বেহেস্তে যান। জাহান্নমেও যেতে পারেন।

আমার অপরাধ?

মমতাজকে ধর্ষণ এবং হত্যা।

মিথ্যে কথা।

হেরোইন স্মাগলিংয়ে আপনিও অংশীদার। কিঙয়ের ঠিকানা জেনেই আপনি এসেছেন—

মিথ্যে কথা।

মমতাজও সে ঠিকানা জানত বলে আপনি তাকে খুন করেছেন।

এবার এক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে প্রশ্ন করল গজানন—মমতাজ জানত ঠিকানাটা?

আলবত জানত।

আপনিই তাকে ধর্ষণ করেছেন এবং খুন করেছেন—পেট থেকে ঠিকানাটা জেনে নিয়েই—

এতগুলো কথা লিখতে যতটা সময় গেল, তার চাইতে অনেক কম সময়ে ঘটে গেল অনেকগুলো ঘটনা।

আচমকা ছোট্ট ব্রেক কষল গজানন। আমিনুলের রিভলভারের নলচে ঠেকানো ছিল তার মাথার পেছনে। সামান্য হুমড়ি খেল আমিনুল। নলচে সরে গেল লক্ষ্য থেকে। গজানন এক হাত দিয়ে রিভলভারসুদ্ধ কবজি চেপে ধরল অমানুষিক শক্তি দিয়ে (মাথায় চোট বৃথা যায়নি)—আর এক হাত দিয়ে সিটের তলা থেকে পয়েন্ট থ্রি এইট বের করে সটান গুলি করল আমিনুলের রগ লক্ষ্য করে।

স্টিয়ারিং হুইল ছাড়া গাড়ি তখন এলোমেলোভাবে ছুটছে, পথ থেকে নেমে পড়ছে। একটা গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা মেরে উলটে গেছে।

হাঁচোড়-পাঁচোড় করে জিরো জিরো বেরিয়ে এল ভাঙা দরজায় প্রচণ্ড লাথি কষিয়ে।

ভাঙা কাচে কপাল কেটে রক্ত পড়ছে। স্টিয়ারিং হুইল বুকে চেপে বসে পাঁজরা গুঁড়িয়ে দেয়নি, এই রক্ষে।

কঁ্যাচ করে একটা গাড়ি ব্রেক কষল পাশে।

থাক, থাক, রিভলভার আর লুকোতে হবে না! এই তো মুরোদ! আমি না থাকলে এতটা পথ যেতে কী করে! নাও, উঠে বসো।

পুঁতিবালা! ডিসিপ্লিন ব্রেক করেছিস। কে তোকে এখানে আসতে বলেছে? তোর চাকরি আর নেই।

নেই তো নেই। ঝটপট উঠে বসো। কে কোন দিক দিয়ে এসে পড়বে। এটা হাইওয়ে।

সুবোধ বালক হয়ে গেল গ্রেট গজানন। গাড়ি উড়ে চলল ফাঁকা রাস্তা বেয়ে। পুঁতিবালার এলো চুল লেপটে যাচ্ছে চোখেমুখে। আজ সে এসেছে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে। পরনে টাইট জিনস প্যান্ট আর শার্ট।

বল, কেন এসেছিস? গর্জে ওঠে গজানন।

তোমার মুরোদ দেখতে, মিটি-মিটি হাসছে পুঁতিবালা—ঠিকানা পেয়েছ?

কার?

কিঙের।

না।

হ্যাঁ।

বলছি না।

আমি বলছি হ্যাঁ। আলো নেভবার সঙ্গে-সঙ্গে মমতাজ কী বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল?

তুই সব দেখেছিস?

পেছনের জানলা থেকে।

দ্যাখ পুঁতিবালা, মেয়েটা এত বজ্জাত—

সাফাই গাইতে হবে না, গজাননদা। তোমার সব খেলাই আমি দেখছি। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ। কী নাম বলেছিল মমতাজ?

নাম? নাম?

বলো, বলো, মনে করবার চেষ্টা করো—

মাথায় এমন মারল—

ঠিক তার আগে কী যেন বলে চেঁচিয়ে উঠল?

নু...নু...মনে পড়েছে। পুঁতিবালা, মনে পড়েছে।

নামটা কী?

নুরুল হাসান। বলেছিল, নুরুল হাসান এসে গেছে, ও গড!

নুরুল হাসানই তাহলে মমতাজের গড?

তাই তো দেখছি। ওর স্বামীর নাম—

নুরুল হাসান নয়।

তবে কার নাম?

গজাননদা, তোমার সাগরেদি করে ব্রেনটাকে কীরকম পাকিয়েছি এবার দ্যাখো। এটা কী দেখছ?

টেলিফোন গাইড।

এই শহরের টেলিফোন গাইড। মমতাজের ওপর যখন ধর্ষণ আর মারধর চালাচ্ছে আমিনুল, আমি তখন—

আমিনুল!

আবার কে? ভারি পাজি লোক। কাল রাতেই আমি বুঝেছি।

কী...কী বুঝেছিস তুই?

সে অন্য কথা। মমত্রাজকে জঘন্য ভাবে ধর্ষণ করে ওর মুখ থেকেই নুরুল হাসান নামটা বের করে নেয় আমিনুল। হেরোইন মানুষের আগল আলগা করে দেয়—বিশেষ করে আন্নাকালীর মতো মেয়েদের—

আন্নাকালী!

ওই হল গিয়ে! মমতাজ মানেই আন্নাকালী। গায়ের যা রং—ম্যাগে। যাক যা বলছিলাম, মমতাজের কাছ থেকে নামটা জেনে নিয়ে তাকে অমানুষিক ভাবে পিটিয়ে মেয়ে ফেলে আমিনুল। আমি বাধা দিইনি। অমন মেয়ের ওই দশাই হয়। আমি তখন খুঁজছিলাম টেলিফোন গাইডটা। তারপর পাহারা দিচ্ছিলাম তোমাকে। আমিনুল ট্রিগার টেপবার আগেই—টাইট সার্টের বক্ষদেশ থেকে খুদে রিভলভারটা বের করে দেখাল পুঁতিবালা—পৌরুষ উড়িয়ে দিতাম আমিনুলের।

স্যাডিস্ট!

যা খুশি বলো। আমি গাড়ি চালাচ্ছি—দেখতেই পাচ্ছ। তুমি গাইডখানা দ্যাখো। নুরুল হাসান নিশ্চয় বড় দরের লোক। কিঙ-য়ের আসল নাম যদি নুরুল হাসান হয়—টেলিফোন তার নামে থাকবেই। দ্যাখো।

ভালো ছেলের মতো ছুটন্ত গাড়িতে গাইডের পাতা উলটে গেল গজানন। পাওয়া গেল নুরুল হাসানের নাম আর ঠিকানা।

হাসল পুঁতিবালা—আমিনুল জানত তুমিও ঠিক এইভাবে পেয়ে যাবে ঠিকানা। তাই বধ করতে চেয়েছিল তোমাকে। দাদা গো, এখন বলো কী করতে চাও।

বধ করব।

কাকে?

কিঙকে।

তবে চলো—এখুনি।

হাইওয়ে থেকে একটু ভেতরে বাড়িটা। দোতলা। পেট্রল পাম্পে জিগ্যেস করতেই পাওয়া গেল পথনির্দেশ।

গাড়ি দূরে রেখে ভাইবোন এগিয়ে গেল মরণের টঙ্কার বাজাতে।

দুজনেই এগোল বাড়ির সামনের দরজার দিকে। পেছনে পাহারা থাকতে পারে। সেখানে অন্ধকার। সামনে কেউ থাকবে না। এখানে আলো।

দরজা খোলাই রয়েছে। কোনও গোপনতা নেই। আর পাঁচটা গেরস্থ বাড়ির মতোই। করিডরে জ্বলছে আলো।

চৌকাঠ পেরিয়েছে গজানন, এমন সময়ে পাশের দেওয়ালের খুপরি থেকে একটা ষণ্ডামার্কা লোক বেরিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে।

কী যেন বলতেও গেল। কিন্তু বলবার অবকাশ ছিল না গ্রেট গজাননের। মাথার

চোট পেয়ে তখন তার কোষগুলো নিদারুণ টনটনে—

ফলে, এক হাতে তার মুখ চেপে ধরল গজানন, আর এক হাতের ছোট্ট ছুরিটা বসিয়ে দিল তার বুকে।

নিষ্প্রাণ দেহটাকে আস্তে-আস্তে শুইয়ে দিল মেঝেতে।

এবার তার চোখ জ্বলছে। গজানন রক্ত দেখেছে। গজানন রেগেছে।

খুশি হল পুঁতিবালা।

করিডরের শেষে একটা ঘরে কারা যেন কথা কইছে।

পা টিপে-টিপে দুজনে এগিয়ে গেল দরজার পাশে।

ভারি গলায় একজন বলছে—মমতাজের ওপর হুকুম আছে গজাননকে পটাসিয়াম সায়ানাইড দিয়ে চলে আসবে এখানে।

শুনেই মাথার চুল খাড়া হয়ে যায় গজাননের। কী নৃশংস মেয়েছেলে রে বাবা! হেরোইনের নাম করে পটাসিয়াম সায়ানাইড খাওয়ানোর প্ল্যান করেছিল তাকে। পুঁতিবালা কি সাধে বলে আন্নাকালী! ভগবান বাঁচিয়েছেন।

ভারি গলায় আবার বললে—দরজা খোলাই আছে—মমতাজের এত দেরি হচ্ছে কেন বুঝছি না। কী হে কেমিস্ট, তুমি আর দেরি কোরো না। মাল খাঁটি আছে কিনা টেস্ট করে বলে দাও, ওজন করে ভাগ করে দাও।

ভাঙা গলায় একজন বললে—তাই হোক বস্। দেনাপাওনা এখানেই মিটে যাক। যে যার মাল ইন্ডিয়ায় নিয়ে যাক। পেছনে ফেউ যখন লেগেছে।

ভারি গলায় বললে—ক'ভাগ হবে তাহলে?

সরু গলায় একজন বললে—চার ভাগ। আপনি রাখবেন?

ভারি গলা—না।

সরু গলা—তাহলে তিনভাগ হোক। আমার বাইশ পাউন্ড।

ভাঙা গলা—আমার বাইশ পাউন্ড।

হেঁড়ে গলা—হেঁ-হেঁ, আমারও বাইশ পাউন্ড।

দোরগোড়ায় শোনা গেল বজ্রগর্জন—আমার ছেষট্টি পাউন্ড।

সবেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পাঁচটা লোক। প্রত্যেকেই ভীষণ চমকে উঠে তাকিয়ে দরজার ফ্রেম জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা কালান্তক যমদূতের মতো মানুষটার দিকে। কে রে বাবা? মানুষ না অসুর? ঝাঁকাল চুল ফুলেফেঁপে বিচ্ছিরি কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে আছে মাথার চারপাশে। চোখ দুটো দু-টুকরো জ্বলন্ত কয়লার মতো গনগনে রাঙা। চাহনিও পৈশাচিক...অমানুষিক।

সবার আগে কিঙ সামলে নিল। দীর্ঘদেহী যে পুরুষ মূর্তি—ভারি গলাটা তারই। মাথার সামনে টাক, পেছনে লম্বা চুল। টিকোলো নাক। জমিদারি গোঁফ। রীতিমতো কর্তৃত্বব্যঞ্জক খানদানি চেহারা।

বললে ভারি গলায়—গজানন?

জিরো জিরো গজানন। বলতে-বলতে টেবিলে স্তূপাকার ছেষট্টিটা পলিথিন প্যাকেট দেখে নিল গ্রেট গজানন। সাদা মিহি গুঁড়ো প্রতিটি প্যাকেটে। নিক্তি হাতে নিয়েই দাঁড়িয়ে উঠেছে যে চশমাধারী ভদ্রলোক-ভদ্রলোক মানুষটা, ওই নিশ্চয় কেমিস্ট। না। ওকেও বাদ দেওয়া যাবে না। এ ঘরের সবাই পাজি। তাই এ ঘর ছেড়ে কেউ জীবন্ত বেরোতে পারবে না। এ ঘরের এক কণা সাদা গুঁড়োও ভারতের মাটিতে পৌঁছবে না।

মৃত্যুর দ্রিমি-দ্রিমি ডম্বরুধ্বনি বোধহয় আগেই শুনতে পেয়েছিল ভারি গলার অধিকারী লম্বা লোকটা। একটুও না নড়ে বললে—ওয়েলকাম; মাই ফ্রেন্ড। তিন ভাগ নয়, চার ভাগই হোক।

মহাশয়ের নাম?—গজাননের গলায় কি করাত বসানো? কথাগুলো কানের মধ্যে দিয়ে কেটে-কেটে বসে যাচ্ছে কেন?

নুরুল হাসান।

ওরফে কিঙ।

ইয়েস।

এরপর আর কোনও কথাই হল না ঘরের মধ্যে। শুধু শোনা গেল গুলির শব্দ।

বাইরের হাইওয়েতে সে আওয়াজ পৌঁছেছিল। আতশবাজি পোড়ানো হচ্ছে মনে করেই কেউ কান দেয়নি।

মাত্র পাঁচটা বুলেট খরচ করেছিল গজানন আর পুঁতিবালা। তিনটে জিরো জিরো—দুটো তার সাগরেদদের।

প্রথম বুলেটটা অবশ্য জিরো জিরোর। কিঙ-য়ের দুই ভুরুর ঠিক মাঝখান দিয়ে করোটিতে প্রবেশ করেছিল গরম সীসের টুকরোটা।

টেবিলের ওপরেই ছিল ব্যাগ। ছেষট্টিটা প্যাকেট তার মধ্যে ভরে বেরিয়ে এসেছিল ভাইবোন স্পাই কোম্পানি।

দিন কয়েক পরেই 'ত্রিশূল' দপ্তরের রামভেটকি সুরকিওয়ালার টেবিলে প্যাকেটগুলো সাজিয়ে রেখে শুধু বলেছিল গজানন—সরি, লাশ সাতটা আনতে পারলাম না।

***'ঘরোয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত। (শারদীয় সংখ্যা।)*

আবার জিরো জিরো গজানন

বেপারিটোলা লেনের অত্যাধুনিক অফিসকক্ষে বসে জিরো জিরো গজানন ওরফে বেলেঘাট্টাই গজানন টেবিলের ওপর দু-পা তুলে দিয়ে পাইপ টানা প্র্যাকটিস করছে। এককোণে টাইপরাইটার নিয়ে বসে উদাসভাবে কাচের জানলা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট মিস প্রীতি বল ওরফে পুঁতিবালা। বোধহয় নাগরের কথা ভাবছে।

জিরো জিরো গজাননের প্রথম কাহিনি যাঁরা পড়েছেন, তাদের কাছে এই দুজনের নতুন পরিচয় দেওয়ার আর দরকার নেই। গজানন একসময়ে ছিল মেন্ট্যাল ক্লিনিকে—রাগের মাথায় লরির ওপর লাফিয়ে উঠে এক লাথিতে উইন্ডস্ক্রিন চুরমার করে ড্রাইভার-ট্রাইভার সবাইকে পিটিয়ে ঠান্ডা করার পরেই তার মাথার গোলযোগ দেখা যায় এবং বন্ধুরা টেনে হিঁচড়ে তাকে নিয়ে যায় পাগলের ডাক্তারের কাছে। ওষুধ নয়, স্রেফ বাক্যের মহিমায় সুস্থ হয় গজানন এবং ডাক্তারের নির্দেশে প্রতিভাকে কাজে লাগায় দেশের স্বার্থে।

অর্থাৎ স্পাইয়ের ব্যবসা করে। এ ব্যবসায় মারপিট উত্তেজনা হাঙ্গামা আছে, প্রাণটা যখন-তখন পালাই-পালাই করে এবং সেইটাই গজাননের প্রচণ্ড রাগী ব্রেনটাকে বরফের মতো ঠান্ডা রেখে দেয়।

পুঁতিবালাকে সে সংগ্রহ করেছে হিন্দ সিনেমার সামনে থেকে। সন্ধের দিকে দাঁড়িয়ে কাপ্তেন পাকড়াবার ফিকির আঁটছিল চটুল চোখের ঝলক হেনে, অভাবে স্বভাব নষ্ট আর কী! দেখেই মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠেছিল জিরো জিরো গজাননের।

তার ওই ঝাঁকড়া অসুর মার্কা চুলের রুদ্রমূর্তি আর তীব্র চাহনি দেখেই প্রমাদ গুনেছিল পুঁতিবালা। কিন্তু পালাবে কোথায়? গজানন তাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট বানিয়েছে, তবে ছেড়েছে। তবে বয়সের ধর্ম তো যায় না। শিকার ধরতে বেরোলেই শ্রীমতী পুঁতিবালা একটু-আধটু এদিক-ওদিক করে বসে। গজানন তা জানে। বকে। দরকার হলে চাঁটি-টাঁটিও মারে। দু-জনের মধ্যে কিন্তু ভারি মিষ্টি ভাইবোনের সম্পর্ক।

এই গেল গজানন-পুঁতিবালার ইতিবৃত্ত। দার্জিলিঙে হিপনোটিক কিলারদের বিরাট গ্যাংটার বারোটা বাজানোর পর থেকে গজাননের দক্ষিণা আর খাতির দুটোই বেড়ে গেছে। ইন্টারন্যাশনাল সিক্রেট সোসাইটি 'ত্রিশূল' এখন আর তাকে ব্যঙ্গার্থে নেকনজরে দেখে না, সত্যি-সত্যিই নেকনজরে দেখে এবং জটিল প্রাণঘাতী কেস না হলে তাকে তলব করে না।

গজাননের সুবিধে হচ্ছে সে একাই অ্যাকশনে নেমে পড়ে। ইন্ডিয়ান আর্মির রেড ডেভিল কম্যান্ডোদের মতো। হয় কাজ শেষ করে ফরসা হয়ে যাও, নইলে মরো—এই হল তার সোজা সরল কাজের দর্শন। কারও সাহায্য চাই না। 'এসেছি একলা, যাইব একলা, কেউ তো সঙ্গে যাবে না'—জিরো জিরো গজাননের এটা একটা প্রিয় গান। আর একটা প্রিয় গান হল, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে।' গজানন লেখাপড়া শেখবার চান্স পায়নি—কিন্তু গুরুদেবকে বেশ শ্রদ্ধা করে।

হঠাৎ পাইপ টানা বন্ধ করল গজানন। সাদা প্রিয়দর্শিনী টেলিফোনের পাশে লাল ইলেকট্রনিক আলোটা জ্বলছে আর নিভছে।

ত্রিশূল-এর টেলিফোন এসেছে। এসব কারিগরি ত্রিশূল কর্তৃপক্ষদের। স্পেশাল এজেন্টের স্পেশাল ব্যবস্থা তারাই করে দিয়ে গেছে।

মুখ থেকে পাইপ এবং টেবিল থেকে পা দু-খানা ঝট করে নামিয়ে নিয়ে রিসিভার তুলে নিল গজানন। মেরুন কালারের টি-শার্টের ওপর সাদা যন্ত্রটাকে প্রায় ঠেকিয়ে সদ্য রপ্ত করা ইয়াঙ্কি টানে বললে—'ইয়া...ইয়া...দিস ইজ জিরো জিরো গজানন।'

ওপার থেকে ভেসে এল রামভেটকি সুরকিওয়ালার অতীব মধুর কণ্ঠস্বর—'গজানন, মাই ডিয়ার গজানন, আর ইউ ফ্রি নাউ?'

'আই অ্যাম অলওয়েজ ফ্রি ফর দ্য কানট্রি।' এ ক'টা কথাও লিখে-লিখে প্র্যাকটিস করে নিয়েছে গজানন। দু-চারটে ইংলিশ বুকনি না ছাড়লে এ লাইনে প্রেস্টিজ থাকে না।

'গজানন, মাই সুইট গজানন, এখুনি চলে আসুন; ভেরি সুইট গলায় বললে রামভেটকি সুরকিওয়ালা—যার চোদ্দো পুরুষেও রামছাগল, ভেটকি মাছ বা সুরকির ব্যবসা করেনি। গুপ্তচর পেশায় নাকি অদ্ভুত-অদ্ভুত নাম নিলে শত্রুপক্ষের গায়ে কাঁটা দেয়। রামভেটকি সুরকিওয়ালাকে এমনিতে দেখলেও অবশ্য গায়ে কাঁটা না দিয়ে যায় না।

গজাননের সঙ্গে অনতিকাল পরেই দেখা হল এহেন লোমহর্ষণকারী পুরুষটির। ছোট্ট একটা বুলেট-প্রুফ ঘরের মধ্যে বসে তাড়ি খাচ্ছিল রামভেটকি। তাড়ি খেলে নাকি হাঁপানি সেরে যায়। তাই হুইস্কি ছেড়ে তাড়ি ধরেছে অতিশয় কদাকার এবং রীতিমতো ভয়ানক এই মানুষটা। মানুষের আগের কোন এক পুরুষ গরিলা ছিল। কীভাবে জানা নেই, বিধাতার দুর্বোধ্য লীলাহেতু বহু জন্ম পারের সেই বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে রামভেটকি জন্ম নিয়েছে। গুলি বিনিময়ের ফলে একটা কান হারিয়েছে। বুকেও একটা ফুটো আছে—সেই থেকেই হাঁপানির ব্যয়রাম, ডাইরেক্ট অ্যাকশনে আর নামতে পারে না। কিন্তু ডাইরেক্ট ডিসিশন নিতে তার জুড়ি নেই। ব্ল্যাক ক্যাট কম্যান্ডো ছিল সে এক সময়ে। যুদ্ধের সময়ে শত্রুপক্ষের পেছনে প্যারাসুট নিয়ে লাফিয়ে নেমেছে, টেলিকমিউনিকেশন সেন্টার ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে, অপারেশনাল হেড কোয়ার্টারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, বড্ড ঝামেলা পাকাচ্ছিল বলে বিশেষ এক কম্যান্ডারকে খতমও করেছে। ফিরে আসার পর এমন প্রস্তাবও উঠেছিল ব্ল্যাক ক্যাট কম্যান্ডোর নাম এখন থেকে ব্ল্যাক গরিলা কম্যান্ডো রাখা হোক।

কিন্তু বেসরকারি সংস্থা 'ত্রিশূল' তাকে টেনে নিয়েছে ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্যে। এখন রামভেটকি সুরকিওয়ালার ডিম্যান্ড দেশে-বিদেশে—আজ কলকাতায়, এক মাস পরে মস্কোয়, তার পরের মাসে হয়তো ওয়াশিংটনে।

এহেন কালান্তক যমের সামনে অকুতোভয়ে দাঁড়িয়ে বললে আমাদের জিরো জিরো গজানন, 'ইয়েস বস্, হোয়াট অর্ডার?'

'গজানন, কেস সিরিয়াস। অবতার সিং খতম।'

'অবতার সিং...অবতার সিং!...কোন অবতার?'

'ননসেন্স! অবতার সিং আমাদের কান্ট্রির বেস্ট সায়েন্টিফিক ব্রেন—মিলিটারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এমন গবেষণা করেছেন যে ভয়ে কাঁটা হয়ে গেছে তামাম দুনিয়া।'

'তাই নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একটু কারেন্ট খবর রাখুন, গজানন। এই যে আইসল্যান্ড সামিট ব্যর্থ হল, গর্বাচভ আর রেগান যে যাঁর দেশে ফিরে গেলেন। কারণ কী? স্টার ওয়ার্সের চাইতেও ভয়ানক যুদ্ধ পরিকল্পনা অবতার সিং মাথায় এনে ফেলেছিলেন বলে। খবরটা হাইলি সিক্রেট—তা সত্ত্বেও লীক আউট হয়ে গেছিল। ফলে আইসল্যান্ডের আইস গলল না—মাঝখান থেকে অবতার সিং-এর মাথাটা গেল।'

'মাথাটা গেল?' বসে পড়ল গজানন। রামভেটকির শেষের কথায় 'মাথাটা' শব্দের ওপর কেন এত জোর দেওয়া হল? নিশ্চয় তার মানে আছে।

'হ্যাঁ, অবতার সিং-এর ব্রেন সমেত মাথাটা উধাও হয়েছে। শুধু চোয়াল আর মাথার পেছন দিকটা গলার সঙ্গে লেগে আছে।'

দমদম এয়ারপোর্ট থেকে হেলিকপ্টারটা কলাইকুন্ডার যেখানে এসে নামল, তার আশেপাশে ধু-ধু মাঠ! বেশ কয়েক বছর আগে এখানে এয়ারফোর্সের মহড়া দেখে গেছিল গজানন। সে এক সাঙ্ঘাতিক দৃশ্য। ভারতীয় বিমানবহর যে কী দুর্ধর্ষ, সেদিন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছিল।

রামভেটকি আগে নামল কপ্টার থেকে। পেছন-পেছন গজানন। এই ফাঁকা মাঠে মুন্ডুহীন একটা দেহ দেখবার প্রত্যাশায় যখন ইতি-উতি তাকাচ্ছে, রামভেটকি তখন

হেলিকপ্টারকে পেছনে ফেলে হেলেদুলে এগিয়ে যাচ্ছে ছোট্ট একটা টিলার দিকে। কপ্টারের বিকট আওয়াজ শোনা গেল পেছনে। সচমকে ঘাড় ফিরিয়ে গজানন দেখলে শূন্যে উড়েছে অতিকায় গঙ্গাফড়িং। একটু কাত হয়ে উড়ে যাচ্ছে যেদিক থেকে এসেছে, সেই দিকেই। দেখতে-দেখতে দিকচক্রবালে হারিয়ে :গেল যন্ত্রযান।

এটা আবার কী ব্যবস্থা? ফেরা হবে কী করে? চমক ভাঙল পেছন থেকে গরিলা বপুর সুমধুর কণ্ঠস্বরে, 'মাই ডিয়ার গজানন, হাঁ করে তাকিয়ে না থেকে চলে আসুন।'

পেছন ফিরল গজানন। রামভেটকি টিলার কাছে পৌঁছে গেছে। এরকম উইয়ের ঢিপির মতো টিলা অজস্র রয়েছে এ অঞ্চলে। বিশেষ এই টিলাটির সঙ্গে রামভেটকির এত প্রণয় কেন বুঝল না।

তবুও পা দুটোকে টেবিল ফ্যানের মতো বনবন করে ঘুরিয়ে পৌঁছে গেল অতীতের ব্ল্যাক কম্যান্ডোর কাছে।

রামভেটকি ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। গজানন জানে ঠিক ওইরকম স্বর্গীয় হাসি হাসতে-হাসতে রামভেটকি যে-কোনও মানুষের টুঁটি কেটে দিতে পারে—চক্ষের নিমেষে, অথবা জামাকাপড়ের অদৃশ্য কোনও অঞ্চল থেকে ফস করে আগ্নেয়াস্ত্র টেনে বের করে বেধড়ক গুলি চালিয়ে যেতে পারে নির্ভুল নিশানায়। রামভেটকি মূর্তিমান আতঙ্ক অকারণে হয়নি।

এহেন জীবন্ত বিভীষিকাটি মিঠে হেসে বুক পকেট থেকে একটা সরু ডটপেন বের করে হেঁট হল টিলার ওপর। এক হাতে খানকয়েক নুড়ি আর কিছু মাটি সরাতেই চোখে পড়ল এক ইঞ্চি বর্গক্ষেত্রের একটা ইস্পাতের পাত। ঠিক মাঝখানে ছোট্ট একটা ফুটো।

ডটপেনের যে জায়গা দিয়ে লেখা হয়, সেই জায়গাটা পেঁচিয়ে খুলে নিল রামভেটকি। কালির ছোট্ট টিউবটাও বেরিয়ে এল সেইসঙ্গে। এবার ডটপেন টর্চের মতো ফোকাস করল ইস্পাতের পাতটার ওপর। পেছনের ক্লিপটা ঘুরোতেই সরু রশ্মি রেখা গিয়ে পড়ল প্লেটের মাঝখানকার ফুটোয়। ক্লিপ আরও ঘোরাতেই সরু হয়ে এল রশ্মি—শেষপর্যন্ত বিন্দুর আকারে স্পর্শ করল ছোট্ট ফুটোটাকে।

সঙ্গে-সঙ্গে ভোজবাজি দেখা গেল চোখের সামনে। বেলেঘাটার মস্তান গজানন এরকম ম্যাজিক জীবনে দেখেনি—সিনেমা টিনেমায় দেখার কথাটা ধর্তব্যের মধ্যে নয় বলে বাদ দেওয়া গেল।

বাঁ-দিকের কাঁকড় ছাওয়া ভূতল নিঃশব্দে সরে গেল পাশের দিকে। চৌকোনা ফোকর বেরিয়ে পড়েছে। সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে।

চোখ ছানাবড়া করল না গজানন। না করার জন্যে ট্রেনিং নিতে হয়েছে বিস্তর। শুধু বললে সহজ গলায়—'যে ফুটোটায় রে ফেললেন, ওটা তো বৃষ্টির জলে নষ্ট হয়েও যেতে পারে।'

ডটপেনের রিফিল লাগিয়ে নিয়ে পকেটে রাখতে-রাখতে বললে রামভেটকি, 'মাই ডিয়ার গজানন, ওই গুপ্ত রহস্যটা আপনাকেও দেখাইনি।'

'মানে?'

'ফুটোর মুখটা ঢাকা ছিল। পায়ের চাপে অনেক আগেই ঢাকনা সরিয়েছি।'

'স্প্রিং টিপে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু স্প্রিং লাগানো বোতামটা কোথায় আছে, তা জানতে চাইবেন না। দেখলেন

না হেলিকপ্টারটাকেও সরিয়ে দিলাম। আমাদের এই গোপন আস্তানার খবর যত কম লোকে জানে, ততই ভালো। আসুন!' বলে সিঁড়িতে পা দিলে রামভেটকি।

একটু পরেই কবন্ধ দেহ দেখে শিউরে উঠল গজানন।

কলাইকুণ্ডার এই তেপান্তরের মাঠের পাতালে এরকম এলাহি কাণ্ডকারখানা কে কবে দেখেছে? গজানন আবার পাগল হয়ে যাচ্ছে না তো?

দু-হাতের দুই মুঠো দিয়ে ঝাঁকড়া চুল খামচে ধরে মাথাটাকে বেশ করে ঝাঁকিয়ে নিল জিরো জিরো গজানন। স্পেশাল কম্যান্ডো ট্রেনিং নেওয়ার সময়ে সুবেদার ছাতু সিং ওকে পইপই করে বলেছিল, 'বাপুহে, চুল কেটে ছোট করে নাও। কেউ যেন খামচে ধরে তুলে আছাড় না মারতে পারে।'

ভীষণ রেগে গেছিল গজানন, 'ধরলেই হল? আমার চুল ধরবে আর আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিজের আছাড় খাওয়া দেখব? ধরুন না আপনি...চেষ্টা করে দেখুন।'

গজাননের কটমটে চোখ আর অসুরমার্কা মুন্ডু দেখে সুবেদারের আর সে ইচ্ছে হয়নি। শুধু বলেছিল, 'বুঝবে ঠ্যালা।'

'চুল কাটব না।'

হাজার হোক বাঙালি মস্তান। স্যামসনের চুলের মধ্যেই শক্তি নিহিত ছিল। বাঙালি মস্তানরাও তা বিশ্বাস করে। চুল কাটতে দেবে কেন? চুলের বাহারেই যে আসল বল।

তাই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যেতেই চুল ধরে মাথাটাকে ঝাঁকিয়ে নিল গজানন। অন্য কারও ঘিলু হলে নিশ্চয় নড়ে যেত, কিন্তু জিরো জিরোর ঘিলু যে-সে ঘিলু নয়—নিরেট। তাই অমন প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতেও স্থানচ্যুত হল না।

কী দেখল গজানন? লম্বা করিডর সিঁড়ির একদম নিচের ধাপ থেকে শুরু হয়েছে। শেষ দেখা যাচ্ছে না—কেননা আলোগুলো সব নিভানো রয়েছে। সিঁড়ির মাথা থেকে দেখেছিল নিরন্ধ্র অন্ধকার বিরাজ করছে পায়ের তলায়। শেষ ধাপে পা দিতেই আপনা হতেই দপ করে জ্বলে উঠেছিল গোপন আলো—ঠিক পনেরো ফুট পর্যন্ত করিডর আলোকিত হয়েছিল সেই আলোর আভায়। রামভেটকি হনহন করে এগিয়েছে, যতই এগিয়েছে, ততই সামনের করিডর আলোকিত হয়েছে এবং পেছনের ফেলে আসা করিডর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে।

তাজ্জব হলেও চোখেমুখে তা প্রকাশ করেনি গজানন। সবই অতিরিক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা অতি সাবধানতা। দৈবাৎ যদি পাতাল ঘাঁটিতে কেউ প্রবেশ করে, অন্ধকারে নিশ্চয় টর্চ ফেলবে...

ফেলেওছিল গজানন। সিঁড়ির মাথা থেকেই অন্ধকারকে টিপ করে পেনসিল টর্চ ফোকাস করেছিল।

সঙ্গে-সঙ্গে অভূতপূর্ব কাণ্ড। সিঁড়িটা আচমকা লাল আলোয় ছেয়ে গেছিল। দু-পাশের দেওয়ালের গায়ে সারি-সারি ফোকর আবির্ভূত হয়েছিল এবং প্রত্যেকটা ফোকর দিয়ে একটা করে কালচে ইস্পাতের আগুন বর্ষণ করার নল বেরিয়ে এসেছিল। সবক'টা নল ফেরানো টর্চ যে ধরে রয়েছে তার দিকে। অর্থাৎ গজাননের দিকে।

মেঘমন্দ্র চ্যালেঞ্জ শোনা গেছিল স্পিকারে—পাতাল পথ গমগম করে উঠেছিল সেই আওয়াজে, 'হু ইজ দেয়ার?'

চকিতে পেছন ফিরে হতচকিত গজাননের হাত থেকে পেনসিল টর্চ ছিনিয়ে নিয়েছিল রামভেটকি সুরকিওয়ালা, স্পিকারে ততক্ষণে কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে।

'থ্রি...টু...ওয়ান...'

'জিরো' বলার আগেই 'ত্রিশূল' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল রামভেটকি, সেইসঙ্গে একটা সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করেছিল। খুবই জটিল এবং খটমট মন্ত্র। কিন্তু কীভাবে জানা নেই, গজাননের গজ-মস্তিষ্কে তা অক্ষরে-অক্ষরে গেঁথে গেছিল।

ঐন্দ্রীকুলিশপাতেন শততো দৈত্যদানবাঃ।

পেতুর্বিবদারিতাঃ পৃথ্বাং রুধিরৌঘ প্রবার্ষিণঃ।।

ব্যস, অমনি লাল আলো গেল মিলিয়ে, তার আগেই রোমাঞ্চিত কলেবরে গজানন প্রত্যক্ষ করে নিয়েছিল, সারি-সারি নলগুলোও অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ফোকরগুলোর মধ্যে।

ভয়ের চোটে যে গা ঘামে, তা সেদিন হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করেছিল গজানন। কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে কাষ্ঠ হেসে জিগ্যেস করেছিল রামভেটকিকে, 'ওটা কীসের মন্ত্র, বস্?'

'চণ্ডীপাঠ করলাম। প্রতিবার শ্লোক পালটায়। মুখস্থ করেও লাভ নেই। ইডিয়ট। আর আলো জ্বালাবেন না।'

না, আর আলো জ্বালায়নি গজানন। শুধু তখনই মাথার চুল খামচে ধরে ঘিলু নাড়ানোর চেষ্টা করে ধাতস্থ হয়েছিল এবং তারপরেই দেখেছিল, পরের পর অদৃশ্য আলো জ্বলছে আপনা থেকেই করিডর বেয়ে এগোনোর সঙ্গে-সঙ্গে। সুবোধ অনুচরের মতো রামভেটকির পেছনে-পেছনে যেতে-যেতে দেখেছিল দু-পাশে সারি-সারি দরজায় সংস্কৃত অক্ষরে একটা করে লাইন লেখা রয়েছে। গজানন আবার সংস্কৃত পড়েনি। কোনও ল্যাঙ্গ য়েজই ভালোভাবে পড়েনি, সংস্কৃত বয়কট করেছিল বাল্যকালেই। তাই মানে বুঝতে পারেনি। কিন্তু রামভেটকি টোলের পণ্ডিতের মতো প্রতিটি নামের ওপর চোখ বুলিয়ে বিড়বিড় করে পড়তে-পড়তে সহসা থমকে দাঁড়াল একটা দরজার সামনে। পাল্লায় হাত বুলিয়ে অদৃশ্য কোনও বোতামে চাপ দিল বোধহয়—নিঃশব্দে পাল্লা সরে গেল পাশে।

আলো ঝলমল ঘরের মধ্যে দেখা গেল...

পুরো ঘরটাই খুব সম্ভব অ্যালুমিনিয়াম জাতীয় ধাতুর প্লেট দিয়ে মোড়া। এমন কিছু পেল্লাই ঘর নয়। লম্বায় চওড়ায় বড় জোর দশ ফুট। ঠান্ডা কনকনে ঘর। মনে হল যেন এইমাত্র ফ্রিজের পাল্লা খোলা হল। ভেতরে পা দিতেই গজাননের হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠল শুধু ঠান্ডায় নয়, টেবিলের ওপর রাখা বস্তুটি দেখে।

একটাই মাত্র টেবিল ঘরের ঠিক মাঝখানে। চকচকে স্টেনলেশ স্টিলের। তার ওপর শায়িত বস্তুটাকে এখন বস্তুই বলা উচিত, কেননা, যার মধ্যে প্রাণের নাচানাচি নেই, তাকে বস্তু বলাই সঙ্গত।

এই যে বস্তুটা জিরো জিরো গজাননের হাড় পর্যন্ত কালিয়ে দিল, এর হাত-পা-বুক-পেট অবিকল মানুষের মতোই। কিন্তু মানুষ নামক প্রাণীটার মুন্ডু বলেও একটা জিনিস থাকে ধড়ের আগায়—এর তা নেই।

শুধু নেই বললে কম বলা হবে, মুন্ডু যেখানে থাকবার কথা, সেখানে রয়েছে কাটা নখের মতো একফালি চোয়াল আর চিবুক। মুখের ওপর দিকটা অবিশ্বাস্যভাবে গোল করে কেটে নেওয়া হয়েছে। চোয়ালের আর চিবুকের হাড় মাখনের মতো যেন কেটে গেছে

শল্যচিকিৎসক ছুরিতে। কিন্তু এক ফোঁটা রক্ত নেই। চুঁইয়েও পড়েনি। ক্ষত মুখ বেমালুম জুড়ে গেছে।

পেটের মধ্যে গুলতানি শুরু হয়েছে টের পেল গজানন। এরকম তো কখনও হয় না। বেলেঘাট্টাই গজানন মুন্ডুহীন ধড় অনেক দেখেছে, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল হাসপাতালের মর্গে উঁকি মেরে দেখেছে কবন্ধ দেহ (ফুটবল পেটানোর ফাঁকে-ফাঁকে), কিন্তু মানুষের মুন্ডু নিয়ে এরকম বিচ্ছিরি কারবার কখনও দেখেনি।

চিত্রার্পিত, মানে, ছবির মতোন দাঁড়িয়ে থাকা গজাননের পাশে এসে দাঁড়িয়ে রামভেটকি বললে, 'এই হচ্ছে অবতার সিং।'

ঢোক গিলে গজানন বললে, 'কালী—কালী...' (গজানন সার্বজনীন কালী পুজোর বিরাট পাণ্ডা ছিল এককালে)—'অবতার সিং বলে চিনব কী করে?'

'আপনি জীবনে দেখে থাকলে তো চিনবেন। আমরা দেখেছিলাম। এখন চিনেছি ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলিয়ে দেখে।'

'অবতার সিং!'

আধ কলসি জল ঝাঁকুনি দিলে যেরকম আওয়াজ হয়, প্রায় সেই ধরনের একটা আওয়াজ বেরোল রামভেটকির গলা দিয়ে। হাসি না হাহাকার ঠিক বোঝা গেল না।

বললে, 'না, অবতার সিং নন।'

চমকে উঠল গজানন। এত জোরে পাশের দিকে মুন্ডু ঘোরাল যে ঝাঁকড়া চুল চোখে মুখে এসে পড়ল।

বললে স্খলিত স্বরে, 'একবার বলছেন অবতার সিং, আবার বলছেন অবতার সিং নন। মানে...মানেটা কী?'

'মাই ডিয়ার ডিয়ার গজানন, হুঁশিয়ার হতে হয় এ লাইনে গোড়া থেকেই। অবতার সিং অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন, এই আশঙ্কায় আমরা নকল অবতার সিংকে বাজারে ছেড়ে রেখেছিলাম—আসল অবতার সিং এখন বহাল তবিয়তে আছেন আমাদের গোপন আস্তানায়।'

'আসল নকল।' গজানন ঈষৎ বিমূঢ়।

'ইয়েস, ইয়েস, মাই—'

'নকলকে পেলেন কোত্থেকে?'

'যমজ ভাই অবতার সিং-এর।'

'কালী! কালী!'

'জিরো জিরো গজানন,'—অকস্মাৎ কঠিন হয়ে ওঠে রামভেটকির স্বর, 'এ কাজ নিতে পারবেন?'

'মুন্ডুকাটাদের ঠিকানা বার করতে হবে?'

'হ্যাঁ। এভাবে মুন্ডু উড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা কারা ঘটাতে পারে, তারা কোন দেশের মানুষ কীভাবে ঘটায়—সব জানতে হবে। দেশের স্বার্থে।'

'দেশের স্বার্থে; প্রতিধ্বনি করল গজানন। কানের মধ্যে অনুরণিত হল ডাঃ বক্সীর উপদেশ, 'দেশের স্বার্থে প্রতিভাকে কাজে লাগাবে গজানন, মস্তানিতে নয়।'

'জীবন যায় যাক, নৃশংস হত্যাকারীকে দরকার হলে হত্যাও করতে হতে পারে।'

'তা আর বলতে, দাঁত বার করে হাসল গজানন। এতক্ষণে বেশ ফ্রি মনে হচ্ছে নিজেকে। কতদিন যে খুনজখম, দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়নি।—'লাশটা পেলেন কোথায়?'

'দুর্গাপুরের জঙ্গলে।'

নক্ষত্রবেগে হাইওয়ে ধরে ছুটে চলেছে গজাননের গাড়ি। লেটেস্ট মডেলের মারুতি। মেরুন কালার। ড্রাইভ করছে নিজেই। হাতে কাজ নিয়ে বেপারীটোলা লেনের অফিস ঘরে বসে থাকবার পাত্র সে নয়। পুঁতিবালাকে রেখে এসেছে অফিস ম্যানেজ করতে। ছুটকো পার্টি এলে ভাগিয়ে দেবে'খন। গা-গতরের ব্যাপার থাকলে নিজেই ভিড়ে যাবে। ভাবতে ভাবতেই মুচকি হাসল গজানন। পুঁতিবালার এই দেহসর্বস্ব তদন্তধারা খুবই বাজে ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু ওই তো বয়স...বয়সের ধর্ম তো থাকবেই, তাছাড়া কাজও হয় বটে...

আচমকা ব্রেক কষল গজানন। সরু রাস্তার ওপর দমাস করে একটা শালগাছ ফেলা হল। এই হল, এইমাত্র। আর একটু আগে ফেললে নির্ঘাত উলটে যেত মারুতি।

হালকা গাড়ি নিমেষে এক পাক ঘুরে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু বগলের তলা থেকে রিভলভারটা টেনে বের করার আগেই ঝনঝন করে জানলার কাচ ভেঙে ঠিকরে এল ভেতর দিকে, সেই সঙ্গে ভীমের গদার মতো একটা শাল কাঠের খুঁটি।

খুঁটির টিপ ঠিক করাই ছিল। রগে ধাঁই করে মারতেই যে-কোনও ভদ্র সন্তানের মতো চোখে সরষের ফুল দেখল গজানন।

সিটে এলিয়ে পড়া দেহটার ঠ্যাং চেপে ধরে এক হ্যাঁচকায় রাস্তার ওপর টেনে নামাল যে দৈত্যটা, আকারে আয়তনে সে দানবসমান হলেও মানুষ। ঘাড় পর্যন্ত লুটোচ্ছে বাবরি চুল। কপালের ওপর দিয়ে একটা বড় চিত্রবিচিত্র রুমাল মাথার পেছন দিকে গিঁট দিয়ে বাঁধা। পরনে ঢিলে পায়জামা আর পাঞ্জাবি—দুটোই রঙিন ছিটের! মুখখানা রোদেপোড়া। গোঁফ আর দাড়ি প্রায় জঙ্গলের মতো বললেই চলে—কুচকুচে কালো।

যে শালকাঠের খুঁটি দিয়ে গজাননের জ্ঞানলোপ করা হয়েছে, সেটা এক হাতেই ছিল। চটি পরা পা দিয়ে জিরো জিরোর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা দেহটাকে ঠোক্কর মেরে চিৎ করে শোয়াল মানুষ-দানব। তারপর হাতের খুঁটি দু-হাতে বাগিয়ে ধরে আর একটা মোক্ষম ঘা মারল গজাননের মাথায়।

জিরো জিরোর মাথা বলেই রক্ষে, সাধারণ মানুষের মাথা ওই চোটেই দু-ফাঁক হয়ে যেত। কিন্তু শৈশব থেকেই গজাননের মাথার খুলির হাড় খুব মোটা—বোধহয় মোটা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই স্রষ্টা মাথার ডিজাইনটা করেছিলেন।

খটাং করে করোটিতে চোট পড়তেই গজাননের ব্রেনের ভেতরে রাশি-রাশি নিউরোণের মধ্যে নিমেষে অজস্র সঙ্কেত বিনিময় ঘটে গেল। মগজের রহস্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মগজ বিশারদরাও আজও জানতে পারেননি—গজাননের মতো সৃষ্টিছাড়া মগজের খবর কে রাখে?

চক্ষের পলকে চনমন করে উঠল গজাননের সমস্ত সত্তা। ঠিক যেন প্রলয় ঘটে গেল কোষে-কোষে, সেন্টারে-সেন্টারে। মুহূর্তের মধ্যে—সটান উঠে বসল গজানন। এ আর এক গজানন। বেলেঘাটাই গজানন। চোখ জ্বলছে। দাঁত কিড়মিড় করছে।

মাথার খুলি দু-ফাঁক হওয়া দূরে থাক, এ যে উঠে বসেছে! তাকাচ্ছে অমানুষিক চোখে! দানোয় পেল নাকি? মারাদাঙ্গা দানবটা ক্ষণেকের জন্যে ঘাবড়ে গেছিল।

ওইটুকু সময়েরই দরকার ছিল গজাননের। পুরো শরীরটা বসা অবস্থাতেই শূন্যে ছিটকে গেল বিশাল আততায়ীর দিকে। (এই প্যাঁচটা জনৈক ব্ল্যাকবেল্ট ক্যারাটে মাস্টারের কাছে শিখেছে গজানন) এবং ছ'ফুট শূন্যে উঠেই জোড়া পায়ের সজোর লাথি কষিয়ে দিল খুঁটিধারীর চোয়াল লক্ষ্য করে।

চোয়াল ভেঙে গেল আততায়ীর। কয়েকটা দাঁত ছিটকে পড়ল এদিকে-সেদিকে এবং সেইসঙ্গে নিজেও উলটে পড়ল পেছন দিকে।

গজানন শূন্য থেকে অবতীর্ণ হল তার বিশাল বপুর ওপর এবং পলকের মধ্যে দমাদম ক্যারাটে মার মেরে গেল চোখ, নাক টুঁটি লক্ষ্য করে। ফলে লোকটা চোখে অন্ধকার দেখল, ভাঙা নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে টের পেল এবং কণ্ঠনালীর বারোটা বাজায় বিষম শব্দে কাশতে লাগল।

কিন্তু নাম তার খান বুদোশ। জিপসীদের পাণ্ডা খান বুদোশ। পূর্বপুরুষদের ইরানি রক্ত বইছে ধমনী-শিরায়। দু-হাজার জিপসী তার কথায় ওঠে-বসে। পয়সার বিনিময়ে হেন কাজ নেই যা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

খান বুদোশের মুখে লাথি? গায়ে হাত? চোখে এমনিতেই অন্ধকার দেখছিল খান বুদোশ, এবার যন্ত্রণায় বুদ্ধির আলোও গেল নিভে। বিকট জিপসী হুঙ্কার ছেড়ে পাঞ্জাবির তলা থেকে টেনে বের করল রিভলভার এবং ট্রিগার টিপে গেল আন্দাজে জিরো জিরোকে তাগ করে।

নিস্তব্ধ বনভূমি শিউরে ওঠে হুঙ্কার এবং গুলিবর্ষণের শব্দে। বনের মধ্যে থেকে শোনা গেল আরও কয়েকজনের চিৎকার। হই-হই করে ছুটে আসছে। চেঁচাচ্ছে অনেকগুলো কুকুর।

আসছে খান বুদোশের সাঙ্গপাঙ্গরা। ইরান যাদের নাগরিক অধিকার দেয়নি—তারা। ইরানে ফিরতে না পেরে বনের নেকড়ের মতো রয়েছে যারা—তারা।

তারা এসে পড়লে গজাননের মুন্ডু নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলা হত নিঃসন্দেহে, হাত-পা-ধড় চিবিয়ে খেত উপোসী কুকুরগুলো।

কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল একটা আশ্চর্য ব্যাপার।

খান বুদোশ রিভলভার ধরতেই বিদ্যুৎগতিতে গজানন সরে গেছিল নিরাপদ দূরত্বে। দমাদম শব্দে গুলিগুলো এদিক-ওদিক ধেয়ে যাচ্ছে দেখে নিঃশব্দে শিস দেওয়ার ভঙ্গি করেছিল আপনমনে। মাথার মধ্যে সেই চিড়বিড়ে ভাবটাও অনেক কমে এসেছে।

এমন সময়ে জঙ্গলের গহনে শোনা গেল আগুয়ান কোলাহল।

সচকিত হল জিরো জিরো। কী করবে ভাবছে, অতর্কিতে বনের মধ্যে থেকে কক্ষচ্যুত উল্কার মতো ধেয়ে এল যেন সাক্ষাৎ বনদেবী।

অহো! অহো! কী রূপ! কী বিম্বাধর। কী তনুবর! কী বক্ষদেশ! টাইট জিন প্যান্ট আর গেঞ্জি পরা এহেন রূপসী শরীরী বিদ্যুতের মতো ছুটে এসে গজাননকে বলল, 'কুইক। খান বুদোশকে তুলুন গাড়ির মধ্যে।'

'খান বুদোশ।' ফ্যালফ্যাল করে অপরূপার দিকে চেয়ে বললে গজানন।

'আমাকে দেখবার অনেক সময় পাবেন।' (অসহিষ্ণু স্বর বিম্বাধরার—'ওরা যে এসে গেল।' বলেই কোত্থেকে একটা রিভলভার বের করে দমাস করে মারল খান বুদোশের মাথায়। বেশ ভালো মার। জ্ঞান হারাল জিপসী-পাণ্ডা। ওদিকে গাছপালাদের ফাঁক দিয়ে দলে-দলে বেরিয়ে আসছে রংবেরঙের পোশাক পরা জিপসীদের দল।

দেখেই টনক নড়ল জিরো জিরোর। শুধু জিগ্যেস করলে, 'সুন্দরী, কে আপনি?'

'ত্রিশূল।'

'ও মাই গুডনেস,' বলেই বীর বিক্রমে খান বুদোশকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দিল মারুতির পেছনের সিটে। ত্রিশূল সুন্দরীও সেখানে বসে পকেট থেকে নাইলন দড়ি বের করে বাঁধতে লাগল জিপসী সর্দারের হাত পা।

ততক্ষণে গাড়ি ঘুরে গিয়ে ছুটছে কলকাতার দিকে—টপ স্পিডে। মাথার ফুলোটায় হাত বুলোতে-বুলোতে 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' গানটা গলা ছেড়ে গাইছে গজানন।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে মাথা ঠান্ডা করে ফেলল গজানন। 'ত্রিশূল' সংস্থাটার শুধু টাকার জোর নেই, রুচিও আছে বটে। খাসা বাংলো-বাড়ি! দার্জিলিংয়ে-কালিম্পঙে যেমন কটেজ প্যাটার্নের দোতলা বাড়ি দেখা যায়, (গজানন শুনেছে বিলেতেও নাকি এমনই বাড়ি আছে) —অবিকল সেই ধরনের ছিমছাম বাড়ি গড়ে তুলেছে সল্টলেকের এই নিরালা সেক্টরে। চারপাশে অনেকখানি বাগান—মাঝে তন্বী শিখরদশনা পীন পয়োধরার মতো এই বাড়ি। বাস্তবিকই মনোরম।

ত্রিশূল সুন্দরীর নাম এলোকেশী, নামটা শুনে প্রথমে হেসেই ফেলেছিল গজানন। এলোকেশী তো তার পিসির নাম। ন্যাড়ামাথা বুড়িকে কতই না খেপিয়েছে গজানন। আর এই ডানাকাটা অপ্সরীর নাম কিনা এলোকেশী। যার চুল এলিয়ে দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কারণ চুল তো ব্যাটা ছেলের মতো ছোট-ছোট করে কাটা।

এলোকেশী মুক্তাহাসি হেসে গজাননকে নিয়ে এসেছে সল্টলেকের এই ডেরায়। একাই থাকে নাকি এখানে। দেশবিদেশ থেকে ত্রিশূল এজেন্টরা এলে নিশ্চয় ওঠে এখানে। এলোকেশী অবশ্য তা বলেনি, বুঝে নিয়েছে গজানন।

অচৈতন্য খান বুদোশকে একতলার হলঘরে শুইয়ে এলোকেশী গেল একটা দেওয়ালের সামনে। গজাননকে বললে, 'আপনি বারান্দায় যান—দোতলায়।'

গজানন এতটা পথ ড্রাইভ করে এসে ভেবেছিল এলোকেশীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ হাস্য পরিহাস করবে অথবা একত্রে রামভেটকিকে ফোন করবে। তাই একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েই হনহন করে চলে গেল দোতলায়।

যাওয়ার আগে আড়চোখে দেখে নিল পকেট থেকে ডটপেন বার করছে এলোকেশী। এই সেই ধরনের ডটপেন যার দৌলতে রামভেটকি পাতাল বিবরের দ্বার উন্মোচন করেছিল। এখানেও নিশ্চয় সেইরকম ব্যাপার ঘটবে। দেওয়াল চিচিং ফাঁক হয়ে যাবে আলিবাবার রত্ন গুহার মতো।

কিন্তু দাঁড়িয়ে দেখবার প্রবৃত্তি হয়নি। এলোকেশী যখন সরাতে চায়, তখন সরেই যাওয়া যাক।

তখন সবে সন্ধে নামছে। সামনের বাগানে আধো অন্ধকার। গজানন সিগারেট ফিগারেট খায় না। পাইপ টানে অথবা নস্যি নেয়। নস্যির ডিবেটা বার করে বাঁ-হাতের তেলোতে বেশ খানিকটা ঢালছে, এমন সময়ে চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল নিচের বাগানে গাছপালার তলা দিয়ে সাঁৎ করে মিলিয়ে গেল একটা ছায়ামূর্তি।

হাতের নস্যি থেকে চকিতে চোখ তুলেছিল গজানন। কিন্তু ছায়ামূর্তি যেন হাওয়ায়

মিলিয়ে গেছে। ওপর থেকে ভালো করে ছাই দেখাও যায় না। কাজেই নস্যিটাকে সশব্দে নাকের ফোকরে চালান করে দিয়ে প্রবল বেগে নেমে এল নিচের তলায়। সামনের ঘরটা পেরিয়ে তবে যেতে হবে বাগানে। কিন্তু ঘরটা আর পেরোতে হল না।

সোফা থেকে গড়িয়ে পড়েছে খান বুদোশ। পুরো বুকখানা জুড়ে রয়েছে একটা গোল গহ্বর। ধড়ের ঠিক মাঝখানে এরকম খাঁ-খাঁ শূন্যতা চোখে দেখা যায় না।

গজাননের মনের চোখে ভেসে ওঠে অবতার সিং-এর মুন্ডুহীন ধর। এখানে রয়েছে বক্ষহীন ধড়।

কারা করছে এই কু-কাণ্ড? কীভাবে?

ত্রিশূল-এর গোপনঘাঁটির কি শেষ নেই? গজানন তাজ্জব হয়ে গেল এই কলকাতারই বুকে আর একটা অত্যাধুনিক ঘাঁটি দেখে।

ওকে সল্টলেকের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল রামভেটকি। এলোকেশী গুম হয়ে বসে রয়েছে পাশে। নক্ষত্রবেগে গাড়ি এল দমদম এয়ারপোর্টের দিকে। তারপর ঢুকে গেল একটা বাগানবাড়ির মধ্যে।

খান বুদোশের বক্ষহীন ধড় আগেই পাচার করে দিয়েছিল রামভেটকি।

গাড়ি দাঁড়াতেই প্লেন ড্রেস পরা একজন কম্যান্ডো (চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। কদমছাঁট চুল, বুলডগের মতো মুখ, পেটাই চেহারা।) এসে শুধু বলল গজাননকে, 'আজকের মন্ত্র?'

'সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে ব্যাটাকে ধর' টাইপের ব্যাপারটা হয়ে গেল না? চড়াৎ করে রক্ত চড়ে গেল গজাননের মাথায়। একে তো সংস্কৃতটা সে জানে না, তার ওপর ডাইনে বাঁয়ে ত্রিশূল-এর দুই কেউকেটা থাকতে তাকে মন্ত্র জিগ্যেস করা কেন?

মুচকি হেসে (গরিলা মুখে যতটা হাসা যায়) রামভেটকি বললে, 'সিকিউরিটি কাউকে বিশ্বাস করে না—আমাদেরকেও নয়। মন্ত্রটা আমাদের তিনজনকেই বলতে হবে।'

'কিন্তু জিগ্যেস তো করা হল শুধু আমাকে।' গজাননের গলা তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে।

'আপনার মুখ এখানে নতুন বলে,'—বলেই রামভেটকি নোটবই বের করে একটা পাতা খুলে বলল, 'যা লেখা আছে, তাই বলুন।'

দেখল গজানন। একটাই মন্ত্র। ছোট্ট।

বলল, 'হ্রীং।'

'ক্রিং।' বলল রামভেটকি।

'ক্রিং।' বলল এলোকেশী।

পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল প্লেন ড্রেসের কম্যান্ডো।

গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়েছে তিনজনে। গাছপালার মধ্য দিয়ে কিছুদূর যেতেই চোখে পড়ল একটা কটেজ প্যাটার্নের বাড়ি। দু-দিকে অ্যাসবেসটসের এবং অন্য দু-দিকে লাল টালির ঢালু ছাদ। অ্যাসবেসটসের চালে আঁকা একটা লাল হরতন।

'এটা কি তাসের দেশ?' বলে ফেলেছিল গজানন।

রামভেটকি কিছু না বলে গটগট করে গিয়ে দাঁড়াল দরজার সামনে। দরজা মানে একটা গোটা টেক্কা তাস। সামনে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই পাল্লা সরে গেল পাশে। পরপর ঢুকে এল তিনজনে। গজানন দেখল ও-পাশে আর একটা ঘর। এদিকের দরজা থেকে ওদিকের

দরজা পর্যন্ত তেরোজন ষণ্ডামার্কা কম্যান্ডো দাঁড়িয়ে লাইন দিয়ে। প্রত্যেকেই অ্যাটেনশন ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে সামনের দিকে।

এদের সামনে দিয়ে গজানন, রামভেটকি আর এলোকেশীকে যেতে হল ওদিকের দরজার সামনে এবং যাওয়ার সময়ে আড়চোখে গজানন দেখলে প্রত্যেকেই খর চোখে দেখে নিচ্ছে তিনজনের মুখ, কেউ-কেউ হাতের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখছে ঠিক লোক যাচ্ছে কিনা সামনে দিয়ে। গজাননের ছবিও তাহলে আছে এদের কাছে।

সামনের দরজা আপনা হতেই খুলে গেল রামভেটকি কপাটের সামনে হাজির হতেই। ভেতরে একটা লম্বা টেবিলে শোয়ানো খান বুদোশের বীভৎস দেহাবশেষ। পাশে দাঁড়িয়ে দাড়িওলা এক বৃদ্ধ। চোখে চশমা, গায়ে সাদা অ্যাপ্রন।

পরিচয় করিয়ে দিল রামভেটকি, 'জিরো জিরো গজানন, ইনিই আমাদের ব্যালিস্টিক এক্সপার্ট ডক্টর সিঙ্কারো। এককালে হিটলারের কনসেনট্রেসন ক্যাম্পে ছিলেন। গ্যাস চেম্বারে ঢুকে ছেলেবেলায় মরতে-মরতে বেঁচে গেছিলেন। সিঙ্কারো ওঁর ছদ্মনাম, আসল নাম জানলে বুঝবেন হিটলারের কত কাছের লোক ছিলেন ইনি। ডক্টর সিঙ্কারো, কী বুঝলেন? যে অস্ত্র দিয়ে এইভাবে মানুষ খুন করা হচ্ছে, তা তৈরি হয়েছে কোন দেশে?'

'নো,' ছোট্ট জবাব ডক্টর সিঙ্কারোর। বৃদ্ধের চুলগুলো ধবধবে সাদা, এলোমেলো, অনেকটা আইনস্টাইনের মতো—মুখে কেবল পাইপটা নেই।

'তার মানে কোন দেশ আমাদের পেছনে লেগেছে, তা জানা যাচ্ছে না। আর কোনও খবর?'

কাঁপা গলায় আশ্চর্য বাংলা বলে গেলেন ডক্টর সিঙ্কারো। গজানন তো হতবাক।

'হিটলার যখন বাঙ্কারে বসে বার্লিনের সাবওয়েতে জল ঢুকিয়ে গাদা-গাদা মানুষকে ইঁদুরের মতো চুবিয়ে মারছে, তখন একজন বলেছিল, 'নতুন অস্ত্রটা এদের ওপর পরখ করুন না—জলে চুবিয়ে মেরে কী হবে? চেহারাগুলো হবে এই রকম।' বলে একটা কন্ধকাটা নাশ দেখিয়েছিল—যার মুন্ডুটা অবতার সিং-এর মুন্ডুর মতো মাঝখান থেকে অর্ধেক উধাও।'

'মাই গড!' নিমেষে অ্যাটেনশন হয়ে গেল রামভেটকি। 'এ অস্ত্র তাহলে জার্মান ব্রেনের?'

'এগজ্যাক্টলি। কিন্তু এখন আর জার্মানদের হাতে নেই। পরে আমি অনেক খুঁজেছি। অস্ত্রটাকেও চোখে দেখিনি—ডিজাইনও পাইনি।'

'কীভাবে এরকম গর্ত হচ্ছে বলে মনে হয় আপনার?'

মাথা চুলকোলেন ডক্টর সিঙ্কারো, 'সেইটাই তো মাথায় আসছে না। একটা বিস্ফোরণ ঘটছে শরীরের মধ্যে—কিন্তু রক্ত-মাংস-হাড় সব হাওয়া হয়ে যাচ্ছে কীভাবে, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'একটা হাতিয়ার হাতে পেয়ে গেলে বুঝতে সুবিধে হবে?'

চোখ উজ্জ্বল হল ডক্টর সিঙ্কারোর—'নিশ্চয়।'

গজানন দাঁড়িয়ে আছে মেরিন ড্রাইভার-এর একটা খানদানী হোটেলের বারান্দায়। দুর্গাপুরের জঙ্গল তন্নতন্ন করে খুঁজে খান বুদোশের দলকে আর পাওয়া যায়নি। পায়ে হেঁটে নয়, ট্রেনে চড়ে তারা নাকি এসেছে আমেদাবাদে। দলে আছে গাপ্পা বুদোশ—খান বুদোশের ছোট ভাই। নওজোয়ান গাপ্পা বুদোশ নাকি চেহারায় চলনে বলনে ইউরোপিয়ান। রামভেটকির

ধারণা এই গাপ্পাই হল পালের গোদা। ইরান থেকে খেদিয়েছে, এখন কোন দেশের টাকা খেয়ে ইন্ডিয়ায় মানুষ খতম করে চলেছে, তা গাপ্পাকে গায়েব করতে পারলেই ধরা যাবে।

তাই গজানন এসেছে প্রাণটাকে হাতে নিয়ে। একা। কিন্তু ও জানত না ওকে গার্ড দেওয়ার জন্যে এলোকেশীকেও পাঠানো হয়েছে ওর অজান্তে।

জানল বোম্বাই হোটেলে পা দেওয়ার দিনই রাতে। মেরিন-ড্রাইভ-এর হাওয়া খেয়ে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে গজানন, এমন সময় নজরে পড়ল মাইক্রো-ক্যামেরাটা টেপ দিয়ে লাগানো দরজার ফ্রেমে পায়ের কাছে।

নিজেই লাগিয়ে দিয়েছিল ঘর থেকে বেরোনোর সময়ে। রামভেটকির দেওয়া ক্যামেরা। ডটপেনের ডগা পেঁচিয়ে খুলে নিলেই বেরোয় এই ক্যামেরা। আর একটা ডটপেনের মধ্যে থাকে মাইক্রোব্যাটারি। পাশাপাশি রাখলেই চুম্বকের টানে জুড়ে থাকে ব্যাটারি আর ক্যামেরা। ক্যামেরা তখন অটোমেটিক হয়ে যায়, অন্ধকারে বা আলোয় ঘরের মধ্যে যে-ই ঢুকুক না কেন, তার ছবি উঠে যাবেই।

ফ্রেমের ফাঁকে প্রায় অদৃশ্য ও খুদে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসল গজানন। এই মুহূর্তে তারও ছবি উঠছে ক্যামেরায়। সেকেন্ডে পাঁচটা। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার।

ঘরে ঢুকল গজানন। দরজা বন্ধ করে দিয়ে আলো জ্বালল। ঘরে কেউ নেই। জামাকাপড় খুলে সটান ঢুকে গেল স্নান ঘরে। পাঁচ তারা হোটেলের স্নান কক্ষ দেখলে দিল্লির বাদশারাও ট্যারা হয়ে যেতেন নিশ্চয়। গজানন তো হবেই। বেলেঘাটায় কে কবে দেখেছে এমন এলাহি ব্যবস্থা।

নরম-গরম জলের শাওয়ারটা খুলে দিয়ে গলা ছেড়ে গান গাইছে, 'এসেছি, একলা যাইব একলা, কেউ তো সঙ্গে যাবে না, 'হাত থেকে সড়াৎ করে পিছলে গেল সাবানটা। হেঁট হয়ে মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিতে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়েছে সবে, এমন সময়ে...

শাওয়ারের ঠিক পাশেই গ্লেজড টালি উড়ে গেল পরপর তিনটে। খান-খান হয়ে এসে পড়ল গজাননের মাথাতেই খটাং খট করে।

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়েছিল গজানন। টালির জায়গায় তিনটে গর্ত দেখেই চোখ কপালে উঠে গেছিল ক্ষণেকের জন্যে। তারপরই চোখ ঘুরিয়ে দেখলে স্নানকক্ষের প্রবেশ পথের দামি পরদাটাতেও তিনটে ছ্যাঁদা পাশাপাশি। তখনও ধোঁয়ার সুতো বেরোচ্ছে পরদা থেকে।

অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে গজানন—শুধু ওই হড়কে যাওয়া সাবানটার জন্যে। পরদা ফুটো করে টালি উড়িয়ে দেওয়ার পথেই তো ছিল গজাননের প্রিয় নিরেট মাথাটা। এতক্ষণে তারও উড়ে যাওয়ার কথা।

অতএব দিগম্বর গজানন আরও একটু সরে গেল কলতলার বাথটবের দিকে। নজর পরদার দিকে। পরদা দুলে উঠল। প্রথমে দেখা গেল একটা বিদঘুটে অস্ত্র। পেটমোটা রিভলভার। জন্মে এমন রিভলভার দেখেনি গজানন।

রিভলভার ধরে যে লোকটি ঢুকল ঘরের মধ্যে, তাকে যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। চোখে তার বাঘের চাহনি, পা ফেলার ভঙ্গিমাও বাঘের মতো। লাফ দেয় আর কী!

লোকটা দেখে ফেলেছে শাওয়ারের নিচে প্রত্যাশিত বস্তুটা নেই; অর্থাৎ গজাননের কবন্ধ দেহ নেই। চকিতে বিদঘুটে রিভলভার বাগিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছে, তার আগেই যেন বাজ ভেঙে পড়ল মাথায়।

গজানন, ন্যাংটা গজানন, এখন ফুল ফর্মে। ক্যারাটে গুরু কি বৃথা মার শিখিয়েছেন?

বোধহয় আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগে দিশি গাঁট্টা মেরেছে গুপ্তঘাতকের মাথায়। ক্যারাটের মশলা মিশোনো গাঁট্টা তো—এক মারেই চোখে সর্ষে ফুল দেখতে-দেখতে বাথটবের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বদমাশটা। গরম জলের কলটা খুলে দিল গজানন। মুখে ফোসকা পড়ুক আগে—পরে আরও পেটানো যাবে।

আগে দেখা যাক বিদঘুটে অস্ত্রটা। গাঁট্টার চোটে হাতিয়ার ঠিকরে গেছে কলতলার বাইরে ঘরের কার্পেটে। হেঁট হয়ে পাশে বসল গজানন। কার্পেট পুড়ছে কেন? আশ্চর্য আগ্নেয়াস্ত্রের পেটটা দেখে মনে হচ্ছে যেন গভীর জলের মাছ জেলের জালে পড়ে উঠে এসে পড়ে আছে সমুদ্রের বালির ওপর—হাওয়া ঢুকে পেটটা ফুলেই চলেছে। একটু যেন লালও হয়ে উঠেছে। গনগনে আভা ছাড়ছে। কার্পেট পুড়ছে সেই কারণেই।

সভয়ে চেয়ে রইল গজানন। ফাটবে নাকি? কিন্তু একটু আগেই তো এই অস্ত্র ধরেই আততায়ী তার মাথা ওড়াতে গেছিল। নলচেটা বেঁটে, কিন্তু বেশ ফাঁদালো। রিভলভার এরকম হয় নাকি? জল-পিস্তল বলেই তো মনে হচ্ছে। দোল খেলার সময়ে পিচকিরির মতো জল ছুঁড়ে দেওয়ার খেলনা।

কিন্তু এ খেলনার মুখ থেকে বেরোয় সাক্ষাৎ মৃত্যু। এ আবার কী ধরনের মারণাস্ত্র?

বিমূঢ় গজাননের চোখের সামনেই বিচিত্র মারণাস্ত্রের উদর আরও একটু স্ফীত হল। গনগনে আভা আরও একটু প্রকট হল। কোনও ধাতু যে এভাবে রবারের মতো ফুলতে পারে, তা তো জানা ছিল না গজাননের।

হঠাৎ গজাননের গজ-মস্তিষ্কের কোষগুলোয় কী সঙ্কেত বিনিময় ঘটল, তা দেবা না জানন্তি। মৃত্যুকে সামনে দেখলেই বরাবরই ও এমনিভাবে হাত বাড়িয়ে মৃত্যুকে ক্যাঁক করে ধরতে যায়।

চ্যাপটা হাতল ধরে মারণাস্ত্রটা তুলে দূরের খাটের দিকে তাগ করল গজানন।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা জার্ক লাগল হাতে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। কিন্তু হাত স্টেডি রইল। কানে ভেসে এল একটা বিস্ফোরণের শব্দ।

খাটের ওদিকের স্টিল আলমারিটা বিস্ফোরিত হয়েছে। বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে যে বস্তুটি তা খাটের গদির এদিক থেকে ঢুকে ওদিক দিয়ে বেরিয়েছে।

কী ভয়ানক শক্তি অদৃশ্য বিস্ফোরকের। মাখনের মতো গদি ফুটো করে বেরিয়ে গিয়ে শক্ত আলমারিতে আছড়ে পড়তেই ফাটিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে আলমারি।

হাতের মারণাস্ত্রের দিকে তাকিয়ে থ হয়ে গেল গজানন। পেটের ফুলোটা হঠাৎ এত কমে গেল কী করে? গনগনে আভাটাও আর নেই।

ভয়ে-ভয়ে আজব অস্ত্রকে কার্পেটে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল গজানন। যার হাতে এই অস্ত্র একটু আগে শোভা পেয়েছে সেই ব্যাটাচ্ছেলেকে মনের সুখে এবার ধোলাই দেওয়া যাক।

কলতলার দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল পরদা সরিয়ে বিহ্বল দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে ঘাতক মহাশয়। বিস্ফারিত চক্ষু যুগল নিবদ্ধ কার্পেটের ওপর রাখা বিটকেল অস্ত্রটার দিকে। একটু আগে আলমারি বিস্ফোরণের শব্দ শুনে এবং গরম জলের ছ্যাঁকা খেয়ে নিশ্চয় সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে।

এখন আবার সম্বিৎ হারাবে নাকি? ওরকম আতঙ্কঘন চোখে চেয়ে আছে কেন পেটমোটা দানব অস্ত্রর দিকে?

গজানন যখন এই প্রশ্নটা মাথার মধ্যে এনে মন্থরগতিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছে, ঠিক সেই সুযোগে লোকটা সোজা ডাইভ মারল মারণাস্ত্রের দিকে।

নিমেষে গজানন ফিরে এল গজাননের মধ্যে। বাঁ-পায়ের শট ওর চিরকালই প্রচণ্ড। ঘাতক প্রভু যখন মেঝের ছ'ইঞ্চি ওপর দিয়ে ধেয়ে যাচ্ছে মারণাস্ত্রের দিকে ঠিক তখনি পাশ থেকে বাঁ-পায়ে পেনাল্টি কিক করল গজানন—লোকটার পেটে।

কোঁক-ধড়াম—ধুম। পুরো বপুটা নিক্ষিপ্ত হল শূন্য পথে। খাটের ওপর দিয়ে ছিটকে পড়ল জানলার সামনে।

মারণাস্ত্র পাকড়ে ধরে সেইদিকেই তাক করল গজানন। অমনি নরকের বিভীষিকা যেন ফেটে পড়ল খুনে লোকটার চোখেমুখে।

ঠেলে বেরিয়ে আসা দুই চোখ মেলে সেকেন্ড কয়েক চেয়ে রইল বিকট অস্ত্রের দিকে। পরক্ষণেই স্প্রিংয়ের পুতুলের মতো লাফিয়ে উঠে ছুটে গেল খোলা জানলার দিকে এবং একলাফে জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

বাইশ তলা শূন্যপথ অতিক্রান্ত হতে গেলে যেটুকু সময়। তারপর বাইশ তলা নিচ থেকে ভেসে এল আছড়ে পড়ার শব্দ।

ফ্যালফ্যাল করে হাতের অস্ত্রটার দিকে চেয়ে রইল গজানন।

গজাননের চমক ভাঙল দরজায় টোকা পড়ায়। খট খট...খট খট খট খট...খট!

ত্রিশূল দলের সঙ্কেত! কে এল?

বিকট অস্ত্র হাতে নিয়েই দরজার সামনে ছুটে গেল গজানন। ম্যাজিক হোলে চোখ রেখে দেখল...

বাইরে দাঁড়িয়ে এলোকেশী।

এলোকেশী। এ সময়ে? এখানে?

ঝটাং করে পাল্লা খুলতেই এলোকেশী আঁতকে উঠে বললে, 'গজাননবাবু, ডোন্ট বি সিলি। বলেই বোঁ করে পেছন ফিরে বললে, 'জামাকাপড় পরে নিন।'

তাই তো! গজাননের খেয়ালই নেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে গায়ে সুতোটি চাপাবার সময় পায়নি। দুই সারি গজদন্তের ফাঁকে বিরাট জিভটা ঠেলে দিয়ে সাঁৎ করে ঢুকে গেল কলতলায় এবং এক মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে এল পাজামায় পা গলিয়ে।

এসেই সে কী তড়পানি, 'আপনি কোত্থেকে এলেন?'

এলোকেশী তখন একটা সোফায় বসে বুকের উপত্যকায় ঝোলানো একটা নেকেড মেয়ের লীলায়িত পোজের লকেটের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে। গজাননের প্রশ্নটা শুনে আড়চোখে এমনভাবে তাকাল প্রশ্নকর্তার দিকে যে, সেই ব্যক্তির পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ থেকে মাথার চুলের ডগা পর্যন্ত শিরশির করে উঠল অনাস্বাদিত পূর্ব উত্তেজনায়। এ সেই চাহনি যার সামনে মুনিঋষিরা টলে যান, দেব সাধন ভুলে বাৎস্যায়ন শাস্ত্রচর্চায় মত্ত হন।

গজাননের ফুলো-ফুলো পাথরের মতো পেশিগুলো অনাবৃত অবস্থায় দেখেই যে এলোকেশী এলিয়ে পড়েছে, তা হাড়ে-হাড়ে বুঝল জিরো জিরো।

বাট ডিউটি ইজ ডিউটি—মেয়েরাই সব সাধনার পতন ঘটায়, শাস্ত্র-টাস্ত্র না পড়লেও গজানন তা জানে। তাই গলাটাকে যদ্দূর সম্ভব কর্কশ করে (করা কি যায়!) বললে, 'এখানে কেন এসেছেন?'

কাম-টু-দ্য-বেড চোখ তুলে তাকাল এলোকেশী। যার সাদা বাংলা হল, এসো, শোবে এসো। কিন্তু ছুঁড়িদের সঙ্গে শোওয়া গজাননের পোষায় না। ওইরকম চাহনি দেখলেই গা পিত্তি জ্বলে যায়। একটু আগে আচমকা চাহনির ঝলকে গা শিরশির করার জন্যে (হাজার হোক পুরুষ মানুষ তো) রাগও হয়ে গেল নিজের ওপর। গজদন্ত খিঁচিয়ে আর একবার যেই দাবড়ানি দিতে যাচ্ছে, এলোকেশী বললে, 'আমি এসেছি আপনাকে গার্ড দিতে।'

এমন নেচে উঠল গজানন (অভিনব পিস্তল হাতেই রয়েছে), পাজামার দড়ি ঢিলে হয়ে গেল এবং পাজামা নেমে এল ইঞ্চি তিনেক নিচে। খপ করে দড়ি ধরে পাজামা তুলে বললে যথাসম্ভব বজ্রগর্ভ স্বরে, 'একমাত্র ভগবান শালা ছাড়া আমাকে গার্ড দেওয়ার কেউ নেই।'

অহো! অহো! কী ডুমোডুমো পেশি বুকের! মিঃ ইউনিভার্স হলে পারত গজানন। মুগ্ধ (এবং বিলোল) চোখে চেয়ে এলোকেশী বললে, 'নিচের তলায় এখুনি একটা লাশ পড়ল আপনার জানলা থেকে।'

তিড়বিড়িয়ে ওঠে গজানন, 'জানলা থেকে জ্যান্তই বেরিয়ে গেছিল—নিচে গিয়ে লাশ হয়েছে।'

'আপনি ফেলে দিয়েছেন?'

'আজ্ঞে না,' অজান্তেই দাঁত কিড়মিড় করে ফেলে গজানন, 'ধরতে পারলে মুন্ডুটা ছিঁড়ে নিতাম।'

'ও,' ঠোঁটের ওপর ছোট্ট তিলটা চুলকে নিল এলোকেশী। অমনি গজাননের মনে পড়ে গেল পিসির কথা—ওরে গজানন, ঠোঁটে তিলওয়ালা মেয়ে দেখলেই জানবি পরপুরুষে আসক্তি আছে। ঠিকই বলেছে তো পিসি। এলোকেশীর রকমসকমও ভালো ঠেকছে না। এমনভাবে চাইছে যেন গজানন একটা মুচমুচে নানখাতাই বিস্কুট, পেলেই চিবিয়ে খাবে।

কাজেই শক্ত চোখে চাইতে হল গজাননকে, 'রাস্কেলটা এসেছিল এই দিয়ে আমার মুন্ডু উড়োতে,' দেখাল হাতের বিদঘুটে অস্ত্রটা।

'জীবনে দেখিনি বাপু এমনি রিভলভার। নিন, ব্যাগের মধ্যে রাখুন,' বলে নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ধরল এলোকেশী।

গজানন কিন্তু দেখেছে বিটকেল হাতিয়ার মাঝে-মাঝে বিচ্ছিরিভাবে ফুলে ওঠে, লাল হয়, বিস্ফোরণ সৃষ্টি করে। কাজেই টেবিলের ওপর থেকে নিজের বুলেট-প্রুফ ব্রিফকেসটা টেনে নিতে নিতে বললে, 'এর মধ্যেই থাক।'

ব্রিফকেস আর হাতছাড়া করেনি গজানন। রামভেটকি বলেছিল আজব হাতিয়ার একখানা আনতেই হবে। এই সেই হাতিয়ার।

হোটেলের ঘর থেকে বেরোনোর আগে, দরজার ফ্রেমের পাশ থেকে মাইক্রো-ক্যামেরা খুলে নিয়ে রেখেছিল ডটপেনের মধ্যে।

এলোকেশী তখন নেমে গেছে। দেখতে পায়নি খুদে ক্যামেরার গোপন অবস্থান। পায়নি বলেই রক্ষে। নইলে...

কানহেরী কেভস বোম্বাই শহর থেকে বেশ দূরে। পর্বতগুহা দেখতে বিস্তর টুরিস্ট যায় ইলেকট্রিক ট্রেনে, ফরেন টুরিস্টরা যায় গাড়িতে। ঝকঝকে গাড়ি ধূলি ধূসরিত হয়ে যায় গুহা অঞ্চলে একবার টহল দিয়ে।

কিন্তু সে ধুলো বাইরে, মানে, এই আস্তানার বাইরে। এলোকেশী বিলিতি গাড়িতে চাপিয়ে গজাননকে ঝড়ের বেগে কানহেরী কেভস অঞ্চলের এই গোপন আস্তানায় এনে ফেলার পর—বেলেঘাটাই মস্তান বেচারার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছে একটার পর একটা কাণ্ডকারখানা দেখে।

জবরদস্ত পার্টি বটে এই ত্রিশূল। সংগঠন কাকে বলে দেখিয়ে দিয়েছে, সারা ভারতটাকে রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ফেলেছে বিবরঘাঁটি আর গুপ্তচর দিয়ে। উদ্দেশ্য একটাই, ভারতের স্বার্থরক্ষা। সরকারি ব্যবস্থায় যে সর্ষের মধ্যে ভূত, তা বুঝে গেছে।

দেশকে সত্যিই ভালোবাসে এই ত্রিশূল। যতই দেখছে গজানন, ততই বিমোহিত হচ্ছে। কোনওকালে ভাবতেও পারেনি গুহা থেকে বেশ খানিকটা দূরে জঙ্গলের মধ্যে এ রকম একখানা আস্তানা বানিয়ে বসে আছে রামভেটকির ওপরওয়ালারা।

গাড়িখানা এলোকেশীই চালিয়ে নিয়ে এসেছে। জঙ্গলের মধ্যে বাঁই-বাঁই করে ঢুকে পড়েছে। দূর থেকে মনে হয় যেন একটা পায়ে চলা পথ কিছুদূর গিয়েই বনের মধ্যে হারিয়ে গেছে অথবা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কিছুদূর ঢোকবার পর দেখা যায় মাটির রাস্তা পিচের রাস্তা হয়ে গেছে এবং এক-এক জায়গায় রাস্তা চার-পাঁচটা রাস্তা হয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে। যে-কোনও নবাগত এই পয়েন্টে পৌঁছেই দুরুদুরু বুকে নিবিড় বনানীর রহস্যময়তা উপলব্ধি করেই পিছু হটে আসবে।

কিন্তু পথ যারা চেনে, তারা পেছোয় না। পিচমোড়া এই রাস্তার গোলকধাঁধা ইচ্ছে করেই সৃষ্টি হয়েছে কৌতূহলীদের দূরে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে, দলের লোকেদের নির্বিঘ্নে নিয়ে আসার জন্যে।

এলোকেশীর গাড়িও তাই চরকিপাক দিতে-দিতে এ রাস্তা সে রাস্তা হয়ে ঢুকে গেল গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলে। এক জায়গায় একটা পরিত্যক্ত এয়ারপোর্টও দেখতে পেল গজানন। যুদ্ধের আমলে নিশ্চয় বিমানবাহিনী বানিয়েছিল, এখন আর তার খোঁজ কেউ রাখে না। বিলিতি গাড়ি প্রায় নিঃশব্দে গিয়ার চেঞ্জ করতে-করতে সেই এয়ারপোর্টের পাশ দিয়েই ঢুকল অন্য একটা রাস্তায়। রাস্তা হঠাৎ শেষ হয়েছে একটা ফাঁকা জায়গায়। যেন টেক অফ করার জন্যেই রাস্তার শেষ ওখানেই।

গাড়িটা কিন্তু টেক অফ করল না, 'টেক ডাউন' করল। মানে, স্রেফ পাতালে ঢুকে গেল। রাস্তাটা যে আসলে ইস্পাতের ঢাকনি তা কে জানত। কবজার ওপর লম্বাটে কৌটোর ঢাকনি যেমন ওপর দিকে খুলে যায়, ঠিক সেইভাবে প্রায় পনেরো ফুট রাস্তা মেঝে উঠে গেল ওপর দিকে।

গাড়ি থেকে নেমে গেল ঢালু পাতাল-বিবরে। মাথার ওপরকার ঢাকনি নেমে এসে বন্ধ করে দিলে বিবর পথ।

আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল গজাননের। এ কাদের পাল্লায় পড়েছে সে? এরা যে আরব্য রজনীর মতো কাণ্ডকারখানা দেখিয়ে চলেছে ভারতের বুকে।

কাণ্ডর তখনও দেখেছে কী গজানন দ্য গ্রেট। দেখল এরপরেই।

গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে দাঁড়াল একটা কুয়োর ওপরকার চাতালে এবং চাতালটা লিফটের মতো নেমে গেল কুয়োর মধ্যে। সাঁ-সাঁ করে বেশ খানিকটা নামবার পর রুদ্ধ হল নিম্নগতি।

আলো ঝলমলে একটা বিশাল হলঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি। জানলার কাচের মধ্যে দিয়ে হলঘরের বিশালতা এবং বিচিত্র যন্ত্রপাতির বিপুল সমাবেশ দেখে গজানন দ্য গ্রেট চোখ দুটো প্রায় ছানাবড়ার মতো করে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ।

হলঘরের চারপাশে ছড়ানো ছিটোনো যন্ত্রপাতিগুলো চলছে আপনা হতেই। অনেকগুলো বিদঘুটে চেহারার রোবট চালাচ্ছে কলকবজা। নিজেরাও তো এক-একটা কল, কাউকে দেখতে বাচ্চাদের মোটরগাড়ির মতো—চাকার ওপর গড়গড়িয়ে যাচ্ছে।

এই রকমই একটা খুদে মোটরগাড়ি সাঁ করে ছুটে এল গজাননদের দিকে। চকিতে টান-টান হয়ে গেল গ্রেট স্পাইয়ের আপাদমস্তক। কেননা, আগুয়ান যন্ত্রের মাথার ওপরে একটা ইস্পাতের নল ফেরানো রয়েছে তাদের দিকে। পেটের কাছে একটা টি-ভি স্ক্রিনের মতো পরদায় রংবেরঙের জ্যামিতিক নকশা আঁকা হয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুত ছন্দে।

বগলের তলা থেকে লুগারটা টেনে বের করতে যাচ্ছে গজানন, বাধা দিল এলোকেশী। মুখে সেই অপ্সরা হাসি।

বললে স্টিরিও মিউজিক কণ্ঠে, 'গজাননবাবু, ঘাবড়াবেন না, রোবট সেন্ট্রিকে গুলি করবারও সময় পাবেন না।'

তা বটে। এলোকেশী ওর হাতখানা বেশ মোলায়েম করে ধরে (এত মোলায়েম ভাবে যে সন্দেহ হতে লাগল যার ঠোঁটে তিল...) নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। পুঁচকে মোটরগাড়িটা তখন সামনেই দাঁড়িয়ে। মাথার ওপরকার ইস্পাতের নলচের সরু ফুটোটার দিকে সভয়ে তাকিয়ে গজানন।

এলোকেশী হেসে চণ্ডীপাঠ করে গেল। টিভি স্ক্রিনের বুকে লেখা হয়ে গেল—"Ok Hop in."

মানে, সব ঠিক আছে। গাড়িতে লাফ দিয়ে উঠে পড়।

বলে কী খুদে গাড়ি। ওইটুকু গাড়িতে...

এলোকেশী ততক্ষণে উঠে গেছে গাড়িতে।

খেলনার গাড়ির সিটের মতো ছোট্ট সিটে বসে হাতছানি দিয়ে আর চোখ টিপে ডাকছে গজাননকে।

—আচ্ছা ঢলানি মেয়ে তো। রাগে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে গেল গজাননের। গালের কাটা দাগটাও সুড়সুড় করে উঠল এই সময়ে। কিন্তু অতিকষ্টে সেখানে হাত বুলোল না গজানন। কেননা, ওর মারদাঙ্গা ফিচারের সুইচ ওই কাটা দাগটা। হাত বুলোলেই মাথার মধ্যে পটাং করে যেন তার ছিঁড়ে যায়, তারপর প্রলয় ঘটিয়ে ছাড়ে চক্ষের নিমেষে—নিজের অজান্তেই।

অতএব কাটা জায়গায় হাত বুলোনো সমীচীন হবে না। বিশেষ করে ইস্পাতের নলচেটা এখনও যে ফিরে রয়েছে তার দিকেই।

অগত্যা মুখটা প্যাঁচার মতো করে গাড়িতে উঠে এলোকেশীর গায়ে গা দিয়ে বসল গজানন। মুহূর্তের মধ্যে পুঁচকে মোটর ভীষণ বেগে ছুটে গেল হলঘর পেরিয়ে একটা করিডরের দিকে। এ করিডর সে করিডর ঘুরে দাঁড়াল একটা দরজার সামনে।

এলোকেশী নেমে পড়েছে। ডাকছে গজাননকে। হাতের ব্রিফকেস নিয়ে নামতে যাচ্ছে সে, এমন সময়ে একটা কলের হাত এসে খামচে ধরল ওর হাত—হাতটা বেরিয়ে এল গাড়ির অজস্র কলকবজার মধ্যে থেকেই।

ফিউরিয়াস হয়ে গেছিল গজানন। সাঁড়াশির মতো আঁকড়ে ধরা হাতটাকে ছাড়াতেও পারছে না, ধস্তাধস্তিই সার।

আবার সেই স্টিরিও মিউজিকের মতো হাসি হাসল এলোকেশী, 'আমার ব্যাগ রেখে এসেছি দেখছেন না? আপনারটাও রেখে আসুন। কমপিউটার চেকিং হবে।'

কমপিউটার চেকিং। সেটা আবার কী?

গজগজ করতে-করতে নেমে এল গজানন। কলের হাত ওর হাত ছেড়ে দিয়েই আচমকা পেছন থেকে এমন একটা পদাঘাত করল পশ্চাৎদেশে যে ছিটকে গিয়ে দড়াম করে দরজার ওপর পড়ল গজানন দ্য গ্রেট এবং দরজা স্পর্শ করার আগেই পাল্লা খুলে গেল আপনা থেকে। তাল সামলাতে না পেরে গজানন মুখ থুবড়ে পড়ল ভেতরে।

এ অবস্থায় গজানন কেন, স্বয়ং দশাননও মাথার ঠিক রাখতে পারে না। তিড়িং করে লাফিয়ে মোটরটাকে তুলে আছাড় মারবে বলে বেরোতে যাচ্ছে গজানন এমন সময় দরজা বন্ধ করে দিয়ে ছিটকিনি টেনে সামনে এসে দাঁড়াল এলোকেশী।

আশ্চর্য এইটুকু সময়ের মধ্যেই ভোল পালটে ফেলেছে। জিনস প্যান্ট আর ঢিলে শার্ট অন্তর্হিত হয়েছে। পরনে শুধু ব্রা আর ব্রিফ। ফরসা বডিখানা লীলায়িত ভঙ্গিমায় মেলে ধরেছে গজাননের সামনে। কণ্ঠে মদির আহ্বান, 'গজানন, এখন আমাদের আধঘণ্টার রেস্ট। কাম, এনজয়—আই ওয়ান্ট ইউ।'

বলে কী হারামজাদি! আই ওয়ান্ট ইউ বললেই হল! গজানন কি তেলেভাজা যে ফুটপাতে কিনতে পাওয়া যায় এবং খাওয়া যায়?

কিন্তু...কিন্তু গজানন এরকম হকচকিয়ে যাচ্ছে কেন? ঘরের মায়াময় আলো-আঁধারির জন্যে কি? ছোট্ট ঘর। একপাশে পুরু গদির ডাবল বেড। গজাননকে ওই দিকেই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে প্রায় বিবসনা এলোকেশী। গজাননের সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসছে। হাত বাড়িয়ে গজাননের সার্টের বোতাম খুলে দিচ্ছে এলোকেশী। খাটে বসে পড়েছে গজানন। ভ্যাবা গঙ্গারামের মতো চেয়ে রয়েছে এলাকেশীর সরীসৃপের মতো ক্ষিপ্রতার দিকে। পাশের ছোট্ট টেবিল থেকে একটা মদের বোতল তুলে নিয়ে দুটো গেলাসে ঢেলে একটা এগিয়ে ধরেছে গজাননের দিকে। না...না...গজানন সুরাপান করবে না...কিছুতেই না...! এলোকেশী দু-হাতে দুটো গেলাস নিয়ে সবলে জাপটে ধরেছে গজাননকে—ঠোঁটে ঠোঁট...গরম হলকায় যেন পুড়ে যাচ্ছে গজাননের মুখ...কিন্তু মুখ সরাতে পারছে না...লিপস্টিকে মুখ মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে—তবুও না—গজানন চিৎ হয়ে পড়ে গেছে খাটে। গেলাস দুটো টেবিলে রেখে টান মেরে ট্রাউজার্সটা খুলে দিল এলোকেশী। চকিতে গজাননের দিকে পেছন.ফিরেই ব্রায়ের মধ্যে থেকে একটা হোমিওপ্যাথিক গ্লোবিউলের মতো সাদা জিনিস বের করে ফেলে দিল একটা গেলাসে। পরমুহূর্তেই দুটো গেলাস নিয়েই ঘুরে দাঁড়াল গজাননের দিকে। যে গেলাসে পড়েছে সাদা গ্লোবিউল, সেই গেলাসটা ঠুসে ধরল গজাননের হাঁ করা ঠোঁটের মধ্যে।

আর একটু হলেই সুরাপান করে বসত গজানন। তারপর 'ইয়া আল্লা' বলে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিত নিজেকে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ছোট্ট ঘরের একদিকের দেওয়ালের খানিকটা সরে যেতেই চৌকো খুপরির মধ্যে দিয়ে আবির্ভূত হল একটা বিকটাকার মুখোশ—শূন্যে ভাসছে। মুখোশের দাঁতের ফাঁকে একটা সিগারেট। সিগারেটের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল একটা ছোট্ট বুলেট—ঢুকল এলোকেশীর রগে।

গজাননের ঠোঁটের সামনে থেকে মদিরাপাত্র ছিটকে গেল খাটে। এলোকেশী তার নরম বুক নিয়ে শিথিল দেহে পড়ে রইল গজাননের ওপর।

গজানন এখন জামাপ্যান্ট পরে নিয়েছে। আঙুল দিয়ে আঁচড়াচ্ছে মাথার লম্বা চুল। ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে রামভেটেকি এবং ডক্টর সিঙ্কারো নামে সেই দাড়িওলা বৃদ্ধ যিনি কিনা এককালে হিটলারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন।

ডক্টরের হাতে রয়েছে বিদঘুটে সেই অস্ত্র। জোরালো স্পট লাইটের তলায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছেন।

রামভেটেকি হাসি গোপন করার চেষ্টা করে বলছে, 'মাই ডিয়ার গজানন, আপনার পদস্খলন হচ্ছিল বলে এলোকেশীকে শট ডেড করা হয়েছে একথা যেন ভাববেন না।

কটমট করে তাকাল গজানন, 'টার্গেট ছিলাম নিশ্চয় আমি?'

জিভ কাটল রামভেটেকি। গরিলামুখে জিভ কাটার ফলে আরও হাস্যকরই দেখাল শ্রীহীন মুখাবয়ব।

বলল, 'ও নো। কমপিউটার চেকিং-য়ে ধরা পড়ল এলোকেশী ডাবল গেম খেলে চলেছে।'

'মা—মানে?'

'দরজার ফ্রেমে লাগানো আপনার ক্যামেরার ফিল্মে কার ছবি উঠেছে জানেন? এলোকেশীর। বিটকেল ওই হাতিয়ার নিয়ে বেরিয়ে আসছে আপনার ঘর থেকে।'

'এলোকেশী।'

'ও ইয়েস। যাকে আপনি এনজয় করতে যাচ্ছিলেন।'

'শাট আপ।'

'এলোকেশীই প্রথম গিয়েছিল আপনাকে সাবাড় করতে—তখন আপনি ঘরে ছিলেন না নিশ্চয়—'

'ডাইনিং রুমে গেছিলাম।'

'রাইট। তারপরেই এল সেই লোকটা। তার ফটোও উঠেছে সিক্রেট ক্যামেরায়।'

গজাননের গজমস্তিষ্কে একটা সূক্ষ্ম চিন্তা স্মৃতির আকারে ঝাঁ করে দেখা দিল সেই মুহূর্তে। মস্তিষ্ক কখন যে কী করে বসে তা তাবড় মস্তিষ্কবিশারদরাও জানেন না। তাই আচম্বিতে গজাননের মনে পড়ে গেল সল্টলেকের ত্রিশূল ঘাঁটির দোতলায় দাঁড়িয়ে যখন যে নস্যগ্রহণ করছে, নিচের বাগানে সন্ধের আঁধারে সাঁৎ করে মিলিয়ে গেছিল একটা ছায়ামূর্তি। তড়িঘড়ি নিচে নেমে এসে দেখেছিল খান বুদোশের কবন্ধ দেহ।

এলোকেশীই কি তাহলে...?

সন্দেহটা মুখে প্রকাশ করতেই রামভেটেকি সায় দিলে, 'রাইট ইউ আর। খান বুদোশ অনেক জানত। তাই মুন্ডু উড়িয়ে দিয়েছিল এলোকেশীই—ইস তখন যদি জানতাম।'

'হারামজাদি ওই জন্যেই সরিয়ে দিয়েছিল আমাকে, 'দাঁত কিড়মিড় করে গজানন।

গলা খাঁকারি দিলেন ডক্টর সিঙ্কারো। ভালো বাংলায় বললেন, 'মহাশয়গণ, এই সেই অস্ত্র যার গোপন ফরমুলা হিটলার ছাড়া কাউকে জানানো হয়নি।'

সিঙ্কারো এখন ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। হাতে সেই ভয়াল অস্ত্র।

বলছেন, 'অজানা এক দো-আঁশলা ধাতু দিয়ে এর বডি তৈরি হয়েছে। সামান্য তাপ

পেলেই রবারের মতো ফুলে উঠতে থাকে। তারপর আগের অবস্থায় ফিরে যায় হঠাৎ। চেম্বারে যে অ্যাটমিক রিঅ্যাকশন ঘটে, তার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দেয় প্রচণ্ড প্রেসার দিয়ে। এক সেন্টিমিটার ডায়ামিটারের গোল বুলেট ঠিকরে গিয়ে ফাটে ছোট্ট অ্যাটম বোমার মতো—কিন্তু শব্দ হয় না। নিশ্চিহ্ন করে দেয় টার্গেট।'

চোয়াল ঝুলে পড়েছিল গজাননের। রবারের মতো বেড়ে যায় এ আবার কী ধাতু?

রামভেটকি কিন্তু চোয়াল শক্ত করে বললে, 'এরকম কটা গুলি আছে ভেতরে।'

'আরও ছত্রিশটা।'

'মাই গড।'

'এই ট্রিগারটা টিপলেই—'

ঘরে ঢুকল একটি মূর্তি। পুরুষ। ভাবলেশহীন মুখে রামভেটকির দিকে তাকিয়ে বললে, মেসেজ এসেছে জিরো ওয়ান ফোর টু থেকে।'

গজাননের ঝোলা চোয়াল উঠে এসেছিল লোকটাকে দেখেই। আচমকা সুড়সুড় করে উঠেছিল গালের কাটা দাগটা। অজান্তেই হাত বুলিয়ে ফেলতেই মাথার মধ্যে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

রামভেটকি আর সিঙ্কারো দেখলেন শুধু আশ্চর্য দৃশ্য। দাঁড়িয়ে থেকেই বডি থ্রো করল গজানন। দু-হাত সামনে প্রসারিত। ক্যাঁক করে পুরুষমূর্তির গলা টিপে ধরে হেঁকে উঠল ছাদ কাঁপানো স্বরে—'অত উঁচু থেকে পড়েও মরিসনি?'

রহস্য! রহস্য! রহস্য!

কে এই আগন্তুক যাকে দেখেই গজাননের তাৎক্ষণিক পাগলামি চাগিয়ে উঠল?

এই সেই আততায়ী—বোম্বাই হোটেলে যে বিকট হাতিয়ার নিয়ে গজাননকে কবন্ধ বানাতে গেছিল—গজাননের হাতে হাতিয়ার দেখেই জানলা দিয়ে লাফ মেরেছিল। কিন্তু সে কি মরেনি?

'মরেছিল। হাড়গোড় ভেঙে পিণ্ডি পাকিয়ে গেছিল।'

'তবে এ লোকটা কে?'

'তারই ডবল।'

রহস্য পরিষ্কার হয়েছিল আস্তে-আস্তে অনেক জেরা এবং অনেক কাণ্ডকারখানার পর।

অবতার সিং-এর নকল সাজিয়েছিল ত্রিশূল আসল অবতার সিংকে বাঁচাবার জন্যে। বিকট হাতিয়ারের কোপটা তাই গেছে নকল অবতারের মুন্ডুর ওপর দিয়ে।

কিন্তু যারা এই নৃশংস কাণ্ড করে চলেছে, তারা নকল মানুষ বানানোর ব্যাপারে এগিয়ে গেছে আরও কয়েক ধাপ। যে-কোনও প্রাণীর দেহকোষ থেকে সম্পূর্ণ সেই প্রাণীটাকে সৃষ্টি করতে পারে ল্যাবরেটরিতে। এক কথায় যাকে বলে ক্লোনিং। আফ্রিকান ব্যাঙকে ক্লোন করে নকল ব্যাঙ তৈরির পর নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এক বৈজ্ঞানিক হুঁশিয়ার করেছিলেন—'খবরদার। মানুষ ক্লোন করতে যেও না। দানব তৈরি হয়ে যেতে পারে।'

গুপ্ত শত্রুরা ঠিক তাই করেছে। রামভেটকির এই বিশ্বস্ত অনুচরটিকে মদের আড্ডায় ঘুম পাড়িয়ে তার হাতের চামড়া চেঁচে নিয়ে সেই কোষ থেকে বানিয়েছিল হুবহু দুই অনুচর। একজনকে পাঠানো হয়েছিল গজানন নিধনে। আর একজন মোতায়েন রয়েছে ত্রিশূলেরই

এই গোপন আস্তানায়। গজানন যদি তাকে চিনে না ফেলত, না জানি আরও কত নৃশংস কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়ত দানব-মগজওলা এই নকল পুরুষটি।

'আসল অনুচরটি তাহলে এখন কোথায়?'

'সব চেয়ে কঠিন প্রশ্ন!'

জবাব পেতে কালঘাম ছুটে গেছিল ত্রিশূলবাহিনীর। নিষ্ঠুর নিপীড়নে প্রাণটাকে শুধু টিকিয়ে রেখেছিল নকল অনুচরদের মধ্যে। তারপর হিপনোটিক সাজেশানের পর বেরিয়ে এল জবাবটা।

আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের যে ক'টি দ্বীপে আগ্নেয়গিরি আছে, তারই একটিতে নিবিড় বনানীতে ভারত-শত্রুদের ঘাঁটিতে বন্দি রয়েছে ত্রিশূলের পরম বিশ্বস্ত এই অনুচরটি। হয়তো তার দেহকোষ থেকে অ্যাদ্দিনে তৈরি হয়ে গেছে আরও অনেক চলমান দানব।

ডুবো জাহাজ চলেছে আন্দামানের জলতল দিয়ে। ভারত সরকারের সাবমেরিন। যেন একটা তিমি মাছ।

আগ্নেয়দ্বীপে দিবালোকে বা নিশীথ রাতে ডাঙায় নামা বিপজ্জনক, এ খবরটা আগেই দিয়ে রেখেছিল নকল অনুচর। তাই এই ব্যবস্থা।

গজানন গ্যাঁট হয়ে বসে ছোট্ট একটা চেম্বারে। বেপারীটোলা লেনের অফিসে বসে থাকার মতোই পোজ মেরে রয়েছে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন বেড়াতে বেরিয়েছে। মাথার কোটরে যে চিন্তাকীট রাশি-রাশি কুরেকুরে খাচ্ছে, তা প্রকাশ পাচ্ছে না মোটেই। একেই বলে গুরুর ট্রেনিং।

গুরুর নির্দেশটাও সুরুৎ করে চলে যাচ্ছে মগজের অযুত নিযুত রন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে। দেশের সেবায় এই দেহমন্দিরকে উৎসর্গ করে চলেছে গজানন দ্য গ্রেট। শত্রুপুরীতে প্রবেশ করবে একা। তারপর?

তারপর নাস্তি।

রামভেটকি এসে দাঁড়াল সামনে। গরিলাআননে সংশয়। পারবে তো গজানন দুর্ভেদ্য দুর্গকে ভেতর থেকে উড়িয়ে দিতে?

গজানন সটান চাইল রামভেটকির চোখে-চোখে। মাথার মধ্যে চিন্তাকীট রাশি-রাশি ফুসফাস করে মিলিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। রামভেটকির ওই সংশয় ভরা চাহনি নিমেষে পালটে দিয়েছে গজাননের মুখচ্ছবি। কঠিন প্রত্যয় আর সর্বনাশা জেদ ফের মাথাচাড়া দিয়েছে।

বললে সংক্ষেপে, 'নামবার সময় হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

গজানন এখন দ্বীপে দাঁড়িয়ে। সাবমেরিন বিদায় নিয়েছে। ইষ্টমন্ত্র জপ করতে গিয়ে পুঁতিবালার নাম স্মরণ করে ফেলেছে গজানন বেশ কয়েকবার। ভাবনাটা যে শুধু ওকে নিয়েই। ছাতার তলায় ছিল এতদিন। গজানন অক্কা পেলে ভেসে যাবে বেচারি। রূপ আর যৌবন...

অন্ধকার অন্ধকার...চারিদিকে নিঃসীম অন্ধকার। আশেপাশে ছোট-বড় গাছের ভিড়। পেছনে সমুদ্রের বিরামবিহীন কলরব। রাতজাগা প্রাণীও কি নেই ছাই এই ভয়ঙ্কর দ্বীপে?

এত নৈঃশব্দ্য ভালো লাগছে না গজাননের। পায়ে-পায়ে নিবিড় বনানী ছাড়িয়ে এক চিলতে ফাঁকা জায়গায় আসতেই আচম্বিতে সারা দেহে অনুরণন অনুভব করল গ্রেট জি।

প্রতিটি লোমকূপ যেন তরঙ্গায়িত হচ্ছে। গোড়ায়-গোড়ায় যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হচ্ছে। বডিটাও বেশ হালকা লাগছে। পা ফেলতে গিয়ে সেটা আরও ভালোভাবে টের পাওয়া গেল। পা-খানা মাটিতে পড়ল না।

জোর করে পা দিয়ে মাটি স্পর্শ করতে গিয়ে পেছনের পা-খানাও উঠে এল মাটি ছেড়ে—গজানন না চাইতেই।

পায়েদের এবম্বিধ অবাধ্যতা গজানন অন্তত সইতে পারে না।—কোনওমতেই না। হেঁট হয়ে তাই দেখতে গেছিল পা দু-খানা আছে কোথায়...

চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

দুটো পা-ই মাটি থেকে অনেক ওপরে। তা প্রায় দশফুট তো বটেই। অন্ধকারে সঠিক মালুম হচ্ছে না। তবে হাড়ে-হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

গজানন শূন্যে ভেসে উঠেছে। এবং আরও উঠছে। দেখতে-দেখতে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে দেহমন্দির উঠে এল বেশ উঁচুতে।

আর তারপরেই দেহময় বিদ্যুৎপ্রবাহ এমনই প্রবল হয়ে উঠল অকস্মাৎ যে জ্ঞান লোপ পেল গজাননের।

গজানন জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে আছে। মাথার ওপর জ্বলছে চৌকো টালির মতো একটা সাদা আলো। নরম আভায় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে না।

চোখের মণি ঘুরিয়ে (দেহ না নাড়িয়ে) আশপাশ দেখে নিল গজানন। জ্ঞান ফিরে পেলেই তথাকথিত নায়কদের মতো 'আমি কোথায়?' বলার ট্রেনিং সে পায়নি। ব্যাপারটা গুরুতর, তা আঁচ করেছে চৈতন্য ফিরে আসতেই। তার আগে জানা দরকার, বেলুনের মতো শূন্যে ভাসিয়ে তাকে আনা হয়েছে কোথায়।

বিশাল গহ্বর মনে হচ্ছে না? আশেপাশে অনেকদূর পর্যন্ত ফাঁকা তারপর পাহাড়ের দেওয়াল বলেই তো মনে হচ্ছে। সে দেওয়াল আঁধারের মাঝে উঠে গেছে অনেক ওপরে—অনেকটা গম্বুজঘরের মতো গোল হয়ে জড়ো হয়েছে মাথার ওপর।

চৌকো আলোক-টালির ফাঁক দিয়ে বহু উঁচুতে দেখা যাচ্ছে রন্ধ্রপথ। পর্বতচূড়া নিঃসন্দেহে। আকাশ আর তারা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে সুস্পষ্ট।

জয় মা কালী! এ কোথায় এনে ফেললে মা আমাকে! এ যে ফোঁপরা পাহাড়। প্রকৃতিতে এরকম বিস্ময় বিরল নয়, তা জানে গজানন। নেচার বহুত মিস্টিরিয়াস। কি-কিন্তু শত্রু ঘাঁটি এহেন স্থানে।

জুল-জুল করে চেয়েই রইল গজানন। একটা আঙুল আগে নাড়াল। নড়ছে। তারপর টের পেল সারা দেহটাই নাড়ানো যাচ্ছে। অর্থাৎ, শত্রুপক্ষ তাকে না বেঁধেই ফেলে রেখে গেছে। তোবা! তোবা! কিন্তু কেন? লম্ফ দিয়ে চম্পট দেবে নাকি?

কিন্তু তা হল না। ওই একটু আঙুল নাড়ানোতেই সজাগ হয়ে উঠেছিল পাশের একটা যন্ত্র। দেখতে অবিকল স্টার ওয়ার্স সিনেমার পিপে রোবটের মতো। যন্ত্রচক্ষু এতক্ষণ সজাগ নজর রেখেছিল তার ওপর। এবার সরব হল যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর।

'গজানন মহাশয়, আপনি অযথা নড়িবেন না। প্রাণ যাইতে পারে।'

ওরেব্বাস! এ যে সাধু ভাষায় কথা বলে। গলার আওয়াজটা যদিও খাসা—স্টিরিও বাজনার মতো।

যথাসম্ভব মধুর কণ্ঠে গজানন বললে, 'বৎস রোবট, আমাকে এই স্থানে লইয়া আসিয়াছ কেন?'

'আপনার মস্তিষ্ক কাটিয়া ক্লোনিং-কপি রোবট বানাইব বলিয়া।'

'ভেতরে-ভেতরে আঁতকে উঠলেও গজানন অকস্মাৎ অট্টহাস্য করে উঠল। যন্ত্ররা বিরক্ত হতে জানে না। তাই অবিচল কণ্ঠে বললে, 'হাস্যের কারণ জানিতে পারি কি?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। বৎস রোবট—'

'আমার নাম সি-কে-টু-ফোর।'

'ওকে! ওকে! মাই ডিয়ার সি-কে-টু-ফোর, আমি যে অলরেডি রোবট।'

'প্রাঞ্জল করিয়া বলুন।'

'আমি উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলাম। মানসিক ডাক্তার আমার ব্রেনটাকে বদলাইয়া দিয়া সুস্থ করিয়াছে।'

'ব্রেন স্ক্যান করিয়া সেরূপ কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই।'

'তোমাদের যন্ত্রে দেখা যাইবে না। ইহা এক প্রকার কেমিক্যাল হরমোন—ধাতু নয় যে দেখা যাইবে।'

'কেমিক্যাল হরমোন?'

'ইয়েস মাই ডিয়ার সি-কে-টু-ফোর, ইতিপূর্বে ক্লোনিং-কপি রোবট বানাইয়াছ এবং আমাকে খতম করিবার জন্য পাঠাইয়াছ, তাহাদের আমি খতম করিয়াছি এই কারণেই।'

যন্ত্র চুপ। আর এক দফা অট্টহাসি হাসল গজানন।

বলল, 'শূন্যপথে আনিলে কীভাবে আমাকে?'

'হাইপার ফোর্স দ্বারা।'

'সে বস্তুটা কী?'

'অ্যান্টিগ্র্যাভিটি।'

'সে তো কল্পবিজ্ঞানে হয় শুনিয়াছি।'

'বিজ্ঞান তাহার হদিশ জানিয়াছে। এই পৃথিবীতেই ছ'শো ফুট ওপর পর্যন্ত হাইপার ফোর্সের অস্তিত্ব রহিয়াছে। আমরা কেবল তাহাকে জোরদার করিয়াছি।'

'উত্তম করিয়াছ। এবার আমাকে ছাড়িয়া দাও।'

'তৎপূর্বে আপনার ব্রেনের কেমিক্যাল টেস্ট হইবে।'

'তোমার মুন্ডু হইবে,' বলেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছে গজানন, এমন সময়ে থ হয়ে গেল পুঁতিবালাকে দেখে।

বহু উঁচু থেকে পাহাড়চুড়োর ছিদ্রপথ দিয়ে লম্বভাবে সটান শূন্যপথে নেমে এল একটা নারীমূর্তি। দাঁড়াল তার সামনে।

পুঁতিবালা। কটমট করে তাকিয়ে আছে সি-কে-টু-ফোরের দিকে। সি-কে-টু-ফোর যেন সন্ত্রস্ত হল সেই মূর্তি দেখে। কয়েক ইঞ্চি পেছনে সরেও গেল। কিন্তু তার আগেই ধেয়ে গেল পুঁতিবালা। খোঁপা থেকে একটা চুলের কাঁটা বের করে ঢুকিঁয়ে দিলে রোবটের অনেকগুলো ফুটোর একটায়।

সবক'টা আলো নিভে গেল সি-কে-টু-ফোরের গায়ে, গোঙানির মতো একটা যান্ত্রিক আওয়াজ কেবল নির্গত হল স্পিকার থেকে।

ঘুরে দাঁড়াল পুঁতিবালা। বললে খুব সহজ গলায়—'ফিউজ করে দিলাম।'

'তু-তুই এখানে কীভাবে এলি?' গজানন হতবাক।

'সে অনেক কথা। পরে শুনবে, হারামজাদারা অনেক আগেই এনেছিল আমাকে। এদের বস ব্যাটাচ্ছেলের নিজের বউ আছে—কিন্তু পরকীয়া লোভী কিনা—তাই...' নিগূঢ় হাসল পুঁতিবালা।

গা পিত্তি জ্বলে গেল গজাননের।

'এখানেও ওই সব করছিস।'

'ডিউটি ফার্স্ট', উৎকট গম্ভীর মুখে বললে পুঁতিবালা, 'বাকি সব নেক্সট। পুরো তল্লাটটার খবর নেওয়া হয়ে গেছে। ওরা মোট ন'জন আছে। ওদিকের স্টিল চেম্বারে একজনকে ক্লোনিং কপি রোবট বানাচ্ছে—আমাকেও করত। পরকীয়ার জোরে—' ফিক করে হেসে ফেলে পুঁতিবালা।

'কী করবি এখন?' রাগ চেপে বলে গজানন।

'এসো আমার সঙ্গে,' এগিয়ে যায় পুঁতিবালা হরিণীর মতো ক্ষিপ্র গতিতে। গজাননও চলে পেছন-পেছন।

সাদা হেলিকপ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বললে পুঁতিবালা, 'চালাতে জানো?'

'সব জানি।'

'তবে উঠে বোসো।'

'তারপর? পাহাড়ের ওই ফুটো দিয়ে হেলিকপ্টার তো বেরোবে না।'

'ফুটো দিয়ে নয়, এই বোতামটা টিপলেই—' পাহাড়ের গায়ে একটা বোতাম টিপল পুঁতিবালা—'চিচিং ফাঁক করে।'

হলও তাই। পাথুরে দেওয়াল সরে গেল একপাশে। স্টিল ডোর। পাথরের মতো নকশা করা বলে পাথুরে দেওয়াল বলে মনে হয়েছিল এতক্ষণ।

সামনে খোলা চত্বর। তারপর...

পুঁতিবালাকে ফেলেই ভেতরে উঠে গেল গজানন। রামভেটকির দাপটে তাকে অনেক কিছুই শিখতে হয়েছে। এবার তা কাজে লাগাল।

কিন্তু পুঁতিবালা আসছে না কেন?

হেঁকে ডাকা তো যাচ্ছে না। মুখ বাড়িয়ে চক্ষু স্থির হয়ে গেল গজাননের।

লাল রঙের একটা পেল্লায় ঘড়ির কাঁটা ঘুরোচ্ছে পুঁতিবালা। ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে এক জায়গায় রেখেই দৌড়ে এসে উঠে পড়ল হেলিকপ্টারে।

বললে রুদ্ধশ্বাসে, 'ঝটপট চলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সরে যেতে হবে। আওয়াজ পেয়ে ওরা ছুটে এলেই—'

আর বলতে হল না গজাননকে। ইঞ্জিন স্টার্ট করে হেলিকপ্টার চালু করল চক্ষের নিমেষে। পর্বতকন্দর থরথর করে কেঁপে উঠল ভীষণ আওয়াজে। হইহই আওয়াজ শোনা গেল দূরে। ঘাড় কাত করে দেখল গজানন ন'টা মূর্তি ছুটে আসছে এদিকে। দুমদাম শব্দে তপ্ত বুলেট ঠিকরে আসছে ওদের দিকে।

আর তাকায়নি গজানন। ঈষৎ কাত হয়ে হেলিকপ্টার চক্ষের নিমেষে বেরিয়ে এল পাহাড়ের বাইরে এবং সেইভাবেই ছিটকে গেল আকাশের দিকে।

পাঁচমিনিট পূর্ণ হতেই পুঁতিবালার হাতে সেট করা টাইম বোমা বিস্ফোরিত হল।

বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। আন্দামানের সেই দ্বীপটি আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন বললেই চলে।

গুপ্তচর বাহিনীর বাকি ঘাঁটিগুলোও নির্মূল হয়েছে এরপরে পুঁতিবালার সংগৃহীত তথ্যের বলে।

অতএব অতীব রোমাঞ্চকর এবং অবিশ্বাস্য এই কাহিনিরও সমাপ্তি এইখানে।

** 'দ্বীপবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত। (শারদীয় সংখ্যা।)*

ব্রোঞ্জের গণেশ

৷৷ প্রথম দৃশ্য ৷৷

(বসবার ঘর। ছন্দা বসে আছে। মনীশ নাগরাজনকে টানতে-টানতে ঢুকছে।)

মনীশ—ছন্দা, ছন্দা—দ্যাখো, কে এসেছেন। আসুন, আসুন স্যার, বসুন। ভাগ্যিস দেখা হয়ে গেল। ধরে না আনলে তো আর আসতেন না।

ছন্দা—কী ব্যাপার, কাকে ধরে আনলে। ও, মিঃ নাগরাজন—নমস্কার।

নাগরাজন—নমস্কার।

মনীশ—দারোগাসাহেবকে ধরে আনলাম—উনি দারোগা, সবাইকে ধরেন-টরেন। আজ আমাকেই ধরে আনতে হল ওঁকে।

ছন্দা—খুব খুশি হলাম, মিঃ নাগরাজন। ভাবতেই পারিনি গরিবের ঘরে আপনার পায়ের ধুলো পড়বে।

নাগরাজন—Please, অমন করে বলবেন না, ম্যাডাম। জানেনই তো আমাদের যা কাজ। তবে একথা বিশ্বাস করতে পারেন যে, আজ আপনাদের এখানেই আসছিলাম।

মনীশ—আপনি তো তাহলে অনেকদিন জ্বালাবেন।

নাগরাজন—জ্বালাব? মানে?

মনীশ—জ্বালাবেন বইকি। একটু আগেই আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল আপনাকে নিয়ে। ভাগ্যিস সেদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল—নইলে ওর হারানো হাত ঘড়িটা তো আর ফিরে পেতাম না। নতুন জায়গায় এসেছি। সঙ্গে-সঙ্গে একটা অমঙ্গল ঘটলে মন খারাপ হয়ে যেত না? উঃ, চিমটি কাটছ কেন?

নাগরাজন—সাজপোশাক দেখে মনে হচ্ছে আপনারা কোথাও বেরুচ্ছিলেন। আমি এসে শুভযাত্রায় বাদ সাধলাম নিশ্চয়ই। আমি বরং—

মনীশ—আরে না মশাই। রাখুন আপনার ওঠা। আপনি এলেন আর আমরা বেড়াতে

বেরুব? না, না। তার চেয়ে বরং Let us celebrate your presence today. কী বল?

ছন্দা—আপনারা বসুন—আমি আসছি।

নাগরাজন—না, না, আপনি আবার কেন ব্যস্ত—

ছন্দা—আঃ, আপনি বসুন তো চুপচাপ। এ বাড়িতে আমি গিন্নি তা জানেন?

(ছন্দার প্রস্থান)

নাগরাজন—(সপ্রশংসভাবে) Really she is a gem. সত্যি মশাই—স্ত্রীভাগ্য আছে বটে আপনার।

মনীশ—ওকে নিয়েই তো আছি মশাই। ওর জন্যেই সব ছেড়েছি, বাপ মায়ের স্নেহ হারিয়েছি। আবার ওর মধ্যেই পেয়েছি ঘরের সমস্ত উত্তাপ উষ্ণতা। যা হারিয়েছিলাম সব পেয়েছি। জানেন ইন্সপেক্টর, ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই এ সংসারে।

নাগরাজন—শুনে খুশি হলাম। যাক, মাইশোর কেমন লাগছে বলুন?

মনীশ—প্রথম-প্রথম তো সব জায়গাই ভালো লাগে। বিশেষ করে মহীশূরের মতো সুন্দর জায়গা কার না ভালো লাগে। খুব বেড়াচ্ছি-টেড়াচ্ছি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। তবে কতদিন এ চার্ম বজায় থাকবে তা জানি না।

নাগরাজন—থাকবে থাকবে মশাই। আমি তো প্রায় তিন বছর কাটিয়ে দিলাম। এখনও তো বেশ ভালো লাগছে। আপনাদের কলকাতার সেই কর্মমুখর প্রাণচাঞ্চল্য এখানে নেই বটে—কিন্তু এখানকার এই নৈঃশব্দ্যই এর প্রাণ। থাকুন, ভালোবাসুন—তখন ছাড়তেই চাইবেন না।

মনীশ—(মুগ্ধভাবে) বাঃ! পুলিশে চাকরি করেও ভারি চমৎকার কবি-প্রকৃতি তো আপনার। বাংলা vocabulary তো বেশ strong করেছেন দেখছি। কী স্যার, লেখার অভ্যাস-টভ্যেস আছে নাকি?

(ট্রে হাতে ছন্দার প্রবেশ)

ছন্দা—খুব তো জমিয়ে গল্প হচ্ছে। নিন এবার কিছু খেয়ে নিন।

নাগরাজন—Very good, দিন মিসেস সরকার। Mr. Sarkar জিগ্যেস করছিলেন, আমি সাহিত্যচর্চা করি কিনা। বলছিলাম আমার তো বই পড়াই হয়ে ওঠে না, লেখা দূরে থাক।

ছন্দা—ও হো, আপনি তো আসল ব্যাপারটাই জানেন না। আসুন পরিচয় করিয়ে দিই। Mr. Nagrajan আপনি যেমন পুলিশের কাজে গোয়েন্দাগিরি করেন, ইনি মনীশ সরকার তেমনি বাংলা পাঠক সমাজে গোয়েন্দা কাহিনি লিখে বিলক্ষণ দুর্নাম কিনেছেন সেই সাথে আমাকেও ডুবিয়েছেন। আঃ চুল টানছ কেন?

নাগরাজন—By jove, আপনি ডিটেকটিভ গল্প লেখেন নাকি?

ছন্দা—আপনি মশাই, ওর কাছে খুনের গপ্পটপ্প করবেন না যেন। ঘুমিয়ে জেগে সবসময়ে তো খুন করে চলেছে। কোনওদিন না আমাকেই—

নাগরাজন—(হেসে) নাঃ আপনাদের দেখছি কস্মিনকালেও বনিবনা হবে না।

মনীশ—নতুন কী অ্যাডভেঞ্চার করলেন মশাই?

নাগরাজন—অ্যাডভেঞ্চার বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়, তবে সম্প্রতি একটা অদ্ভুত খুনের ঘটনা আমাকে বড়ই ভাবিয়ে তুলেছে।

মনীশ—তাই নাকি! কী ব্যাপারটা বলুন তো?

নাগরাজন—অবশ্য অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপারটা। মহীশূর রাজপরিবারের সমস্ত সম্মান নির্ভর করছে এই ব্যাপারটা সমাধানের ওপর। তবে আপনাদের বলতে বাধা নেই, কারণ আপনাদের আমি Family friend বলেই মনে করি। (একটু থেমে) ললিতা মহল দেখেছেন আপনারা?

মনীশ—কোন ললিতা মহল? গেস্ট হাউসের কথা বলছেন?

নাগরাজন—হ্যাঁ।

মনীশ—বাড়িটার কথা শুনেছি বটে। দেখা হয়ে ওঠেনি এখনও।

নাগরাজন—দেখে আসবেন একদিন। এখান থেকে মাইল চারেক দূরে মহারাজ কৃষ্ণরাজা ওয়াদিয়ার রাজবাড়ি। প্রাসাদ তোরণের সামনেই দেখবেন একটি Circle. ঠিক কেন্দ্র থেকে পরস্পর সমকোণে চলে গেছে দুটি রাস্তা। একটি রানি মহলের দিকে—নাম শুনেই বুঝতে পারছেন রানি মহল কী। আর একটা গিয়ে পৌঁছেছে এই ললিতা মহলে। মহীশূর রাজন্যবর্গের সম্মানিত অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত গেস্ট হাউস। এই ললিতা মহলেই কয়েকদিন আগে পাওয়া গেছে একটি মৃতদেহ। হৃৎপিণ্ডের মাঝখান দিয়ে কেউ ধারালো সরু একটা শলাকা চালিয়ে দেওয়ার ফলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে।

মনীশ—মৃত ব্যক্তি কে?

নাগরাজন—তাঁর কথা বলতে গেলে রাজপরিবারের একটা ছোট্ট ইতিহাস বলতে হয়।

মনীশ—বলতে বাধা থাকলে বরং থাক।

নাগরাজন—না, আপনাদের বলতে কোনও বাধা নেই। প্রথমেই বলে রাখি বর্তমান মহারাজা কৃষ্ণরাজা নিঃসন্তান। এই সন্তান না হওয়ার পেছনে আছে এক করুণ অথচ Interesting কিংবদন্তী। বহু বছর আগে এ বংশের এক রাজকন্যা কুলদেবীর আরাধনায় উন্মাদিনী হয়েছিলেন। নিজেকে দেবীর চরণে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়ে দিবানিশি বিভোর হয়ে থাকতেন তাঁর পূজায়। একদিন তিনি মনস্থ করলেন তাঁর যাবতীয় রত্নালঙ্কার দেবীকে উৎসর্গ করবেন নদীগর্ভে বিসর্জন দিয়ে। সমস্ত রত্নালঙ্কার তিনি সেই উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। তখনকার মহারাজা ছিলেন তাঁর ভাই। তিনি বোনের এই সঙ্কল্পের কথা জানতে পেরে তাঁকে জানালেন—রাজপরিবারের সমস্ত অলঙ্কার আর রত্নরাজি দেশবাসীর। তাদের অমতে এবং অজ্ঞাতসারে কোষাগারের একরতি স্বর্ণও তিনি অপব্যয় করতে পারেন না। রাজভগ্নী বোঝাবার চেষ্টা করলেন—এ অপব্যয় নয়, দেবীর কাছে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু মহারাজ তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। বোনের খেয়াল চরিতার্থ করতে দেশবাসীকে তিনি বঞ্চিত করতে পারেন না।

ছন্দা—Interesting গল্প তো—

নাগরাজন—সেই রাতেই নদীতীরে আবির্ভূত হল অভিমানী রাজকন্যার তপঃক্লিষ্ট দেহ। বসনাঞ্চলে তাঁর যাবতীয় স্বর্ণালঙ্কার। সেই বিপুল ঐশ্বর্য হাতে নিয়ে তিনি নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে রাতের অন্ধকারে উচ্চারণ করলেন এক অভিশাপ বাণী—দেবর চরণে অঞ্জলি সমর্পণে বাধা দেয় যে রাজবংশের মহারাজা, আজ থেকে সে রাজন্যবর্গ হবেন নিঃসন্তান। এই বলে তিনি অলঙ্কার সমেত নদীগর্ভে তলিয়ে গেলেন।

মনীশ—কী ভয়ানক! তারপর?

নাগরাজন—তারপর উত্তাল উদ্দাম হাওয়া হাহাকার রবে আছড়ে পড়ল তাঁর

ওপর—নিঃশব্দ ক্রন্দন যেন। ফিরিয়ে আনতে চাইল তাঁকে। কিন্তু নদীগর্ভের আবর্ত আরও দুর্নিবার বেগে আবিল হয়ে আহ্বান জানালেন রাজকুমারীকে। মুহূর্তের মধ্যে পুঞ্জ-পুঞ্জ ফেনার মাঝে হারিয়ে গেল রাজকন্যার শুভ্র বরতনু—সেই সাথে যাবতীয় রত্নরাজি। এরপর থেকেই দেখা গেছে—সিংহাসনে সমাসীন এক মহারাজার সন্তান হয়েছে—কিন্তু পরবর্তী মহারাজা থেকেছেন নিঃসন্তান। তাঁর পরবর্তী রাজার আবার সন্তান হয়েছে। জানি না এর মধ্যে অলৌকিক ব্যাপার আছে কিনা। কিন্তু বংশানুক্রমিক ভাবে এই ব্যাপারেই পুনরাবৃত্তি হতে দেখা গেছে। বর্তমান মহারাজা নিঃসন্তান। প্রচলিত প্রথানুযায়ী তিনি পোষ্য নিয়েছেন যুবরাজ চন্দ্রকেতুকে।

ছন্দা—বাবা! দেবী তাহলে খুব জাগ্রত বলুন?

নাগরাজন—আজ্ঞে হ্যাঁ। সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। তাঁর প্রসাদেই এ রাজ্যের আজ এত উন্নতি। কৈশোরেই এই চন্দ্রকেতুকে মহারাজ ইংলন্ডে পাঠিয়েছিলেন উচ্চশিক্ষার জন্য। Physics-এ ডক্টরেট নিয়ে আট বছর পর যুবরাজ যখন স্বদেশে ফিরলেন তখন তিনি আর একা নন—সঙ্গে তাঁর স্ত্রী পেট্রিসিয়া। পেট্রিসিয়া স্পেনের মেয়ে। পড়াশুনো করতে এসেছিলেন লন্ডনে। সেখানেই তাঁদের পরিচয়, প্রণয় এবং পরিণয়। মহারাজা যুবরাজকে স্নেহ করতেন প্রাণের চেয়েও বেশি। তাই অন্তরে শেল হানলেও ক্ষমা করলেন তাঁকে। কিন্তু যুবরানির থাকার ব্যবস্থা হল মূল প্রাসাদের বাইরে—রানি মহলে। যুবরাজ আপত্তি করলেন না। এসব ঘটনা ঘটে বছর তিনেক আগে। যুবরানির প্রথম আগমনে কিছুটা চাঞ্চল্যের সূত্রপাত হয়েছিল—কিন্তু কালের প্রবাহে ধীরে-ধীরে সবই স্বাভাবিক হয়ে আসে। মাসখানেক আগে যুবরানির এক বাল্যবন্ধু এলেন এখানে ভারতবর্ষ বেড়াতে। নাম এ্যান্টনি মার্সডেন।

ছন্দা—রানির লাভার নিশ্চয়।

নাগরাজন—হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। এই ললিতা মহলেই উঠেছিলেন। ললিতা মহলের বিরাট লাইব্রেরিতে আছে নানারকম সংগ্রহ। সেইসব নিয়েই মেতেছিলেন। প্রায় দিন সাতেক আগে মার্সডেনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এই লাইব্রেরির মধ্যে গণেশ মূর্তির পায়ের কাছে।

মনীশ—গণেশ মূর্তি?

নাগরাজন—হ্যাঁ। যুবরাজের সংগ্রহ বাতিক আছে। নানারকম মুদ্রা থেকে শুরু করে মূর্তি ইত্যাদি সংগ্রহ করে এক ছোট আর্ট মিউজিয়ামও করেছেন ললিতা মহলে। ব্রোঞ্জের তৈরি এই বিরাট গণেশ মূর্তিটি লাইব্রেরি রুমেই রাখা হয়েছে একটি সিংহাসনের ওপর। তারই পায়ের তলায় মার্সডেনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। একটা সরু ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেউ তার হৃৎপিণ্ডটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় মৃতদেহের মুখে কোনও ভয় বা যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র ছিল না। ছিল অপার বিস্ময়।

মনীশ—ঘরটা আপনি হত্যার পর দেখেছেন নিশ্চয়। কিছু ক্লু পাননি?

নাগরাজন—কিস্যু না। মার্সডেন মারা গেছে আগের রাত্রে—পোস্টমর্টেমে এর বেশি কিছু পাওয়া যায়নি।

মনীশ—সে রাত্রে গেস্ট হাউসে কে-কে ছিল?

নাগরাজন—মার্সডেন আর নিয়মিত দারোয়ান, বয়, বাবুর্চি—এরা ছাড়া আর কেউ না।

মনীশ—যুবরাজ?

নাগরাজন—যুবরাজ সে রাত্রে রাজধানী থেকে প্রায় মাইল দশেক দূরে রিজার্ভ ফরেস্টে শিকার করতে গিয়েছিলেন। সকালে খবর পাঠানো মাত্র ফিরে আসেন।

মনীশ—তাহলে মোটের ওপর কোনও দরকারি সূত্রই আপনি পাননি—তাই না?

নাগরাজন—একেবারে না।

মনীশ—আচ্ছা, ব্যক্তিগতভাবে কারও ওপরে সন্দেহ হয় না আপনার?

নাগরাজন—সন্দেহ আর কাকে করব? যতদূর জানা গেছে, মার্সডেনের সঙ্গে এ রাজ্যে পরিচয় ছিল শুধু দুজনের—যুবরাজ ও যুবরানির। এই ক'দিনের মধ্যে তাঁদের সঙ্গে শত্রুতা গড়ে ওঠাও অস্বাভাবিক। তাছাড়া ললিতা মহল থেকে উনি বাইরে বেরুতেন কদাচিৎ—বেরোলেও গন্তব্যস্থান ছিল রানিমহল। কিন্তু যুবরাজ ও যুবরানির alibi অকাট্য। একজন ছিলেন রানিমহলে। আর একজন রিজার্ভ ফরেস্টে। এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণও পেয়েছি যথেষ্ট।

মনীশ—আশ্চর্য!

নাগরাজন—আরও আশ্চর্য হবেন যে, লাইব্রেরি ঘরের সমস্ত দরজা জানলা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। প্রত্যেকটি স্ল্যাস উইন্ডো আর দরজা শক্তভাবে আঁটা ছিল ভেতর থেকে। সকালে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকার পর তাই দেখা গেছে।

মনীশ—বন্ধ ঘরের মধ্যে মৃতদেহ পাওয়া গেলে দুটো পথে এ রহস্যের সমাধান পাওয়া যেতে পারে। এক নম্বর—মৃতব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে কিনা। দু-নম্বর—ঘরের মধ্যে কোনও গুপ্ত দরজা আছে কিনা। বিশেষ করে রাজা-মহারাজার বাড়ি যখন।

নাগরাজন—মিঃ সরকার, আমারও সেকথা মনে হয়েছিল। কিন্তু Postmortem report বলছে তীক্ষ্ণ শলাকাটা যেভাবে হৃৎপিণ্ডে বিঁধেছে, আত্মহত্যায় সেটা সম্ভব নয়। তাছাড়া অস্ত্রটাই বা যাবে কোথায়? সেটাও তো অনেক খোঁজা হয়েছে। কাজেই আত্মহত্যার প্রশ্নটা ধোপে টেকে না।

মনীশ—গুপ্ত দরজার খোঁজ করেছিলেন?

নাগরাজন—মহারাজকে আমার সন্দেহের কথা খোলাখুলি বলেছিলাম। উনি আমায় গেস্ট হাউসের পুরোনো নক্সা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে ললিতা মহলের কোথাও নেংটি ইঁদুরের জন্যেও গুপ্তপথ রাখা হয়নি।

ছন্দা—আচ্ছা, আপনি যুবরাজ বা যুবরানির সঙ্গে এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেননি? তাঁদের কী মত?

নাগরাজন—এটা অবশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, সন্দেহ নেই। দেখুন, আপনাদের আমার ভালো লেগেছে। এসব ব্যাপার অত্যন্ত Secret, তবু এতটা যখন আপনাদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করেছি, তখন সঙ্কোচের বাধা আর রাখব না। যুবরাজের সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়েছিল তা খুব প্রীতিকর নয়।

মনীশ—যেমন।

নাগরাজন—শুনুন তবে।

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

(রাজঘর। যুবরাজ চন্দ্রকেতু বসে আছেন দামি চেয়ারে।
নাগরাজন দাঁড়িয়ে সামনে, পুলিশি বেশে।)

চন্দ্রকেতু—এ কেস হাতে নিয়েছেন আপনি?

নাগরাজন—Yes, your হাইনেস।

চন্দ্রকেতু—সবাইকে জেরা করেছেন?

নাগরাজন—Yes, your—

চন্দ্রকেতু—কী বলে তারা?

নাগরাজন—রাত্রে ইনি ছাড়া এখানে কেউ ছিলেন না। দরজা জানলা ভিতর থেকেই বন্ধ ছিল। কোনও চিৎকারও শোনা যায়নি।

চন্দ্রকেতু—কী মনে হয় আপনার? Suicide ?

নাগরাজন—কোনও অস্ত্র তো পাওয়া যাচ্ছে না।

চন্দ্রকেতু—মার্ডার?

নাগরাজন—দরজা-জানলা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, হাইনেস। খুনি এল কোথা দিয়ে গেলই বা কী করে?

চন্দ্রকেতু—খুনও নয়—আত্মহত্যাও নয়। Well, then ?

নাগরাজন—এ রহস্যের কিনারা করতে সময়ের প্রয়োজন।

চন্দ্রকেতু—বটে। সময় পেলে কিনারা করতে পারবেন? বেশ, দিলাম সময়। করুন কিনারা। You want my statement ?

নাগরাজন—If you please।

চন্দ্রকেতু—মার্সডেনের সঙ্গে আমার আলাপ মাত্র একমাসের আর গতরাত্রে আমি Forest-এ ছিলাম আমার অনুচরদের সঙ্গে—এই আমার জবানবন্দি। আর খুনি কে—তা যদি জানতে চান তাহলে শুনুন—খুনি আমি নিজে।

নাগরাজন—Your হাইনেস, আমি একজন নগণ্য কর্মচারী। আপনার পরিহাসের যোগ্য নই।

চন্দ্রকেতু—পরিহাসের সময় এটা নয় Inspector। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, এটা আত্মহত্যা না খুন—আমি বলব খুন। যদি জিগ্যেস করেন, খুনি কে? বলব আমি স্বয়ং। তারপরের কাজটা—প্রমাণ করার দায়িত্বটা আপনার—আমার নয়। প্রমাণ করুন, আমি খুনি। সময় চাইছিলেন—সময় দিলাম।

(শিস্ দিয়ে প্রস্থান)

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

(বসবার ঘর। নাগরাজন, ছন্দা আর মনীশ বসে রয়েছে।)

নাগরাজন—(চিন্তিতভাবে) যুবরাজ সময় দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু প্রায় একমাস হয়ে গেল Mr. Sarkar, এক পা-ও এগুতে পারলাম না।

মনীশ—যুবরাজের কথা শুনে আপনার কী মনে হল? সত্যিই কি তিনি—

নাগরাজন—ভগবান জানেন। যে সুরে তিনি কথা বললেন—তা থেকে সত্যি মিথ্যে ধরা অসম্ভব।

মনীশ—মার্সডেনের সঙ্গে কি যুবরাজের কোনওরূপ শত্রুতা থাকা সম্ভব? মানে যদি কোনও ত্রিভুজ প্রেমের ব্যাপার—

নাগরাজন—কী করে বলি বলুন? যদি সেরকম কিছু থেকে থাকেও, যুবরানির confession ছাড়া তো সেকথা জানা যাবে না কোনওদিন।

মনীশ—তাঁর Statement নেননি এখনও?

নাগরাজন—রাজাদের ঘরের বউয়ের নাগাল কি আর অত সহজে পাওয়া যায় মনীশবাবু। দরখাস্ত করেছি মহারাজের কাছে। এখনও অনুমতি মেলেনি। তবে গতকাল একটা চিরকুট পেয়েছি যুবরানির কাছ থেকে। এই দেখুন—

(নাগরাজন চিরকুট দিল মনীশের হাতে। মনীশ সামনে ধরে রয়েছে)

মনীশ—(নারীকণ্ঠে শোনা যায় চিরকুটের কথাগুলি) মার্সডেনের মৃত্যু রহস্য নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করলে উপকৃত হবেন। কোনও Signature নেই দেখছি। কবে যাচ্ছেন?

নাগরাজন—কাল যাওয়ার ইচ্ছে আছে। আপনিও চলুন না আমার সঙ্গে।

মনীশ—আমি—মানে—কিন্তু তিনি ডেকেছেন আপনাকে—আমাকে allow করবেন কেন?

নাগরাজন—সে দায়িত্ব আমার। দেখুন crime detection-এর দিক দিয়ে কলকাতা যে আজ ভারতবর্ষকে পিছনে ফেলে দিয়েছে তা আমার অজানা নয়। এদিক দিয়ে বাঙালিদের আমি শ্রদ্ধা করি। তা ছাড়া আপনি ডিটেকটিভ গল্প লেখেন—জেরা করার একটা সহজাত প্রবণতা থাকা আপনার স্বাভাবিক। কী বলেন, মিসেস সরকার?

ছন্দা—তা আর বলতে। আমি তো একেবারে জেরবার হয়ে যাচ্ছি দিনেরাতে।

(সকলে হেসে ওঠে)

মনীশ—কিন্তু।

নাগরাজন—আর কোনও কিন্তু নয়, তাহলে ওই কথাই রইল।

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

(রানির ঘর। যুবরানি প্যাট্রিসিয়া, নাগরাজন আর মনীশ।)

প্যাট্রিসিয়া—Your name please ?

নাগরাজন—আলেক নাগরাজন—C.I.D. Inspector, যাকে আপনি আসতে বলেছিলেন। আর ইনি হচ্ছেন আমার বন্ধু মনীশ সরকার—বাঙালি। ইনি একজন অ্যামেচার প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

প্যাট্রিসিয়া—বিশ্বাস করতে পারি নিশ্চয়ই?

নাগরাজন—আমাকে যদি পারেন—তাহলে ওঁকেও পারবেন।

প্যাট্রিসিয়া—বেশ, বলুন কী জানতে চান।

নাগরাজন—Your highness আমাকে আজ ডেকে পাঠিয়েছিলেন to discuss Mr. Marsden's death।

প্যাট্রিসিয়া—Right. But do you think it an ordinary death ?

নাগরাজন—Postmortem একে আত্মহত্যা নয় বলেই Report দিয়েছে।

প্যাট্রিসিয়া—Alright. আপনি কি জানেন It is a case of murder ?

নাগরাজন—Yes, your highness।

প্যাট্রিসিয়া—হত্যাকারী কে, জেনেছেন?

নাগরাজন—আমি যদি বলি, বিশ্বাস করবেন না, Your highness।

প্যাট্রিসিয়া—হত্যাকারীকে উচিত শাস্তি দিতে পারবেন? ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলুন।

নাগরাজন—শপথ করছি।

প্যাট্রিসিয়া—মার্সডেনের সঙ্গে এ দেশে কার কার আলাপ আছে জেনেছেন?

নাগরাজন—যতদূর জেনেছি, শুধু আপনার সঙ্গে আর যুবরাজের সঙ্গে।

প্যাট্রিসিয়া—এদের মধ্যেই একজন খুনি।

মনীশ—মাপ করবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে স্পষ্ট প্রশ্ন করা ছাড়া উপায় নেই।

প্যাট্রিসিয়া—Don't hesitate।

মনীশ—আপনি নিশ্চয় খুন করেননি?

প্যাট্রিসিয়া—(মৃদু হেসে) আপনার অনুমান সত্য। আমি তাকে ভালোবাসতাম।

মনীশ—একথা যুবরাজ জানতেন?

প্যাট্রিসিয়া—Yes, জানতেন।

মনীশ—কতদিন থেকে।

প্যাট্রিসিয়া—স্পষ্টভাবে জানতে পারেন বিয়ের ছ'মাস পর থেকে।

মনীশ—Excuse me, এরপর থেকে কি আপনাদের মধ্যে অশান্তির সূত্রপাত হয়?

প্যাট্রিসিয়া—That's right।

মনীশ—কিন্তু Mr. Marsden হঠাৎ এ দেশে এলেন কেন?

প্যাট্রিসিয়া—আমায় নিয়মিত চিঠি লিখত Marsden। আমিও লিখতাম। আমার এ দেশে আসার পর প্রায় ছ'মাস ঠিকমতো তার চিঠি পেয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ একদিন বন্ধ হয়ে গেল চিঠি আসা। অধীর হয়ে চিঠির পর চিঠি লিখতে লাগলাম। কিন্তু কোনও উত্তর পেলাম না। তারপর হঠাৎ একদিন মার্সডেন এসে হাজির হল এখানে।

মনীশ—আমার ঔদ্ধত্য মার্জনা করবেন, কিন্তু Mr. Marsden-এর চিঠিগুলো যুবরাজের হস্তগত হয়েছে, একথাই কি আপনি বলতে চাইছেন?

প্যাট্রিসিয়া—আপনার অনুমান সত্য এবং সেই ব্যাপারেই বোঝাপড়া করতে চেয়েছিল মার্সডেন।

মনীশ—তারপর?

প্যাট্রিসিয়া—এখানে এসে মার্সডেন প্রথমেই আমার সঙ্গে দেখা করে সব ব্যাপারটা আমায় জানায়। তারই নির্দেশমতো আমি যুবরাজের সঙ্গে দেখা করি। ভালোভাবেই শুরু করি কথাবার্তা—একথা-সেকথার পর আসল প্রসঙ্গে এলাম।

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

(রাজঘর। যুবরাজ আর যুবরানি বসে আছেন)

চন্দ্রকেতু—কিছু বলবে?

প্যাট্রিসিয়া—হ্যাঁ ডার্লিং, একটা কথা তোমায় বলার ছিল—If you don't mind—

চন্দ্রকেতু—Oh yes, বলবে বইকী। বলার যখন আছে তখন নিশ্চয় বলবে। বলো—আমি শুনছি।

প্যাট্রিসিয়া—বেশ কিছুদিন ধরে আমার চিঠিপত্র নিয়মিত পাচ্ছি না।

চন্দ্রকেতু—তাই নাকি? বেশ, আমি খোঁজ নিচ্ছি।

প্যাট্রিসিয়া—খোঁজ আমি নিজেই নিয়েছি। অন্য সব চিঠি আমি ঠিক পেয়েছি। শুধু একজনের চিঠিরই গোলমাল হচ্ছে।

চন্দ্রকেতু—কে সেই ভাগ্যবান?

প্যাট্রিসিয়া—তার নাম তোমার অজানা নয়, চন্দ্র। মার্সডেনের একটা চিঠিও আমি গত ক'মাস ধরে পাইনি। What happened to those letters?

চন্দ্রকেতু—(তীব্রস্বরে) আমার সঙ্গে নরম সুরে কথা বলো, প্যাট্। মনে রেখো এটা তোমার মাদ্রিদ নয়।

প্যাট্রিসিয়া—জানি এটা মাদ্রিদ নয়—এটা Mysore, তোমার স্বদেশ—তোমার স্বেচ্ছাচারিতার, তোমার উচ্ছৃঙ্খলতার লীলাক্ষেত্র। কিন্তু তাই বলে আমার ব্যক্তিগত চিঠি চুরি করার মতো মনোবৃত্তি আমি তোমার কাছে আশা করিনি।

চন্দ্রকেতু—চুরি।

প্যাট্রিসিয়া—Yes চুরি। না বলে পরের জিনিস নেওয়াকে চুরি বলে—তা কি তুমি জানো না।

চন্দ্রকেতু—মূর্খ! তুমি পুরুষ হলে চাবুক দিয়ে তোমায় শিখিয়ে দিতাম কী করে যুবরাজ চন্দ্রকেতুর সঙ্গে কথা বলতে হয়। Yes, তোমার সব চিঠি আমিই নিয়েছি—নিয়েছি এ রাজ্যের মঙ্গলের জন্য। তোমার মতো পরপুরুষ আসক্ত নারীর যাতে এ রাজ্যের রানি হওয়ার কোনও দাবি না থাকতে পারে—তার ব্যবস্থাই করতে হবে আমায়।

প্যাট্রিসিয়া—Well, তুমি যদি ভেবে থাকো, তোমার রানি হওয়ার জন্য আমি আকুল—তবে, তুমি খুব ভুল করেছ। তুমি জানতে মার্সডেনের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক আছে। তা সত্ত্বেও রূপের মোহে তুমি আমায় বিয়ে করেছিলে। আমার দরিদ্র বাবা-মাকে পয়সার লোভ দেখিয়ে মত আদায় করতে তোমার বাধেনি। বাবা-মার মনে কষ্ট দিতে চাইনি তাই মার্সডেনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে, এসেছিলাম তোমার সঙ্গে।

চন্দ্রকেতু—কিন্তু এখন আবার সে সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হল কেন? আমাকে দোহন করার জন্যে?

প্যাট্রিসিয়া—নিজে ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চয় আশা করো না তোমার স্ত্রী তোমার কীর্তিকলাপ শুনে পরম সুখে দিন যাপন করবে রানিমহলের নিঃসঙ্গ বিলাসকক্ষে? তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের শ্লেষটুকু আমি গায়ে মাখলাম না। মাদ্রিদে আমাদের বংশের ঐতিহ্য যে কত সুপ্রাচীন তা তোমার অজানা নয়।

চন্দ্রকেতু—নিশ্চয়ই অজানা নয়। আর তাই প্রমাণ করে দেব সে বংশে জন্মগ্রহণ করেও কত নিচে তুমি নেমেছ। একটা রাজ্যের যুবরানির পদে অভিষিক্ত থেকেও সামান্য একটা পর পুরুষের সঙ্গে প্রেম পত্রালাপ করতে তোমার ঐতিহ্যে বাধে না।

প্যাট্রিসিয়া—তার জন্যে তুমিই Responsible। আমি তো সব ছেড়েই চলে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি...

চন্দ্রকেতু—Yes, আর সেইসঙ্গে ঘুচিয়ে দেব এ রাজ্যের সঙ্গে তোমার সব সম্পর্ক। এই মার্সডেনের সঙ্গে তোমাকে ফেরত যেতে হবে তোমার বাবা-মা'র কাছে—মাদ্রিদে।

প্যাট্রিসিয়া—না, কেতু। তা তুমি কখনও করতে পারো না। আমার বৃদ্ধা মা, বাবা, আমার আত্মীয়স্বজন আমার বংশ—

চন্দ্রকেতু—অনেক-অনেক আগে তোমার ভাবা উচিত ছিল, তোমার মা-বাবা, আত্মীয়স্বজনের কথা। এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। মজার কথা কি জানো, আমাদের হিন্দু

বিবাহে Divorce পাওয়া খুব সোজা নয়। তাই তোমায় যদি আমি ত্যাগ করি, তাহলে স্বামী পরিত্যক্তার কলঙ্কিত জীবন নিয়ে তোমাকে হয়তো একা জীবন কাটাতে হবে।

প্যাট্রিসিয়া—না, না, চন্দ্র। এত নিষ্ঠুর তুমি হয়ো না। একদিন তো তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে?

চন্দ্রকেতু—হ্যাঁ বেসেছিলাম। সে ভালোবাসার ফল তুমি পেয়েছ। এখন আমি তোমায় ঘৃণা করি। সে ঘৃণার বিষফলও তোমায় পেতে হবে। Good night, My Queen, Good night।

৷৷ ষষ্ঠ দৃশ্য ৷৷

(রানির ঘর। মনীশ, যুবরানি, নাগরাজন বসে আছে।)

মনীশ—এ ঘটনাটা ঘটেছে কতদিন আগে?

প্যাট্রিসিয়া—মার্সডেনের মৃত্যুর পনেরো দিন আগে।

মনীশ—এ বিষয়ে মার্সডেনের সঙ্গে যুবরাজের কথা হয়েছিল?

প্যাট্রিসিয়া—হয়েছিল।

নাগরাজন—কবে?

প্যাট্রিসিয়া—তার মৃত্যুর রাত্রেই।

মনীশ—আপনি জানেন সেসব কথা?

প্যাট্রিসিয়া—জানি। (গলা ধরে আসে) সে রাতে লতিতা মহলের লাইব্রেরি রুমে ওদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছিল।

মনীশ—যদি আপত্তি না থাকে...

প্যাট্রিসিয়া—বেশ শুনুন...

৷৷ সপ্তম দৃশ্য ৷৷

(লাইব্রেরি ঘর। একটা ব্রোঞ্জের গণেশ মূর্তি সিংহাসনে। সামনে পাদানী। মুকুট থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। চন্দ্রকেতু আর মার্সডেন তার সামনে দাঁড়িয়ে। পাশে একটা ডায়াল টেলিফোন। ব্রোঞ্জের মূর্তি, সদ্য ব্রোঞ্জপেন্ট করা। মূর্তির মুকুট থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।)

মার্সডেন—যুবরাজ, এত রাত্রে আমরা কেন এখানে মিলিত হয়েছি তা নিশ্চয়ই আপনার অজানা নয়।

চন্দ্রকেতু—নিশ্চয়ই। অজানা কেন হবে?

মার্সডেন—What's your decision in the matter জানতে পারি কি?

চন্দ্রকেতু—চিঠিগুলো সম্বন্ধে—তাই না?

মার্সডেন—Yes।

চন্দ্রকেতু—সে কথা তো আপনার বান্ধবীকেই জানিয়েছি।

মার্সডেন—তা আমি জানি। But is that all ?

চন্দ্রকেতু—Do you expect anything more ?

মার্সডেন—ভেবে দেখুন তার মান-সম্মান, তার ভবিষ্যৎ জীবন, মাদ্রিদে তার বংশের সুনাম।

চন্দ্রকেতু—জানি, জানি। তার মান-মর্যাদার কথা ভাববার দায়িত্ব শুধু আমার একার নয়। তারও ভাবা উচিত ছিল।

মার্সডেন—তার সেই ভুলের সুযোগ নিয়েই কি তার সমস্ত জীবনটা নষ্ট করে দিতে চান আপনি?

চন্দ্রকেতু—Shut up। আমার সিদ্ধান্তের ওপর একজন বিদেশির সমালোচনা শুনতে চাই না আমি। যাকে স্পেনের এক সামান্য পরিবার থেকে তুলে এনে বসিয়েছিলাম রানির সিংহাসনে—একদিন যার পুত্রসন্তান হত এ রাজ্যের রাজা—এই তার প্রতিদান? ভুল আমারই হয়েছে—মানুষ তার প্রকৃতির ঊর্ধ্বে কখনওই উঠতে পারে না। আপনার স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। জানেন, প্যাট্রিসিয়ার এই অবনতির জন্যে—তার এই চরম দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী কে?

মার্সডেন—আপনার মতে আমি?

চন্দ্রকেতু—হ্যাঁ আপনি। আপনি সেই লোক যার জন্যে আজ তাকে পেতে হবে সারাটা জীবন ধরে অশেষ যন্ত্রণা।

মার্সডেন—ভুলে যাচ্ছেন, যৌবনের শুরু থেকেই আমাদের মধ্যে ভালোবাসা ছিল। সে ভালোবাসা আজও অক্ষয়, অম্লান।

চন্দ্রকেতু—থামুন! ভালোবাসা! ভালো তাকে আমি বাসিনি? যে সিংহাসনের জন্যে এ রাজ্যের বহু সম্ভ্রান্ত বংশ প্রতীক্ষা করছে বহুদিন—সে সিংহাসনে তাকে বসবার অধিকার দিয়েছে কে?

মার্সডেন—আপনি কি মনে করেন সেইটেই আপনার ভালোবাসার যথেষ্ট প্রমাণ? আসলে ভালো তাকে আপনি কোনওদিন বাসেননি। বেসেছিলেন তার রূপকে! সত্যিই যদি ভালোবাসতেন, তাহলে সে আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী জেনেও শুধু রূপের মোহে তাকে জোর করে বিয়ে করতেন না। আপনার লজ্জা হওয়া উচিত যে আজ আপনি আপনার ভুলের সমস্ত দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন।

চন্দ্রকেতু—Language! Language! Mr. Marsden। এই ধরনের মন্তব্য করার পরেও আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস আজ অবধি কারুর হয়নি। However, আপনার সঙ্গে বেশি সময় নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। বলুন, কী চান আপনি?

মার্সডেন—আমার চিঠিগুলো ফেরত চাই।

চন্দ্রকেতু—পাবেন না।

মার্সডেন—পাবই। এবং আপনি হাতে করে দেবেন।

চন্দ্রকেতু—তাই নাকি?

মার্সডেন—Exactly। মনে রাখবেন যুবরাজ। আগুন নিয়ে খেলা করছেন আপনি। আমাদের দুজনকে যদি আপনি কলঙ্কের পাঁকে ডোবাতে চান, মনে রাখবেন, আপনিও রেহাই পাবেন না। আপনাকে নিয়েই আমরা ডুবব।

চন্দ্রকেতু—অর্থাৎ?

মার্সডেন—অর্থাৎ চিঠি শুধু আমিই প্যাট্রিসিয়াকে লিখিনি, সেও আমায় লিখেছে। আর সে আপনার বিবাহিতা স্ত্রী।

চন্দ্রকেতু—Blackmail!!

মার্সডেন—অনেকটা। তবে আমার শর্ত ব্ল্যাকমেলারদের মতো অতটা কঠিন নয়। শুধু চিঠির প্যাকেটটা আমাকে দিলেই আপনি মুক্ত হতে পারেন। প্যাট্রিসিয়ার চিঠিগুলো আপনার সামনেই পুড়িয়ে ফেলব আমি।

চন্দ্রকেতু—ব্ল্যাকমেলারদের বিশ্বাস...

মার্সডেন—করা না করা আপনার মর্জি। তবে করলে আপনি উপকৃতই হবেন।

চন্দ্রকেতু—Mr. Marsden।

মার্সডেন—বলুন।

চন্দ্রকেতু—এ বিষয় নিয়ে আমার একটু চিন্তার দরকার। কয়েক মিনিট একলা থাকতে দেবেন?

মার্সডেন—Of course। আমি আমার ঘরে যাচ্ছি। আপনি ডেকে পাঠাবেন।

॥ অষ্টম দৃশ্য ॥

(রানির ঘর। যুবরানি, মনীশ আর নাগরাজন।)

মনীশ—এসব কথা আপনি জানলেন কী করে?

প্যাট্রিসিয়া—যুবরাজের সঙ্গে অদ্ভুত এক চুক্তিতে রফা হওয়ার পর মার্সডেন সেখান থেকেই টেলিফোন করে আমায় সব জানিয়েছিল। তার মনে তখন ছিল জয়ের উল্লাস।

মনীশ—কী অদ্ভুত চুক্তি? আপনি জানেন নাকি?

প্যাট্রিসিয়া—হ্যাঁ, শুনুন তবে।

॥ নবম দৃশ্য ॥

(লাইব্রেরি ঘর। গণেশ মূর্তি। যুবরাজ আর মার্সডেন।)

চন্দ্রকেতু—Mr. Marsden। চিঠিগুলো আপনাকে আমি দেব, কিন্তু একটি শর্তে।

মার্সডেন—বলুন?

চন্দ্রকেতু—চিঠিগুলো আপনাকে খুঁজে নিতে হবে।

মার্সডেন—আমাকে?

চন্দ্রকেতু—হ্যাঁ। আমি এখন ফরেস্টে যাচ্ছি শিকার করতে। চিঠিগুলো এই লাইব্রেরি ঘরেই আছে। খুঁজে নিন।

মার্সডেন—এই ঘরেই?

চন্দ্রকেতু—হ্যাঁ, এই ঘরে। খুঁজে নেওয়ার ভার আপনার। যদি পান ভালো—না পেলেও ভয় নেই—চিঠিগুলো আপনি পাবেন—তবে আপনাকে এবং প্যাটকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে।

মার্সডেন—বেশ, আমি রাজি।

চন্দ্রকেতু—ঠিক আছে। আমি চললাম।

(চন্দ্রকেতু বেরিয়ে যেতেই টেলিফোনের রিসিভার তুলল মার্সডেন।)

মার্সডেন—হ্যালো, প্যাট্রি, মার্সডেন Speaking....

(মঞ্চ অন্ধকার হয়ে এল...মার্সডেনের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল।)

॥ দশম দৃশ্য ॥

(রানির ঘর। যুবরানি, মনীশ আর নাগরাজন বসে রয়েছে।)

প্যাট্রিসিয়া—তারপর সারাটা রাত কাটিয়েছি অস্থিরভাবে। ভোর হয়ে গেল কিন্তু মার্সডেন ফিরল না। বারবার ফোন করেছি। প্রতিবারই ফোনে Ring হয়েছে শুধু, কেউ ধরেনি। তখনই দারুণ সন্দেহ আর আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়ি। তারপর কী হয়েছে—আপনারা তো জানেন।

মনীশ—হত্যাকারী কে, তা তো পরোক্ষভাবে বলেই দিলেন আপনি। কিন্তু প্রমাণ কোথায়? ঘটনার সময় তো তিনি ফরেস্টে রাইফেল চালাচ্ছেন। নিখুঁত alibi। ঘরের দরজা জানলা ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় যুবরাজের নিয়োজিত অন্য কারুর পক্ষেও ঘরের মধ্যে ঢুকে খুন করা Practically impossible।

প্যাট্রিসিয়া—Inspector। প্রমাণ খুঁজে বার করার ভার আমার নয়, আপনার। আপনাদের আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি? I am so tired।

নাগরাজন—না, Your highness। ভবিষ্যতে যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে হয়তো আপনাকে বিরক্ত করতে হতে পারে। আজ আমরা চলি।

প্যাট্রিসিয়া—Just a minute. আজ সকালে যুবরাজ টেলিফোনে আমাকে Contact করেছিলেন। আমাকে আজ রাত্রে Guest House-এর লাইব্রেরি রুমে দেখা করতে বলেছেন।

নাগরাজন—রাত্রে কখন?

প্যাট্রিসিয়া—রাত আটটায়।

নাগরাজন—ব্যাপারটা অদ্ভুত! যুবরাজ আপনার সঙ্গে তো এখানেই দেখা করতে পারেন। উদ্দেশ্য কিছু জানিয়েছেন?

প্যাট্রিসিয়া—উদ্দেশ্য একই। চিঠির প্যাকেট নিয়ে আমার সঙ্গে একটা Final বোঝাপড়া করতে চান।

নাগরাজন—আপনি কি যাচ্ছেন?

প্যাট্রিসিয়া—না। একলা অত রাত্রে নিজের মহল ছেড়ে অতদূরে যাওয়ার কোনও বাসনাই নেই। I suggest আমার বদলে যাবেন আপনারা। আমার মনে হয় এমন কিছু আপনারা আজ দেখতে পাবেন সেখানে, যাতে আপনাদের তদন্তের অনেক সুবিধা হতে পারে।

নাগরাজন—মিঃ সরকার কী বলেন?

মনীশ—যুবরানির Plan-এর প্রশংসা করছি। রহস্যময় ঘরখানি দেখতে পারলে ভালোই হয়।

নাগরাজন—বেশ তাহলে আমার অফিসে চলুন। রাত আটটা বাজতে তো বেশি দেরি নেই। ওখান থেকে আমরা আমাদের নিরাপত্তার কিছু সরঞ্জাম নিয়ে নিতে পারব। Good night your Highness।

॥ একাদশ দৃশ্য ॥

(লাইব্রেরি ঘর। গণেশ মূর্তি। সামনে দাঁড়িয়ে নাগরাজন আর মনীশ।)

নাগরাজন—দেখুন Mr. Sarkar, এই সেই অভিশপ্ত কক্ষ যেখানে মৃত মার্সডেনকে পাওয়া গিয়েছিল। ওই সেই গণেশ মূর্তি—ওই সিংহাসনের তলায় পড়েছিল লাশ।

মনীশ—মূর্তিটি অপূর্ব। মাথার মুকুট থেকে বিচ্ছুরিত ওই আলোয় কেমন যেন একটা

Hypnotic spell রয়েছে। কিন্তু সময় তো উত্তীর্ণ হয়ে গেল। কই, যুবরাজ তো এলেন না।

নাগরাজন—সেই কথাই তো ভাবছি। তবে কি যুবরাজ সব টের পেয়ে গেলেন? তা হলে তো বিপদের কথা।

মনীশ—(ভীতস্বরে) তাহলে আমাদেরই বা থেকে কী লাভ। অনর্থক সমস্ত রাত এখানে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। চলুন ফিরে যাই।

নাগরাজন—আর একটু বসুন। ন'টা বাজলেই ফিরব।

॥ দ্বাদশ দৃশ্য ॥

(বসবার ঘর। মনীশ আর ছন্দা বসে আছে।)

মনীশ—শুনলে তো আমাদের আজকের Adventure-এর Report।

ছন্দা—তা তো শুনলাম। কিন্তু যুবরাজ যে সব জানতে পেরে গেছে। কী হবে তাহলে?

মনীশ—কী আবার হবে? অত ভাববার কী আছে?

ছন্দা—দ্যাখো, অমন করে সব উড়িয়ে দিও না। এদেশের লোক আমরা নই, বলতে গেলে বিদেশি—শুধু-শুধু ভবিষ্যৎ মহারাজের বিরাগভাজন হওয়া কি ভালো?

মনীশ—খারাপটাই বা কি?

ছন্দা—(রেগে) খুব বীরত্বপনা দেখানো হয়েছে। কিছুই যেন হয়নি। আমি বলে দিলাম তোমায়—এ ব্যাপারে তোমার আর মাথা গলাবার দরকার নেই। খুনের গল্প লেখো যত খুশি আপত্তি নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে যদি আবার মাথা গলাও তবে—তবে দেখবে মজাটা।

মনীশ—আহা, রাগ করো কেন, ছন্দা। কাল নাগরাজন আসবে। তখন অনেক আলোচনা করা যাবে। অত চট করে চটলে কি চলে?

ছন্দা—না, চটবে না। এই বিদেশে সত্যিকার আপনজন বলতে কেই বা আছে বলো তো? বিপদে পড়লে কে দেখবে? দুজনের মধ্যে একজনের যদি কিছু হয় তখন আমার কী হবে? তুমি কি তা ভাবো না?

॥ ত্রয়োদশ দৃশ্য ॥

(অন্ধকার মঞ্চে শুধু স্পটলাইটের ফোকাসে দেখা যাচ্ছে মনীশের প্রায়-উন্মাদ আকৃতি। কান্নাজড়ানো গলায় সে বলে যাচ্ছে...)

"সেদিনের স্মৃতি আজও আমার মনের মধ্যে দগদগে হয়ে রয়েছে—আজও মনে হয় এ বুঝি মাত্র সেদিনের ঘটনা। স্বামীর অমঙ্গল কামনায় উদগত অশ্রু কম্পিত কণ্ঠ ছন্দার সেই মিনতি যদি রাখত, মহীশূরের রাজপরিবারের রহস্য থেকে যদি নিজেকে সরিয়ে আনতাম, তবে জীবন আমার এমন অভিশপ্ত হত না। ভগবান, আর যে আমি পারি না।"

॥ চতুর্দশ দৃশ্য ॥

(বসবার ঘর। মনীশ আর ছন্দা।)

ছন্দা—কী গো, দেখছ কী অমন করে? নিজের বউকে চিনতে পারছ না?

মনীশ—হঠাৎ একি বেশ, দেবী। সোনার গয়না ফেলে সর্বাঙ্গে ফুলের সাজ, কবরীতে

করবী—গলায় মালা—আমি তো বাপু মুনি ঋষি নয়। আমাকে ভোলাবার জন্যে এত সাজ কেন প্রিয়ে। আমি তো প্র্যাকটিকালি ভুলেই রয়েছি।

ছন্দা—বাঃ বাঃ! বেশ মানুষ যা হোক। আমি কি তোমায় ভোলাতে এসেছি? কেন আজকের তারিখটা মনে নেই?

মনীশ—আজকের তারিখ...১৭ই ফেব্রুয়ারি। ওঃ হোঃ, একদম ভুলে গেছি। আর তোমারই বা আক্কেলটা কী? মনে করিয়ে দেবে তো। কিছু কেনাকাটা হল না।

ছন্দা—কেন? আমি কেন মনে করাব? দেখছিলাম পুরুষের মন। কিছুই মনে থাকে না। আমি মরলেই তো—

মনীশ—এই সেরেছে। হে সম্রাজ্ঞী, ক্রোধ সংবরণ করুন। আমি আপনার দাস বই আর কিছু না। দাসের সঙ্গে এ মতো ব্যবহার আপনার সাজে না, মহিষী। আমি আপনাকে Gentleman's word দিচ্ছি, যে কানন থেকে এই পুষ্পসম্ভার সঞ্চয় করেছেন আপনি, আমি হবো সেই মালঞ্চের মালাকার।

ছন্দা—বাবাঃ, পেটে পেটে এত! নাও ছাড়ো, অনেক কাজ আছে।

(নেপথ্যে নাগরাজনের গলা—আসতে পারি?)

ছন্দা—এই...নাগরাজন...ছাড়ো না।

মনীশ—আরে আসুন আসুন Inspector। এত সকালে কি ব্যাপার?

নাগরাজন—কী ব্যাপার? ম্যাডাম যে একেবারে বনলক্ষ্মী সেজেছেন! Splendid! কোনও Occassion আছে নাকি?

মনীশ—না, না, occassion মানে আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী কিনা।

ছন্দা—আপনার যদি আপত্তি না থাকে আজ আমাদের এখানে lunch খেয়ে যাবেন।

নাগরাজন—My goodness! নিশ্চয়ই খাব। কিন্তু কোনও special arrangement করতে পারবেন না। আপনার যা রান্নাবান্না হবে তাই এক মুঠো দেবেন। যাক মিসেস সরকার, কালকের ঘটনা সব শুনেছেন তো?

মনীশ—হ্যাঁ। ও তো একেবারে ভয়ে সারা। বলছে রাজারাজড়ার সঙ্গে বিবাদ করা—

নাগরাজন—না, মিসেস সরকার—আপনি ভয় পাবেন না। Mr. Sarkar-এর সব দায়িত্ব আমার। আমি Government-এর একজন গেজেটেড অফিসার। আমার কথার একটু মূল্য তো আছে?

(ঘোড়ার পদশব্দ)

নাগরাজন—ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ। ঘোড়ায় চড়ে এখানে আবার কে এল? যুবরাজ নাকি?

(চন্দ্রকেতুর প্রবেশ)

চন্দ্রকেতু—(ব্যঙ্গচ্ছলে অভিবাদন) Yes Inspector। যুবরাজই বটে। আপনাকে এ বাড়িতে ঢুকতে দেখেই নামলাম।

নাগরাজন—(স্যালুট করে) Yes, Your honour।

চন্দ্রকেতু—এখানে কি আপনার C.I.D. ডিপার্টমেন্টের Branch Office খুলেছেন নাকি?

নাগরাজন—আমার বন্ধু Mr. Manish Sarkar, Mrs. Sarkar—যুবরাজ চন্দ্রকেতু।

চন্দ্রকেতু—ও, Mr. Detective, তাই না?

মনীশ—আজ্ঞে না। আমি সামান্য গৃহস্থ ঘরের ছেলে। কাজের ধান্দায় এখানে এসেছি।

চন্দ্রকেতু—তাই নাকি। কিন্তু Mr. Sarkar, জানেন তো আগুন নিয়ে খেলতে গেলে সে আগুন মধ্যে-মধ্যে নিজের দেহেও ছড়িয়ে পড়ে।

মনীশ—জানি Your Highness। এও জানি যে যারা আগুন নিয়ে খেলতে জানে, তারা নিজের শরীর বাঁচিয়ে খেলা দেখায়।

চন্দ্রকেতু—বটে! আচ্ছা আশা করি আবার দেখা হবে। তবে মাইন্ড ইউ মিঃ সরকার, তখনও যেন যুবরাজ চন্দ্রকেতুর সঙ্গে এইভাবে মাথা তুলে কথা বলতে পারেন। চিয়ারিও Inspector, কতদূর এগোলেন? সময় তো যথেষ্ট নিয়েছেন।

নাগরাজন—কাজ, এগুচ্ছে, স্যার।

চন্দ্রকেতু—এগোচ্ছে নাকি? Very good Very good. I wish your every success Inspector। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

(চন্দ্রকেতুর প্রস্থান। অশ্বখুর ধ্বনি দূরে মিলিয়ে গেল)

ছন্দা—সর্বনাশ! উনি কি করে জানলেন যে তুমি এর মধ্যে গোয়েন্দাগিরি করছ?

মনীশ—(কঠিনভাবে) জেনেছেন যে করেই হোক। মনে হচ্ছে ওঁর আর কিছুই অজানা নেই। তাই সাবধান করতে এসেছিলেন আমাকে।

নাগরাজন—Mrs. Sarkar, যুবরাজের কোপদৃষ্টিতে শুধু আমি নয়—আপনারাও পড়লেন শেষে।

মনীশ—সে জন্যে চিন্তা করবেন না Inspector। সত্যের অন্বেষণ করা আপনার পেশা—আর আমার নেশা। দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

॥ পঞ্চদশ দৃশ্য ॥

(অন্ধকার মঞ্চে শুধু স্পটলাইটের ফোকাসে দেখা যাচ্ছে মনীশের প্রায়-উন্মাদ আকৃতি। কান্নাজড়ানো গলায় সে বলে যাচ্ছে...)

"সমস্ত দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর গৃহলক্ষ্মীর মধু সঙ্গলাভের সুখচিন্তাই ছিল আমার কাজের প্রেরণা। প্রতিদিন পথের মোড় থেকে জানলায় প্রতীক্ষারতা ছন্দাকে দেখা ছিল আমার দৈনন্দিন কার্যসূচির একটা অঙ্গ। কপালে ছোট্ট কুমকুমের টিপ—সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর রেখা—বাঁকানো ভ্রূ আর মিষ্টি হাসি দিয়ে সে প্রতিদিন অভ্যর্থনা জানাত তার এই দীন স্বামীকে। বিয়ের পর থেকে একটি দিনের জন্যেও ব্যতিক্রম দেখিনি এ নিয়মের। অসুস্থ শরীর নিয়েও উঠে এসেছে জানলায়। কিন্তু হঠাৎ সেদিন দেখলাম চিরন্তন এ নিয়মের ব্যতিক্রম। সেই প্রথম, সেই শেষ। যুবরাজের সঙ্গে আলাপের ঠিক পরের দিন বাড়ি ফেরার পথে দূর থেকে দেখলাম জানলা শূন্য—ধড়াস করে উঠল বুকটা। নাম-না-জানা এক ভয় সাপের মতো পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ধরতে লাগল হৃৎপিণ্ডটাকে। দুরুদুরু বুকে প্রবেশ করলাম গৃহে। সারা বাড়ি খুঁজে কোথাও দেখতে পেলাম না ওকে। রান্নাঘর বাথরুম খুঁজি—নাম ধরে ডাকি, অপেক্ষা করি, কিন্তু কোনও সাড়া নেই। দু-একজন প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিলাম—সেখানেও নেই। এই করে কাটল দুটি অসহ্য ঘণ্টা। সে কী রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠা! কোথায় গেল? কোথায় যেতে পারে? আমার ফেরার সময় সে তো কোথাও যায় না। তবে

কি কোনও accident হল রাস্তায়! আর পারলাম না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটতে লাগলাম নাগরাজন-এর অফিসের দিকে।"

।। ষষ্ঠদশ দৃশ্য ।।

(পুলিশ অফিসারের ঘর। যুবরাজ বসে, নাগরাজন দাঁড়িয়ে। যুবরাজের জামার আস্তিনে আর কাঁধে লেগে ব্রোঞ্জ পাউডার। ঝড়ের বেগে মনীশের প্রবেশ)

মনীশ—মিঃ নাগরাজন...

নাগরাজন—কী হয়েছে, মিঃ সরকার? আপনার চোখমুখ এরকম কেন? কী হয়েছে?

মনীশ—(ঠোঁট কেঁপে ওঠে) ছন্দা নেই, নাগরাজন—ছন্দা নেই—

নাগরাজন—কেন? কোথায় গেছেন তিনি?

মনীশ—জানি না। বাড়ি ফিরে তাকে দেখতে পেলাম না—দু-ঘণ্টা অপেক্ষা করেছি। মিঃ নাগরাজন, এই সময় সে কোথাও যায় না। নিশ্চয় তার কিছু হয়েছে। আপনি—আপনি আমায় help করুন।

(চন্দ্রকেতু উঠে দাঁড়াল। মুখে ক্রুর ব্যঙ্গ-হাসি)

চন্দ্রকেতু—All right, Inspector। আমি তাহলে এখন চলি। আপনার Progress কেমন হচ্ছে সে বিষয়ে আমার খুবই কৌতূহল। তাই আমি আসি মাঝে-মাঝে। আশা করি কয়েকদিনের মধ্যেই আপনার তদন্তের report পাব। এতদিন সময় লাগানো অবশ্য আপনাদের মতো দক্ষ অফিসারের উচিত নয়। বিশেষ করে মিঃ সরকারের মতো প্রাইভেট ডিটেকটিভের সাহায্য যখন নিচ্ছেন—চলি—

(চন্দ্রকেতুর প্রস্থান। ঘোড়ার পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে...ফ্যালফ্যাল করে নাগরাজন—দাঁড়ান মিঃ সরকার, ছুটবেন না—আমি আসছি।)

।। সপ্তদশ দৃশ্য ।।

(মঞ্চ অন্ধকার। মোটরের শব্দ। মোটর থামার শব্দ। ধাবমান দরজায় দুমদাম ধাক্কা দেওয়ার শব্দ।)

মনীশ—(নেপথ্যে) দরজা খোলো—শিগগির দরজা খোলো। কে আছ ভেতরে। যেও না গণেশের কাছে। যেও না, তুমি যেই হও। গণেশের দিকে যেও না। দোহাই তোমার! Inspector, দরজা ভেঙে ফেলুন—সর্বনাশ হয়ে যাবে এখুনি।

(দরজা ভেঙে ফেলার শব্দ—ছন্দার অস্ফুট আর্তনাদ...মনীশের চিৎকার—ছন্দা-া-া)

(মঞ্চ আলোকিত হল। গণেশ মূর্তির সামনে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছন্দা লুটিয়ে পড়েছে মেঝেতে। নিষ্প্রাণ। বুক রক্তরঞ্জিত। বেগে মঞ্চে ঢুকছে মনীশ আর নাগরাজন। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা রয়েছে একটা লম্বা লাঠি।)

নাগরাজন—এ কি মিসেস সরকার—ওঃ হো My God—may her soul rest in peace।

(একটু চুপচাপ)

নাগরাজন—মিঃ সরকার, আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করব না। দেওয়া যায় না—তা বিশ্বাস করি। কিন্তু একটু শক্ত হোন আপনি। হত্যাকারীকে ধরার এমন সুযোগ

আর পাব না। এখানেই কোথাও লুকিয়েছে সে। দেখি তো গণেশ মূর্তির পিছনে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা।

মনীশ—(চিৎকার করে) For God's Sake. Don't go there. ওই লম্বা লাঠিটা হাতে নিন Inspector। ওটাকে মূর্তির মাথার মুকুটের বিচ্ছুরিত আলোর ওপর নাড়ুন। (দেওয়ালে ঠেস দেওয়ানো লম্বা লাঠিটা তুলে নিয়ে নাগরাজন গণেশ মূর্তির মুকুটের বিচ্ছুরিত আলোর সামনে ধরল। ঘটাং করে শব্দ হল লাঠিটা আলোর ওপর ধরতেই, মূর্তির বুক থেকে একটা তীক্ষ্ণ ফলা বেরিয়ে এসেই আবার ঢুকে গেল। ব্লেডটার গায়ে রক্ত।)

নাগরাজন—একি! ব্লেডের গায়ে রক্ত!

মনীশ—হ্যাঁ। আমার ছন্দার রক্ত। এইবার আপনি যুবরাজকে arrest করতে পারেন। তীক্ষ্ণধী যুবরাজের মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়েছে এইভাবে। আজ আর নয় Inspector। আমি আর পারছি না।

॥ অষ্টাদশ দৃশ্য ॥

(অন্ধকার মঞ্চে শুধু স্পটলাইট ফোকাসে দেখা যাচ্ছে মনীশের প্রায়-উন্মাদ আকৃতি। কান্নাজড়ানো গলায় সে বলে যাচ্ছে...।)

"তার পরেও নিঃসঙ্গ একাকী জীবন বয়ে নিয়ে চলেছি আজ ২০ বছর ধরে। জানি না কবে তার সঙ্গে আবার মিলতে পারব। ছন্দা...ছন্দা...ছন্দা...জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্গিনী আমার। আর কতদিন—আর কতদিন বইতে হবে আমার এ জীবন-যন্ত্রণা!"

(মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল। তারপরেই মঞ্চ আলোকিত হল। বসবার ঘর। মনীশ শুষ্ক উদভ্রান্ত মুখে বসে রয়েছে। নাগরাজন ঘরে ঢুকছে।)

মনীশ—আসুন Inspector, বসুন। আজ আর আপনাকে চা খাওয়াতে পারব না। কারণ, চা আমি ছেড়ে দিয়েছি। ছন্দা চা ভীষণ ভালোবাসত, ও চলে যাওয়ার পর...

নাগরাজন—এ জন্যে আমিই দায়ী মিঃ সরকার।

মনীশ—যাক গে। যুবরাজ ধরা পড়েছেন?

নাগরাজন—না।

মনীশ —কেন?

নাগরাজন—সাধারণ অপরাধীর মতো বিনা পরোয়ানায় রাজবংশের কাউকে গ্রেপ্তার করার অধিকার আমাদের নেই। পরোয়ানা নিয়ে পৌঁছতে দেরি হয়ে গিয়েছিল আমার। যুবরাজ মহলে পৌঁছে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে পরপর দুটি ফায়ারিং-এর শব্দ শুনলাম। ঘরে ঢুকে আমরা দেখলাম দুটি প্রাণহীন দেহ—যুবরাজ ও যুবরানির । পাশেই যুবরাজের সিক্সচেম্বার কোল্টখানা পড়েছিল। কিন্তু মিঃ সরকার, আসল রহস্যটা তো এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেল আমাদের কাছে। মার্সডেন ও ছন্দাদেবী কী করে মারা গেলেন—তা তো বুঝলাম। কিন্তু মূর্তির মেকানিজমটা—লাঠি নাড়ানোর সঙ্গে ওই লোহার ফলাটার কী যোগাযোগ—এ ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না?

মনীশ—ফটো ইলেকট্রিক সেলের নাম শুনেছেন?

নাগরাজন—Electric eye যাকে বলে?

মনীশ—হ্যাঁ। মূর্তির মুকুটে ওইরকম একটা ইলেকট্রিক আই লাগানো আছে। সেল

বিচ্ছুরিত রশ্মি কোনও কিছুতে বাধা পেলেই ভেতরের দুটি পয়েন্টে বৈদ্যুতিক প্রবাহের সঙ্গে সংযুক্ত আছে automatic machine। বুকের খুপরি খুলে বেরিয়ে আসে মৃত্যুদূত। সামনে দাঁড়ানো মানুষের হৃৎপিণ্ডের স্বাদ গ্রহণ করে। আলোকরশ্মির সামনে বাধাটুকু সরে গেলেই আবার circuit বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কৃপাণটিও ভিতরে ঢুকে যায় সঙ্গে-সঙ্গে।

নাগরাজন—আশ্চর্য! কী অপূর্ব মেধা যুবরাজের! কিন্তু কী নৃশংস জঘন্য তার প্রয়োগ!

মনীশ—প্রতিভার পদস্খলন!!

নাগরাজন—কিন্তু আপনি জানলেন কি করে এসব? আমাকে তো কিছুই বলেননি?

মনীশ—বলবার আর সময় পেলাম কোথায় বলুন? বলবার সময় পেলে কি আর এভাবে ছন্দাকে হারাতে হতো আমায়? পাঁচ মিনিট—শুধু পাঁচ মিনিট আগে যদি জানতে পারতাম সব কথা!! যে মুহূর্তে যুবরাজ আমার সামনে দিয়ে আপনার অফিস থেকে চলে গেলেন—সেই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে খুলে গেল সমস্ত রহস্যের দ্বার।

নাগরাজন—ঠিক বুঝলাম না।

মনীশ—যুবরাজ আমার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকা লক্ষ করলাম, তাঁর জামার আস্তিনে আর কাঁধে লেগে রয়েছে তামাটে ব্রোঞ্জ পাউডার। সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মতো চোখের সামনে ভেসে উঠল ব্রোঞ্জের গণেশ মূর্তিটা। আর সঙ্গে-সঙ্গে মুকুটের রশ্মি আর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে পুলিশ জার্নালে প্রকাশিত হল Photo electric cell-এর ওপর একটি প্রবন্ধ। কী করে যে সেই মুহূর্তে আমার সে কথা মনে এল আমি নিজেই জানি না। হয়তো ছন্দার বিপদাশঙ্কাই আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিতে সাহায্য করেছিল। যুবরাজের কাঁধে ব্রোঞ্জ-পাউডার দেখেই মনে হল যুবরাজ নিশ্চয়ই মূর্তির গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কিছু করছিলেন। মার্সডেনের মৃতদেহও পাওয়া গিয়েছিল মূর্তির পায়ের কাছে। লক্ষ করেননি, সদ্য ব্রোঞ্জ পেন্ট করা হয়েছে গণেশকে চকচকে রাখার জন্যে? যাতে চট করে চোখ টানে সেদিকে।

নাগরাজন—কিন্তু মার্সডেন বা মিসেস সরকার মূর্তির কাছে গেলেন কেন?

মনীশ—মার্সডেন চিঠির তাড়াটা খুঁজতে মূর্তিটার কাছে গিয়েছিল। মুকুটের পেছনে ফাঁকটা তো লক্ষ করেছেন? অনায়াসেই লুকিয়ে রাখা যায় সেখানে। মার্সডেন সিংহাসনের ওপর উঠে হাত বাড়াল মুকুটের ওপর। রশ্মি বাধা পেতেই ফলাটা বেরিয়ে এসেই আবার ঢুকে গেল। মার্সডেনের মৃতদেহ পড়ল লুটিয়ে—সবার অগোচরে। তার মুখে যে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখেছেন—তার কারণ এখন নিশ্চয় বুঝছেন। আপনিও তো কম অবাক হননি ব্যাপারটা দেখে। অথচ যুবরাজ তখন ফরেস্টে শিকার করছেন। নিখুঁত alibi, কী বলেন?

নাগরাজন—কিন্তু অন্য নির্দোষ লোকেরও তো প্রাণ যেতে পারে এভাবে?

মনীশ—সেখানেই যুবরাজের বাহাদুরি। ইলেকট্রিক সেল সবসময় চালু থাকত না। কোনও নির্দোষ লোকের যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্যেই যুবরাজ মূর্তির গায়ে গুপ্ত সুইচ লাগিয়ে রেখেছিলেন। মার্সডেনের মৃত্যুর সময় তিনি মার্সডেনের কাছে কয়েক মিনিট সময় নিয়েছিলেন মনে আছে?

নাগরাজন—হ্যাঁ। সেই সময়েই বোধহয় তিনি সুইচ অন্ করে দিয়েছিলেন?

মনীশ—হ্যাঁ। কিন্তু crime nevery pays। তাই ছন্দার বেলায় সুইচ অন্ করতে গিয়ে তাঁর পোশাকে ব্রোঞ্জ পাউডার লেগে গেল। আর তাতেই ধর্মের কল বাতাসে নড়ে উঠল। নিজের alibi establish করতে যদি না তিনি আপনার অফিসে এসে বসে থাকতেন, তাহলে আমার সঙ্গে ওঁর দেখা হত না—তিনি ধরাও পড়তেন না। এমনকি যদি না আমি সেদিন ওঁকে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ করতাম তা হলেও হয়তো এ রহস্যের যবনিকা কোনওদিন উঠত না। সবই বিধাতার খেলা Inspector, দেখুন না—রহস্যের সমাধান হল, অপরাধী নিজের হাতেই শাস্তি গ্রহণ করল। কিন্তু বড় বেশি মূল্য দিতে হল আমাকে। এত আমি চাইনি। এ মূল্য দিয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে আমি চাইনি।

(সহানুভূতিপূর্ণ কাঁধ চাপড়ায় নাগরাজন। মনীশ একটু সামলে ওঠে।)

নাগরাজন—কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, মিঃ সরকার—ছন্দা দেবী কেন ওখানে গেলেন আপনাকে না জানিয়ে? কেনই-বা আপনার ডাকে সাড়া না দিয়ে উঠতে গেলেন সিংহাসনের ওপরে?

(ফের মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল। শুধু স্পটলাইটের ফোকাস রইল মনীশের মুখের ওপর। সে বলছে...)

মনীশ—কী জবাব দেব? কী জবাব দেব এ প্রশ্নের? জানি এই রহস্যের সমাধান হয়তো কেউ খুঁজে পাবে না। এই প্রহেলিকার উত্তর আমাকে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে। কেন গেল সে ওখানে? কেমন করে গেল? কী করে ঢুকল লাইব্রেরি রুমে? কেন সাড়া দিল না আমার নিষেধে? কেন এগিয়ে গেল সে কালান্তক গণেশ মূর্তির সামনে? অপহরণ? সম্মোহন? নাকি কোনও ওষুধের প্রভাব? জানি—জানি—আমি জানি এর উত্তর।

আর ভাবতে পারি না...একই বিষয়ে চিন্তা করে-করে আমার স্নায়ুমণ্ডলীও হয়ে পড়েছে বিপর্যস্ত। আবোল-তাবোল অসংলগ্ন চিন্তা যেন মাথার ভেতর কুরে-কুরে খায় আজকাল। জানি মরণের ওপারে গিয়ে যতদিন না তার সাক্ষাৎ পাচ্ছি ততদিন আমার এ যন্ত্রণার শেষ নেই। কিন্তু কবে আসবে সে পরম লগ্ন? কবে আমি আবার তার দেখা পাব? কবে? কবে? কবে? কবে সে নিজের মুখে আমাকে বলবে অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে—

(মঞ্চ একদম অন্ধকার। স্পটলাইট নিভে গেল। নেপথ্যে ছন্দার কান্নাজড়ানো প্রতিধ্বনিময় স্বর শোনা যাচ্ছে...ওগো, কেন তুমি আমার কথা শুনলে না...কেন তুমি যুবরাজের হুঁশিয়ারি শুনলে না...তাই সে আমাকে ধরে. নিয়ে গিয়ে গণেশ মূর্তির সামনেই আমাকে....তারপর, গণেশ মূর্তি দেখিয়ে বলেছিল—এ মুখ আর স্বামীকে দেখিও না...ওই সিংহাসনের ওপর গিয়ে দাঁড়াও...আত্মহত্যা করো...আমি তাই করেছি...নোংরা শরীরটা নিয়ে তোমার কাছে যেতে চাইনি...তুমি তা জানতে...তাই আমার পোস্টমর্টেম করতে দাওনি...)

প্রেতিনী কন্যার কাহিনি

'আপনি ভূত মানেন?'

'মানি।'

'তবে কেন বলছেন, পেতনি খুন করেনি আপনার নাতনিকে?'

অসহায় চোখে তাকিয়ে রইলেন জগদীশ গুপ্ত। ভদ্রলোক প্রায়-বৃদ্ধ। অথচ বেশ শক্ত সমর্থ। দাড়িগোঁফ ভালোই কামিয়েছেন। কিন্তু চুল আঁচড়াননি। একমাথা সাদা চুল পাখির বাসার মতো ছড়িয়ে রয়েছে মাথা ঘিরে। ফরসা তিনি কোনওকালেই নন। তার ওপর রোদে পুড়েছেন সারাটা জীবন। খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবিও লাট খাওয়া। পাঞ্জাবির বোতাম থেকে কালো 'কার' বেরিয়ে ঢুকে রয়েছে চোরা-পকেটে। নেহাতই সেকেলে মানুষ। এখনও পকেটঘড়ির অভ্যেস ছাড়তে পারেননি।

ইন্দ্রনাথ রুদ্রর বসবার ঘরে বসে অনেক অদ্ভুত কাহিনি শুনেছি। অনেক রোমাঞ্চর স্বাদ পেয়েছি। কিন্তু যে কাহিনিটা আজ বলতে বসেছি তা লিখতে গিয়েও আমার গা শিরশির করছে।

চোখ কুঁচকে জগদীশবাবুর দিকে চেয়ে আছে ইন্দ্রনাথ। আমি বসেছি ওর পাশে। সকালে এইখানেই আমার আড্ডা। সেই আড্ডায় ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়েছেন জগদীশ গুপ্ত।

এসেই জানিয়েছেন, তাঁর একমাত্র নাতনিকে পাথর দিয়ে পিটিয়ে মেরেছে একটা পেতনি। তিনি বিপত্নীক। তেল-সাবান কারখানার মালিক। স্বদেশি জিনিস প্রচার করার আদর্শ সামনে রেখে ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন। এখন তাঁর ভেষজ সাবান ভারতের পয়লা সারির সাবান। পয়সা কামিয়েছেন অনেক। দানধ্যানও করেছেন প্রচুর। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন কারখানারই ম্যানেজারের সঙ্গে। প্লেন অ্যাকসিডেন্টে একই সঙ্গে মারা গেছে তাঁর স্ত্রী, মেয়ে আর জামাই। নাতনি ছাড়া দুনিয়ায় কেউ ছিল না। মাত্র ষোলো বছর বয়স তার। বড় দুরন্ত। মা ছাড়া কি বাচ্চা মানুষ করা যায়? নাতনিকে নিয়েও তিনি হিমশিম খেয়েছেন। মেয়ে বলে কথা। মা বেঁচে থাকলে তাকে চোখে-চোখে রাখতে পারত। জগদীশবাবু তা পারেননি। ভূতের বাড়িতে অ্যাডভেঞ্চার করতে গিয়েই সেই নাতনিই প্রাণ দিয়েছে। একটা ফরাসি পেতনি পাথর দিয়ে পিটিয়ে তার খুলি ভেঙে দিয়েছে।

ভূতের বাড়িটা চন্দননগরে। তিনশো বছর ধরে হানাবাড়ি হিসেবে কুখ্যাত হয়ে রয়েছে।

'তিনশো বছরের হানাবাড়ি?' কৌতূহলী হয়েছিল ইন্দ্রনাথ।

জগদীশবাবু তখন শুনিয়েছিলেন গা-ছমছমে সেই কাহিনি। অবিশ্বাস্য অথচ সত্য।

ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতে এসেছিল ফরাসিরা। চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালে গড়ে ওঠে ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কুঠি বসায় চন্দননগরে ১৬৯০

খ্রিস্টাব্দে। তার ক'বছর পরেই গঙ্গার ধারে গড়ে ওঠে সন্ন্যাসীদের একটা মঠ। পুরুতমশায়ের দোতলা বাড়িও ছিল এই মঠের এলাকায়।

এই বাড়িই এখন ভূতের বাড়ি দুর্নাম কিনেছে দেশ-বিদেশে। এসেছেন অনেক ভূত-শিকারি। তাঁরাও হতভম্ব হয়েছেন।

বাড়িটা কদাকার। লাল ইট দিয়ে তৈরি। জানলাগুলো লম্বাটে আর সরু। আলো ঢুকতেও যেন ভয় পায়। সবসময়ে যেন ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে সামনের নোংরা লনের দিকে। এ লনে গাছের চাইতে বেশি আছে আগাছা। বড়-বড় ঘাস। কাঁটাঝোপ।

তিনশো বছর বয়েসেও বাড়িটায় চিড় খায়নি—একখানা ইটও খসে পড়েনি। তবে ছ্যাতলা লেগেছে সারা গায়ে। কখনও সবুজ, কখনও কালচে। পেটাই ছাদ নেই। আছে ঢালু টালির চাল। এককালে লাল ছিল এই টালি—এখন তা বহুবর্ণ।

লনের তিনদিকে বড়-বড় ঝুপসি গাছ। বটগাছই বেশি। মোটা ডাল লতিয়ে থাকে মাটির ওপর। বটের ঝুরি বাড়তে-বাড়তে পুরো জায়গাটাকে দুর্গম করে তুলেছে।

গঙ্গার দিকেও রয়েছে বড়-বড় গাছ। এই গাছের সারির জন্যেই গঙ্গার বুক থেকে দেখা যায় না হানাবাড়িকে। চোখে পড়ে শুধু একটা জঘন্য জঙ্গল। রাতে সেখানে জোনাকি জ্বলে। পুরো জায়গাটাকে আরও ভয়াবহ মনে হয়।

তল্লাটের সব্বাই জানে, এ বাড়িতে ভূত আছে। তাদের আবির্ভাব বিশেষ একটা লোমহর্ষক ঘটনার পর থেকেই। তিনশো বছর ধরে ঘটনাটা মুখে-মুখে টিকে রয়েছে। বীভৎস কাহিনি। সে ঘটনা না ঘটলে এ বাড়ি নাকি প্রেতপুরী হত না।

এ জন্যে দায়ী তিনশো বছর আগের ধর্মান্ধ কিছু মানুষ। জাতে তারা ফরাসি। ধর্মে খ্রিস্টান। ভারতের মাটিতে উপনিবেশ টিকিয়ে রাখার জন্যে তাদের অনেকেই ছিল আদিম বর্বর। তাদের এই পৈশাচিকতাই নাকি নিঃশব্দ প্রতিবাদ তুলেছে প্রেতলোকে। আজও তাই রক্ত-জল করা ঘটনার পর ঘটনা চলেছে এই নির্জন নিকুঞ্জে।

মঠে ছিল সন্ন্যাসিনীদেরও আস্তানা। ফ্রান্সের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় 'মব্লাঁ', যেখানে ইতালির সঙ্গে সীমান্ত রচনা করেছে, দুর্গম সেই পাহাড়ি অঞ্চলের একটি মেয়ে ছিল মঠে। গঙ্গার রূপ দেখত সে সকাল-সন্ধে, ১৫,৭৮১ ফুট উঁচু 'মব্লাঁ'-র রূপও ভাসত চোখের সামনে। বিশাল পাহাড় আর বিরাট নদী নিশ্চয় আকুল করেছিল তার অন্তর। বড় বেশি নিঃসঙ্গ মনে হয়েছিল নিজেকে।

প্রকৃতির হাতছানি যখন প্রবল হয়ে ওঠে মনের মণিকোঠায়, তখন কিন্তু শিথিল হয়ে পড়ে নিয়মের নিগড়।

রূপসী, তরুণী, একাকিনী এই সন্ন্যাসিনীর অন্তরে প্রেমের তুফান রচিত হয়েছিল তখন থেকেই। মনের দিক দিয়ে একাকিনী। তাই অন্বেষণ করেছিল মনের মতো দোসর।

পেয়েও ছিল।

মঠেরই এক সন্ন্যাসীকে।

প্রথমে মিটেছিল চোখের তৃষ্ণা। দূর থেকে দুজনে দুজনকে দেখে মিটিয়েছিল হৃদয়ের আশ। মন কিন্তু ইন্ধন জুগিয়ে গেছিল শরীরকে। তিল-তিল করে কামনা সঞ্চিত হয়েছিল প্রতিটি রক্তবিন্দুতে। লোমকূপের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে জমেছিল বারুদ—শরীরী-তৃষ্ণার বিস্ফোরক। দেহমিলনেই যার পরিসমাপ্তি—আর কিছুতে নয়।

তাই একদিন দেখা গেছিল অভাবনীয় সেই দৃশ্য। তামাটে রঙের দুটি ঘোড়া পবনবেগে টেনে নিয়ে চলেছে একটা শকটকে। মাথায় ছাদ নেই। লাগাম ধরে বসে আছে তরুণ সন্ন্যাসী। হাওয়ায় উড়ছে তার লম্বা সোনালি চুল। পাশে বসে মুক্তির আনন্দে ঝকমকে চোখে শেষবারের মতো মঠ দেখবে সন্ন্যাসিনী। ফ্রান্সে তাদের একজনের জন্ম ইতালির সীমান্তে, আরেকজনের স্পেনের সীমান্তে। পাহাড় আছে দু-জায়গাতেই। গঙ্গা খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিয়েছে পাহাড়ের আহ্বানকে।

আচমকা মুখ শুকিয়ে গেল মেয়েটির। অশ্ব নীরবে চলতে শেখেনি—বিশেষ করে ছোটবার সময়ে। যুগল অশ্বের খুরধ্বনিতে মুখর হয়েছিল নির্জন বন। সেই সঙ্গে চাকার ঘড়ঘড় আওয়াজ। মঠের মানুষরা তো সচকিত হবেই।

তাই তারা বেরিয়ে এসেছে দলে-দলে। তাদেরও বাহনের অভাব নেই। ধেয়ে আসছে দুই পলাতককে পাকড়াও করবে বলে।

ধরা পড়েছিল তিনশো বছর আগের সেই রোমিও আর জুলিয়েট। প্রেমের পূতশিখায় জীবন উজ্জ্বলতর করে নেবে ভেবেছিল তারা। কিন্তু তা হল না। বিচার হয়ে গেল দুজনের। শাস্তি একটাই। মৃত্যু।

লনের একটা গাছ থেকে দড়ি ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হল তরুণ সন্ন্যাসীকে।

নির্মমতম মৃত্যুর স্বাদ দেওয়া হল তরুণীকে।

জীবন্ত কবর দেওয়া হল মঠেরই দেওয়ালে—দাঁড়ানো অবস্থায়।

সেই মঠ এখন পরিত্যক্ত। ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাদেরকে যমালয়ে পাঠানো হয়েছে—সূক্ষ্ম শরীরে আজও তারা টহল দিচ্ছে মঠের সর্বত্র। আজও দেখতে পাওয়া যায়, গাছতলা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বিষণ্ণবদনা এক নারীমূর্তি। হাওয়ায় উড়ছে তার শ্বেতবসন, উড়ছে স্বর্ণকেশ। মুখ তার ফ্যাকাসে, চক্ষু নিবদ্ধ পথের দিকে।

দেখা যায় ঘোড়া দুটিকেও। গায়ের রং তাদের ঘোর তামাটে। বায়ুবেগে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে সেকেলে শকট। মঠের বাগানেই তার আবির্ভাব ঘটে, মিলিয়ে যায় সেখানেই।

ষোলো শতক থেকেই নাকি চলছে এই কাণ্ড। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সবক'টা ফরাসি উপনিবেশ ইংরেজদের অধিকারে চলে যায়। ফিরে পায় ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে—ভিয়েনা চুক্তির শর্ত অনুসারে।

অশরীরীরা কিন্তু থেকে যায় এই সময়েও। পার্থিব সম্পত্তির হাত বদলে তারা নির্বিকার। অপার্থিব আকৃতি নিয়ে মঠকে দখলে রেখে দিয়েছে শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরে।

প্রেতলোকের বাসিন্দাদের সঙ্গে সহাবস্থান সম্ভব হয়নি মঠের মানুষদের। যদিও বিদেহীরা কক্ষনও কারও ক্ষতি করেনি—শুধু বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার। দেখা গেছে, দু-হাত বাড়িয়ে সাদা পোশাক পরা দুটি মূর্তি পায়ে-পায়ে এগোচ্ছে পরস্পরকে বুকে টেনে নেবে বলে—কিন্তু মিলিয়ে যাচ্ছে মুখোমুখি হয়েই।

দিনের-পর-দিন, রাতের-পর-রাত এ দৃশ্য কি দেখা যায়? চম্পট দিয়েছে মঠের সবাই।

বনাকীর্ণ হানাবাড়ি নিয়ে কেউ আর তেমন মাথা ঘামায়নি। বাঙলার মানুষ বাঘ আর ভূতের সঙ্গে ঘর করে অভ্যস্ত। সাপ আর মশা তাদের গা-সওয়া।

সাড়া পড়ে গেল কিন্তু ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে। তখনও চন্দননগর ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে আসেনি—এসেছিল ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। ভারতের মাটিতে ফরাসি

উপনিবেশ দেখতে ছুটে আসত সাহেব-মেমরা। পণ্ডিচেরি আর কারিকল, মাহে আর ইয়ানাম তাদের বুকে যত না স্পন্দন জাগিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি উত্তাল করেছে হুগলি জেলার এই চন্দননগর।

কারণ এখানে রয়েছে একটা ভূতের বাড়ি। সত্যি ভূতের বাড়ি। ফরাসি বর্বরতার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে বিদেহীরা। কখনও মানুষের চেহারায়, কখনও ঘোড়ার চেহারায়।

পর্যটকরা চাঞ্চল্যকর সংবাদটা পৌঁছে দেয় লন্ডন শহরে। লুফে নেয় 'ডেলি মিরর' দৈনিক পত্রিকা। হেডলাইন দিয়ে ছেপে দেয় চন্দননগরে হানাবাড়ির লোমহর্ষক সমাচার আর তিনশো বছর আগেকার ফরাসি বর্বরতার মুখরোচক কাহিনি।

খবরটা পড়েই লম্ফ দিয়ে ভারতে ছুটে আসেন বিখ্যাত ভূত-শিকারি এডগার লুসি। ভূতের বাড়ির খবর পেলেই ভদ্রলোক ছুটে যেতেন। সত্যি ভূত হলে তাদের রিপোর্ট লিখে বই ছেপে ফেলতেন। মিথ্যে ভূত হলে তাদের জালিয়াতি ধরিয়ে দিতেন।

ভূত-শিকার ছিল তাঁর নেশা। নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পেশা। ভূত ধরার কাহিনি কে না পড়তে চায়। বই বিক্রি হত দেদার। রোজগার হচ্ছিল ভালোই।

ব্রিটিশ ভারতে ফরাসি উপনিবেশে কায়াহীনরা গ্যাঁট হয়ে বসে রয়েছে শুনেই তিনি জাহাজের খরচ পকেট থেকে বের করেছিলেন।

এসে দেখেছিলেন হানাবাড়ির দুর্নাম ঘোচানোর জন্যে এক পাদরি সেখানে বসবাস শুরু করেছেন। নাম তাঁর রেভারেন্ড অ্যান্টনি গোমেজ। স্বামী-স্ত্রী থাকেন। বাচ্চাকাচ্চা নেই। ভয়ডরও কম।

'ভূত আছে কি? ঘোড়া ভূত?'

ভূত-শিকারির প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন পাদরি সাহেব—'বিলক্ষণ আছে। একটু-আধটু উপদ্রব করে বটে। কিন্তু অনিষ্ট তো করে না। একসঙ্গে আছি বেশ।'

'উপদ্রবগুলো কীরকম?'

পাদরি সাহেব তখন সব লিখে দিয়েছিলেন। সেই লেখা বগলে নিয়ে ভূত-শিকারি ফিরেছিলেন লন্ডনে। প্রতিবেদন বেরিয়ে গেছিল 'ডেলি মিরর' পত্রিকায়।

'অদ্ভুত কাণ্ডকারখানাগুলো কী ধরনের?'

'তালা ঝুলছে ঘরের বাইরে থেকে। অথচ আলো জ্বলে ওঠে ঘরের মধ্যে। সেই আলো নড়েচড়ে বেড়ায়। লণ্ঠন নিয়ে কেউ বা কারা যেন ঘরে পায়চারি করছে।'

'পায়চারি করছে? পায়ের আওয়াজ শোনা যায় না?'

'নিশ্চয় যায়। পা ঘষটানির আওয়াজ। পা যেন চলতে চাইছে না। ক্লান্ত চরণ। তবুও হাঁটতে হচ্ছে পায়ের মালিক বা মালকিনকে। দুলছে লণ্ঠনের আলো।'

'ঘোড়ার গাড়ি? সত্যি দেখা গেছে?'

'স্বচক্ষে দেখেছে বাড়ির ঝি। লনের ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে গেছে অশ্বশকট। তারার আলোয় স্পষ্ট বোঝা গেছে গাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দুটি ঘোড়া। সওয়ার দুজন পাশাপাশি বসে। দুজনেরই গায়ে সাদা পোশাক। বাগান পেরিয়ে ফটক পর্যন্ত গিয়েই আচমকা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ছায়াবাজি।'

'ছায়াবাজি? চোখের ধাঁধা নয়তো? অথবা ধোঁকাবাজি? ম্যাজিক লণ্ঠনের কারসাজি?'

'তাহলে ফিসফিস করে কারা অত কথা বলে ঘরে-ঘরে? তালাবন্ধ ঘরে কে তাদের ঢুকতে দিয়েছে? শোনা যায় পুরুষকণ্ঠে বিড়বিড় বকুনি—নারীকণ্ঠের চাপা কান্না।'

'নারীকণ্ঠ? দেখা দেয়নি সেই রমণী?'

'অবশ্য দিয়েছে। বহুবার দিয়েছে।'

'গোটা তল্লাট জুড়ে তখন খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছিলেন ভূত-শিকারি। এ ব্যাপারে ভদ্রলোক শার্লক হোমসের কায়দায় ডিটেকটিভগিরি করেন। জোচ্চুরি ফাঁস করতে গেলে গোয়েন্দাগিরির মুন্সিয়ানা তো দরকার। জনে-জনে জিগ্যেস করে একটা ব্যাপারে তাঁর বেজায় খটকা লেগেছিল।'

'যে বাড়িতে এখন ভূতের খেলা চলছে, সন্ন্যাসীদের মঠ আদৌ সেখানে ছিল কিনা—এই একটি ব্যাপারে তো কেউ দিব্যি গেলে কথা দিতে পারছে না। তিনশো বছর আগের ব্যাপার। কেউ বলে, মঠের পুরুত থাকতেন এই হানাবাড়িতে। কেউ বলেন সন্ন্যাসীদের থাকার জায়গাও ছিল এই বাড়ি।'

'সন্ন্যাসিনীদের আস্তানা? থাকার কথা তো এই মঠের এলাকাতেই। কিন্তু সেরকম কোনও ডেরা দেখতে পেলেন না এডগার লুসি। তবে কি সবটাই কপোলকল্পনা? গ্রাম্য উপকথা?'

সন্ন্যাসিনী-প্রেতিনীর সম্ভাবনা তাই উড়িয়ে দিলেন ভূত-শিকারি। গোয়েন্দারা তাই করেন। যার প্রমাণ নেই—তা খারিজ করেন।'

'কিন্তু তামাটে ঘোড়ায় টানা সেই গাড়িটাকে তো দেখা গেছে বারবার। পনেরো শতকের আগে ঘোড়ায় টানা গাড়ির আবির্ভাব ঘটেনি খাস লন্ডন শহরেও। কিন্তু ষোড়শ শতকে সেই গাড়ি যদি চন্দননগরের ফরাসি মঠে দেখা যায়, তাহলে তো গ্রামের মানুষদের মনে দাগ কেটে যাবেই। বানিয়ে নেওয়াও সম্ভব নয়। না দেখলে বলতে যাবে কেন?

তবে হ্যাঁ, সন্ন্যাসিনীরা যত বেয়াদপিই করুক, জ্যান্ত গোর দেওয়ার নজির তো গোটা ইউরোপে কখনও দেখা যায়নি। ইউরোপীয়রা এত বর্বর নয়। এরকম বর্বর ছিল নাকি মোগল পাঠান সুলতান-নবাব-বাদশারা। কোমলপ্রাণ পাদরি সাহেব মঠের মেয়েকে মঠের দেওয়ালেই দাঁড় করিয়ে ইট গেঁথে কবর দেবেন—এমন পৈশাচিকতা কল্পনাও করা যায় না।'

ভৌতিক কাহিনির এই অংশটুকুও স্রেফ মনগড়া—এই সিদ্ধান্তেই এলেন ভূত-শিকারি সাহেব প্রাথমিক তদন্তের পর।

'বেশ, বেশ, গোর দেওয়ার ব্যাপারটা না হয় শোনা কথা। চোখে তো কেউ দেখেনি। রং চড়ানো রটনা হলেও হতে পারে।

কিন্তু বিদেশিনী প্রেতিনীকে তো দেখা গেছে। বহুবার বহু জায়গায়। কখনও লনে, কখনও বাগান, কখনও ঝোপের বর্ডার দেওয়া পথে। শুধু রাতে নয়—দিনের আলোতেও।'

'দিনের আলোয়? সূক্ষ্মশরীরীর পক্ষে তো কায়াগ্রহণ সম্ভব নয়। একটোপ্লাজম জোগাড় করবে কী করে? আলোকতরঙ্গের ধাক্কায় তো শরীরী হওয়া যায় না।'

নিছক গল্পকথা নিশ্চয়। তুড়ি মেড়ে উড়িয়ে দিলেন ভূত-শিকারি ইংরেজ।

আর তারপরেই শুরু হল তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। প্রেতলোক যেন এই ক'দিন তক্কে-তক্কে ছিল—তাঁর হাস্যকর অনুসন্ধান-পর্বের ইতি হওয়ার প্রতীক্ষায় ছিল। অবিশ্বাসের হাসি হেসে 'সব বুজরুকি'—এই রিপোর্ট যেদিন লিখলেন, তার পরের দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল হানাবাড়ির হট্টগোল।

এবার আরও বেশিমাত্রায়। যেন তাঁকে তুমুল অভ্যর্থনা জানাতে কোমর বেঁধে লেগেছে

সাহেব ভূতপেতনীরা। হাজার হোক, একই মহাদেশের মানুষ তো। এত দূর থেকে, এত পয়সা খরচ করে এসে খালি হাতে ফিরে যাবেন?

'গেঁইয়াদের গল্প'—এইরকম একটা শিরোনামও লিখেছিলেন লুসিসাহেব তাঁর ডাইরিতে। লিখেছেন রাত্রে। ঘুমোতে যাওয়ার আগে। সকালে উঠে নাস্তা সেরে ফের কলম বুলোতে গেছিলেন ডাইরিতে।

চক্ষুস্থির হয়েছে তখনি।

'গেঁইয়াদের গল্প'—এই হেডলাইনটাই নেই। ডাইরির যেখানে লিখেছিলেন সেখানটা বিলকুল সাদা। কস্মিনকালেও যেন সেখানে কলমের আঁচড় পড়েনি। ম্যাজিক কালি দিয়ে লিখতেও তো নিব চেপে বসার দাগ থাকবে। তাও নেই। ম্যাজিক কালির প্রশ্ন অবশ্য ওঠে না। একই দোয়াতের কালি দিয়ে বাকি অংশটা লিখেছেন—তা যেমন তেমনই রয়েছে।

নেই শুধু 'গেঁইয়াদের গল্প' শিরোনামটা!

তাজ্জব কাণ্ড! গালে হাত দিয়ে বসে রইলেন ভূত-শিকারি ইংরেজ। কায়াহীন বড় রসিক তো! হেডলাইনটাকেই উড়িয়ে দিয়েছে!

উপদ্রব শুরু হল সেইদিনই সন্ধে থেকে। উপদ্রবের পর উপদ্রব। উৎসব শুরু হয়ে গেছে যেন অতিপ্রাকৃত দুনিয়ায়—অসম্ভব কাণ্ড ঘটাতে লেগেছে কোমর বেঁধে।

দোতলার ঘরে বসেছিলেন ভূত-শিকারি। বড় ঘর। এক কথায়, হলঘর। আড্ডা মারবার জন্যে তৈরি। খানদানি সাহেববাড়ি আর জমিদারবাড়িতে এই ধরনের বড়-বড় ঘর দেখা যায়। বিলাসী জমিদারবাবুরা নাচঘর বানাতেন এই কায়দায়। গোটা ঘর মোড়া থাকত দামি কাশ্মিরী কার্পেটে।

সেসব দিন গেছে। চন্দননগরের এই ফরাসি যাজক বোধহয় সেই বাবুয়ানির রেশ টেনে আনতে চেয়েছিলেন বিশাল এই ঘরখানায়। গাঁয়ের লোকদের মুখে কানাঘুষোয় অনেক গল্পকথাও শুনে এসেছেন ভূতশিকারি। ষোড়শ শতকের পাদরির কিঞ্চিৎ নারীঘটিত দোষ ছিল। মঠের মেয়েদের মাঝেমাঝে এই ঘরে নিয়ে আসতেন। যে মেয়েটি অশরীরী হয়ে আজও টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, তাকেও কবজা করতে চেয়েছিলেন। রূপে সে ছিল তিলোত্তমা, স্বভাবে সরস্বতী। যাজকের কামনার ইন্ধন জোগাতে মন চায়নি। প্রেমের আগুনেই পুড়ে মরেছে। মঠেরই সন্ন্যাসীকে নিয়ে চম্পট দেওয়ার চেষ্টায় শাস্তি হয়েছে ভয়াবহ। কুটিল পাদরি একটা দৃষ্টান্ত খাড়া করতে চেয়েছিলেন। ভবিষ্যতে কেউ যেন তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়ার দুঃসাহস না দেখায়।

বিরাট এই ঘরেই রেভারেন্ড অ্যান্টনি গোমেজের সঙ্গে বসেছিলেন এডগার লুসি। ছিলেন মায়া গোমেজ—রেভারেন্ডের সাতপাকে বাঁধা বউ। হিন্দুমতে বিয়ে। মায়া চন্দননগরের সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের মেয়ে। ভয়ানক রূপসী। রং যেন ফেটে পড়ছে। চোখে যেন বিদ্যুৎ জ্বলছে—রেগে গেলে মনে হয় মা দুর্গা মহিষমর্দিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণা হতে চলেছেন।

মায়া বিদুষী মেয়ে—সুবর্ণবণিক মেয়েদের মতো লবঙ্গলতিকা নয়। পড়াশুনা শেষ করেছিল কনভেন্টে। তারপর রেভারেন্ডের টানটান বপু, মিষ্টি-মিষ্টি হাসি আর চোখা-চোখা বুলি শুনে তাঁকেই বিয়ে করে ফেলে। সাতগেঁইয়া নিষেধের তোয়াক্কা রাখেনি।

লুসির সঙ্গে খোশগল্প চালিয়ে যাচ্ছে এই মায়া। ঘরে জ্বলছে তেলের প্রদীপ আর মোমবাতি। ১৯২৯ সালেও এই হানাবাড়িতে বিদ্যুতের লাইন আনাননি রেভারেন্ড।

মায়া-ই আনতে দেয়নি। বাড়িটার সাবেকিয়ানা তাহলে যে গোল্লায় যাবে। এ বাড়িতে থাকার মাধুর্যই যে নিষ্প্রদীপের রোমাঞ্চ!

'বোগাস!' বলেছিলেন লুসি। 'এইরকম একটা বুড়ো বাড়ি আর বাগানকে যদি আলো-অন্ধকারের ছায়ামায়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়, তাহলে গা ছমছম করবে আপনা হতেই—বিদেহিনীকে কষ্ট করে প্রেতলোক থেকে জার্নি করতে হবে না।'

কথাটা সবে বলেছেন লুসি সাহেব—বলেই হো-হো করে অবশ্য হেসেছিলেন—এমন সময়ে ঘটল সেই কাণ্ড।

পেল্লায় একটা শামাদান হেলেদুলে বাতাসে ভাসতে-ভাসতে দরজা দিয়ে ঢুকল ঘরে।

দেখেই আতীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠেছিল বেনের মেয়ে মায়া, 'এ কী ম্যাডাম! আমার বাবার দেওয়া বিয়ের জিনিস! এই নিয়ে এ কী ইয়ার্কি!'

শামাদানটা বিলকুল বেলজিয়ান কাচ দিয়ে তৈরি। লম্বা স্ট্যান্ডের ওপর পাঁচখানা মোমবাতি বসানো যায়। চিলেকোঠার ঘরে ঠাকুরঘর বানিয়ে মায়া এই দীপাধার রেখে দিয়েছিল সেখানে। বিলিতি পন্থায় পঞ্চপ্রদীপের আরতি করবার জন্যে।

আশ্চর্য সুন্দর গুরুভার সেই বাতিদানই বাতাসে ভেসে এসে ঢুকল হলঘরে।

দমাস করে আছড়ে পড়ল লুসির পায়ের কাছে।

বলা বাহুল্য, ওইরকম একটা আছাড় খাওয়ার পর কাচের শামাদান আর আস্ত থাকতে পারে না। খানখান হবেই। প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠেছিল মায়া মল্লিক, থুড়ি, গোমেজ।

তড়াক করে সটান দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন ভূত-শিকারি ইংরেজ মহাশয়। এসব ভেলকি তিনি অনেক দেখেছেন। কিছু ভূত অবশ্য বিশেষ এই ক্ষমতার অধিকারী হয় বটে, কিন্তু চন্দননগরের মতো নেটিভ জায়গায় এহেন ভৌতিক ক্রীড়া আশা করা যায় না।

অতএব তিনি স্বজাতীয় ভাষায় তীব্র কণ্ঠে জানতে চাইলেন—'এইসব গাড়োয়ানি ফচকেমির মানেটা কি?'

বলেই, তাঁর খেয়াল হয়েছিল—তিনি বসে আছেন ফরাসি মঠে। এখানকার জড়পদার্থের অণু-পরমাণুতেও ফরাসিয়ানা বিধৃত রয়েছে।

সুতরাং গমক মারা যাক ফরাসি ভাষায়। তাই করেছিলেন।

পরিণামটা হল আরও ভয়ানক।

রাশি-রাশি নুড়ি উড়ে এল দরজা দিয়ে—কড়াং-কড়াং দুমদাম ঠকঠকাস করে আছড়ে পড়ল লুসি সাহেবের পায়ের কাছে। কখনও একটা, কখনও একাধিক—শূন্যপথে ধেয়ে এসেই পড়ছে সাহেবের সামনে।

চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল সাহেবের। এ নুড়ি তিনি চেনেন। বাগানের পথে রয়েছে বিস্তর।

আচম্বিতে বন্ধ হয়ে গেল নুড়ির স্রোত। লুসি সাহেব তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ পাকিয়ে চেয়ে আছেন দরজার দিকে। লম্বায় তিনি প্রায় সাড়ে ছ'ফুট। বাঁশের মতো শক্ত সিধে শিরদাঁড়া। লম্বা নাকের নিচে গোঁফজোড়া ঝোপের মতো এলোমেলো করে রাখেন ইচ্ছে করে—বুজরুকরা দেখলেই যাতে ভয় পায়।

সেই গোঁফ এখন খাড়া হওয়ার উপক্রম হল বিদেহীদের পরবর্তী বিটলেমি দেখে।

বাগানের কুয়োর ধারে পাড়ে পড়ে থাকে বিস্তর ভাঙা ইট আর পাথর। বেশ কয়েকটা

আধলা নিশ্চয় সাড়া দিয়েছে কায়াহীনদের আহ্বানে। শ্যাওলামাখা নোংরা আধলাগুলো সগৌরবে দরজা দিয়ে ধেয়ে এসে দমাদম করে আছড়ে পড়ল সাহেবের পদতলে।

বাকরহিত হয়ে গেছেন এখন তিনজনেই। সাহেব প্রত্যক্ষ করছেন অবিশ্বাস্য দৃশ্য—রেভারেন্ড গোমেজ এবং তদীয় স্ত্রী অবলোকন করছেন শিষ্ট ভূতপ্রেতের অশিষ্ট আচরণ। তাঁরা বিলক্ষণ বিক্ষুব্ধ। অতিথি আপ্যায়নে এহেন ত্রুটি বরদাস্ত করা যায় না।

কিন্তু ভূতপ্রেতের দল কি সহসা ক্ষিপ্ত হয়েছে? মস্তিষ্ক কি তাদের উত্তপ্ত হয়েছে? এত কাণ্ডের পরেও কি তাদের কি ক্ষ্যামা দেওয়া উচিত ছিল না? ঢের হয়েছে—এই বলে রঙ্গ বন্ধ করা উচিত ছিল না?

তা না করে, তারা এবার গাছের শুকনো পাতা বাগান থেকে এনে উড়িয়ে দিয়েছে ঘরময়।

ঘরে হাওয়া নেই। শীতের সন্ধে। জানলা বন্ধ। অথচ যেন হাওয়া ঘূর্ণিপাক রচনা করে চলেছে বিশাল হলঘরে। ঘুরে-ঘুরে নাচের ছন্দে উড়ছে ঝরাপাতার দল।

ক্লাইমাক্সটা ঘটল তারপরেই। নাটকীয় সেন্স না থাকলে এমন চরম কাণ্ড ঘটানো যায় না।

ঢং-ঢং-ঢং-ঢং করে বেজে উঠল একতলার দরজা-ঘণ্টা। সাবেকি বাড়ির সব হালচালই বজায় রেখেছিল বেনের মেয়ে মায়া। সদর দরজায় অতিথি-ঘণ্টা বাজালে অদ্ভুত আভিজাত্যে বাড়ি গমগম করে ওঠে।

সেই ঘণ্টাই এখন বাজছে অশরীরীদের হাতে। মাংসহীন অস্থিহীন করপল্লবে ঘণ্টার দড়ি ধরে বোধহয় ফরাসিনী প্রেতিনী হ্যাঁচকা টান মারতে-মারতে নাটকীয়ভাবে জানান দিয়ে যাচ্ছে তার অস্তিত্বের, 'আমি আছি! আমরা আছি! ও সাহেব—লিখে রাখো—আমরা ছিলাম, আছি, থাকব!'

এই জাতীয় বেল্লিকপনা কোনও সাহেব ভদ্রলোক সইতে পারে? সকালে উঠে খটকা লেগেছিল ডাইরির পাতা থেকে হেডলাইন অদৃশ্য হওয়া দেখে—সন্ধে হতেই হানা দিল অদৃশ্য কারিগররা? এইভাবে?

সেই রাতেই তন্নতন্ন করে অভিযান চালালেন লুসিসাহেব। নিচের দরজা বন্ধ ছিল ভেতর থেকে—নেমে নিয়ে দেখলেন বন্ধ রয়েছে তখনও। ঝি-চাকররা কেউ রাত কাটায় না এ বাড়িতে—হাজার বখশিস দিলেও। বাড়িখানাও এককালে মঠবাড়ি ছিল বলে এমন কায়দায় নির্মিত যে, সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেলে বাড়িতে প্রবেশের আর কোনও পথ থাকে না।

তা সত্ত্বেও বাগানের পাথর আর নুড়ি, কুয়োর ইট আর পাথর, গাছতলার ঝরাপাতা তারা বোধহয় ঝুড়ি ভরতি করে দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে কি এক অলৌকিক পন্থায় পাচার করেছে বাড়ির ভেতরে।

তদন্ত সম্পন্ন হল রাতেই। আর কোনও নাটক দেখায়নি বিদেহীরা। বোধহয় সারারাত হেসেই কুটিপাটি হয়েছে।

পরের দিন পিঠটান দিলেন এডগার লুসি। খিদিরপুরে গিয়ে জাহাজে চেপে লন্ডন। লন্ডনে পৌঁছেই লম্বা কাহিনি ছাপিয়ে দিলেন 'ডেলি মিরর' কাগজে। হইহই পড়ে গেল গোটা কন্টিনেন্টে এবং এই উপমহাদেশেও। ভূত-শিকারির বিশ্বাস জেগেছে যে হানাবাড়িতে রাত্রিবাস করে সে বাড়ি তো একবার দেখে আসা দরকার।

হুজুগে মানুষের অভাব কোনও দেশেই নেই। বিলেত আমেরিকার মানুষ দলে-দলে তো এলই—এল ভারতের নানান অঞ্চলের মানুষও। বেশি এল কলকাতার মানুষ। হুজুগের চাটনি ছাড়া যাদের ভাত হজম হয় না।

ফলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়াল মায়া আর রেভারেন্ডের। নির্জনে রোমান্স আর রোমাঞ্চর ডবল লাভের আশাতেই ঘর বেঁধেছিলেন তাঁরা এই পোড়োবাড়িতে। দিনগুলো যাচ্ছিল ভালোই। সূক্ষ্মশরীরীরা ঈর্ষায় জ্বলে গেলেও স্থূলশরীরী দুজনের পাকাধানে মই দেয়নি এতদিন। এখনও দিল না। তবুও বাড়ি ছেড়ে সরে পড়তে হল গোমেজ দম্পতিকে। ভূতের উৎপাতে নয়—দর্শনার্থীদের উপদ্রবে। দিবারাত্র খালি লোক আর লোক। বাগানে লোক, বাগানের বাইরে লোক, ঘরে লোক। ঘণ্টা বাজছে যখন-তখন। পিলপিল করে আসছে উৎসুক মানুষ—চন্দননগরের সস্তা সুপেয় পানীয় পান করছে এবং ঢংঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে দেখছে—বিদেহীদের হাতে কতখানি শক্তি থাকলে তবে এই ভারি পেতলের ঘণ্টার কণ্ঠা নাড়ানো যায়।

তাই পালিয়ে গেলেন রেভারেন্ড দম্পতি। লুসিসাহেব যেদিন কাষ্ঠ হেসে বিদায় নিলেন, ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে, বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে, বিদেহীদের উদ্দেশে টা-টা, 'অ-রিভয়ের', 'অ্যাডিউ' বলে গেলেন—তার একমাস পরেই ছলছল চোখে মায়াও খ্রিস্টান স্বামীর হাত ধরে চলে এল শ্রীরামপুরে।

তারপর কেটে গেছে আঠারোটা মাস। পরিত্যক্ত থেকেছে পোড়োবাড়ি।

১৯৩১-এর নভেম্বরে আর এক কাঠগোঁয়ার রেভারেন্ডের ইচ্ছে হল ওই বাড়িতে থাকবেন। বিলিতি শিক্ষার একটু ছোঁয়া পেলেই দেশীয় বিশ্বাসগুলোকে কুসংস্কারের বাতি জ্বালিয়ে ছাই করে দেওয়ার মহান উদ্দেশ্য প্রজ্জ্বলিত তখন অনেক মহাশয় ব্যক্তির মধ্যে। রেভারেন্ড রামকানাই বিশ্বাস তার ব্যতিক্রম নন। ইনিও এলেন তাঁর বাঁজা বাঙালি বউকে নিয়ে। সন্তান-টন্তান না হলে মেয়েদের মাথায় বোধহয় ছিট গজায়—সবকিছুর মধ্যেই বাতিক দেখা যায়। বাঁজা বউটির নাম ময়নামতী। খাসা নাম। রামকানাই এই নাম শুনে আর শ্যাম অঙ্গ দেখে ময়নামতীকে সহধর্মিণী বানিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর বুক ফুলিয়ে একদিন উঠে এলেন পোড়োবাড়িতে।

বুক চুপসে গেল দুদিনেই। অপদেবতারা মানুষের অহঙ্কার দুচক্ষে দেখতে পারে না। চোখের ঘুম উড়ে গেল রামকানাই আর ময়নামতীর। রাতের শয়ন পর্যন্ত নির্বিঘ্ন রইল না।

রামকানাই পড়েছিলেন এডগার অ্যালান পো-র 'ব্ল্যাক-ক্যাট' গল্পটা। দেওয়ালে জ্যান্ত কবরস্থ হয়েছিল কালো বেড়াল বাড়ির বউয়ের ডেডবডির সঙ্গে। তাই তিনি মঠের সমস্ত দেওয়াল ঠুকে-ঠুকে দেখতেন ফোঁপরা দেওয়াল কোথাও পাওয়া যায় কিনা।

আর যায় কোথা? ভয়ানক খেপে গেছিল প্রেতিনী আর তার হবু বর। বাগানের নুড়ি ছুঁড়ে জানলার কাচ গুঁড়িয়েছে, ঘণ্টা বাজিয়ে কান ঝালাপালা করে দিয়েছে। তাতেও যখন পোড়োবাড়ি ছেড়ে 'পাদমেকং ন গচ্ছামি' পণ করেছে রেভারেন্ড দম্পতি—তখন আরও উৎপাত শুরু করেছে ফরাসি ভূতপেতনি।

ময়নামতী এক সন্ধ্যায় বায়ুসেবন করছিল বাগানের পথে। আচমকা একটা আধলা ইট তেড়ে এসেছে তাকে লক্ষ্য করে। অদৃশ্য হাতে ইটের আবির্ভাব ঘটেছে দেখে বুদ্ধিমতী

ময়নামতী পিছু ফিরেই দৌড়েছিল সদর দরজার দিকে। বেরসিক বিদেহী তখন সেই ইট আছড়ে মেরেছে তার পিঠে।

বউয়ের গায়ে হাত! রেগে লাল হয়েছিলেন রামকানাই রেভারেন্ড। চিঠি লিখেছিলেন এডগার লুসিকে। এই আঠেরো মাস চন্দননগরের পোড়োবাড়ির নামও মুখে আনেননি ভূত-শিকারি। রামকানাইয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধ পায়ে ঠেলতে পারলেন না। ফের এলেন বাংলার হুগলি জেলায়।

হাওয়ায় খবর এসে গেছিল পোড়োবাড়িতে—তৈরি হয়েই ছিল অশরীরীগণ। চৌকাঠে পা দিলেন এডগার লুসি—ঢংঢং করে বেজে উঠল পেতলের মস্ত ঘণ্টা!

থ হয়ে গেলেন ভূত-শিকারি। আপ্যায়নটা হুবহু আগের মতোই হবে নাকি?

হলও তাই। আবার দোতলার ঘরে উড়ে এল ঝরাপাতা আর নুড়ি—আছড়ে পড়ল আধলা ইট!

ভাবনায় পড়লেন ভূত-শিকারি। এ বাড়ির ভূতপেতনি তাঁকে বন্ধু হিসেবে দেখছে, না শত্রু হিসেবে চোখে-চোখে রেখেছে, আঁচ করতে পারলেন না। তবে ক্ষণে-ক্ষণে রোমাঞ্চিত হতে লাগল তাঁর উসকোখুসকো গুম্ফ।

উঠে গিয়ে টেনে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তুলে দিলেন ছিটকিনি।

তাঁর চোখের সামনেই খট করে নেমে এল ছিটকিনি—ফট করে দু-হাট হল দরজা।

চোয়াল ঝুলে পড়েছিল সাহেবের। আর ঠিক তক্ষুনি হিপপকেট থেকে তাঁর রূপোর চিরুনি উঠে এসে ঠকাস করে মাথায় বাড়ি মেরে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

সাধের চিরুনি আর খুঁজে পাননি এডগারসাহেব।

ক্ষিপ্ত অশরীরীদের ঠান্ডা করার জন্যে ধূপ জ্বালিয়েছিল ময়নামতী। নিভে গেছিল সেই ধূপ। ভূত-শিকারির মাথায় এসেছিল বদবুদ্ধি। মেয়েভূতকে বশ করার জন্যে ল্যাভেন্ডারের শিশি খুলে ঘরময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সুগন্ধি।

দক্ষিণ ফ্রান্সের হালকা সুবাস কিন্তু পাগল করে দিয়েছিল ফরাসি ভূতপেতনি দুজনকে। মুর্হুমুহু ঃ বেজে গেছিল পেতলের ঘণ্টা, দেওয়াল থেকে আছড়ে-আছড়ে পড়েছিল ছবির-পর-ছবি।

তিন দিনের বেশি হানাবাড়িতে থাকতে পারেননি এডগারসাহেব। আগে যা হয়নি—এবার তা হয়েছে। ইট আর পাথর ছোঁড়া হয়েছে তাঁকে টিপ করে। বুকে আর পিঠে।

তিন দিন পর, সটান বিলেতে ফিরে গেলেন ভূত-শিকারি। লিখলেন 'ইন্ডিয়ার সবচেয়ে কুখ্যাত হানাবাড়ি' নামে একখানা বই। সেই বই ছেপে বেরোতে-বেরোতে গেল একটা বছর।

এই এক বছর কিন্তু হানাবাড়িতেই থেকেছেন রেভারেন্ড রামকানাই এবং তাঁর ভার্যা। লিপিবদ্ধ করেছেন প্রায় দুহাজার অলৌকিক ঘটনা। তার মধ্যে আছে শূন্য থেকে মদের বোতলের আবির্ভাব—চেয়ারে আছড়ে পড়ে গুঁড়িয়ে যাওয়া। অবশ্যই তা চন্দননগরের বিখ্যাত সরাব। সাদা দেওয়ালে অদৃশ্য হাতে লিখন। একটাই নাম বারবার লেখা হয়েছে দেওয়ালে। 'মেরিয়ানা' সেই নাম।

রামকানাই প্রতি ঘটনা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন এডগার লুসিকে। বইতে ঠাঁই পেয়েছিল সমস্ত ঘটনা।

বইটা বেরিয়ে যাওয়ার পর বাড়িময় যেন তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হয়ে গেছিল।

ময়নামতীর সাধের কাচের বাসনপত্র যখন চুরমার হতে লাগল, গয়নার বাক্স আলমারি থেকে উধাও হয়ে পড়ে রইল লনে—তখন স্বামী-স্ত্রী লম্বা দিলেন বাড়ি ছেড়ে।

জগদীশ গুপ্তর একটা হাস্যকর মুদ্রাদোষ আছে। তিনি তোতলা নন, কিন্তু কথা শুরু করার আগে প্রথম অক্ষরটা জোর দিয়ে বার কয়েক উচ্চারণ করেন। দীর্ঘকাহিনি তিনি নিবেদন করলেন এইভাবেই। বলার ভঙ্গিমা অতিশয় বিরক্তিকর। কিন্তু কাহিনির প্রমাদে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম।

তিনি স্তব্ধ হতেই ইন্দ্রনাথ বললে, 'বুঝলাম। পার্থিব পন্থায় আপনার নাতনি খুন হয়েছে—পেতনি করেনি—এ বিশ্বাসটা কেন আপনার মাথায় এসেছে, তার জবাব পেলাম।'

'ক্যা ক্যা-ক্যানো বলুন তো?'

'ফরাসি ভূতপেতনী ভয় দেখিয়েছে পাথর ছুঁড়ে—মেরে ফেলেনি কক্ষনও, বড় অনিষ্ট করেনি।'

'ঠি-ঠি-ঠিক ধরেছেন। তবে কেন নাতনির খুলি গুঁড়িয়ে গেল?'

'মানুষের হাত গুঁড়িয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'একাই গেছিল?'

'সেটা আপনি বের করুন। একা যাওয়ার মেয়ে সে নয়। গাদাগাদা ছেলেবন্ধু। শাড়ি কক্ষনও পরেনি। জিনস আর শার্ট। ক্যারাটে জানত। ফায়ার আর্মসয়ে দারুণ ইন্টারেস্ট। চালাতেও জানত। গুলি ফসকায়নি। নীতিবোধ কম। কী বলছি, বুঝছেন নিশ্চয়। দাদু হয়ে আর কী বলব। আমি স্বদেশি করেছি, দেশসেবা করেছি, জীবনে আদর্শ রেখে এতগুলো বছর কাটালাম। এসব আমার ভালো লাগে না। মা নেই, বাবা নেই—আমি আর কতদিক দেখব?'

'বুঝেছি। ভূতের বাড়ির খবরটা পেল কী করে?'

জগদীশ গুপ্ত তখন তাঁর ব্যাগের চেন টানলেন। একটা বই বের করলেন। ইন্দ্রনাথের হাতে গছিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই বই পড়ে।'

বইটার নাম 'দ্য মোস্ট হন্টেড হাউস ইন ইন্ডিয়া'। লেখকের নাম এডগার লুসি।

চোখ তুলে বললে ইন্দ্রনাথ, 'পুস্তনিতে তো দেখছি আপনার নাম লেখা রয়েছে।'

'আমারই বই। এসব ব্যাপার মানি বলেই কিনি। ময়না যে এই পড়ে দৌড়বে, তা ভাবিনি।'

'ময়না? আপনার নাতনির নামও ময়না?'

'ময়নামতী। ওর মায়ের নাম ছিল ইন্দুমতী। তার মায়ের নাম বিন্দুমতী—মানে, আমার স্ত্রী।'

চুপ করে রইল ইন্দ্রনাথ। ভাবছে।

বললে, 'বইখানা আমার কাছে থাক। আপনার নাম-ঠিকানা ফোন নম্বর দিয়ে যান।'

ঘণ্টাখানেক লাগল বাগবাজারে পৌঁছতে। ইন্দ্রনাথ আমাকে ল্যাজে বেঁধে নিয়ে গেল। মান্ধাতার আমলের দোতলা বাড়িটার সরু সিঁড়ি দিয়ে সটান উঠে গেল। চাতালে দাঁড়িয়ে তিন দিকের তিনটে দরজার একটার কড়া নেড়ে বললে, 'ভূতনাথবাবু; জেগে আছেন, না ঘুমোচ্ছেন?'

কর্কশ খিটখিটে বুড়োটে জবাব ভেসে এল ভেতর থেকে, 'আবার কে আপদ এল? মোক্ষদা...ও মোক্ষদা...বলে দে ঘুমোচ্ছি।'

দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। ভেতরে পা দিল ইন্দ্রনাথ। আঠার মতো পেছনে লেগে আছি আমি। ঢুকেই বললে, 'মানুষ বিপদে পড়লেই আপনার কাছে আসে। আপদ হব কেন?'

তক্তপোশে বসে এক বুড়ো। তিনদিকে তিনটে তাকিয়া। শিরদাঁড়া কুঁজো। গায়ে ময়লা গেঞ্জি। একমাথা টাক। গোটা শরীরটার হাড়গুলো চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কোনও মানুষ যে এত রোগা আর কঙ্কালসার হয়, না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

চশমাটা চোখে আঁটতে-আঁটতে খিটখিটে বুড়ো বললেন, 'চেনা-চেনা গলা মনে হচ্ছে...আরে কে ও! ইন্দ্রনাথ...ভূতনাথের চ্যালা...কী জাদু...এতদিন পরে কী মনে করে? ভূতধরা আমি ছেড়ে দিয়েছি। গেট আউট।'

অম্লানবদনে তক্তপোশে গিয়ে বসল ইন্দ্রনাথ। আমাকে বললে বসে পড়তে। বুড়োর তেউড়ে যাওয়া ওপরের শিরদাঁড়া টিপে দিতে-দিতে বললে, 'ব্যথাটা তো এই তিনখানা ভার্টিব্রায়?'

'হ্যাঁ...হ্যাঁ...ন্যাকামো হচ্ছে?'

'ভূতনাথবাবু, এডগার লুসিকে চেনেন?'

'দ্যাট ফোর-টোয়েন্টি? চারশো বিশ নম্বর ওয়ান? চন্দননগর নিয়ে যে গুলগাপ্পা ঝেড়েছে?'

'দ্য মোস্ট হন্টেড হাউস ইন ইন্ডিয়া আপনি পড়েছেন?'

'হোয়াট! এডগারের নষ্টামি আমি পড়ব না? গেট আউট।'

শিরদাঁড়া টিপতে-টিপতে ইন্দ্রনাথ বললে, 'আরাম লাগছে?'

'হুঁ।'

'এডগার ফোর-টোয়েন্টি কেন?'

'সব বোগাস। ও বাড়িতে কী আছে, সেটা এখনও গবেষণার বিষয়। আমার শিরদাঁড়াটা বেগড়বাঁই না করলে অ্যাটেম্প নিতাম। তবে এডগার ব্যাটাচ্ছেলে অ্যান্টনি গোমেজ আর রামকানাইয়ের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে সব বানিয়ে লিখেছে। যত না কাণ্ড ঘটেছে, তার বিশ গুণ বাড়িয়েছে। ননসেন্স! স্কাউন্ড্রেল!'

'আপনি জানলেন কী করে?'

'ইউ ফুল! ইউ ড্যামড্! আমি জানলাম কী করে? ভূত-শিকারি ভূতনাথকে এ কথা বলবার সাহস তোমার হয়? গেট আউট!'

'বলুন না।'

'ইন্ডিয়ার একমাত্র ভূত-শিকারি আমি। ভূতের বাড়িগুলোর বদনাম ঘোচানোর জন্যে কোথায় যাইনি? কিন্তু বদনাম বাড়িয়ে লিখে যে লোক বই বিক্রির ধান্দায় থাকে—সে আমাদের প্রফেশনের কলঙ্ক। এডগার তাই করেছে। টাইমস আর বিবিসি থেকে রিপোর্টার পাঠিয়েছিল ঘটনাগুলোর সত্যি-মিথ্যে যাচাই করতে। গোমেজের ওই বউটার নাম যেন কী?'

'মায়া।'

'বেনেদের সেই মেয়েটা। ভালো মেয়ে। ইংরেজিটা বেশ জানে। স্বামীর কুকীর্তি চিঠি লিখে আমেরিকান সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ওদের জার্নালে তা

ছেপে বেরোয়—ওই তো ওই তাড়ার মধ্যে আছে। খাসা চিঠি। নাম কেনার জন্যে অ্যান্টনি হাত মিলিয়েছিল এডগারের সঙ্গে। মায়ার তা ভালো লাগেনি।'

'ময়নামতী কিছু বলেনি?'

'রামকানাইয়ের সেই মিচকেপোড়া বাঁজা বউটা? দুটোই ফোর টোয়েন্টি। নাম আর পয়সা—দুটোরই দরকার ছিল। কম দক্ষিণা লুটেছে?'

'কিন্তু লোকে তো দেখেছে ভৌতিক কাণ্ড?'

'ভৌতিক কাণ্ড? স্টুপিড! ওসব ম্যাজিক আমিও জানি। বুড়বকদের বুদ্ধু বানাতে জানতে হয়। সৎ বলেই এই হাল আমার।—এসেছ কেন? মতলবটা কী?'

'ওই বাড়িতে একটা মেয়েকে মেরে ফেলা হয়েছে।'

'কে মেরেছে?'

'ভূতে নিশ্চয়। পাথর পিটে খুলি ভাঙা হয়েছে।'

'খবরদার! খবরদার! মেরিয়ানা খুনি নয়। অভাগিনী মুক্তি পাচ্ছে না বলেই দুষ্টুমি করছে—খুন করার ধাত তার রক্তে ছিল না—মনেও ছিল না।'

'মরে গেলে তো ধাত পালটে যায়?'

'কোথাকার জ্ঞানদাতা রে? গেট আউট! গেট আউট! পরলোক নিয়ে পকড়-পকড় করতে এসেছে ভূতনাথ শিকদারের কাছে। —যা জানতে চাও, সেটা জেনে যাও। মেরিয়ানার প্রেতাত্মাকে কেউ স্কেপগোট খাড়া করতে চেয়েছ। পাথর পিটিয়ে খুলি গুঁড়িয়ে বোঝাতে চাইছে—প্রেতিনীর কীর্তি। কক্ষনও না। মানুষের কীর্তি। মাগী ওখানে গেছিল কেন?'

'মাগী নয়—মেয়ে। ষোলো বছর বয়স।'

'আইব্বাস! 'লভ' করতে তো? ওই হানাবাড়ির বাগান তো লভের জায়গা। কলকাতা থেকেও ছোটে ছোঁড়াছুঁড়িরা। এই ছুঁড়িটার লাভার আছে...নিশ্চয় আছে...গেট আউট...আমার খিদে পেয়েছে।'

চন্দননগর পুলিশ থানা।

থানাদার ডিসুজা সাহেব বেশ খাতির করলেন আমাদের। ইন্দ্রনাথের চেয়ে বেশি করলেন আমাকে। কারণ আমি লিখি। ট্যাঁকের জোর না থাকলেও আজকাল লেখকরা ইদানীং বেশ কলকে পাচ্ছে এই একটা জোরে। কলমের জোরে।

অ্যালকাথিনের একটা প্যাকেট ইন্দ্রনাথের সামনে রেখে তিনি বললেন, 'গল্পের গোয়েন্দা আমি নই। হলে তুচ্ছ এই জিনিসটা নিয়ে মাথা ঘামাতাম।'

খোঁচাটা হজম করে নিয়ে বুদ্ধদেবের হাসি হাসল ইন্দ্রনাথ। হাসিতে যেন বরাভয় ঝরে পড়ছে।

বললে, 'কোথায় পেলেন?'

'বাগানের রাস্তায়। পাথর নুড়ির ওপর পড়েছিল। কত ছোট দেখেছেন? আলপিনের ডগার চেয়ে একটু বড়।'

'রঙটা সবুজ।'

'জিনিসটাও। ম্যাগনিফাইং গ্লাসে দেখেছি। শার্লক হোমস-এর মতো।'

এবারের খোঁচাটা যেন শুনতেই পেল না ইন্দ্রনাথ, 'বস্তুটা ধার দেবেন?'

'স্বচ্ছন্দে। আমরা প্র্যাকটিক্যাল ডিটেকটিভ। নাইনটি পারসেন্ট পার্সপিরেশন—টেন পারসেন্ট ব্রেন ওয়ার্ক। আচ্ছা আসুন, নমস্কার।'

জগদীশ গুপ্ত সত্যিই আদর্শবান পুরুষ। এত বড় শিল্পপতি—অথচ তিনতলা বাড়িটাকে বানিয়েছেন মধ্যবিত্তের মতো।

দোতলার বৈঠকখানা ঘরে বসে তিনি বললেন, 'আপনাকে তো বলেইছি, ময়নার নীতির বালাই ছিল না। দেদার ছেলে-বন্ধু।'

'মেয়ে-বন্ধু?'

'কম।'

'বিশেষ কারও নাম?'

রিসিভারের দিকে হাত বাড়ালেন জগদীশবাবু, 'কমলি, স্কুটারটা আছে? নিয়ে চলে আয়। দশ মিনিটের মধ্যে।'

কমলির পরনে কমলা রঙের সালোয়ার কামিজ। কালো বডিখানা স্টিলের তলোয়ার বললেই চলে।

বললে, 'একটা ছেলেই বড় হ্যাংলামো করত ময়নার সঙ্গে। আমাদের সঙ্গেও করেছে। একটু বেশি চায়। ও দাদু, আপনি কানে চাপা দিন।'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'তার কি সবুজ গাড়ি আছে?'

চোখ বড় হয়ে গেল কমলির, 'মারুতি।'

'কোথায় পাব তারে?'

গ্রেট ইন্ডিয়ান রেফ্রিজারেশন কোম্পানির মালিকের একমাত্র ছেলে তার চেম্বারে বসে বললে, 'হ্যাঁ, আমার মারুতি আছে। সবুজ রঙের। চন্দননগরের ডিসুজাসাহেবেরও পার্সোনাল গাড়িটা মারুতি। সবুজ রং। চেনেন ডিসুজাকে? থানাদার ডিসুজা?'

'এখুনি এলাম তাঁর কাছ থেকেই।'

'থানায় গেছিলেন? গাড়িটা দেখেননি? ওর অফিসের সামনেই থাকে।'

'আপনার গাড়িটা কোথায়?'

'এই জানলা দিয়ে তাকান। ওই দেখুন।'

ইন্দ্রনাথ উঠে গেল জানলার কাছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে গেছে ছেলেটাও। মিঠুন চক্রবর্তীর কায়দায় চুলের ছাঁট। পাতলা নাক, একটু টিকোলো। শান্ত সুন্দর চোখের চাহনি—অনেকটা ইন্দ্রনাথের মতোই। লম্বায় দুজনেই সমান। দেখতেও সমান সুন্দর। শুধু পোশাক আলাদা। ধুতি-পাঞ্জাবির পাশে সাফারি সুট।

এখন ওরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। চোখে-চোখে তাকিয়ে।

'আপনি তাহলে যাননি ময়নার সঙ্গে?'

'না।'

'কোথায় ছিলেন?'

'এখানে।'

'তার প্রমাণ? আপনি মালিকের ছেলে। হাজিরার খাতা আপনার জন্যে নয়।'

কাঁধ ঝাঁকাল সুদর্শন তরুণ, 'বিশ্বাস করুন।'

জয়ন্তকে অফিস থেকে তুলে নিয়ে ফিরলাম ইন্দ্রনাথের ডেরায়।

'জয়ন্ত,' বললে ইন্দ্রনাথ, 'থানাদার ডিসুজার মারুতি আর সুরেশ লাম্বার মারুতি—দুটোই এখন সন্দেহের আওতায় চলে এসেছে।'

সুরেশ লাম্বা সুদর্শন ওই ছেলেটার নাম। চেহারায় নবাবপুত্তুর। স্বভাবে মেয়েঘেঁষা। মাড়োয়ারি জন্মসূত্রে—শিক্ষায়-দীক্ষায় বাঙালি।

জয়ন্ত বললে, 'থানাদারের গাড়ি তোলা পরে হবে'খন। সুরেশের গাড়ি তুলিয়ে নিচ্ছি। আর কী হুকুম?'

জবাব না দিয়ে টেলিফোন তুলল ইন্দ্রনাথ। নিমেষে তারের ও-প্রান্তে এসে গেল প্রেমচাঁদ—প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির কর্ণধার। দিল্লি যার হেড অফিস।

দিল্লি আর কলকাতায় কথা হয়ে গেল এইভাবে ঃ

'ইন্দ্র বলছি। হেল্প চাই।'

'ফরমাইয়ে।'

'সরকারি ফোরেনসিক ল্যাবের দুরবস্থা তোর অজানা নয়।'

'সেইজন্যেই তো ইমপোরটেড ইকুইপমেন্ট দিয়ে সাজিয়েছি আমার ফোরেনসিক ডিপার্টমেন্ট। সেটাও তোর অজানা নয়।'

'কাল সকালে ক্যালকাটা অফিসের ইনচার্জকে পাঠিয়ে দে।'

'তোর কাছে? কী মতলবে?'

'এক টুকরো রং পাঠাব..না, না, দুটো টুকরো। দুটোই সবুজ রঙের।'

'বেশ?'

'স্পেকটোগ্রাফিক অ্যানালিসিস করতে হবে।'

'প্রতিটি নমুনায় কী-কী উপাদান আছে জানতে হবে? মিলে যাছে কিনা বলতে হবে?'

'ইয়েস, মাই বয়।'

'হেল উইথ ইউ। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে এইভাবে কেউ কথা বলে?'

'প্রেম, স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ আছে? যা দিয়ে এক্স-রে অ্যানালিসিস করা যায়?'

'কী নেই বন্ধু? দিস ইজ প্রেমচাঁদ প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি—'

'রঙে ক'টা স্তর আছে, বলতে হবে।'

'আর কী?'

'লেজার এনার্জি দিয়ে এক-একটা রঙের স্তরকে ভেপার করে দেওয়ার প্রসেসটার কী যেন নাম?'

'লেজার মাইক্রোপ্রোব। ভেপারকে অ্যানালাইজ করতে হয় এমিসন স্পেকট্রোগ্রাফি দিয়ে। রঙের প্রত্যেকটা উপাদানের ওয়েভ লেন্থ জানা যায়। এত দরকার আছে কি?'

'আছে। অকাট্য প্রমাণ ছাড়া মাল ফসকে যাবে। টাকার মালিক। পলিটিক্যাল কানেকশন আছে নিশ্চয়। আমি চাই বৈজ্ঞানিক প্রমাণ। হেল্প মি।'

'ডোন্ট ওয়ারি।'

অনেক রাতে বাড়ি ফিরলাম। কবিতা সারাদিন হেদিয়ে মরেছে। ভাগ্যিস ইন্দ্র সঙ্গে আসেনি। ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিত কবিতা।

কথার তোড় নীরবে শুনে গেলাম। তারপর বললাম সারাদিনের কাহিনি। সবশেষে বললাম, 'সুরেশ লাম্বাই গেছিল ময়নার সঙ্গে হানাবাড়িতে।'

'জানলে কীভাবে?'

'বাগানের নুড়ি চাকায় লেগে ছিটকে গিয়ে লেগেছিল ড্রাইভারের দরজার প্যানেলে। রং চটে গিয়েছিল নুড়িতেই। ডিসুজা কূর্ম অবতার-থানাদার হলেও এই একটি উত্তম কাজ করেছে। কুচি রং হুবহু মিলে গেছে চটা রঙের জায়গায়। নিজের চোখে দেখে এলাম।'

হুম করে দম ফেলে কবিতা বললে, ঠাকুরপোর ব্রেন আছে বটে। ডিটেকশনে ডক্টরেট। এখন মাইক্রোসকোপিক এগজামিনেশন করে মিলিয়ে নেওয়া বাকি। ফাইন! লাম্বা ছোঁড়া কি লম্বা দিয়েছে?'

'তাকে বাড়ি ছেড়ে নড়তে বারণ করে এল ইন্দ্রনাথ। লোকাল থানাদারও নজর রেখেছে।'

নজর রাখাই সার হয়েছিল।

পরের দিন সকালেই টেলিফোন এসেছিল ইন্দ্রনাথের, 'মৃগ চলে আয়। লাম্বা-লম্বা দিয়েছে।'

গেলাম লাম্বার বাড়ি। ঊষালগ্নে গোটা বাড়ি কেঁপে উঠেছিল ঘন-ঘন গুলির আওয়াজে। গুলি চলছে সুরেশ লাম্বার ঘরে। আধ মিনিটেই থেমে গেছিল শব্দ।

দরজা ভেজানো ছিল। মেঝেতে লুটিয়ে আছে সুরেশ। হাতে রয়েছে দুশমন আকৃতির একটা হ্যান্ডগান। ভোঁদা, কালচে। চিক্কণ নয় মোটেই। খ্যাঁদা চোঙা লম্বায় মোটে দু-ইঞ্চি। দেখলেই গা হিম হয়ে যায়। 'স্টার ওয়ার্স' সিনেমার ডার্থ ভেডার-এর রশ্মিবন্দুক বললেই চলে।

আমেরিকার কুখ্যাত কোবরে M-11/9—যার ম্যাগাজিন থেকে বত্রিশটা নাইন মিলিমিটার সাইজের তামার গুলি বেরিয়ে যায় পরপর—একবার ট্রিগার টিপে ধরলেই।

সুরেশ তার নিজের ব্রেন ঝাঁঝরা করেছে বত্রিশটা মৃত্যুদূতকে দিয়ে।

তার আগে লিখে গেছে ছোট্ট চিঠি। পরিষ্কার বাংলায় ঃ

আমার অপরাধ আমি মারোয়াড়ির ছেলে। ময়নাকে এত ভালোবেসেও তার মন পেলাম না। ও আমাকে চায়নি। চেয়েছিল আমার কোবরেকে। হানাবাড়িতে গেছিল কোবরের শক্তি যাচাই করতে। খালি করেছিল ম্যাগাজিন। তারপর সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমি দিইনি। কেড়ে নিতে গেছিল। পারেনি। ক্যারাটে 'চপ' মেরেছিল আমার কণ্ঠা টিপ করে। আমি থার্ড গ্রেড ব্ল্যাক বেল্ট ও নই। ঘুরে গিয়ে বেঁচে গেছিলাম। হাতের কোবরেও ঘুরে গিয়ে ওর মাথায় মেরেছিল। ভীষণ ভারি। মারা যায় তক্ষুনি। বাঁটের খাঁজ ছিল চোট-এর জায়গায়। লেভেল করে দিয়েছিলাম পাথর দিয়ে। ময়না নেই। আমি চললাম। রইল অভিশপ্ত কোবরে। আর যেন কাউকে ছোবল না মারে।

'নবকল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত (শারদীয় সংখ্যা, ১৪০০)।

বেঁচে উঠলেন ফাদার ঘনশ্যাম

সুনামের মতো একটা জিনিস ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল মাঝে-মাঝে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন। আবার এক-একটা সময় আসে, সুনামের আনন্দে বুঁদ হয়ে থাকতে পারেন না। অল্প সময়ের জন্য হলেও এইরকম ঘটনা তাঁর জীবনে প্রায় ঘটে। কখনও তিনি কাগজে-কাগজে পৃথিবীর নবম আশ্চর্য হয়ে থাকেন, সাপ্তাহিকীর সমালোচনা স্তম্ভের বাগবিতণ্ডার মধ্যেও তাঁর ঠাঁই হয়ে যায়, ক্লাব আর ড্রইংরুমে তাঁকে নিয়ে মুখরোচক আড্ডা জমে—সেইসব আড্ডায় তাঁর নিপুণ আর বুদ্ধিদীপ্ত গোয়েন্দাগিরির অনুপুঙ্খ বর্ণনা অত্যন্ত ভুলভাবে পরিবেশন করা হয়। আর এই জিনিসটা বেশি করে ঘটে এই পশ্চিমবঙ্গেই। ফাদার ঘনশ্যামকে যারা জানে, তাদের কাছে এই গপ্পোগুলো বেশ বেখাপ্পা আর অবিশ্বাস্য মনে হয়। তা সত্ত্বেও, ডিটেকটিভ হিসাবে ফাদার ঘনশ্যামের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি অনেক ম্যাগাজিনেই বেরচ্ছে।

আশ্চর্য এই যে, ভ্রাম্যমান এই বহুল প্রচারিত আলোকবর্তিকা দীপ্যমান হলেন অতি প্রত্যন্ত এক অঞ্চলে—সুদূরের সেই অঞ্চল তাঁর নিবাস থেকে বহু-বহু দূরে। তাঁকে একটা দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল বিশেষ সেই জায়গায়। কাজটা মিশনারী বিষয়ক বটে, আবার গ্রাম্য গির্জা বিষয়কও বটে। জায়গাটা ভারতের একদম উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। যেখানে স্বাধীনতাকামী উপজাতীয়রা নিত্য সংঘর্ষ আর চোরাগোপ্তা খুন-জখম যেন তেন প্রকারেণ চাগিয়ে রেখেছে, যেখানকার সন্ত্রাসবাদে গোপনে মদত দিয়ে চলেছে ভারতের বাইরের রাষ্ট্রশক্তিরা—ভারতকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন আর দুর্বল করার প্রয়াসে। সব রকম গাত্রবর্ণের মানুষই এখানে থাকে—সাদা, কালো, হলদেটে। পর্যটন পিয়াসীরা প্রায় সারা বছর টহল দিয়ে যায় সেখানে—কারণ, জায়গাটাকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে ভারতের দ্বিতীয় ভূস্বর্গ বলা চলে।

গোলমালটা শুরু হল এইরকমই এক পর্যটককে নিয়ে। দ্বিতীয় ভূস্বর্গে পা দিয়েই তিনি তাঁর একটা ব্যাগ হারিয়ে ফেলেছিলেন। ভীষণ বিরক্ত, ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি ঢুকে পড়লেন প্রথমেই যে বাড়িটা দেখলেন, সেই বাড়ির মধ্যে।

বাড়িটা সেই অঞ্চলের মিশন-হাউস, গ্রাম্য-গির্জা রয়েছে পাশেই। বাড়ির সামনে টানা লম্বা বারান্দা। সারি-সারি পোঁতা খুঁটি পাক দিয়ে বেড়ে উঠেছে কালো আঙুর—পাতায় ম্যাড়মেড়ে লালচে ভাব। এর ঠিক পেছনে একইভাবে সারবন্দি ভাবে বসে রয়েছে সিধে শক্ত খুঁটির মতো অনেকগুলো মানুষ—গায়ের রং তাদের আঙুর ফলের মতোই কালো। তাদের কারোরই চোখের পাতা পড়ছে না। চামড়ায় লেগে আছে যেন বৃষ্টিবনের গাছের শ্যাওলা। এদের অধিকাংশ লম্বা বিড়ি টানছে—ছোট চুরুট বলা যায়। ছোট্ট এই দলে ধূমপানই একমাত্র নড়াচড়ার চিহ্ন। পর্যটক মহাশয়ের বর্ণনায় এরা নিছক উপজাতি ছাড়া কিছু নয়। যদিও এদের কয়েকজন মহাভারতের মধ্যম পাণ্ডবের বংশধর বলে দাবি করে।

ভদ্রলোক কলকাতায় থাকেন। একটি দৈনিক সংবাদপত্রের সাংবাদিক। ছিপছিপে তনু, চুল ফাঁকা-ফাঁকা, অসাধারণ নাক। অ্যাডভেঞ্চারাস্ এই নাক দেখলেই মালুম হয় পিঁপড়ে-খেকো প্রাণী যেমন তার দীর্ঘ নাকের ডগা দিয়ে পরখ করে নেয় সামনের পথ ঠিক আছে কিনা, ইনিও সেই বিদ্যায় বিলক্ষণ রপ্ত। সংবাদ নাকি সাংবাদিকদের কাছে দৌড়ে চলে আসে। ইনি এঁর নাকের ডগা দিয়ে সংবাদ টেনে নেন, যাচাই করেন, তারপর ছেপে দেন।

আশ্চর্য এই পুরুষের নামটাও। নাক উঁচু করে চলবেন ভবিষ্যতে, নামকরণের সময়ে তাঁর বাবা-মা বোধহয় সেই তথ্য অবগত ছিলেন—তাই তাঁর নাম রেখেছিলেন—নাকেন্দ্র। পরে নিশ্চয় তাঁরা ধ্যানযোগে উপলব্ধি করেছিলেন, এহেন নামের অধিকারী হয়ে পুত্রকে বিস্তর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। তাই তাঁরা অন্য একটা নাম দেন—বরেন্দ্র। যৌবন উপস্থিত হওয়ার পর বরেন্দ্র জানতে পারলেন, দুটি কারণে তিনি কোনও মহিলার বর হতে পারছেন না। এক, তাঁর অ্যাডভেঞ্চারাস নাক—দুই, তাঁর বরেন্দ্র নাম। নাক ছাঁটাই করা সম্ভব নয়। তাই তিনি নাম ছাঁটাই করলেন। 'বর' বাদ গেল, হয়ে গেলেন শুধু ইন্দ্র। যদিও নামের দৌলতে ঋগবেদের প্রধান দেবতার একটি ছাড়া কোনও গুণই তিনি অর্জন করতে পারলেন না। যেটি পারলেন, সেটি হল, অন্যান্য সাংবাদিকদের ওপর ছড়ি ঘোরানো। যেমন করতেন দেবরাজ—দেবতাদের ওপর কর্তৃত্ব।

এঁর উন্নাসিকতা একটি ব্যাপারে তাঁকে উগ্রপন্থী করে তুলেছিল। ধর্মচর্চা হোক স্বতঃস্ফূর্ত—তা যেন থাকে সংগঠনের বাইরে। দেবালয় ছিল তাঁর দু-চক্ষের বিষ, সাংগঠনিক ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে তাঁর কলম থেকে অ্যাসিড ঝরে। এহেন মানসিকতার মানুষ যখন ব্যাগ হারিয়ে ক্ষিপ্ত হন এবং প্রথম বাড়িটাকেই দেখেন মিশন-হাউস, তখন তাঁর ওপর উগ্রচণ্ডীর ভর হওয়া স্বাভাবিক। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো তিনি দেখলেন বিলকুল নিষ্কর্মা এবং ধরণী সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন কয়েকটি মানুষ নিমগ্নচিত্তে বিড়ি সেবন করছে কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানের মতোই চিড়বিড় করে উঠলেন ধ্যানস্থ ধূমপায়ী ওই কয়েকজনের ওপর। নির্লজ্জভাবে সময়ের এহেন অপব্যবহার যে নিদারুণ অদক্ষতার লক্ষণ, তা জ্বালাময়ী ভাষায় প্রকাশ করতে কসুর করলেন না। অতঃপর তিনি যে প্রশ্নবাণটি নিক্ষেপ করলেন, সেটি তাঁর প্রিয় ব্যাগঘটিত। প্রিয় বস্তু ফিরিয়ে আনার তিলমাত্র উদ্যোগ না দেখিয়ে ধূমপায়ী ক'জন যখন ধূমপানকেই ধ্যানযোগের প্রথম ধাপ বলে বিবেচনা করল এবং বাক্যহারা হয়ে রইল—তখন তিনি বাগ্‌বিস্তারের গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে রাখলেন এবং একাই কথা বলে গেলেন।

কল্পনার চোখে দেখে নিন, প্রখর রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে কয়েক বিঘৎ লম্বা পেরেকের মতো সিধে একটা লোক গলা চড়িয়ে কথাই বলে যাচ্ছেন, তাঁর পোশাক অতীব পরিচ্ছন্ন, ইস্পাত-কঠিন মুঠোয় ঝুলছে একটা ব্রিফকেস। ছায়ায় সমাসীন নিষ্কম্প কয়েকটি মানুষকে লক্ষ করে তিনি অনর্গল বকে চলেছেন। উচ্চকণ্ঠে অতি যত্নে তিনি প্রথমে ব্যাখ্যা করেছিলেন কীভাবে ধূমপায়ী পুরুষ ক'জন এমন অলস আর কদর্য হয়ে উঠেছে। এদের এই পশুবৎ আচরণ চূড়ান্ত তামসিকতার লক্ষণ এবং এরা পশুর চাইতেও অধম। অনেক আগেই নিজেদের এহেন আদিম বর্বরতা এদের বোঝা উচিত ছিল। বক্তার ধারণা, পাদরিদের অনিষ্টকর প্রভাব রয়েছে এর মূলে। এই একটি কারণে এতগুলি লোক দারিদ্রের চরম

সীমায় পৌঁছেছে, চূড়ান্তভাবে নির্যাতিত হয়েছে এবং উপায় না পেয়ে ছায়ায় বসে অনর্গল ধূমপান করে চলেছে।

তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতার শেষাংশ ছিল এইরকম, 'অত্যন্ত নরম প্রকৃতির মানুষ তোমরা, তাই তোমাদের পায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে মুকুটধারী পাদরিরা, তাদের গায়ে ঝকমকে সোনার আলখাল্লা, তোমাদের পরণে ছেঁড়া পোশাক। অত্যাচারীর ভূমিকায় থেকে এরা ফেটে পড়ছে আত্মম্ভরিতায়। ঠকিয়ে যাচ্ছে তোমাদের ঝকমকে ক্রাউন, চাঁদোয়া আর পবিত্র ছাতার ঐশ্বর্য দেখিয়ে, তোমরা বোবা বনে রয়েছ এদেরই সামনে। ভাবছ এবং তোমাদের ভাবানো হয়েছে—এরাই নাকি ধরণীর রাজা, আকাশ থেকে নেমে এসেছে তোমাদের ভালো করার জন্যে। কতখানি ভালো হয়েছে তা আয়নায় নিজেদের দেখলেই হাড়ে-হাড়ে টের পাবে। নিজেদেরই কান্না পাবে। বড়-বড় কথা আর জাঁকজমক দেখিয়ে তোমাদের ভুলিয়ে রাখা হচ্ছে বলেই আজ তোমাদের এই হাল হয়েছে। বর্বরতার পর্যায়ে নেমে এসেছ, লিখতে জানো না, পড়তেও জানো না—'

ঠিক এই সময়ে পাদরিসাহেব স্বয়ং বেরিয়ে এলেন মিশন-হাউসের বাইরে। নিতান্ত দীনহীন পোশাকে। প্রায় ছুটতে-ছুটতে এলেন। তাঁর মাথায় নেই স্বর্ণকিরীট, অঙ্গে নেই মহার্ঘ বস্ত্র। চালচলন মর্যাদাব্যঞ্জক নয় মোটেই। বরং তার বিপরীত। গগন থেকে খসে পড়া ধরণী-সম্রাট মনে হওয়া দূরে থাক, প্রথম দর্শনেই তাঁকে নিতান্ত হাঘরে মানুষ বলে মনে হয়। অন্যের ব্যবহার করা কালো আলখাল্লায় মোড়া যেন একটা বেঢপ বান্ডিল। মাথায় মুকুট-ফুকুটের বালাই নেই। চকচক করছে টাক। হোঁৎকা আকৃতি নিয়ে তিনি বিষম বেগে বেরিয়ে নিস্পন্দ ধূমপায়ীদের কী যেন বলতে গেলেন, কিন্তু আগন্তুককে দেখেই দ্রুতস্বরে বললেন—

'আরে! আরে! বলুন কীভাবে সাহায্য করতে পারি। ভেতরে আসতে পারেন—স্বচ্ছন্দে।'

ভেতরে এলেন সাংবাদিক ইন্দ্র। বিবিধ বিষয়ে তাঁর জ্ঞানবৃদ্ধিও ঘটতে লাগল তখন থেকে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, পূর্ব ধারণার চাইতে শক্তিশালী ছিল ভদ্রলোকের সাংবাদিক-কৌতূহল আর সহজাত প্রবৃত্তি। সেয়ানা সাংবাদিকদের যা অবশ্যই থাকে। প্রচুর প্রশ্ন করে গেলেন। জবাব শুনে চমৎকৃত হলেন। আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পেল। যা ছিল তাঁর বক্তৃতার পাদদেশে—অর্থাৎ কেলে মর্কট মানুষগুলো লিখতে জানে না, পড়তেও জানে না—এই ব্যাপারেই আবিষ্কৃত করলেন যে তথ্য, তা তাঁর পূর্ব ধারণা নস্যাৎ করে ছাড়ল। এরা সবাই দিব্বি লিখতে পারে, চমৎকার পড়তে পারে। কারণ একটাই। বেঢপ চেহারার এই পাদরি নিজে তাদের লিখতে পড়তে শিখিয়েছেন। কিন্তু কেউই এই দুটোর ধার ধারে না। তারও কারণ আছে। ওরা কথা বলতে ভালোবাসে। কথার মাধ্যমেই শেখে, কথার মাধ্যমে শেখায়, কথার মাধ্যমেই বোঝায়। স্রেফ প্রাকৃতিক পন্থা তাদের বেশি পছন্দসই। সাংবাদিক মশায় আরও জানলেন, এই যে অদ্ভুত মর্কুটে মানুষগুলো আবলুস কাঠের তৈরি পুতুলের মতো চুপচাপ বসে, মাথার এক গাছি চুলও না নাড়িয়ে, অপদার্থ অলসের মতো এক নাগাড়ে লম্বা বিড়ি টেনে যাচ্ছে—এরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত কর্মঠ নিজস্ব জমিতে। সাংবাদিকের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল যখন জানলেন, ভিখিরির মতো দেখতে হলেও ওদের প্রত্যেকের নিজেদের চাষ-আবাদের জমিজমা রয়েছে। অর্থাৎ দারিদ্র্য কী জিনিস, তার স্বাদ এখনও পায়নি। এরা গতর খাটায়, অল্পে সন্তুষ্ট হয়, বাকি সময়টা প্রতিবেশীদের মঙ্গল চিন্তা করে এবং অত্যন্ত সুখী জীবনযাপন করে। জমিজমার মালিক হওয়ার ব্যাপারে পাদরি সাহেবের অবদান আছে

সামান্য এবং পলিটিক্সে শুধু এই ক্ষেত্রেই তিনি নাক গলাতে বাধ্য হয়েছেন। বংশ পরম্পরায় এরা জমি ভোগ করে এসেছে। পাদরি সাহেব শুধু দেখেছেন, বংশধরদের কেউই যেন জমি নেই বলে গা ঢালা দিয়ে কাটায়। জমি পাইয়ে দিয়েছেন প্রত্যেকেই। স্থানীয় পলিটিক্সে এইটাই সর্বশেষ হস্তক্ষেপ। নাস্তিকদের আধিপত্য এখানে বেড়েই চলেছে। তাদের প্রচার বিজ্ঞানকেন্দ্রিক। ফলাও করে বিজ্ঞান যুক্তিনিষ্ঠ সংগঠনরা জানিয়ে যাচ্ছে, ভগবান-টগবান কিছু নেই। চার্বাকনীতি অনুসরণ করো। পরলোকের কথা না ভেবে ইহলোকেই গুছিয়ে নাও। ঠাকুর দেবতাদের নিয়ে ব্যবসা, তা লাটে তুলে দাও। দৈব ঘটনা, অলৌকিক ঘটনা—এসব ধর্মব্যবসায়ীদের বাকতাল্লা—একদম কান দেবে না। জানবে, সবই বিজ্ঞাননির্ভর। বিজ্ঞানে যার ব্যাখ্যা হয় না, বুজরুকি দিয়েও তা মগজে ঢোকানো যায়। ব্যাখ্যা একটা কোথাও আছে, বিজ্ঞান সেই ব্যাখ্যার নাগাল ধরে ফেলবেই। সেদিনই বুঝবে দৈব মাহাত্ম্য স্রেফ বোলচাল, ধর্মের নামবলী গায়ে দিয়ে লোক ঠকানোর কারবার।

একটা গুপ্ত সমিতির অভ্যুদয় ঘটেছে স্থানীয় পলিটিক্সের এহেন গোলমেলে পরিস্থিতিতে। মাঝে-মাঝে দাঙ্গা বাধাচ্ছে এই সমিতি বিজ্ঞান আর সমাজ কল্যাণের অজুহাতে। প্রচলিত বিশ্বাস আর সংস্কারের এক তীব্র সমালোচক এই সমিতির কর্ণধার। নাম তাঁর আলভারেজ। পূর্বপুরুষ ছিলেন পর্তুগীজ। রক্তের গরম এখনও তাঁর ধমনিতে বইছে। নিন্দুকরা অবশ্য বলে, নিগ্রো রুধির কিঞ্চিৎ পরিমাণে মিশেছে তাঁর ধমনীতে। ভদ্রলোক সুসংগঠক। এ জায়গার বেশ কয়েকটা লজ আর মন্দিরের একচ্ছত্র অধিপতি, সেসব জায়গায় গোপনে চলে নাস্তিকতার আরাধনা—কাজকর্ম বিলক্ষণ হেঁয়ালিপূর্ণ।

রক্ষণশীল যারা, তারা সংগঠিত হয়েছে যে ব্যক্তির ছাতার তলায় তিনি বিলক্ষণ বিত্তবান পুরুষ। বেশ কয়েকটা কারখানার মালিক। পয়সা আছে, মানসম্মানও আছে। তবে তাঁর নাম শুনলেই লোকে চনমনে বোধ করে না। নিজে সম্ভ্রান্ত হয়েও পাঁচজনের সঙ্গে মিশে থাকেন। নাম তাঁর রঞ্জুলাল। রঞ্জুলাল যদি উঠেপড়ে না লাগতেন এবং মিশন-হাউসের পাদরির সঙ্গে হাত না মেলাতেন তাহলে এখানকার সব চাষি জমির মালিক হতে পারত না। ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল সুকৌশলে এই ব্যক্তিকে দিয়ে মস্ত এই কাজটা করাতে পেরেছেন বলেই দাঙ্গাহাঙ্গামা এখানে কমে গেছে—শান্তি-শৃঙ্খলা বহাল রয়েছে।

সাংবাদিক ইন্দ্রকে এইসব কথা যখন বলে যাচ্ছেন ফাদার ঘনশ্যাম, সেই সময়ে রক্ষণশীল নেতা রঞ্জুলাল ঢুকলেন ঘরে। ভদ্রলোক কৃষ্ণকায় পুরুষ। অস্বাভাবিক পেটমোটা। গোটা শরীরটায় যেন হাওয়া ঢুকিয়ে ফুলিয়ে টানটান করা হয়েছে—ফুটবলে যা করা হয়। টোকা মারলেই বুঝি টং করে আওয়াজ হবে। তাঁর মুখ গোল, গালে আর চিবুকে প্রচুর মাংস, কিন্তু মাথায় চুল নেই মোটে, বিলকুল তেলতেলে মাথা। সুগন্ধী চুরুট টানতে-টানতে ঘরে ঢুকেই তিনি থিয়েটারি ঢঙে চুরুট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে দিলেন। যেন ফাদার ঘনশ্যামকেই তিনি খোদ গির্জে বলে মনে করছেন। বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদনও সারলেন আশ্চর্যভাবে কোমর বেঁকিয়ে—ওইরকম টাইট ফিগারে ঝট করে এতখানি বেঁকে পড়া অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভবকেই তিনি সম্ভব করলেন। তবে হ্যাঁ, সামাজিক মেলামেশায় রঞ্জুলাল অতি মাত্রায় নিষ্ঠাবান পুরুষ—বিশেষ করে ধার্মিক ব্যক্তিদের সমীপে এলে তিনি যেন তাঁর সমস্ত অহংবোধ নিমেষে নিক্ষেপ করেন মাটির দিকে। এই ব্যাপারে তিনি পাদরিদের চেয়েও বেশি পাদরিপ্রতিম। বিড়ম্বিত বোধ করলেন ফাদার ঘনশ্যাম—প্রাইভেট লাইফে এতটা বিনয় তাঁকে বরাবর বিচলিত করে।

বললেন ফিকে হেসে, 'পাদরিদের মতো গড়ে উঠিনি আমি। তবে এটাও ঠিক যে পাদরিদের হাতে গড়বার ভার পুরো ছেড়ে দিলে, পাদরিজনোচিত হত না কিছুই।'

হঠাৎ উৎফুল্ল হলেন সাংবাদিক ইন্দ্র—'মিঃ রঞ্জুলাল, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় তো আগেই ঘটেছে। মনে পড়ছে? বম্বের ট্রেড কংগ্রেসে গেছিলেন?'

মিঃ রঞ্জুলালের মাংসল চোখের পাতা পাখা ঝাপটাল বারকয়েক। হাসলেন নিজস্ব ঢঙে। বললেন, 'মনে পড়েছে।'

'ঘণ্টা দুয়েক চলেছিল মিটিং। কাজ হয়েছিল অনেক। আপনিও অনেক বদলে গেছেন।'

'কপাল ভালো অমন জায়গায় যেতে পেরেছিলাম,'—রঞ্জুলাল বেশ বিনীত।

'সৌভাগ্য তাদের কাছেই আসে সৌভাগ্যকে যারা লুফে নিতে পারে,'—সোৎসাহে বলে গেলেন সাংবাদিক ইন্দ্র, 'কথায় বাধা দিচ্ছি না তো?'

'একদম না।' রঞ্জুলালের জবাব, 'পাদরিসাহেবের কাছে হামেশা আসি স্রেফ দুটো কথা বলার জন্য—যা প্রাণে আসে, তাই বলে যাই—কাজের কথা থাকে না।'

ফাদার ঘনশ্যামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর অন্তরঙ্গতা সঞ্চারিত হয়েছিল সাংবাদিক ইন্দ্রর মধ্যেও। দেখতে-দেখতে নৈকট্যবোধ এসে গেল তিনজনের মধ্যেই। রকমারি আলোচনায় মুখর হলেন তিন পুরুষ। অচিরে সাংবাদিক ইন্দ্র উপলব্ধি করলেন, মিশন-হাউস ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর পূর্ব ধারণাকে বেশি পাত্তা দেওয়া ঠিক হচ্ছে না সাদামাটা পাদরির সামনে। ইনি মুখে খই না ফুটিয়ে আর চেহারায় চমক না দেখিয়ে সমাজের যা মঙ্গল করে চলেছেন, তা অনেক বাক্যবীরের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি নিজেই শেষকালে প্রস্তাব করলেন, ফাদার ঘনশ্যামের এত কিছু সুকর্ম, তিনি দেশময় প্রচার করতে চান তাঁর সুলেখনীর মাধ্যমে। আর ঠিক সেই কথার পরেই ফাদার ঘনশ্যাম বুঝলেন, সাংবাদিক ইন্দ্রর বৈরী আচরণ যদিও বা বরদাস্ত করা যায়, তাঁর সহানুভূতির সুর তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

সাংবাদিক ইন্দ্র কিন্তু এমন উপকরণ কি ছাড়তে পারেন? কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। ফাদার ঘনশ্যামকে নিয়ে ফিচারের পর ফিচার লিখে গেলেন ইংরিজি আর বাংলা পত্রপত্রিকায়। উচ্চ প্রশংসায় ঠাসা সেইসব লেখা সাগরপাড়ের কাগজেও ছাপা হতে লাগল বিশেষ করে আমেরিকায়। মধ্যপ্রাচ্য ছেয়ে গেল তাঁর লেখালেখিতে। মিডলওয়েস্টের দেশগুলি উদগ্রীব হয়ে রইল ফাদার ঘনশ্যামের নতুন-নতুন কাহিনি জানবার আশায়। খর্বকায় কুমড়ো আকৃতি ফাদারের নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর ফটো তোলা হল দেদার এবং বিশাল ছবি ছাপা হয়ে যেতে লাগল যুক্তরাষ্ট্রের বহুল প্রচারিত রবিবাসরীয় পত্রিকাগুলোয়। বেচারা ফাদার ঘনশ্যাম! প্রচারের দানবিক চাকার ঘূর্ণন বন্ধ করতে পারলেন না তিনি কিছুতেই। তাঁর নিছক কথাগুলোকে তাঁর বাণী বানিয়ে কাগজে-কাগজে ছাপিয়ে যেতে লাগলেন সাংবাদিক ইন্দ্র। ফাদার ঘনশ্যামের বাণী ফ্যালনা জিনিস নয়। বড়-বড় পোস্টার বানিয়ে বিক্রির ব্যবসাও জমে উঠল দেখতে-দেখতে। মোটা হরফের ওপর ফাদারের শ্রীহীন আকৃতি শোভা পেতে লাগল ঘরে-ঘরে। এরপর দেখা গেল, তাঁর মুখের সামান্য কথা বাণীতে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার পর স্লোগানে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন মিছিলে সেই স্লোগান পাইকারি হারে কাজে লাগানো হচ্ছে। আমেরিকা ছাড়া অন্য দেশের মানুষের কাছে একসময় বড় একঘেয়ে লাগতে লাগল ফাদার ঘনশ্যামকে নিয়ে বাড়াবাড়ি দেখে। কিন্তু আমেরিকা জাতটা আলাদা। ম্যাডাম ব্ল্যাভাটস্কি, কর্নেল অলকট, অ্যানি বেসান্ত প্রমুখ থিয়সফিস্টদের ধারণা অনুসারে মানুষ জাতটার বর্শাফলক এই আমেরিকান জাত—এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে। নতুন কিছু পেলে

তার সমাদর করতে তারা জানে। তাই তারা সাদর আমন্ত্রণ জানাল ফাদার ঘনশ্যামকে। বেশি কিছু না, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি স্টেটে যাবেন এবং একটি করে বক্তৃতা দেবেন। ফাদার ঘনশ্যাম সবিনয়ে সেই সব আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করলেন। পরিণামে তাঁর সম্পর্কে আমেরিকান মানুষের শ্রদ্ধা দ্বিগুণ-ত্রিগুণ হয়ে গেল। ফাদার ঘনশ্যাম নাকি এক বিস্ময়। আমেরিকায় বিনা পয়সায় বেড়াতে চান না যিনি, তিনি নিশ্চয় লোকাতীত ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং আরও লোভনীয় প্রস্তাবের পর প্রস্তাব আসতে লাগল তাঁর কাছে। বেচারি ফাদার ঘনশ্যাম! ঠিক এই সময়ে গল্পের সিরিজ ছাপা হতে লাগল তাঁকে কেন্দ্র করে, শার্লক হোমস-এর গল্পের মতো। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় গল্প লেখা আর ছাপানোর মূলেও সক্রিয় রইল সাংবাদিক ইন্দ্রর অত্যুৎসাহ। প্রায় সব গল্পের প্লটে অনুরোধ থাকছে একটাই—মহামান্য বুদ্ধিবর ফাদার ঘনশ্যাম যেন এই জটিল সমস্যাটার সমাধান করে দিয়ে যান শার্লক হোমস স্টাইলে। গল্পের স্রোত বাড়তে-বাড়তে যখন মহানদী হতে চলেছে, অনুরোধ-উপরোধের ঢেউ যখন প্লাবন আকারে ফাদার ঘনশ্যামকে ভাসিয়ে দিতে চলেছে, যখন প্রত্যাখান করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছেন ফাদার, তখন তিনি একটাই অনুরোধ করেছিলেন—বন্ধ করো এইসব গল্প ছাপানো, প্রত্যাখ্যান করলেই যখন তা নব কলেবরে নতুন আমন্ত্রণ আকারে আবির্ভূত হচ্ছে, তখন দিলেন স্থগিতাদেশ, অবশ্যই বিনীত অনুরোধের মোড়কে পুরে।

সাংবাদিক ইন্দ্র এই পয়েন্টটা লুফে নিয়ে মোচড় দিলেন অন্যদিকে। গুজবের স্রোত বইয়ে দিলেন অন্য খাতে। ডক্টর ওয়াটসনের হিরো একদা সাময়িকভাবে পাহাড়চুড়ো থেকে যেভাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল—ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডলও সেইভাবে সাময়িকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলেই তো হয়।

যথা নিয়মে কাকুতি-মিনতি তেড়ে এল ফাদার ঘনশ্যামের দিকেই। কেন তিনি বিশ্ববরেণ্য শার্লক হোমসের অনুকরণে সাময়িকভাবে লোকচক্ষু থেকে অদৃশ্য হচ্ছেন না?

দাবির পর দাবি। দাবির পর দাবি। হেদিয়ে উঠেও অপরিসীম ধৈর্য সহকারে প্রতিটি দাবির জবাব লিখে জানিয়ে দিলেন ফাদার ঘনশ্যাম, সাময়িকভাবে নিজেকে অন্তর্ধান করানোর বিকল্প প্রস্তাবে জানালেন—তাঁকে নিয়ে লেখা গল্পগুলো সাময়িকভাবে অন্তর্ধান করলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। তিনি নিজে অন্তর্হিত হবেন কি না হবেন—সেটা নির্ভর করছে গল্পগাছার তিরোধানের ওপর। দিনে-দিনে জবাব দেওয়া তিনি কমাতে লাগলেন। জবাবের বয়ানও দিনে-দিনে সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর হতে লাগল। শেষ জবাবটা লেখবার পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

আমেরিকা জুড়ে যখন কোনও হইচই আরম্ভ হয় তখন তার রেশ এসে পড়ে এই পোড়া দেশে। একেই বলে পশ্চিমী প্রভাব। সাদা চামড়া যখন নেচেছে কালো চামড়ার ফাদার ঘনশ্যামকে নিয়ে, তখন এখানেও শুরু হয়ে যাক হুজুগের নাচ। বিশেষ করে যে অঞ্চলটিতে ফাদার ঘনশ্যাম প্রায় লুকিয়ে থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কাজ করে যাচ্ছিলেন প্রচার আর আড়ম্বর বাদ দিয়ে, ঠিক সেই জায়গাটাতেই হুদো-হুদো পর্যটকের আসা শুরু হয়ে গেল, শুধু গোটা ভারত থেকে নয়, আমেরিকা আর ইউরোপ থেকেও। পর্যটন ব্যবসায়ীদের পোয়াবারো ঘটে গেল। ফাদার ঘনশ্যামের নামাঙ্কিত পথ নির্দেশক ফলক পুঁতে দেওয়া হল রাস্তার মোড়ে-মোড়ে। ফাদার ঘনশ্যামের নাম লেখা বিশেষ টুরিস্ট বাসও আসতে লাগল। দুর্গমতম সেই দ্বিতীয় ভূস্বর্গে। দলে-দলে মানুষ পিলপিল করতে লাগল ছোট্ট ওই জায়গায়। যেন কুতুবমিনার দেখতে ছুটছে। সবচেয়ে ঝামেলা বাধাল স্থানীয়

দোকানদাররা। তাদের কেউ ফাদার ঘনশ্যামের মূর্তি বানিয়ে চড়া দামে বেচে লাল হয়ে গেল দু-দিনেই, কেউ বেচতে বসল তাবিজ-মাদুলি-লকেট। সবেতেই ঝুলছে ফাদার ঘনশ্যামের ছবি, নয়তো লেখা রয়েছে তাঁর মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী। নাজেহাল হলেন আর এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের ধান্দাবাজিতে। অষ্টপ্রহর তারা হানা দিয়ে গেল গোবেচারা পাদরির ওপর একটা মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে—তাদের বানানো দ্রব্যটার গুণের তারিফ করে দেওয়া হোক লিখিতভাবে। কোনও শংসাপত্রই যখন ছাড়া হল না ফাদারের তরফ থেকে, তখন আসতে লাগল চিঠির স্রোত। সবাই জানে ফাদার ঘনশ্যামের এই একটি দুর্বলতার সংবাদ—সাহিত্যিক না হয়েও তিনি পত্র-সাহিত্যের সমাদর করেন। কারও মনে কষ্ট দেন না। চিঠি এলে চিঠির জবাব দেন। প্রথম-প্রথম তিনি পত্রদাতাদের উদ্দেশ্য ধরতে পারেননি বলে এন্তার জবাব দিয়ে গেছেন। তারপর জানলেন—তাঁর সই-এর জন্যই এত চিঠি লেখা হচ্ছে, আর তাঁর অটোগ্রাফ চড়া দামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। ভালো মানুষের এই অবস্থাই হয়। কাউকে ফেরাতে পারেন না, ফেরাতে পারেননি মদ্য প্রস্তুতকারক সুরজলালকে। খচমচ করে দুটো লাইন লিখে দিয়েছিলেন পুঁচকে একটা কার্ডে। আর এই লেখাটাই হল তার কাল। জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিল বড় ভয়ংকরভাবে।

সুরজলাল মানুষটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অনর্থক বাড়াবাড়ি করেন। ছোটখাটো চেহারা, ঝাঁকড়া চুল, চোখে সোনার রীমলেস চশমা। উনি একটা মেডিসিন্যাল পোর্ট মদ্য প্রস্তুত করেছিলেন। দাম খুবই কম রেখেছেন। গরিব-গেরস্তরা যাতে অসুখ-বিসুখ কাটিয়ে উঠে স্বচ্ছন্দে কিনে খেতে পারেন। ফাদার ঘনশ্যাম গরিবদের কাছে ভগবান সমান। তিনি যদি এই ওষধি-সুরা সামান্য চেখে দেখেন এবং তাঁর মতামত জানিয়ে দেন, তাহলে আখেরে গরিবদেরই উপকার হবে। এরপরেও একটু আম্বা দেখালেন সুরজলাল। কখন এবং কোথায় বসে সুরা চাখবেন ফাদার ঘনশ্যাম তা যদি দয়া করে সংলগ্ন কার্ডটায় লিখে দেন, তাহলে চিরঋণী থাকবেন মদমেকার সুরজলাল।

আম্বা শুনে অবাক হলেন না ফাদার ঘনশ্যাম। বিজ্ঞাপনদাতাদের উৎকট উন্মাদনা কত দিকে মোড় নিতে পারে, তা তাঁর অজানা ছিল না। তাই তিনি কার্ডে যৎসামান্য লিখে দিয়ে হাতের কাজে মন দিলেন। যে কাজ করলে তিনি আনন্দ পান। কিন্তু বাধা পেলেন আবার। এবার চিরকুট পাঠিয়ে কাজে বাগড়া দিলেন যিনি, তিনি বাজে লোক নন। পাঠিয়েছেন তাঁর পলিটিক্যাল শত্রু আলভারেজ। গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ের মিটমাট করতে চান তিনি। মিটিং হোক আজকেই রাতে—শহরের প্রাচীরের বাইরে একটা কফি হাউসে। ফাদার ঘনশ্যাম যদি রাজি থাকেন, এক লাইন লিখে বার্তাবাহকের হাতে যেন এখুনি পাঠিয়ে দেন। বার্তাবাহক লোকটা মার্কামারা দাঙ্গাবাজ টাইপের। যেমন চেহারা, তেমনি চাহনি। তাকে বিদেয় করার জন্য ঝটপট এক লাইনে সম্মতি জানিয়ে দিলেন ফাদার ঘনশ্যাম। তারপর দেখলেন, এখনও ঘণ্টাদেড়েক হাতের কাজ করা যাবে। সুতরাং তন্ময় হলেন সেই কাজে। ঘড়ি দেখে কাজ বন্ধ করলেন। কুতকুতে দুই চোখে কৌতুক ভাসিয়ে সুরজলালের পাঠানো অত্যাশ্চর্য ওষধি সুরার দিকে চেয়ে রইলেন, এক গেলাস পান করলেন এবং নিশার আঁধারে বেরিয়ে পড়লেন।

কড়া চাঁদের আলোয় ছোট্ট শহর ভেসে যাচ্ছে। ছবির মতো সুন্দর ফটকের ওপর বাঁকা খিলেনের দিকে চেয়ে রইলেন ফাদার। ফটকের ওদিকে রয়েছে আশ্চর্য বাহারি পাম গাছের ঝালর। ফোকাস মেরে যেন রঙ্গমঞ্চ সাজানো হয়েছে। খিলেনের অন্যদিকে ঝুলছে

পাম গাছের খাঁজকাটা একটা পাতা। চাঁদ রয়েছে তার পেছন দিকে। এদিক থেকে মনে হচ্ছে যেন কালো কুমিরের চোয়াল। স্রেফ এই কল্পনায় তিনি আকৃষ্ট হতেন না যদি না তাঁর সহজাত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে ফেলত আরও একটা ব্যাপার।। বাতাস কোথাও নেই, সবই নিথর। অথচ স্পষ্ট দেখলেন, ঝুলে থাকা পামগাছের পাতা একটু-একটু নড়ছে।

চারপাশ দেখলেন। উপলব্ধি করলেন, তিনি একা নন। ছাড়িয়ে এসেছেন শহরের শেষ বাড়ি। বেশিরভাগ বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। জানলার পাল্লাও অনেক বাড়িতে খোলা নেই। উনি হেঁটে চলেছেন দুটো দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে। এবড়োখেবড়ো আর বড়-বড় পাথর দিয়ে তৈরি। পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে গজিয়েছে গোছা-গোছা কাঁটা ঝোপ। দেওয়াল দুটো সমান্তরালভাবে প্রসারিত ফটকের দিকে। ফটকের ওদিকে কফি হাউসের আলো দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয় অনেক দূরে রয়েছে। ফটকের নিচে কী রয়েছে, তাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শুধু বোঝা যাচ্ছে, বড়-বড় পাথর দিয়ে মেঝে বাঁধাই করা হয়েছে। চাঁদের আলো ঠিকরে যাচ্ছে সেই পাথর থেকে। এখানে সেখানে রয়েছে এলোমেলো ন্যাশপাতি গাছ। দেখেই অশুভ সংকেতের ডংকা বাজল তাঁর মনের মধ্যে। অদ্ভুত একটা চাপ অনুভব করলেন। কিন্তু পা থামালেন না। একটুও থমকে দাঁড়ালেন না। সাহস তাঁর আছে। সাহসকে ছাড়িয়ে যায় তাঁর কৌতূহল। সারাজীবন কাটিয়েছেন সত্যের অন্বেষণে, ক্ষুধিত বুদ্ধিসত্তা দিয়ে মিথ্যের বিনাশ ঘটিয়েছেন। সত্যানুসন্ধান যত তুচ্ছ ব্যাপারেই হোক না, কৌতূহল চরিতার্থ করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাঁকে বিপদের দিকে টেনে নিয়ে যাবে জেনেও পেছিয়ে আসেননি। তবে মাত্রা ছাড়িয়ে যাতে না যায়, সেদিকে খরনজর রেখেছেন। নিজেকেও সেই অজুহাতে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছেন। এক্ষেত্রে তার অন্যথা ঘটল না। সোজা হেঁটে গেলেন পাম গাছের দিকে। গাছের ওপর থেকে লাফিয়ে এসে একটা লোক ছোরা মারল তাঁকে। একই সময়ে বানরের ক্ষিপ্রতায় পাঁচিলের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ধেয়ে এল একটা লোক। সে উঁচিয়ে রয়েছে একটা কাঠের মুগুর। ছোরা মারার সঙ্গে-সঙ্গে মুগুরও নেমে এল তাঁর মাথার ওপর। ফাদার ঘনশ্যাম একপাক ঘুরে গিয়ে টলে উঠলেন এবং মালভর্তি বস্তার মতো ধপ করে পাথরের মেঝেতে পড়ে গেলেন। পড়ে যখন যাচ্ছেন, তখন তাঁর মুখের পরতে-পরতে ফুটে উঠল মৃদু কিন্তু নিবিড় বিস্ময়বোধ।

নান্দুরাম ঠিক এই সময়ে জানলায় দাঁড়িয়েছিলেন। ভদ্রলোক ধর্মে খ্রিস্টান কিন্তু চার্চে যান না। তবে যে-কোনও কারণেই হোক সমীহ করেন ফাদার ঘনশ্যামকে। এই শহরেই তাঁর জন্ম। শিক্ষাদীক্ষা আমেরিকায়। পেশায় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। কাজ কারবারও করেন আমেরিকায়। পয়সাকড়ি আছে, নামযশ আছে, তাই আলাপ পরিচয় আছে সাংবাদিক ইন্দ্র, ব্যবসায়ী কিন্তু ধার্মিক রঞ্জুলাল আর নাস্তিক শিরোমণি আলভারেজের সঙ্গে। তিনি এক বিচিত্র চরিত্র। বৈচিত্র্য-পিয়াসী বলেই ফাদার ঘনশ্যামকে ভালোবাসেন।

এহেন মানুষটাকে কালো কুমড়োর মতো ছাতা বগলে জানলার সামনে দিয়ে এমন সময়ে হেঁটে যেতে দেখে তিনি অবাক হলেন। চাঁদের আলোয় চকচকে ওই টাক, ওইরকম বিচ্ছিরি আলখাল্লা আর ভাঙা ছাতা বগলে যাচ্ছেন কোথায় ফাদার?

চোখ ছিল তাঁর জানলার দিকে। তাই পরক্ষণেই দেখলেন আরও দুটো মনুষ্যাকৃতি হনহনিয়ে চলে গেল তাঁর জানলা পেরিয়ে। ঝাঁকড়া চুলো খর্বকায় মানুষটাকে এক ঝলকেই চেনা গেল—মদ্য প্রস্তুতকারক সুরজলাল। কিন্তু তার পাশে ঢ্যাঙা বৃষস্কন্ধ ও লোকটা কে?

হুমড়ি খেয়ে জানলায় পড়লেন নান্দুরাম। পেছন থেকে বৃষস্কন্ধ ব্যক্তিকে চিনতে

পারলেন। ডাক্তার যোশী। রঞ্জুলালের ব্লাডপ্রেসার দেখতে গেছিলেন যখন তখন আলাপ হয়েছিল নান্দুরামের সঙ্গে।

ঠিক এই সময়ে আর্ত চিৎকার শুনলেন ফটকের দিক থেকে। ধপ করে একটা আওয়াজ। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে অনেক লোকের চিৎকার। হট্টগোল।

নান্দুরাম বেগে নামলেন পথে। দৌড়লেন চন্দ্রালোকিত ফটকের দিকে। দেখলেন, ঠিক নিচেই লম্বমান কালো বস্তাবৃত একটা খুদে দেহ। ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। তিনি নড়ছেন না।

কফি হাউস থেকে দৌড়ে এসেছে অনেক লোক। এসেছেন স্বয়ং আলভারেজ। তিনি ফাদারের বডির কাছে কাউকে আসতে দিচ্ছেন না। এই মুহূর্তে তাঁর পরনে রয়েছে রক্তরাঙা সফরি স্যুট। মাথার লম্বা সোনালি চুলে চাঁদের আলো ঠিকরে দিচ্ছে সোনালি আভা। মাথায় তিনি কম করেও সাত ফুট। সেই অনুপাতে প্রস্থেও বিশাল। রাজ সেনাপতির মতো খানদানি বপু নিয়ে তিনি দু'দিকে দুহাত বিস্তার করে জনগণকে রুখে দিচ্ছেন। নিরক্ত মুখে পাশে দাঁড়িয়ে সুরজলাল। নান্দুরাম যখন হাঁফাতে-হাঁফাতে এসে পৌঁছলেন, তখন ফাদারের নাড়ি দেখা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে আখাম্বা চেহারার ডাক্তার যোশী বললেন একটাই কথা, 'ডেড।'

'সন্ত্রাসবাদীরা শেষ করে দিল একটা ভালো মানুষকে,'—উৎফুল্ল গলায় বললেন আলভারেজ, 'আমি কিন্তু মারিনি, লোক দিয়েও মারাইনি। যদি সেরকম লোক ধরা পড়ে, এই মুহূর্তে তাকে লটকে দেব এই গাছে।'

নান্দুরাম বললেন, 'আপনি কোথায় ছিলেন?'

'কফি হাউসে। ফাদারের জন্য বসেছিলাম। গোপন মিটিং ছিল জরুরি বিষয়ে।' সুরজলাল আর ডাক্তারকে দেখিয়ে বললেন, 'এঁরাও যাচ্ছিলেন মিটিং-এ।'

গাছের ছায়া থেকে ফ্যাকাশে মুখে বেরিয়ে এলেন সাংবাদিক ইন্দ্র, 'সর্বনাশ হয়ে গেল। গোটা পৃথিবীর ক্ষতি হয়ে গেল। ফাদার ঘনশ্যাম ইজ ডেড।'

রঞ্জুলাল এলেন দৌড়তে-দৌড়তে। তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে, বললেন ডাক্তারকে, 'সিওর ডেথ?'

'হানড্রেড পারসেন্ট।'

'তাহলে ফাদারের ডেডবডি সরিয়ে নেওয়া হোক।'

টলতে-টলতে বাড়ি ফিরে এলেন নান্দুরাম। ঝিম মেরে বসে রইলেন ঘরে। ফাদারের সঙ্গে তাঁর দোস্তি তেমন প্রগাঢ় না থাকলেও লোকটার বোকা বোকা চেহারা আর ভালো-ভালো কাজগুলো তাঁর ভালো লাগত। এমন একটা মানুষকে খতম করে দিয়ে গেল চণ্ডালরা। ঘরে বসেই শুনলেন, রাত ভোর হওয়ার আগেই কবরস্থ হবেন ফাদার ঘনশ্যাম। খবরটা দিয়ে গেলেন সাংবাদিক ইন্দ্র। কারণ, ভয়ানক দাঙ্গা লাগবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ঝটপট ডেডবডি মাটির নিচে চালান করে দিতে হবে। মিশন-হাউসে লোক জড়ো হচ্ছে।

আলো ফোটার আগেই কফিনে শোয়ানো হল ফাদারকে। তাঁর মুখের বিস্ময় বোধ প্রকৃতই রহস্যবহ। আততায়ীদের অন্য কেউ না জানলেও, ফাদার ঘনশ্যাম নিশ্চয় চিনতে পেরেছিলেন। তাই অত অবাক হয়েছিলেন। আলভারেজ কিন্তু কফিনের কাছেই দাঁড়িয়ে গলাবাজি করে গেলেন সমানে। এ খুন তিনি করেননি। তাঁর দলের কেউ করেনি। খুনিকে পাওয়া গেলে তিনি নিজের হাতে তাঁকে ফাঁসিতে লটকাবেন।

মিশন-হাউসের মস্ত ক্রসের তলায় রাখা হয়েছে কফিন। একটু উঁচু জমিতে, তিনদিকে সবুজ ঝোপ, সামনের দিকে কিছু নেই, তাই রাস্তা থেকে দেখা যাচ্ছে কফিন। কাতারে-কাতারে লোক দাঁড়িয়ে গেছে রাস্তায়। তাদের চোখ ছলছল করছে। পিতৃহারা হওয়ার শোকে আচ্ছন্ন প্রত্যেকেই। একদম বোবা। কোথাও নেই কোনও শব্দ। এমনকী আলভারেজও আর তড়পাচ্ছেন না।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কাজ শুরু হতে যাচ্ছে, আর সময় নেই দেখে রঞ্জুলাল আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। টাইট গোল শরীরের গলা দিয়ে যতখানি আওয়াজ বের করা সম্ভব, ততখানি আওয়াজ ছেড়ে বললেন—'কে খুন করেছে ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডলকে? তাঁকে দুচক্ষে দেখতে পারত না যে লোকটা—খুন করেছে সে।'

আর যায় কোথা। এতক্ষণ যে আম জনতা গলা বুজিয়ে ছিল, অট্টরোলে ফেটে পড়ল তারা। তাদের ক্রোধারুণ চোখ ঝলসে ফেলছে একজনকেই—আলভারেজকে।

বীর-শরীরী আলভারেজ যেন এইরকম একটা মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। নিমেষে তাঁর চেহারা গেল পালটে। আফ্রিকার অরণ্যের জঘন্য জিঘাংসা আশ্রয় করল তাঁর সমস্ত মুখাবয়ব। রক্তলাল পরিচ্ছদের মতনই লাল টকটকে হয়ে উঠল দুই চক্ষু। সাত ফুট লম্বা শরীরটা ফুলে যে ডবল হয়ে গেল এবং মনে হল, আদিম বর্বরতা যদি কোথাও থাকে, তবে তা এখানে, এই দেহে।

গলা চিরে বেরিয়ে এল নারকীয় হুঙ্কার—'খবরদার। ফাদারকে খুন করেছে খোদ ভগবান। যদি বিশ্বাস থাকে ভগবানে। কিস্‌সু নেই। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান-টগবান কেউ নেই। থাকলে মরতে হত না নিরীহ মানুষটাকে।'

ওই একটা বক্তৃতাই যথেষ্ট। তৎক্ষণাৎ জনগণের অট্টনিনাদ হল স্তব্ধ। এইবার নিশ্চয় শোনা যাবে গুলিগোলার আওয়াজ। কিন্তু তা হল না।

নৈঃশব্দ্য খান-খান করে দিয়ে বিষম বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন সাংবাদিক ইন্দ্র, 'ফাদার নড়ছেন।'

বাতাস পর্যন্ত বুঝি থেমে গেল এই কথায়। নিথর হল গাছের পাতা।

কফিনের ওপর ঝুঁকে পড়েছেন ডাক্তার যোশী। দেখলেন, ফাদারের মুখ পাশ ফিরেছে।

তারপরেই নান্দুরাম দেখলেন, ফাদার চোখ পিটপিট করছেন। গুঙিয়ে উঠছেন। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসে কুতকুতে চোখে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছেন ডাক্তার যোশীর দিকে।

জীবনে অনেক ইলেকট্রিক্যাল মির‍্যাকল দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন নান্দুরাম, কিন্তু এই মির‍্যাকল কখনও দেখেননি। কোনও বিজ্ঞানের ক্ষমতা নেই এরকম মির‍্যাকল দেখায়। অসম্ভবকে প্রত্যক্ষ করা কাকে বলে, সেই প্রথম তিনি জানলেন। হাজার বছরেও যা দেখা যায় না, তা দেখবার জন্য আধঘণ্টার মধ্যে ভেঙে পড়ল গোটা শহরের মানুষ। ঈশ্বরকে সশরীরে ধরায় অবতীর্ণ হওয়া বুঝি একেই বলে। হাজার-হাজার লোক উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সামনের রাস্তায়। এমন অলৌকিক ঘটনা কে কবে দেখেছে? এমনকী আলভারেজের মতো পাষাণ হৃদয় মানুষেরও মাথা ঘুরে গেল। দু-হাতে রগ টিপে ধরে তিনি ঘাসের ওপর বসে পড়লেন।

স্বর্গসুখের এহেন টর্নাডোর মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা খর্বকায় ব্যক্তিটার কোনও কথাই শোনা গেল না। একে তো তিনি চেঁচিয়ে কথা বলতে পারেন না, তার ওপর মরে বেঁচে

ওঠার ধকলে তাঁর কণ্ঠস্বর ক্ষীণতর হয়েছে। হট্টগোলও কর্ণবধিরকারী। তাঁর দুর্বল অঙ্গভঙ্গি দেখে শুধু বোঝা যাচ্ছে, তুমুল এই হর্ষ তাঁর চিত্তে বিলক্ষণ বিরক্তি উৎপাদন করছে। জনতার সামনে উঁচু জমিতে এসে দুহাত নেড়ে উত্তাল জনগণকে শান্ত করবার বৃথা চেষ্টা করে চলেছেন—হাত নাড়া দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা পেঙ্গুইন পাখনা ঝাপটাচ্ছে। উদ্দামতা একটু স্তিমিত হতেই গলা চড়িয়ে, তাঁর পক্ষে যতখানি রাগ দেখানো সম্ভব, ততখানি রাগ দেখালেন, 'আঃ! কী হচ্ছে!'

পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়ালেন সাংবাদিক ইন্দ্রর দিকে। বললেন, 'এখুনি এই মুহূর্তে ফ্যাক্স করে গোটা পৃথিবীতে আসল খবরটা ছড়িয়ে দিন।'

'মির্যাকল?' মিনমিন করে বুঝি জীবনে এই প্রথম কথা বললেন সাংবাদিক ইন্দ্র।

'না, না, না। ঠিক উলটো। এখানে কোনও মির্যাকল ঘটেনি। আমি মির্যাকল ঘটাতে পারি না।'

ঢোক গিললেন সাংবাদিক ইন্দ্র। অধোবদনে নেমে গেলেন ফ্যাক্স মেশিনের সন্ধানে।

নান্দুরাম বললেন, 'ফাদার, আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

কুতকুতে চোখে তাকিয়ে গোলমুখে বোকা-বোকা ভাব ফুটিয়ে বললেন ফাদার ঘনশ্যাম, 'কী কথা?'

'কৌতূহল।'

'চলুন।'

ওঁরা এখন বসে আছেন গির্জের আচার্যর ঘরে। কাগজপত্র যেভাবে গতকাল ছড়িয়ে গেছিলেন ফাদার, রয়েছে সেইভাবেই। পাশেই ওষধি সুরার বোতল এবং শূন্য গেলাস।

গম্ভীর বদনে বললেন ফাদার, 'কীসের কৌতূহল?'

নান্দুরাম বললেন, 'মরে বেঁচে উঠলেন কীভাবে?'

ফাদার বললেন, 'জীবনে বেশ কিছু মার্ডার কেসের সমাধান ঘটিয়েছি। এবার তদন্ত হবে আমার নিজের মার্ডারের।'

নান্দুরাম বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, বোতল থেকে ঢেলে একটু মদ খাব?'

উঠে দাঁড়ালেন ফাদার ঘনশ্যাম। গেলাসে সুরা ঢাললেন। গেলাস চোখের সামনে এনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর গেলাস নামিয়ে রেখে ফের চেয়ারে বসলেন।

বললেন, 'মরার সময়ে আমি কী অনুভব করছিলাম জানেন? শুনলে বিশ্বাস করবেন না। বিস্ময়—সীমাহীন বিস্ময়বোধে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম।'

'মাথায় চোট পাওয়ায়?'

ঝুঁকে পড়লেন ফাদার। বললেন খাটো গলায়, 'মাথায় চোট না পাওয়ার জন্যই অবাক হয়েছিলাম।'

চেয়ে রইলেন নান্দুরাম। ভাবলেন, চোট-টা নিশ্চয় তেমন জোরদার হয়নি। বললেন, 'কী বলতে চান?'

'বলতে চাই যে, লোকটা অত জোরে মুগুর নামিয়ে আনল মাথা টিপ করে, কিন্তু মুগুর থেমে গেল মাথার কাছে এসে—খুলিতে ছোঁয়া পর্যন্ত লাগল না। একইভাবে আর একজন ছোরা মারল বটে, কিন্তু ছোরার ডগা আমার গা স্পর্শ করল না। ঠিক যেন খেলার ছলে খুনজখম করা। হ্যাঁ, ঠিক তাই। অসাধারণ ব্যাপারটা ঘটল ঠিক তার পরেই।'

চিন্তাবিষ্ট চোখে টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্রের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফের

মুখ খুললেন ফাদার, 'মুগুরের চোট, ছোরার কোপ—কোনওটাই গায়ে লাগল না। অথচ টের পেলাম আমার হাঁটু ভেঙে যাচ্ছে, প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। চোট খেয়েই প্রাণটা বেরিয়ে যাচ্ছে, তা বুঝলাম। তবে সেটা মুগুর বা ছোরা নয়। কোনও অস্ত্র নয়, জানেন কী?'

এই বলে দেখালেন টেবিলে রাখা মদ।

মদের বোতল তুলে নিলেন নান্দুরাম। গন্ধ শুঁকলেন।

বললেন, 'মনে হচ্ছে আপনি ধরেছেন ঠিক। ড্রাগিস্ট-এর কাজ করেছিলাম আমেরিকায় বছর-খানেক। কেমিস্ট্রি পড়েছিলাম। অ্যানালিসিস না করে সঠিক বলতে পারব না, শুধু বলব, অস্বাভাবিক কোনও উপাদান রয়েছে এই মদের মধ্যে। আফ্রিকার জঙ্গলের মানুষরা একরকম আরকের খবর রাখে, যা মৃত্যুর মতো সাময়িক নিদ্রা এনে দেয়।'

শান্ত গলায় বললেন ফাদার, 'কারেক্ট। যে কোনও কারণেই হোক, একটা মির্যাকল ঘটানো হয়েছে। যা বিলকুল ধাপ্পাবাজি। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার দৃশ্য নাটক ছাড়া কিছু নয়। ঘড়ি ধরে কাজ করা হয়েছে। সাংবাদিক ইন্দ্র পাবলিসিটির বাহবা পেতে-পেতে মাথা খারাপ করে ফেলেছেন বলেই মনে হয় আমার। তবে শুধু এই কারণে এতদূর উনি যেতে পারবেন বলে মনে হয় না আমার। একবার আমাকে জাল শার্লক হোমস হিসাবে ওয়ার্ল্ড পাবলিসিটি দিয়েছেন। আবার—'

বলেই থেমে গেলেন। যেন দম আটকে এল। টলতে টলতে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

ব্যাকুল গলায় বললেন নান্দুরাম, 'যাচ্ছেন কোথায়?'

'প্রার্থনা করতে।'

'হঠাৎ এই সময়ে?'

'সমাধানটা ঈশ্বর আমার মাথায় খেলিয়ে দিলেন বলে। যাই—'

'দাঁড়ান। সমাধানটা কী?'

'ওই যে বলছিলাম, জাল শার্লক হোমসের কথা। শার্লক হোমস আর সাংবাদিক ইন্দ্র—এই নাম দুটো পাশাপাশি মাথায় আসতেই পরমপিতা সত্যের ঝলক ঘটালেন মগজের মধ্যে। উঃ। কী বোকা আমি।'

'বলুন। আমাকে বলে যান।'

'আমাকে শার্লক হোমসের কায়দায় মরিয়ে বাঁচিয়ে তোলার গল্পের কথা মনে পড়ছে? আইডিয়াটা সাংবাদিক ইন্দ্র মাথায় এনেছিলেন তখনই। মরে বেঁচে উঠব আমি শার্লক হোমসের মতো। আরক মিশোনো মদ খাওয়ানো হয়েছিল ঘড়ি ধরে—মড়ার বেঁচে ওঠার সময়ও নির্ধারণ করা হয়েছিল ঘড়ি ধরে। কী বুঝলেন?'

মাথা নাড়তে-নাড়তে নান্দুরাম বললেন, 'হ্যাঁ, এবার বুঝছি।'

'মির্যাকলের খবর বোমা ফাটাত গোটা দুনিয়ায়। তারপরেই মির্যাকল-এর জালিয়াতি ধরিয়ে দেওয়া হত। প্রমাণ করে ছাড়ত, ষড়যন্ত্রে রয়েছি খোদ আমি—ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। আর-এক দফা পাবলিসিটি অভিযানে জগৎ ছেয়ে যেত—খ্যাতির মধ্যগগনে পৌঁছে যেতেন সাংবাদিক ইন্দ্র।'

সোজা চোখে তাকালেন নান্দুরাম, 'আর ক'টা নরপশু আছে এই ষড়যন্ত্রে?'

'আলভারেজ তো বটেই, ভুয়ো মির্যাকল প্রমাণ করতে পারলে তাঁর পোয়াবারো।'

'আর?'

'রঞ্জুলাল। ওঁর ভাঁড়ামি আর ভণ্ডামি অনেক আগেই আঁচ করেছিলাম। ওঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের কাঁটা ছিলাম আমি।'

'এতগুলো বাজে লোকের সঙ্গে এখানে থাকতে চান? চলুন আমার সঙ্গে আমেরিকায়।'

তৎক্ষণাৎ মদের বোতলের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন ফাদার ঘনশ্যাম, 'তাহলে এক গেলাস খাই?'

(বিদেশি ছায়ায়)

* *'স্বস্তিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত (পূজা সংখ্যা, ১৪০৩)*

সবুজ মানুষ

একমনে নিজের সঙ্গে গলফ খেলা প্র্যাকটিশ করে চলেছে এক যুবক সমুদ্রের ধারে বালুকা সৈকতের ওপর। গোধূলির ধূসর রঙের ছোঁয়া লেগেছে সমুদ্রে। কোনও স্ট্রোকের মধ্যেই হেলাফেলা নেই, আছে একাগ্র নিষ্ঠা, আণুবীক্ষণিক প্রচণ্ডতা। যেন নিখুঁত খুদে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হচ্ছে এক-একটা স্ট্রোক মারার সঙ্গে-সঙ্গে। চটপট অনেক খেলাই সে রপ্ত করেছে এই জীবনে; কিন্তু চটপট খেলা রপ্ত করে নেওয়ার প্রবণতা আছে বলেই যেসব খেলা চটপট শেখা যায় না, সেসবও রপ্ত করেছে খুবই তাড়াতাড়ি। অ্যাডভেঞ্চার জিনিসটাকে সে ভালোবাসে, অ্যাডভেঞ্চার-ঠাসা পরিবেশে থাকতে পারলে আর কিছুই চায় না। বর্তমানে সে স্যার প্রদ্যুম্ন মল্লিকের প্রাইভেট সেক্রেটারি। বালুকা-সৈকতের ঠিক পাশেই এই যে বিরাট উদ্যান, তার ঠিক পেছনেই স্যার প্রদ্যুম্নর বিশাল ইমারত। উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে বলেই অনন্তকাল কারো প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়ে থাকার অভিপ্রায় নেই যুবকটির। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানও আছে সেই সঙ্গে; তাই সে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বুঝেছে সেক্রেটারি জীবনটায় ছেদ টেনে দেওয়ার শ্রেষ্ঠ পন্থা হল, নিষ্ঠার সঙ্গে সেক্রেটারিগিরি করে উত্তম সেক্রেটারিরূপে স্বীকৃতি পাওয়া। কার্যত সে তাই বটে। অতি উত্তম সেক্রেটারি। গলফ বলটিকে যেরকম ক্ষিপ্রতা সহকারে নিয়ে ফেলছে একদিক থেকে আর একদিকে, হুবহু সেই ক্ষিপ্রতা দিয়ে একাই জবাব দিয়ে যাচ্ছে স্যার প্রদ্যুম্নর নিত্য জমে যাওয়া চিঠির তাড়ার। চিঠির জবাব নিজের মর্জিমাফিক একাই দিয়ে যেতে হচ্ছে বর্তমানে। বলতে গেলে, একাই লড়ে যাচ্ছে পত্রবাহিনীর সঙ্গে। কারণ স্যার প্রদ্যুম্ন তাঁর বিলাস-তরণী নিয়ে জলে ভেসেছেন ছ'মাস আগে। ফেরার সময় হয়েছে—ফিরেও আসছেন—কিন্তু বেশ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে সম্ভাবনা নেই।—কয়েক ঘণ্টা কেন, কয়েক দিনও কেটে যেতে পারে। তারপর হয়ত ফিরবেন।

যুবকটির নাম বিপুল ব্যানার্জি। খেলোয়াড়ি পদক্ষেপে বালুকা সৈকতের গা-ঘেঁষে ঘাসজমিটুকু পেরিয়ে এসে দৃষ্টিচালনা করল সমুদ্রের দিকে। দেখল একটা অদ্ভুত দৃশ্য। সুস্পষ্ট দেখতে পেল না অবশ্য। ঝোড়ো মেঘের আড়ালে গোধূলির আলো মিলিয়ে যাচ্ছে একটু-

একটু করে—ঘনীভূত হচ্ছে তমিস্রা। কিন্তু পলকের জন্যে মনে হল যেন ইতিহাস-আশ্রিত একটি নাটক, অথবা একটা ভৌতিক নাটক স্বপ্নাকারে অভিনীত হয়ে চলেছে অদূরে—মুহূর্তের মরীচিকার মতো যেন বহু যুগের ওপার থেকে ভেসে এসেছে একটা দৃশ্য।

সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি তাম্রবর্ণ এবং সুবর্ণবর্ণ সুদীর্ঘ রেখাপাত করেছে কালচে সমুদ্রের ওপর। নীল সমুদ্র আর নীল নেই—কৃষ্ণবর্ণ হয়ে এসেছে এর মধ্যেই—অন্ধকারের এই পটভূমিকায় দেখা যাচ্ছে আরও অন্ধকারময় দুটি মূর্তিকে। যেন ঐতিহাসিক নাটকের দুটি চরিত্র। যেন মূকাভিনয় চলছে ঘনিয়ে আসা আঁধারের বুকে। একজনের মাথায় উষ্ণীষ—আরেকজনের কোমরে তরবারি। যাত্রাদলের দুটি চরিত্র যেন সহসা নেমে এসেছে ছায়াময় দেহ নিয়ে দারুময় কোনও জাহাজের মধ্যে থেকে।

মরীচিকা দর্শনের প্রবণতা নেই বিপুল ব্যানার্জির। ছায়াদৃশ্যও মরীচিকাসম নয় মোটেই। যুক্তিবুদ্ধি বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা নিয়ে যে-কোনও পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে নেওয়ার ক্ষমতা তার আছে। অতীত অথবা ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে যে-কোনও দৃশ্যই ভেলকির মতো সহসা আবির্ভূত হলে মন দিয়ে যাচাই করে নিতে সে পারে। তাই বিচিত্র এই মূকাভিনয় দেখে মুহূর্তের মধ্যে উপনীত হল যে সিদ্ধান্তে—দুঁদে ভবিষ্যদ্বক্তাও অত তাড়াতাড়ি সে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারত কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে বিলক্ষণ।

চক্ষুভ্রম কেটে যায় মুহূর্তের মধ্যে। পরমুহূর্তেই চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে বিপুল ব্যানার্জি যা দেখল তা অস্বাভাবিক হতে পারে, অবিশ্বাস্য নয় মোটেই। একটি মূর্তি রয়েছে আরেকটি মূর্তির পেছনে—প্রায় পনেরো গজ পেছনে। দুজনকেই দেখে মনে হচ্ছে যেন—রাজবেশ আর সেনাপতির বেশ পরে নেমে এসেছে দুটি মানুষ সমুদ্র অভিযান সাঙ্গ করে। ঝলমলে পোশাকের জরি আর ঝালর, উষ্ণীষের মণি আর তরবারির সুদৃশ্য কোষ দূর থেকেও আর ততটা অস্পষ্ট মনে হচ্ছে না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এহেন বেশ পরে যাত্রাদলে অভিনয় চলে, মঞ্চে বীরদর্পে হাঁটা যায়, নিরালা সমুদ্রতীরে কেউ এভাবে হাওয়া খেতে আসে না। সামনের মূর্তিটি হনহন করে হাঁটছে, আপনমনে, খেয়ালই নেই যে পেছনে আসছে আর একজন। প্রথম ব্যক্তির খাড়া নাক আর ছুঁচলো দাড়ি দেখেই কিন্তু চিনতে পেরেছে বিপুল ব্যানার্জি। স্যার প্রদ্যুম্ন মল্লিক—তার মনিব। পেছন-পেছন যে আসছে, তাকে সে চেনে না। কিন্তু যাত্রা-পার্টির অভিনেতাদের মতো এই যে কুচকাওয়াজ, এর অর্থ অস্পষ্ট নয় তার কাছে। স্যার প্রদ্যুম্ন যাত্রা-পাগল মানুষ। বছরের বেশির ভাগ সময় নিজস্ব বজরায় যাত্রার সরঞ্জাম আর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যাত্রা দেখিয়ে বেড়ান এমন-এমন জায়গায়, যেখানে শহরের কোনও যাত্রা-পার্টির পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় কোনওমতেই। যাত্রাই তাঁর প্রাণ, যাত্রাই তাঁর জীবন। সখের পার্টি নিয়ে জলবেষ্টিত বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে গিয়ে প্রমোদ বিতরণ করে যতটা আনন্দ দেন, তার শতগুণ আনন্দ পান নিজে। সেই বজরা যে ফেরার পথে, এ খবর রাখে বিপুল ব্যানার্জি। ছ-মাস পরে বাড়ি ফিরছেন স্যার প্রদ্যুম্ন। বজরা রেখে এসেছেন নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও। পরনে তাই যাত্রার রাজবেশ। কিন্তু বজরা থেকে রাজবেশ পরে তিনি নেমে এলেন কেন, এই রহস্যটা রহস্যই রয়ে গেল বিপুল ব্যানার্জির মস্তিষ্কে। মিনিট পাঁচেক তো লাগত ধড়াচূড়া পালটাতে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হলেই পারতেন। রহস্যটা তাই জটিল ধাঁধার আবর্ত রচনা করে গেল সেক্রেটারি মশায়ের মগজের কোষে-কোষে। স্যার প্রদ্যুম্নর অভ্যেস সে জানে। কোথায় কী ধরনের পোশাক পরতে হয়, কখন কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে

হয়—স্যার অন্তত তা ভালো করেই জানেন। রহস্যটা তাই বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে জবর রহস্য থেকে গেছিল রহস্যময় এই ব্যাপারের সবচেয়ে বড় রহস্যের আকারে। ধূসর গোধূলি, ঘনায়মান আঁধার আর চলমান ওই দুটি নিঃশব্দ মূর্তি যেন যাত্রা-পার্টিরই একটি নাটকের অংশবিশেষ।

প্রথম ব্যক্তির চেয়েও অনেক বেশি অসাধারণ দ্বিতীয় ব্যক্তি। পরনে যদিও সেনাপতির পরিচ্ছদ—কিন্তু চেহারা অতি অসাধারণ, তার চেয়েও অসাধারণ তার আচরণ। হাঁটছে অদ্ভুতরকম এলোমেলোভাবে—অস্বস্তি যেন ঠিকরে-ঠিকরে পড়ছে প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালনে। কখনও হাঁটছে দ্রুতচরণে, কখনও মন্থর গতিতে। স্যার প্রদ্যুম্নর নাগাল ধরে ফেলা উচিত হবে কিনা, যেন ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছে না কিছুতেই। স্যার প্রদ্যুম্ন কানে কম শোনেন বলেই বোধ হয় পেছনে বালির ওপর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না। যদি শুনতে পেতেন এবং যদি ডিটেকটিভগিরি জানতেন, তাহলে শুধু পদশব্দ শ্রবণ করেই আঁচ করে নিতে পারতেন পায়ের মালিক কখনও খুঁড়োচ্ছে, কখনও নাচছে, এবং এই দুইয়ের মাঝখানে আরও প্রায় বিশ রকমের ভঙ্গিমায় পেছন-পেছন আসছে। লোকটার মুখ আঁধারে ভালো করে দেখা না গেলেও চকিত চাহনির ঝলক দেখতে পাচ্ছে বিপুল ব্যানার্জি—নিরতিশয় উত্তেজনা যেন অদৃশ্য রশ্মি আকারে বিচ্ছুরিত হচ্ছে মুহুর্মুহু চঞ্চল দুই অক্ষিতারকা থেকে। একবার সে পাঁইপাঁই করে দৌড়তে গিয়েও সামলে নিল পরক্ষণেই—মন্থরচরণে পা ফেলে গেল অন্যমনস্কভাবে। তারপরেই যে কাণ্ডটি করে বসল, তা কোনও যাত্রাদলের অভিনেতার কাছে অন্তত আশা করেনি বিপুল ব্যানার্জি—বিশেষ করে নিরালা এই সমুদ্রসৈকতে।

লোকটা খাপ থেকে টেনে বার করল তরবারি!

নাটকের এই নাটকীয় মুহূর্তে ক্লাইম্যাক্স যখন ফেটে পড়তে চলেছে, ঠিক তখনি চলমান মূর্তিদুটি অন্তর্হিত হল সৈকতভূমির একটা টিলার আড়ালে। ক্ষণেকের জন্যে বিস্ফারিত চক্ষু সেক্রেটারি শুধু দেখলে অবহেলাভরে বেগে তরবারি চালনা করে একটা সামুদ্রিক উদ্ভিদের শিরশ্ছেদ করল বিচিত্রবেশী আগন্তুক। ভাবসাব দেখে মনে হল যেন প্রথম ব্যক্তিটিকে কচুকাটা করতে পারার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় বিষম আক্রোশে ঝাল ঝাড়ল নিরীহ উদ্ভিদটার ওপরেই।

কিন্তু ভয়ানক চিন্তাকুটিল হয়ে উঠল মিস্টার বিপুল ব্যানার্জির বদনমণ্ডল। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সৈকতভূমিতে ঘনায়মান চিন্তার মেঘে আচ্ছন্ন দুই চোখ মেলে।

তারপর গম্ভীরবদনে মন্থরচরণে অগ্রসর হল রাস্তার দিকে। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে রাস্তা বেঁকে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত—স্যার প্রদ্যুম্নর বিশাল প্রাসাদের পাশ দিয়ে গেছে এই সড়ক আরও কিছু দূরে।

সমুদ্রতীর থেকে প্রাসাদে পৌঁছতে গেলে স্যার প্রদ্যুম্নকে আসতে হবে এইপথ ধরেই। দূর থেকে সেক্রেটারি তাঁর হাঁটার ধরন দেখে আন্দাজে তাই রওনা হল সেইদিকেই। নিশ্চয় বাড়ির দিকেই চলেছেন স্যার প্রদ্যুম্ন। অচিরে আবির্ভূত হবেন বাঁকা সড়কে। পথটির প্রথম অংশ বালিতে ঢাকা—যেহেতু সৈকত বরাবর গিয়েছে। তারপর বালি শক্ত হয়েছে আরও কিছুদূর এগিয়ে—অনতিদূরে দেখা যাচ্ছে মল্লিকভবন। প্রথমে মন্থরচরণে, তারপর দ্রুত পদক্ষেপে, অবশেষে নক্ষত্রবেগে নিরেট বালি দিয়ে তৈরি এই পথের দিকেই ধেয়ে গেল

বিপুল ব্যানার্জি। গড়িমসি করা তার ধাতে নেই, সবকিছুই করে তড়িঘড়ি—সফল জীবনের মন্ত্রগুপ্তি তো সেইটাই।

কিন্তু একী! বাড়ি ফেরার পথ ধরে স্যার প্রদ্যুম্নকে তো বাড়ি ফিরতে দেখা গেল না। কোথায় গেলেন তিনি?

তার চাইতেও আশ্চর্য ব্যাপারটা দেখা গেল কিন্তু এর পরেই।

বাড়ি অভিমুখে রওনা হল না বিপুল ব্যানার্জিও।

গেল কোথায়, তা জানে শুধু বিপুল ব্যানার্জিই। বাড়ি ফিরেছিল ঠিকই—বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে। বিপুল রহস্য এবং ভয়ানক উত্তেজনার সঞ্চার ঘটিয়ে বসিয়েছিল মল্লিকভবনের প্রতিটি প্রাণীর অন্তরে দীর্ঘ অনুপস্থিতির দরুন।

বিরাট-বিরাট থাম আর পামবৃক্ষ সুশোভিত প্রাসাদে অধীর হয়ে উঠেছিল প্রত্যেকেই। এত দেরি হচ্ছে কেন? সাগ্রহ প্রতীক্ষার পরিশেষে উপস্থিত হল নিদারুণ অস্বস্তি। সবচেয়ে বেশি ছটফট করতে দেখা গেল খাসভৃত্য কদমচাঁদকে। বিপুলকায় এই জীবটি স্বভাবে অতিশয় শান্ত, অস্থিরতা বস্তুটা ধাতে নেই মোটেই। কথা বলে খুব কম—অস্বাভাবিক নীরবতাই তার চরিত্রের বৃহত্তম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এহেন শান্তশিষ্ট নিশ্চুপ প্রকৃতির জীবটিই মুর্হুমুহু গবাক্ষপথে দৃষ্টিচালনা করতে থাকে সমুদ্রসৈকতের ওপর দীর্ঘ বাঁকা সাদা পথটির দিকে—সবেগে পাদচারণা করতে থাকে সামনের বড় হলঘরটিতে।

স্যার প্রদ্যুম্নর প্রাণপ্রিয় ভগ্নী প্রমীলার চিত্তও চঞ্চল হয়েছে বিলক্ষণ। খেয়ালি ভাই যাত্রা নিয়ে ব্যস্ত থাকে বারোমাস। এত বড় বাড়ি আর সংসারের যাবতীয় ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় তাকেই। নামটা তার প্রমীলা—আকৃতিতেও রাবণপুত্র মেঘনাদের পত্নী প্রমীলার মতোই। বিবাহ নামক শুভকার্যটি ললাটে লেখা ছিল না সেই কারণেই। ভাইয়ের মতই তার নাসিকা প্রত্যঙ্গটি অবিকল খাঁড়ার মতোই শাণিত এবং কোপ মারার ভঙ্গিমায় উদ্যত। শুধু এই খাঁড়া নাকের মহিমাতেই জবরদস্ত এই মহিলাটিকে ভয় পায় এ তল্লাটের কাক-চিল পর্যন্ত। এই পৃথিবীর সব্বাই জানে, মেয়েরা জিহ্বা চালনায় এবং অবিরল কথা বলে যাওয়ায় টেক্কা মারতে পারে যে-কোনও বচনবাগীশ পুরুষকে। প্রমীলা হার মানিয়ে দেয় দুনিয়ার সব মেয়েছেলেকে। মুখে কথার তুবড়ি ফোটে অনর্গল—বিরাম নেই এক মুহূর্তের জন্যেও। ঘ্যানোর-ঘ্যানোর করা নয় কিন্তু। কানের পোকা বার করে দেওয়ার মতো আতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর মাঝে-মধ্যে যখন কাকাতুয়ার তীব্র ডাকের মতো প্রচণ্ড হয়ে ওঠে, তখন কাক-চিল পর্যন্ত উড়ে পালায় মল্লিকবাড়ির ত্রিসীমানা ছেড়ে।

স্যার প্রদ্যুম্নর প্রাণাধিকা কন্যা অলিম্পিয়া কিন্তু একেবারেই বিপরীত প্রকৃতির। পিসির মতো ডাকসাইটে তো নয়ই, আকৃতিতেও মেঘনাদ-পত্নীর মতো নয়। রঙটা একটু ময়লা বটে, কিন্তু আয়ত দুই চোখে অষ্টপ্রহর স্বপ্ন যেন লেগেই আছে। চেঁচিয়েমেচিয়ে পিসি বাড়ি মাতিয়ে রাখে বলেই বোধ হয় তার আর চেঁচানো তো দূরের কথা, টুঁ শব্দটিও করার দরকার হয় না। চোখেমুখে মাখানো অদ্ভুত বিষাদ। কেন, তা জানা নেই এই কাহিনিকারের। এহেন ভাইঝির সঙ্গে তাই একাই তড়বড় করে কথা বলে যেতে হয় খান্ডারনি পিসিকে এবং বিন্দুমাত্র অনিচ্ছা প্রকাশ পায় না অনর্গল কথা বলার সময়ে। কানে তো আর তুলো গুঁজে রাখা যায় না, তাই চুপচাপ সব শুনে যায় অলিম্পিয়া। মাঝে-মাঝে কিন্তু এমন প্রাণখোলা হাসি হেসে ওঠে, যা শুনলে এবং দেখলে থমকে যায় উড়ন্ত কাক-চিলও। হাসিটি বড় মিষ্টি, বড়

সুরেলা, বড় ঝঙ্কারময়। অলিম্পিয়ার ভেতরটা যে সঙ্গীতময় এবং প্রাণময়—তার প্রকাশ ঘটে চকিতের জন্যে অপূর্ব ওই হাস্যধ্বনির মধ্যে।

আড়িপাতা যাক এবার পিসি-ভাইঝির কথোপকথনে।

পিসি বলছে, 'এতক্ষণে তো এসে যাওয়া উচিত ছিল দুজনের।'

ভাইঝি উদাস চোখে তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে।

খরখরে চোখে সেদিকে (মানে যুগপৎ ভাইঝি এবং সমুদ্রের দিকে) তাকিয়ে নিয়ে পিসি বললে, 'চিঠি দিতে এসে পিয়ন কিন্তু দিব্যি গেলে বললে, 'দাদাকে আসতে দেখেছে সমুদ্রের তীর বেয়ে। পেছনে ছিল সেই ভয়ানক জীবটা—'

'ভয়ানক জীব?' চোখ না ফিরিয়েই বলে অলিম্পিয়া।

'পীতাম্বর! পীতাম্বর! কেন যে সবাই ওকে সেনাপতি পীতাম্বর বলে, ভেবে পাই না।'

ক্ষণেকের জন্যে অলিম্পিয়ার বিষাদ-কালো দুই চোখে কৌতুকের বিদ্যুৎ খেলে যায়, 'সেনাপতি বলেই বোধ হয় সেনাপতি বলে। রাজাকে রক্ষে করাই যার কাজ, তার নামই হয় সেনাপতি।'

'ওরকম বিতিকিচ্ছিরি লোককে ল্যাজে বেঁধে কোথাও নিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয়? চাকরি খেয়ে দিলেই ল্যাটা চুকে যায়।'

দাদাকে বিষম ভালোবাসে প্রমীলা। কিন্তু লোক চেনার ব্যাপারে দাদার ওপর তিলমাত্র আস্থা তার নেই। এই একটি বিষয়ে সে সর্বেসর্বাই থাকতে চায়। কিন্তু দাদাটা যেন কী! যত্তো সব আপদদের জুটিয়েছে চারপাশে।

'পীতাম্বর মুখচোরা বলেই গায়ে পড়ে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারে না—বিশেষ করে মহিলাদের সঙ্গে।' শেষ কথাটা বলার সময়ে অলিম্পিয়া আয়ত নেত্রপাত করলে প্রমীলা পিসির দিকে, 'কিন্তু তার মানেই এই নয় যে সে লোক খারাপ, সেনাপতি হওয়ার অযোগ্য এবং ঘাড়ধাক্কা দেওয়ার পক্ষে যোগ্যতম পুরুষ।'

প্রমীলার কণ্ঠে এবার জাগ্রত হল সেই বিখ্যাত কাকাতুয়ানিনাদ, 'সেনাপতি! সেনাপতি কাকে বলে জানিস? আমি জানি। অ্যাত্তটুকু বয়স থেকে কত সেনাপতি দেখেছি, সবই অবশ্য যাত্রার সেনাপতি! সেনাপতিদের সবসময়ে লম্পঝম্প করতে হয়, চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাতে হয়, চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাতে হয়—'

অলিম্পিয়া মৃদুস্বরে শুধু বললে, 'পীতাম্বর যাঁর সেনাপতি, তিনি নিজেও লম্পঝম্প করতে জানেন না, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করতে জানেন না।'

'ওটা কথার কথা।' ঝটিতি বললে প্রমীলা পিসি, 'যা বলতে চাই, তা হল...তা হল—পীতাম্বর ঝলমলে চকচকে নয় মোটেই—'

'ছ্যাতলা-পড়া সোনা কি ঝকমকে চকমকে হয়?'

'টগবগে খলবলও যদি হত—'

'সে তো পাগলা ঘোড়ারাই হয়।'

'তুই থাম। কিছুতেই বলতে দিচ্ছিস না যা বলতে চাই।'

'তুমি তো পীতাম্বরের কথাই বলছ।'

'একদম না। বললেই হল? আমি ওই বিপুল ব্যানার্জির কথা বলছি। খাসা ছোকরা। টগবগে তেজি ঘোড়া, ঝকঝকে হিরের টুকরো।'

পরমুহূর্তেই অলিম্পিয়ার সেই আশ্চর্য হাসি সপ্তসুরে জাগ্রত হল কণ্ঠে। এ সুরের তুলনা হয় না—এ হাসি হাসতে পারে, এমন মানুষ দুনিয়ায় আর দুটি নেই। চোখের তারায়, মুখের প্রতিটি পেশিতে হাসি বন্যার মতো ধেয়ে গেল চক্ষের নিমেষে।

'ঘোড়ার মতো লাফ দেওয়া আর হিরের মতো চকচক করার গুপ্তবিদ্যেটা বিপুলবাবু অন্যসব বিষয়ের মতোই শিখে নিতে পারেন পলকের মধ্যে। কৌশল রপ্ত করতে তাঁর জুড়ি নেই।'

পিসির মুখের রং পালটে যাচ্ছে দেখে আশ্চর্য হাসিটাকে পত্রপাঠ মনের কন্দরে নিক্ষেপ করে সহজ হয়ে গেল অলিম্পিয়া।

বললে উদাস-উদাস গলায়, 'সত্যিই তো, বিপুলবাবু এখনও এসে পৌঁছলেন না কেন?'

'গোল্লায় যাক বিপুলবাবু।' বলে গাত্রোত্থান করল প্রমীলা পিসি—জানলা দিয়ে চেয়ে রইল বাইরে।

গোধূলির ধূসর রং আর ধূসর নেই। চাঁদের আলোয় ধরার ধূসর রং এখন প্রায় সাদাটে বললেই চলে। সমুদ্রের ধার বরাবর যেদিকে দু'চোখ যায়, সেদিকেই এই আশ্চর্য রহস্য-থমথমে আলো ছড়িয়ে পড়ছে একটু-একটু করে। বহুদূরে দেখা যাচ্ছে তীরের ভেতর দিকে একটা পুকুর—পুকুর ঘিরে তেড়াবাঁকা গাছের জটলা। তারও ওপাশে সৈকতভূমিতে প্রায় গা ঘেঁষে একটা শ্রীহীন দীনহীন চেহারার টিনের চালাঘর। এ অঞ্চলের চা-পানের একমাত্র আড্ডাখানা। নামটা বিচিত্র। সবুজ মানুষ।

হ্যাঁ। চায়ের দোকানের নাম 'সবুজ মানুষ'। কেন যে দোকানের এহেন নামকরণ করেছে কৃষ্ণকায় দোকানদার হরিহর—তা শুধু হরিহরই জানে। গায়ের রং তার কালো জামরুলের মতোই ঘোর কালো। কিন্তু সবুজ রঙের ওপর তার অহেতুক প্রীতি-রহস্য সমাধান করার জন্যে যখন এ কাহিনির অবতারণা করা হয়নি, তখন বিচিত্র নাম নিয়ে অযথা গবেষণা করার আর দরকার নেই।

সাদাটে চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে 'সবুজ মানুষ' চায়ের দোকান পর্যন্ত। জীবন্ত কোনও প্রাণী নেই কোথাও। একটু আগেই গোধূলির আলোয় এই অঞ্চলেই কিন্তু হেঁটে গেছিল নতমুখ স্যার প্রদ্যুম্ন আর নৃত্যপর পীতাম্বর। কিন্তু কেউ তাদের দেখেনি। দেখেছিল শুধু একজন। বিপুল ব্যানার্জি। তাকেও কেউ দেখেনি।

রাত গভীর হল। মাঝরাত পার করে দিয়ে আবির্ভূত হল বিপুল ব্যানার্জি। অতিশয় বিপুল বেগে এবং বিষম চেঁচিয়ে ঘুম-ঘর থেকে টেনে আনল বাড়ির প্রত্যেককে। প্রেতের মতো ফ্যাকাশে মুখ বিপুল ব্যানার্জির। আরও ফ্যাকাশে লাগছে পুলিশ ইনসপেক্টরের ভাবলেশহীন নিরেট মুখ এবং অবয়বের পাশাপাশি থাকায়। কিন্তু ভাবলেশহীন থাকার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ভাবলেশহীন থাকতে পারেনি আরক্ষাবাহিনীর এই অফিসারটি। মনে হয়েছিল যেন নির্বিকার একটা মুখোশ পরে প্রাণপণে চেপে রাখতে চাইছে ভেতরকার আবেগকে। প্রমীলা পিসি আর অলিম্পিয়ার সামনে যথাসম্ভব রেখে-ঢেকে খবরটা হাজির করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তা চক্ষের নিমেষে যেন হাওয়ায় ভর করে ছড়িয়ে গিয়েছিল বাড়িময়।

বড় ভয়ঙ্কর সংবাদ বহন করে এনেছে নিশীথ রাতের এই দুটি পুরুষ। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে পাওয়া গেছে স্যার প্রদ্যুম্নর দেহ। শুধু দেহ। প্রাণহীন দেহ। গাছ-ঘেরা পুকুরে জাল ফেলে পচা পাঁক আর কাদার মধ্যে টেনে তোলা হয়েছে সেই দেহ।

জলে ডুবে মারা গেছেন স্যার প্রদ্যুম্ন মল্লিক।

বিপুল ব্যানার্জিকে যারা চেনে এবং জানে, তারা নিশ্চয় আঁচ করে নিয়েছে মহা তৎপর এই মানুষটি রাতের উদ্বেগ উত্তেজনা বেমালুম ঝেড়ে ফেলবে সকাল হতে-না-হতেই। কার্যক্ষেত্রেও দেখা গেল তাই। গতরাতের উদভ্রান্ত বিপুল ব্যানার্জি এখন রীতিমতো প্র্যাকটিক্যাল। তড়িঘড়ি হাজির হয়েছে ইনসপেক্টর রাজীবলোচনের কাছে। গতরাতে এই রাজীবলোচনের সঙ্গেই পথে দেখা হয়ে গিয়েছিল বিপুল ব্যানার্জির। 'সবুজ মানুষ' চায়ের দোকানের ঠিক পাশটিতে। সকাল হতেই ইনসপেক্টরকে নিরালা একটা ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রশ্নে-প্রশ্নে নাস্তানাবুদ করে তুলল বিপুল ব্যানার্জি—যেন জেরা করার অধিকারটা আছে শুধু তারই—রাজীবলোচনের নয়।

রাজীবলোচন লোকটিও বড় কম যায় না। শুধু বাইরেটা নয়, ভেতরটাও যেন আস্ত গ্র্যানাইট পাথর দিয়ে তৈরি। একেবারে নিরেট। হয় নিরেট বোকা, না হয় দারুণ ধূর্ত। তাই এইসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা গরম করবার পাত্র নয় মোটেই।

অচিরেই দেখা গেল, রাজীবলোচনের চেহারা আর চাউনি যতই বোকা-বোকা হোক না কেন, ভেতরে-ভেতরে সে নিদারুণ সেয়ানা। বিপুল ব্যানার্জিকে সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে গেল বেশ ওজন করে-করে। খামতি বা ঝুঁকতি নেই কোনও জবাবেই।

প্রশ্নগুলো এল ঝড়ের বেগে, কিন্তু জবাবগুলো গেল গদাই লস্করি চালে—রীতিমত যুক্তিতে ঠাসা অবস্থায়।

বিপুল ব্যানার্জির মাথায় তখন ঘুরঘুর করছে সদ্য-পড়া একটা বইয়ের বিষয়বস্তু। বইয়ের নাম, *'কী করে দশদিনে ডিটেকটিভ হওয়া যায়'*। তাই শেষমেষ বললে, 'ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে তাহলে এই ঃ 'অ্যাক্সিডেন্ট, সুইসাইড অথবা মার্ডার।'

চেয়ে রইল রাজীবলোচন।

ঝটিতি বললে বিপুল ব্যানার্জি, 'ত্রিভুজ রহস্য—চিরকাল যা ঘটে এসেছে, ঘটে চলবে।'

রাজীবলোচন বললে, 'অ্যাক্সিডেন্ট? কক্ষনও না।'

'কেন না?'

'অ্যাক্সিডেন্ট মানে বলতে চাইছেন, অন্ধকারে দেখতে পাননি—জলে পড়ে গেছেন স্যার প্রদ্যুম্ন, কেমন?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

'কিন্তু ঘটনাটা যখন ঘটে, তখন তো অন্ধকার তেমন গাঢ় হয়নি। তা ছাড়া, রাস্তা থেকে পুকুরটা কম করেও পঞ্চাশ গজ দূরে। রাস্তাও অচেনা নয়—চোখ বেঁধে ছেড়ে দিলেও পৌঁছে যেতেন নিজের বাড়ি। পঞ্চাশ গজ দূরে পুকুরের দিকে যাবেন কেন? না, একে অ্যাক্সিডেন্ট বলা যায় না। কোনওমতেই না। জেনেশুনে গিয়ে ধীরে-সুস্থে নিশ্চয় শুয়ে পড়েননি পুকুরের জলে।'

'সুইসাইড করার ইচ্ছে থাকলে—'

'সুইসাইডও নয়। মানুষ সুইসাইড করে কেন? জীবনে বিতৃষ্ণা এসে, মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলে, অথবা দারিদ্র্যের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পারলে—'

'বটেই তো! বটেই তো!'

'স্যার প্রদ্যুম্নর ক্ষেত্রে এর কোনওটাই খাটে না। জীবনে তাঁর তৃষ্ণা না থাকুক, বিতৃষ্ণা নেই। যাত্রাটাত্রা নিয়ে ছিলেন মনের সুখে। মনে আঘাত পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা, তাঁর পারিবারিক জীবন অত্যন্ত সুখের। টাকা-পয়সার অভাব কাকে বলে, তা তিনি জন্মাবধি জানেননি—কোটিপতি বলা যায় এক কথায়। নইলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মত যাত্রা-পার্টির পেছনে দু-হাতে টাকা ওড়াতে যেতেন না। সুখে ছিলেন, বড় সুখে ছিলেন—সুইসাইড করতে যাবেন কোন দুঃখে?'

রহস্যনিবিড় চাপা স্বরে বললে বিপুল ব্যানার্জি, 'তাহলেই দেখুন এসে যাচ্ছে তৃতীয় সম্ভাবনাটা।'

'তৃতীয় সম্ভাবনাটা নিয়ে এই মুহূর্তে এত তাড়াহুড়ো করার কোনও প্রয়োজন দেখছি না,' থেমে-থেমে নিরুত্তেজ গলায় বললেন রাজীবলোচন।

শুনে বিলক্ষণ বিরক্ত হল বিপুল ব্যানার্জি। তার আবার তাড়াহুড়ো করা স্বভাব সব ব্যাপারেই। তড়বড় করে মন্তব্য প্রকাশও করতে যাচ্ছিল, কিন্তু রাজীবলোচন সে সুযোগ দিলে না। বললে, 'শেষ সম্ভাবনাটা আদৌ সম্ভব কিনা জানবার আগে দু-একটা বিষয় জানা দরকার। স্যার প্রদ্যুম্নর সেক্রেটারি আপনি। এই দু-একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারবেন শুধু আপনিই।'

'বিষয়গুলো কী যদি জানতে পারি—'

'ওঁর প্রপার্টি।'

'প্রপার্টি?'

'হ্যাঁ। ওঁর বিরাট সম্পত্তিটা দিয়ে যাচ্ছেন কাকে কাকে? সম্পত্তির পরিমাণটা কত? উইল নিশ্চয় একটা আছে। কী লেখা আছে, সেক্রেটারির জানা থাকতে পারে। জানেন কী?'

'যে ধরনের প্রাইভেট সেক্রেটারি হলে এই বিষয়টা অন্তত জানা যায়, সেই ধরনের প্রাইভেট সেক্রেটারি আমি নই।'

'বটে।'

'কিন্তু যাদের জানা আছে, তাদের নামটা জানি।'

'তারা কারা?'

'মেসার্স লাহিড়ী, মুখার্জি অ্যান্ড ব্যানার্জি কোম্পানি। গুরু নিবাস রোডে এঁদের অফিস। স্যার প্রদ্যুম্নর ইনকাম ট্যাক্স থেকে আরম্ভ করে বিষয়-সম্পত্তির দেখাশুনা করা—সমস্ত করেন এঁরা।'

'সলিসিটর কোম্পানি?'

'হ্যাঁ। উইলের খবর এঁরাই জানেন নিশ্চয়।'

'ঠিক বলেছেন। উইল বাড়িতে রাখা সমীচীন নয়। সলিসিটরদের জিম্মাতেই থাকে। তাহলে ওঁদের ওখানে ঢুঁ মারা যাক!'

'এখুনি।' বিপুল ব্যানার্জির আর তর সইছে না।

কিন্তু রাজীবলোচন লোকটা যেন কী! উইলের পেছনে সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়নোর কোনও অভিপ্রায় আছে বলে মনেই হল না। নিরেট বপু আর নির্ভাষ চাহনি নিয়ে বসে রইল চুপচাপ।

বিপুল ব্যানার্জি কিন্তু আর সামলাতে পারছে না নিজেকে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে। সবেগে দু-পাক ঘুরে এল ঘরময়। উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। যেন একটা চাপা আগ্নেয়গিরি। ফেটে পড়ল বলে।

এবং ফেটেও গেল পুরো দুটো মিনিট যেতে না যেতেই।

প্রশ্নটা ঠিকরে বেরিয়ে এল লাভা উদ্গীরণের মতোই, 'রাজীবলোচনবাবু, স্যার প্রদ্যুম্নর ডেডবডিটা এখন কোথায়?'

'ডক্টর তলাপাত্র তলিয়ে দেখছেন।'

'মানে?'

'মানে, এগজামিন করছেন। মৃত্যুর কারণ খুঁজছেন।'

'কোথায় দেখছেন? মানে, বডিটা এখন কোথায়?'

স্রেফ পাথরের মূর্তির মতোই চেয়ে থেকে রাজীবলোচন বললে, 'থানায়।'

'রিপোর্ট রেডি হতে কত দেরি?'

'ঘণ্টাখানেক তো লাগবেই।'

'অসম্ভব।'

'কী অসম্ভব?'

'এত তাড়াতাড়ি এ ধরনের রিপোর্ট লেখা যায় না। হাপিত্যেশ করে বসে না থেকে চলুন সলিসিটর কোম্পানিতে যাওয়া যাক। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

রাজীবলোচনের পাথর-চাহনি দেখে পরমুহূর্তেই কিন্তু থিতিয়ে গেল বিপুল ব্যানার্জি। সুর পালটে নিল চক্ষের নিমেষে। ইনসপেক্টরের ধীর-স্থির ভাবভঙ্গি তাকে যে বিলক্ষণ অপ্রস্তুত করেছে, তা প্রকট হল চোখে-মুখে।

বিপুল ব্যানার্জি যতখানি অস্থির উইল-বৃত্তান্ত জানতে, ঠিক সেই পরিমাণে প্রশান্ত রাজীবলোচন উইলের বৃত্তান্ত না জানতে। অথবা বলা যায়, জানতে সে চায় ঠিকই—কিন্তু যথাসময়ে—এত হুটোপাটি করতে রাজি নয়।

তাই সুর বদলাতে হল বিপুল ব্যানার্জিকে। রাজীবলোচনের নিরেট বদনের দিকে চেয়ে আমতা-আমতা করে বললে ওভার-স্মার্ট বিপুল ব্যানার্জি, 'ব্যাপারটা...মানে, ঠিক বোঝাতে পারছি না—ইয়ে...স্যার প্রদ্যুম্নর মেয়ের কথা বলছি...তার কথাটাও একটু ভাবা দরকার...এত বড় একটা শক...বুঝতেই পারছেন...'

'পারছি।' অমায়িক বচন রাজীবলোচনের।

আরও ঘাবড়ে গেল বিপুল ব্যানার্জি। ফলে স্পিড বেড়ে গেল কথার, 'মানে, সে বেচারি হয়তো অনেক হাবিজাবি কথাই ভেবে মরছে...দুশ্চিন্তা তো হবেই...ঠিক কিনা বলুন?'

'এক্কেবারে ঠিক।'

'ফালতু চিন্তা থেকে ওকে মুক্তি দেওয়া দরকার।'

'তা তো বটেই।'

'খামোকা ভেবে মরছে। এর মধ্যেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুটন্ধুর সঙ্গে কনসাল্ট করবে ঠিক করে ফেলেছে। একজন তো এই মুহূর্তে এই টাউনেই রয়েছে।'

'কে বলুন তো?'

'নামটা তার যেমন বিদঘুটে, পেশাটাও তেমনি বিদঘুটে। ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করে যারা তাদের আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না।'

'ধর্মের ব্যবসাদারদের অনেক সময়ে দু'চোখ দিয়ে দেখাও যায় না।'

'মানে? মানে?'

'মনের চোখ দরকার।'

এবার বিলক্ষণ চটিতং হল বিপুল ব্যানার্জি, 'আরে মশায়, এ লোকটা পয়লা নম্বর বুজরুক। ঈশ্বর নিয়ে কারবার করে, অথচ পাইপ খায় যখন-তখন।'

'খাক না। সাধু-সন্ন্যাসীরা গাঁজাও খায়।'

'যাচ্চলে! শিব গাঁজা খায় বলেই সন্ন্যাসীরা গাঁজা খায়। কিন্তু যীশু কি কোনওদিন পাইপ খেত?'

'কার কথা বলছেন?' এবার যেন আগ্রহের রোশনাই দেখা যায় রাজীবলোচনের পাথর চোখে।

'যার ভাঙা ছাতা, ন্যাতার মতো আলখাল্লার আর কুমড়োর মতো চেহারা দেখলে আপনি হেসে গড়িয়ে পড়বেন।'

'নামটা?'

'ফাদার ঘনশ্যাম।'

'ঘনশ্যাম পাদরি!'

'চেনেন নাকি?'

'আপনার চাইতে বেশি চিনি।'

'আ-আমার চাইতে! মা-মানেটা কী হল?'

'মানে হল এই যে, ফাদার ঘনশ্যামকে আমি যতটা চিনি, আপনি তার দশ ভাগের এক ভাগও চেনেন না। আইসবার্গের ওপরটুকুই কেবল আপনি দেখেছেন—চোখের আড়ালে যা আছে, তা দেখেননি।'

'আইসবার্গ! মা-মা—'

'মানে, হিমবাহ। ফাদার ঘনশ্যাম একটা মানুষ-হিমবাহ। তাঁর বাইরেটা হাস্যকর। কিন্তু ভেতরটা যে কত ভেতরে গেছে, তা তলিয়ে দেখার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নেই।' বলে বিপুল ব্যানার্জির দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থেকে রাজীবলোচন বুঝিয়ে দিলে সাধারণ মানুষটা বর্তমান ক্ষেত্রে কে—'অদ্ভুত একটা জুয়েল কেসে তাঁর যে ভেল্কি দেখেছি, তাতেই বুঝেছি, ফাদার ঘনশ্যাম পাদরি না হয়ে পুলিশ হলে পারতেন।'

অতঃপর ঘরের মধ্যে থাকা আর সমীচীন বোধ করেনি বিপুল ব্যানার্জি। বিপুল বেগে ঘর থেকে উধাও হয়ে যেতে-যেতে শুধু বলে গেছে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে সলিসিটর কোম্পানিতে ফাদার ঘনশ্যামও আসুক। ডাক্তারও আসুক। এক জায়গাতেই সবকথা হয়ে যাক।'

ব্যবস্থা হল সেইভাবেই। সমুদ্রসৈকত থেকে খুব দূরে নয় টাউন। ইনসপেক্টর রাজীবলোচনকে নিয়ে হুড়মুড় করে সলিসিটর কোম্পানির অফিসে ঢুকল বিপুল ব্যানার্জি। ফাদার ঘনশ্যাম পৌঁছে গেছে তাদের আগেই। কোলের ওপর বিরাট (এবং ভাঙা) ছাতাটা রেখে বসে আছে চেয়ারে। দু'হাত রয়েছে তালিমারা নোংরা ছাতার ওপর। জমিয়ে গল্প করছে কোম্পানির সেকেন্ড পার্টনার সলিল মুখার্জির সঙ্গে। ডক্টর তলাপাত্রও হাজির অফিসরুমে। নিশ্চয় এইমাত্র এসেছেন। সুদৃশ্য ছাতাটা ঘরের কোণে রাখছেন। এখুনি এসেছেন বলেই নিশ্চয় স্যার প্রদ্যুম্নর মৃত্যুসংবাদ এখনও দেননি ফাদার ঘনশ্যাম এবং সলিল মুখার্জিকে। দুজনেরই মুখে তাই কৌতুক ঝলমল করছে। হাসির কথাই বলছে বোধ হয় ফাদার ঘনশ্যাম। চাঁদের মতো মুখ আর চশমার আড়ালে কুৎকুতে চোখে রসবোধ যেন উপচে উঠছে। সলিল মুখার্জি শুধু শুনে যাচ্ছে আর শব্দহীন হাসি হেসে চলেছে। ভদ্রলোকের মাথার চুলে

পাক ধরেছে। বিলক্ষণ আমুদে বলেই দুই চোখ নাচিয়ে-নাচিয়ে ঘনশ্যাম পাদরির কথা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। চকচকে কাগজকাটা ছুরির পাশে পড়ে থাকা ধুলোয় ময়লা কলমটা নাড়তে-নাড়তে নিমগ্ন হয়ে রয়েছে রসালাপে।

রাজীবলোচন আর বিপুল ব্যানার্জি সবেগে আবির্ভূত হতেই গোল চশমার ফাঁক দিয়ে চাইল ফাদার ঘনশ্যাম। বললে, 'ফাইন মর্নিং। ঝড় পালিয়েছে, সকালটাও যেন হাসছে।'

রাজীবলোচন বললে, 'আপনার হাসিও তাই খুলেছে।'

'পুরোপুরি খোলেনি,' বললে ফাদার ঘনশ্যাম, 'এখানে সেখানে এখনও কিছু কালো মেঘ জমে রয়েছে। তবে বৃষ্টি আর পড়েনি।'

'হ্যাঁ, এখনও কিছু কালো মেঘ জমে রয়েছে।' বললে রাজীবলোচন।

'কিন্তু এক ফোঁটা বৃষ্টিও আর পড়েনি।' ফাদার ঘনশ্যামের সুরে সুর মিলিয়ে বললে সলিসিটর সলিল মুখার্জি, 'ও মেঘে আর বৃষ্টি হবে না। ছুটির মেজাজ আসে এমন দিনেই।'

'অথবা ছুটির মেজাজ উবে যায় এমন দিনেই।' বললে রাজীবলোচন।

বিপুল ব্যানার্জি এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। তাই এবার তার দিকে অ্যাপায়নের সুরে বললে সলিল মুখার্জি, 'আছেন কেমন ব্যানার্জি সাহেব? স্যার প্রদ্যুম্ন নাকি ফিরে আসছেন?'

'আসছিলেন, কিন্তু আর আসবেন না।' ফাঁকা গলায় বললে বিপুল ব্যানার্জি।

কলম নামিয়ে রাখল সলিল মুখার্জি, 'কেন আসবেন না?'

'জলে ডুবে মারা গেছেন বলে।'

মুহূর্তের মধ্যে পালটে গেল অফিসরুমের হালকা পরিবেশ। কিন্তু চেয়ারে আসীন মূর্তি দুটির সকৌতুক মুখচ্ছবি কৌতুক-ঝলমলেই রইল আগের মতো। যেন এইমাত্র একটা মস্করা করে বসল বিপুল ব্যানার্জি—তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করে গেল সলিল মুখার্জি এবং ফাদার ঘনশ্যাম। ঠোঁটগুলো রইল কেবল নিস্পন্দ—নিস্পন্দ রইল অবয়বও।

তারপর দুজনেই মৃদুকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করলে একই কথাটা, 'জলে ডুবে মারা গেছেন!'

বলে, ফাদার ঘনশ্যাম তাকালেন সলিল মুখার্জির মুখের দিকে। সলিল মুখার্জিও তাকাল ফাদার ঘনশ্যামের মুখের পানে।

দৃষ্টি বিনিময় সাঙ্গ করে দুজনেই দৃষ্টিশর নিক্ষেপ করল বার্তাবহ বিপুল ব্যানার্জির পানে। কয়েক সেকেন্ড সব চুপচাপ।

পরমুহূর্তেই শুরু হয়ে গেল প্রশ্নের-পর-প্রশ্ন।

পাদরির প্রশ্ন, 'কখন?'

সলিল মুখার্জির প্রশ্ন, 'কোথায়?'

জবাবটা দিল ইনসপেক্টর, 'সবুজ মানুষ চায়ের দোকানের কাছেই যে পুকুরটা আছে —সেইখানে। সবুজ পাঁক আর সবুজ শ্যাওলায় মাখামাখি লাশটা টেনে তোলবার পর চিনতে কষ্ট হয়েছে। ডক্টর তলাপাত্র তারপর—আরে! আরে! ফাদার ঘনশ্যাম! আপনার কী হল? শরীর খারাপ নাকি?'

শিউরে উঠে বললে ফাদার ঘনশ্যাম, 'সবুজ মানুষ! সবুজ মানুষ!'

'লাশটাকে সবুজ মানুষের মতোই লাগছিল বটে—'

'সরি, ইনসপেক্টর! মাথাটা হঠাৎ কীরকম ঘুরে যাওয়ায়—বলুন, বলুন, আপনি বলে যান।'

রাজীবলোচন চোখ দুটো একটু ছোট করে ফাদার ঘনশ্যামের দিকে চেয়ে রইল সেকেন্ড কয়েক। তারপরে বললে, 'মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল কেন?'

কাষ্ঠহাসি হাসল ফাদার ঘনশ্যাম। বললে আমতা-আমতা করে—'ডেডবডিটা সবুজ পাঁক আর সবুজ শ্যাওলায় মাখামাখি হয়েছিল শুনেই—'

'কী মুস্কিল! তাতে মাথা ঘুরে যাবে কেন?'

'আমি ভেবেছিলাম, সমুদ্রের সবুজ উদ্ভিদের জন্যে সবুজ মানুষ হয়ে গেছেন স্যার প্রদ্যুম্ন। সেইটা হলেই বরং ছিল ভালো—পাঁক আর শ্যাওলাটা বড় বিচ্ছিরি জিনিস।'

ঘরসুদ্ধ সবাই নিমেষহীন চোখে তাকিয়ে থাকে ঘনশ্যাম পাদরির দিকে। পাগল নিশ্চয়। মাথায় ছিট আছে। ঘর নিস্তব্ধ।

নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করলেন ডাক্তার তলাপাত্র।

ভদ্রলোক নিঃসন্দেহে অসাধারণ পুরুষ। অন্তত বাহ্য-আকৃতির দিক দিয়ে। মাথায় তালঢ্যাঙা। রোগা ডিগডিগে। চর্বি-টর্বির বালাই নেই। তাই বলে অস্থি-চর্মসার মোটেই নন। পোশাক-আশাকেও রীতিমত পারিপাট্য। যে ধরনের কোট-প্যান্ট পরলে ডাক্তার বলে মনে-মনে সম্ভ্রম জাগে—পরেছেন ঠিক সেই ধরনের কোট-প্যান্ট-টাই। তবে যা একটু সেকেলে। কোট-প্যান্টের কাট-ছাঁট অথবা নেকটাইয়ের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আধুনিক ফ্যাশন অনুযায়ী অচল। বয়স কিন্তু তেমন কিছু নয়। চল্লিশও ছাড়িয়েছে কিনা সন্দেহ। ধড়াচূড়ায় সেকেলে, কিন্তু দাড়ি রাখার ব্যাপারে আধুনিক। মাইকেল মধুসূদন টাইপের দাড়ি রেখে আঁতেল হতে চায় এ যুগের অনেকেই। ডাক্তার তলাপাত্রও সযত্নে মাইকেল-দাড়ির চাষ করেছেন দুই গালে। বরং একটু বাড়িয়েই রেখেছেন। রাবীন্দ্রিক স্টাইলে বুক পর্যন্ত লুটিয়ে দিয়েছেন। দুই চোখে কিন্তু রাবীন্দ্রিক বা মাইকেলি চাহনির ছিটেফোঁটাও নেই। অন্তর্ভেদী রুক্ষ চাহনি। মুখভাব তা সত্ত্বেও সুন্দর। কিন্তু এই মুহূর্তে কেন জানি বড় ফ্যাকাশে মনে হচ্ছে। সরু ছুরির মতো চোখজোড়া বড় চঞ্চল। কোনওদিকে বা কারও দিকেই স্থির থাকছে না, অথচ স্থির রাখার চেষ্টা চলছে অবিরাম।

ঘরের প্রত্যেকেই লক্ষ করল এইসব কিছুই। কেউ কিছু বলার আগেই মুখ খুললেন ডাক্তার। কণ্ঠস্বরে জাগ্রত হল কর্তৃত্ব, প্রখর ব্যক্তিত্ব। নায়ক যেন তিনি এখন নিজে। আশ্চর্য এই কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠস্বরকে ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। বুঝে নিতে হবে।

যা বললেন তিনি, তা এই ঃ 'স্যার প্রদ্যুম্নর লাশ জলের মধ্যে পাওয়া গেছে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যেও রয়েছে একটা রহস্য।'

থামলেন। সবাইকে দেখলেন। তারপর বললেন, 'জলে ডুবে উনি মারা যাননি।'

তড়িৎস্পর্শে যেন সচকিত ইনসপেক্টর রাজীবলোচন। এবং সেই প্রথম তীব্র কণ্ঠে প্রশ্ন করতে শোনা গেল তাকে, 'এক্সপ্লেন।'

'ডেডবডি এগজামিন করে এলাম এইমাত্র। স্যার প্রদ্যুম্নর মৃত্যু হয়েছে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে একটা সরু তীক্ষ্ণ বস্তু ঢুকে যাওয়ার ফলে। ছোট ছোরাজাতীয় কিছু।'

রাজীবলোচন চেয়ে আছে। চোখের পাতা পড়ছে না। গোল চশমার আড়ালে চোখের পাতা বন্ধ করে যেন মনের চোখে দৃশ্যটা কল্পনা করার চেষ্টা করছে ঘনশ্যাম পাদরি।

বললেন ডাক্তার, 'মৃত্যুর বেশ কিছুক্ষণ পর ডেডবডি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল পুকুরের জলে।'

এইবার দুই চোখ খুলে গেল ফাদার ঘনশ্যামের। নিষ্প্রভ মণিকা দুটো এখন আশ্চর্য উজ্জ্বল। যেন প্রাণশক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে তারারন্ধ্র থেকে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে ডাক্তারের পানে।

ফাদার ঘনশ্যামকে যারা দীর্ঘদিন ধরে চেনে, তারা অন্তত জানে, কদাচিৎ এভাবে কারও দিকে তাকিয়ে থাকে বিচিত্র এই পাদরি।

অফিসরুম থেকে একে-একে সবাই বেরিয়ে আসে রাস্তায়। ফাদার ঘনশ্যাম কিন্তু আঠার মতো লেগে আছে ডাক্তারের পেছনে। হঠাৎ গায়ে পড়ে আলাপ শুরু করে দেয় অত্যন্ত অমায়িক ভঙ্গিমায়।

ঘর ছেড়ে বেরোনোর আগেই অবশ্য আসল প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা সেরে নিয়েছে বিষম-কৌতূহলী বিপুল ব্যানার্জি।

প্রসঙ্গটা স্যার প্রদ্যুম্নর উইল সংক্রান্ত।

সলিল মুখার্জি প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ আইনবিদ। উইলের ব্যাপারে চট করে মুখ খুলতে চায় না কোনও আইনজীবীই। বিপুল ব্যানার্জির অস্থিরতা তাকে একটু বিরক্তই করেছে বলা চলে। চুলচেরা চোখে লক্ষও করেছে, উইলের বৃত্তান্ত না জানা পর্যন্ত যেন স্বস্তি পাচ্ছে না সেক্রেটারি।

রাজীবলোচনও দেখেছে বিপুল ব্যানার্জির অধীর কৌতূহল। পুলিশি কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে সলিল মুখার্জির মুখ বন্ধ রাখতেও পারত সেই মুহূর্তে। কিন্তু যে ব্যাপারে কোনও রহস্য নেই, অযথা সেই ব্যাপারটাকে রহস্যময় করে তুলতে চায়নি ফাদার ঘনশ্যাম। বলতে গেলে তারই অনুরোধে অবশেষে মনের আগল খুলেছে সলিল মুখার্জি।

মৃদু হেসে বলেছে পাদরিকে, 'ফাদার, স্যার প্রদ্যুম্নর উইলে ঘোরপ্যাঁচ কিচ্ছু নেই। সবাই যা করে, উনিও তাই করেছেন। স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি দিয়ে গেছেন একমাত্র সন্তান অলিম্পিয়াকে।'

এরপরেই রাস্তায় নেমে এসেছে সবাই। রওনা হয়েছে মল্লিকভবনের দিকে। হন্তদন্ত হয়ে সবার আগে-আগে চলেছে বিপুল ব্যানার্জি। গন্তব্যস্থানে আগেভাগে না পৌঁছলেই যেন নয়।

কিন্তু সেরকম কোনও তাড়াহুড়োই দেখা যাচ্ছে না পেছনের দুটি মূর্তির ক্ষেত্রে। ধীরেসুস্থে যেন হাওয়া খেতে-খেতে চলেছে দীর্ঘকায় ডাক্তার আর হ্রস্ববপু পাদরি। গন্তব্যস্থানে তড়িঘড়ি পৌঁছনোর চাইতে অনেক বেশি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে সাতপাঁচ কথাবার্তায়।

জীবন্ত প্রহেলিকা বলা যায় ডাক্তার তলাপাত্রকে। হাঁটছেন মুখ বুজে। পাদরি ঘনশ্যামের হযবরল কথাবার্তা যেন এ-কান দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে যাচ্ছে ও-কান দিয়ে।

প্রশ্নটা করলেন হঠাৎ।

'ফাদার, একটা কথা জিগ্যেস করব?'

কুৎকুতে চোখ ফিরিয়ে তাকায় ফাদার, 'কী বলুন তো?'

'ব্যাপারটা আপনার লাগছে কীরকম?'

সেকেন্ড কয়েক অনিমেষে ডাক্তারের পানে চেয়ে রইল ফাদার। তারপর বললে, 'কীরকম মানে?'

'মানে, সব তো শুনলেন, এখন কী মনে হচ্ছে আপনার?'

'দু-একটা ধাঁধা ঘুরঘুর করছে মাথার মধ্যে।'

'ধাঁধা!'

'স্যার প্রদ্যুম্নকে তেমনি ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম না বলেই একটু গোলমাল লাগছে?'

'গোলমালটা কোথায়?'

'স্যার প্রদ্যুম্নকে তেমন না জানলেও, ওঁর মেয়ে অলিম্পিয়াকে জানি বেশ ভালো করেই।' ডাক্তারের সরাসরি প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে যায় ফাদার।

'অজাতশত্রু ছিলেন স্যার প্রদ্যুম্ন।' সুন্দর মুখখানাকে উৎকট গম্ভীর করে বলল ডাক্তার।

'আছে, কিছু আছে।' নিরীহ স্বরে বললে পাদরি ঘনশ্যাম।

'কিছু আছে! কোথায়? কী?'

'আপনার কথার মধ্যেই। যা আপনি খুলে বলতে চান না।'

'দেখুন মশায়,' স্বর রুক্ষ হয়ে ওঠে ডাক্তারের, 'আমার এই নাকটা দেখেছেন?'

'সুন্দর নাক।'

'এই নাকের আত্মসম্মান বোধটা একটু প্রখর। যেখানে সেখানে নাক-গলানো আমার ধাতে নেই। বুঝেছেন?'

'বুঝলাম।'

'স্যার প্রদ্যুম্ন খুন হয়েছেন তো আমার কী? ভদ্রলোকের মেজাজের একটু নমুনা পেয়েছি। কাজেই তাঁর মৃত্যুরহস্য নিয়ে কোনও মাথা-ব্যথাই নেই আমার।'

'কীরকম নমুনা শুনতে পারি?'

'আরে মশাই, সামান্য একটা ব্যাপার। অপারেশন করতে গেলে ওরকম একটু-আধটু ভুল সব ডাক্তারই করে। কিন্তু তিলকে তাল করে তুললেন উনি। কোর্টে পর্যন্ত যাওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন।'

'শেষপর্যন্ত আর যাননি?'

'সুবুদ্ধিটা শেষকালে এসেছিল বলেই যাননি। ওঁর নিচের থাকের মানুষদের পোকামাকড়ের মতো দেখতেন। ব্লু ব্লাড থাকলে যা হয় আর কী।'

জবাব দিল না ফাদার ঘনশ্যাম। চেয়ে রইল একদৃষ্টে সেক্রেটারির দিকে। হনহন করে হাঁটতে-হাঁটতে অনেকটা এগিয়ে গেছে বিপুল ব্যানার্জি। হন্তদন্ত হয়ে হাঁটার কারণটাও আবিষ্কার করে ফেলল ফাদার ঘনশ্যাম।

অলিম্পিয়া। স্যার প্রদ্যুম্নর কন্যা। এখনও পঞ্চাশ গজ এগিয়ে রয়েছে বিপুল ব্যানার্জির সামনে। চলেছে মল্লিকভবনের দিকেই।

পঞ্চাশ গজ পথ হনহনিয়ে পেরিয়ে গিয়ে অলিম্পিয়ার নাগাল ধরে ফেলল সেক্রেটারি। দূর হতে মিলিয়ে গেল পাশাপাশি দুটি মূর্তি। অপলকে মূকাভিনয় দেখে গেল ফাদার ঘনশ্যাম পেছন থেকে। খুবই উত্তেজিত মনে হল সেক্রেটারিকে। কারণটা ফাদার ঘনশ্যাম আঁচ করতে পারলেও মুখে প্রকাশ করল না। ডাক্তারের সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে পৌঁছল মোড়ের মাথায়—অদূরে মল্লিকভবন।

আচমকা প্রশ্নটা করল ঠিক তখন।

'ডাক্তার, আপনার আর কিছু বলার আছে বলে মনে হচ্ছে না।'

'কেন থাকবে শুনি?' সঙ্গে-সঙ্গে মুখের ওপর জবাবটা ছুঁড়ে দিয়েই এমনভাবে লম্বা-লম্বা পা ফেলে উধাও হলেন ডাক্তার যেন জবাব নয়, প্রশ্নই করে গেলেন—বলার যদি কিছু থাকেও, বলতে যাবেন কেন? আদৌ কিছু বলার আছে কিনা, সেটাও অনিশ্চিত রয়ে গেল অদ্ভুত ভঙ্গিমায় নিক্ষিপ্ত শব্দ তিনটের মধ্যে। জবাব না জিজ্ঞাসা—কিছুই আঁচ করা না গেলেও ফাদার ঘনশ্যামের মস্ত মাথার মধ্যে শব্দ তিনটে কিন্তু ঘুরপাক খেয়েই

গেল। একা-একা হেঁটে গেল বিপুল ব্যানার্জি আর অলিম্পিয়ার পেছন-পেছন।

কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে গেল মল্লিকভবনের ঝাউবীথির সামনেই।

আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়েছে অলিম্পিয়া। দ্রুত চরণে এগিয়ে আসছে ফাদারের দিকেই। মুখভাব অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে। জ্বলজ্বল করছে কিন্তু দুই চোখ। যেন টাটকা অথচ নামহীন আবেগে আপ্লুত হয়েছে অন্তরপ্রদেশ।

কাছে এসেই বললে চাপা গলায়, 'ফাদার, জরুরি কথা আছে। এখুনি শুনতে হবে। কী করব ভেবে পাচ্ছি না।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। এখুনি শুনব। কিন্তু কোথায় বসে শুনব?'

ঝাউবীথির দুপাশে বিরাট বাগান। ফাদার ঘনশ্যামকে এই বাগানের মধ্যেই নিয়ে গেল অলিম্পিয়া। বসল ঝরাপাতায় ঢাকা ঘাসজমির ওপর। মুখ খুলল সঙ্গে-সঙ্গে। যেন পেট থেকে কথা বার করে না দেওয়া পর্যন্ত আবেগকে আর ধরে রাখতে পারছে না—অজ্ঞান হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

কথাটা এই, 'বিপুল ব্যানার্জি এইমাত্র বড় ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর কথা বলে গেল।'

নীরবে মস্ত মাথা নেড়ে সায় দিলে ফাদার ঘনশ্যাম। কথাগুলো যে খুবই ভয়ঙ্কর, তা পেছন থেকে বিপুল ব্যানার্জির ভয়ঙ্কর উত্তেজনা দেখেই আঁচ করা গেছিল।

অলিম্পিয়া বললে, 'কথাটা পীতাম্বরকে নিয়ে। চেনেন পীতাম্বরকে?'

'চিনি...মানে—'

'সে চেনা নয়,' অধীর কণ্ঠে বলে অলিম্পিয়া, 'জানেন তার নাড়ীনক্ষত্র? তার চরিত্র? তার স্বভাবপ্রকৃতি?'

'অত কি আর জানি। যেটুকু শুনেছি, তা একটু গোলমেলে বইকী।'

'কী রকম? কী রকম?'

'পীতাম্বরকে যাত্রা-পার্টির সবাই পীতাম্বরানন্দ বলে ডাকে। অথচ সে আনন্দে ভরপুর নয় কখনওই। তাকে দেখলেই মনে হয় যেন একটা জীবন্ত বিষের বোতল—কঙ্কালের করোটির ওপর যেন আড়াআড়িভাবে রাখা দুটো মড়ার হাড়।'

'কী ভয়ঙ্কর! কী ভয়ঙ্কর!'

'ভয়ঙ্কর তো বটেই। ওরকম চেহারা যার—'

'পীতাম্বরকে মোটেই ওরকম দেখতে নয়। কিন্তু...কিন্তু' বলতে-বলতে খাদে নেমে আসে অলিম্পিয়ার কণ্ঠস্বর, 'অদ্ভুত কিছু একটা ঘটেছে ওর মধ্যে। এইটুকু বয়স থেকে ওকে আমি চিনি—হাড়ে-হাড়ে চিনি—মড়ার হাড় ওর মুখের ওপর কখনও কল্পনাও করতে পারি না—ভেতরে তো নয়ই। কত খেলা খেলেছি দুজনে সমুদ্রের ধারে বালির ওপর। ঝিনুক কুড়িয়েছি, কাড়াকাড়ি করেছি, বালির কেল্লা গড়েছি, ভেঙে তছনছ করে দিয়েছি। ওর কথাগুলো একটু ঝাঁঝালো। বড় চোখা-চোখা। মনের ভেতর পর্যন্ত কুপিয়ে কাটে। যারা ওকে চেনে না, জানে না, বোঝে না—তাদের কাছে তাই ও বিষের বোতল, কঙ্কালের করোটি আর মড়ার হাড় হতে পারে—আমার কাছে নয়। কেননা, আমি জানি ওর ছুরির মত ধারালো কথাবার্তার মধ্যে আছে কবিতার সুর আর ছন্দ, ফুলের মতো ওর মনের গন্ধ আর রং। সেই সময়ে আমিও ওকে পীতাম্বরানন্দ বলে খেপাতাম। আনন্দ দিতে জুড়ি ছিল না। আনন্দ বিতরণ করতে ভালোবাসত বলেই যাত্রা-পার্টিতে ঢুকেছিল পাঁচজনকে আনন্দ দেবে বলে। কিন্তু...কিন্তু—'

'তারপর?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে শুধু বললে ফাদার ঘনশ্যাম।

'ইদানীং যে যাত্রা-পার্টিতে আনন্দের খোরাক আর পাচ্ছে না, আমার কাছে তা বলেছিল। আমার কাছেই শুধু বলেছিল—আর কাউকে নয়। কিন্তু ভেতরে যার আনন্দ নেই, সে তো নিরানন্দ থাকবে বাইরেও। কাঠের মতো শক্ত হয়ে মুখখানাকে পেঁচার মতো করে—না-না, কঙ্কালের করোটির মত কক্ষনও নয়—পেঁচার মতো করে দিনগত পাপক্ষয়ই কেবল করে গেছে। মড়ার মতো হেঁটে যাওয়া বলতে পারেন—আড়ষ্ট, প্রাণহীন। প্রাণে ফুর্তি থাকলে তো বাইরে বেরোয় ফুর্তির ফোয়ারা—কেন, আমি জানি না! এড়িয়ে চলে আমাকে। তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আমার জন্যে ওর ভেতরটা গুঁড়িয়ে গেছে, আমার তা মনে হয় না। খুব বড় রকমের একটা দুঃখ শুকিয়ে দিয়েছে ওর ফুর্তির ফোয়ারা। এখন যা শুনলাম বিপুল ব্যানার্জির মুখে, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে বলব, ওর এই দুঃখটা এসেছে পাগলামি থেকে। অথবা—'

'অথবা?'

'ওর ঘাড়ে ভূত চেপেছে।'

'বিপুল ব্যানার্জির কাছে কী শুনেছ, অলিম্পিয়া?'

'তা এতই ভয়ঙ্কর যে বলতেও মুখে আটকাচ্ছে।'

'আটকাক। তবুও বলো।'

'বিপুল ব্যানার্জি নিজের চোখে দেখেছে, বাবার পেছন-পেছন পা টিপে-টিপে আসছিল পীতাম্বর। কিছুতেই যেন মনস্থির করে উঠতে পারছিল না। তারপর খাপ থেকে টেনে বার করেছিল তলোয়ার...'

'তারপর?'

'ডাক্তার তো বলছেন, ইস্পাতের সরু ফলা দিয়ে বুক ফুটো করা হয়েছে বাবার।'

'বলেছেন বটে।'

'ফাদার, আপনার কী মনে হয়—'

'তোমার কী মনে হয় অলিম্পিয়া, আগে তা বলো।'

'আমার কী মনে হয়? আমার কী মনে হয়, তা কি আপনি আঁচ করতে পারেননি ফাদার? পীতাম্বর ইদানীং মুষড়ে থাকত। বাবার মেজাজ তো জানি—মেজাজ সপ্তমে উঠতে দেরি লাগে না। পীতাম্বরের সঙ্গে খিটিমিটি লেগে থাকতই। তবু বলব, বিপুল ব্যানার্জি নিজের চোখে যাই দেখুক না কেন, পীতাম্বরের পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয় কোনওমতেই।'

'কিন্তু বিপুল ব্যানার্জি তো ভুল দেখেনি।'

'আমিও আমার পুরোনো বন্ধুর হয়ে ওকালতি করতে বসিনি। তা ছাড়া, পীতাম্বর তো এখন আমার বন্ধু নয়—ছিল এককালে—অনেক-অনেক বছর আগে। এখন আমার ছায়া মাড়ানো দূরে থাক—দূর থেকেই ছায়া দেখলে সরে যায়। বন্ধু সে আর নয়, শত্রুও নয়। সুতরাং পীতাম্বরের পক্ষে যা অসম্ভব, তা হাজারবার বলতে দ্বিধা নেই আমার। অথচ প্রায় হাজারবার ওই একটা কথাই বলে গেল বিপুল ব্যানার্জি—'

'একই কথা হাজারবার বলাটা বিপুল ব্যানার্জির মুদ্রাদোষ।'

'মুদ্রাদোষ!'

বলেই থেমে গেল অলিম্পিয়া। গুম হয়ে মাথা নিচু করে বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

তারপরেই মুখ তুলে বললে একেবারে অন্য সুরে, 'মুদ্রাদোষটা আমার ক্ষেত্রে না

দেখালেই ভালো হত না? বিশেষ করে এই সময়ে?'

'তোমার ক্ষেত্রে?' জুলজুল করে তাকায় ফাদার ঘনশ্যাম।

'হাজারবার বলে গেল একটাই কথা—বিয়ে করতে চায় আমাকে।'

'সুসংবাদ।'

'সুসংবাদ?'

'অভিনন্দনটা কাকে জানাব, সেটাই শুধু ঠিক করে উঠতে পারছি না। তোমাকে, না বিপুল ব্যানার্জিকে?'

'ফাদার!'

'অলিম্পিয়া, উত্তেজনা কোনও সমস্যারই সমাধান করতে পারে না, বরং আরও জট পাকিয়ে দেয়।'

'উত্তেজিত এখন হয়েছি—তখন হইনি।'

'আমিও তা দেখেছি। খুবই উত্তেজিত হয়েছিল বিপুল ব্যানার্জি। বিয়ের প্রস্তাবটা শোনবার পর কী বললে তুমি?'

'বললাম, এখন ওসব কথা থাক।'

'চমৎকার বলেছ। বিপুল ব্যানার্জি কী বলল?'

'কথা কানেই তুলতে চায় না। একই কথা বলে গেল হাজার বার।' বলতে-বলতে অলিম্পিয়ার কথায় জাগল সেই আমুদে সুর—যা ওর অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে সুপ্ত থাকে—বাইরে থেকে দেখে মোটেই বোঝা যায় না, 'কত কথাই না বলে গেল। জীবনে বড় হতে চায়, অনেক উচ্চাশাকে সফল করতে চায়। এক সময়ে নাকি আমেরিকাতে ছিল—অথচ আমেরিকার ডলার ছাড়া আর কোনও আমেরিকান বিষয় নিয়ে ওকে কথা বলতে এর আগে শুনিনি। উচ্চাশাগুলো যে কত উচ্চে পৌঁছেছে, তাও জানবার সৌভাগ্য কখনও হয়নি—জানলাম এই প্রথম। বিয়ে করে নিয়ে যেতে চায় আমাকে আমেরিকার স্বর্গরাজ্যে।'

'সেটা সৌভাগ্য, না দুর্ভাগ্য?'

'আমার ভাগ্যে যা আছে, তা কি আমিই জানি? ফাদার, প্রশ্নটা বিপুল ব্যানার্জির উচ্চাশা সফল করার ব্যাপারে নয়।'

'জানি।' নরম গলায় বললে ফাদার ঘনশ্যাম, 'বিপুল ব্যানার্জি কোনও প্রবলেমই নয় এই মুহূর্তে। প্রবলেম হল—'

'পীতাম্বর।'

'হ্যাঁ, পীতাম্বর। বিপুল ব্যানার্জি ওর সম্বন্ধে যা-যা বলে গেল, তা কি সত্যি? তোমার তো মনে হয় সত্যি নয়।'

শক্ত কাঠ হয়ে গেল অলিম্পিয়া। অদ্ভুত চোখে চেয়ে রইল ফাদার ঘনশ্যামের চশমার আড়ালে কুৎকুতে চোখজোড়ার দিকে। সে চোখে শ্যেনদৃষ্টি নেই, তবুও অলিম্পিয়ার মনে হয় যেন তার ভেতর পর্যন্ত দূরবীণ দিয়ে দেখে নিচ্ছে অদ্ভুত নিস্তেজ ওই চোখজোড়া।

ভুরু কুঁচকে মুচকি হেসে বললে, 'অনেক কিছুই জানেন দেখছি।'

ফাদার ঘনশ্যাম কিন্তু হাসির ধার দিয়েও গেল না। কণ্ঠস্বরেও অটুট রইল গাম্ভীর্য। বললে থেমে-থেমে, 'অলিম্পিয়া, জানি আমি অনেক কিছুই। কিন্তু এই ব্যাপারে জানি খুব সামান্যই। কিন্তু একটা ব্যাপারে জানি খুব ভালো করেই। আমি জানি, কে খুন করেছে তোমার বাবাকে।'

ভীষণ চমকে উঠল অলিম্পিয়া। বসে থাকতেও পারল না। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে হেঁট হয়ে চেয়ে রইল ফাদারের দিকে ফ্যালফ্যাল করে। মুখ সাদা হয়ে গেছে। ফ্যাকাশে।

ফাদার ঘনশ্যাম কিন্তু নির্বিকার। বললে শুষ্ক কণ্ঠে, 'আমি একটা গাধা। নিরেট বোকা। বোঝা উচিত ছিল তখনই।'

'কখন?'

'যখন জিগ্যেস করা হচ্ছিল, কোথায় পাওয়া গেছে তোমার বাবাকে। সবুজ পাঁকে মাখামাখি অবস্থায়। ঠিক যেন সবুজ মানুষ।'

বলে উঠে দাঁড়াল ঘনশ্যাম পাদরি। বিশাল ছাতাটা বাগিয়ে ধরল এমনভাবে যেন হঠাৎ নতুন একটা সঙ্কল্প কঠিন করে তুলেছে অন্তরপ্রদেশকে।

কথার মধ্যেও প্রকট হল নতুন গাম্ভীর্য। বললে, 'তোমার বাবার মৃত্যুকে ঘিরে যে হেঁয়ালি গড়ে উঠেছে, তার সমাধান-সূত্রটিও আমি জেনে ফেলেছি।'

'আ-আপনি জানেন?'

'কিন্তু এখুনি তোমাকে বলব না। খবরটা শুভ নয়, এইটুকুই শুধু জেনে রাখো। তবে যে অশুভ পরিস্থিতির সামনে এসে দাঁড়িয়েছ, তার চাইতে বেশি অশুভ নয়।' বলতে-বলতে কোটের বোতাম এঁটে নিল ফাদার। ঘুরে দাঁড়াল ফটকের দিকে, 'চললাম।'

'কোথায়?'

'পীতাম্বরের সঙ্গে দেখা করতে।'

'জানেন, কোথায় থাকে পীতাম্বর?'

'জানি। সমুদ্রের ধারে টালির ঘরটায়। বিপুল ব্যানার্জি সেখানেই তো দেখেছে ওকে পায়চারি করতে।'

বেগে সমুদ্র-সৈকতের দিকে উধাও হয়ে গেল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল।

অলিম্পিয়া কল্পনার জগতে বাস করতে ভালোবাসে। কল্পনায় আকাশপাতাল রচনা করে। তাই এই মুহূর্তে বয়স্ক এই বন্ধুটি যে ভয়াবহ ইঙ্গিতটি নিক্ষেপ করে অন্তর্হিত হয়ে গেল, সেই কল্পনা মনে নিয়ে একা-একা দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ মনে করল না। অথচ স্থানত্যাগ করে যেতেও পারল না। আচমকা অমন একটা ভয়াবহ ইঙ্গিত দিয়ে ঝড়ের মতো কেন যে উধাও হয়ে গেল ফাদার ঘনশ্যাম, আকাশপাতাল ভেবেও তার কুলকিনারা পেল না। ফাদার নাকি জানে কে খুন করেছে তার বাবাকে। কী করে জানল, সেটা একটা রহস্য। তার চাইতেও বড় রহস্য পুকুরের সবুজ পাঁকে সবুজ হয়ে যাওয়া মৃতদেহটাকে সবুজ মানুষ নামকরণ করা। সবুজ মানুষ! কীসের প্রতীক? এত হেঁয়ালি করে কথা বলে গেল কেন ফাদার? হেঁয়ালির মধ্যে হেঁয়ালি রচনা না করলেই কি চলত না? মনের চোখে যেন দেখতে পেল ভূতের মতো সবুজ মানুষ চক্কর দিচ্ছে পুকুরের পাড়ে—চাঁদের আলোয়। দিনের আলোয় এ ধরনের গা-ছমছমে কল্পনা মনের মধ্যে কেন যে হঠাৎ ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, বুঝে উঠল না অলিম্পিয়া। দিনের আলোটাকেই বরং আরও বেশি রহস্যময় মনে হল চাঁদনি রাতের চেয়ে।

পুকুর। পাঁক। সবুজ মানুষ।

গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অলিম্পিয়া।

সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই অনেক দূরে দেখা গেল দ্রুত আগুয়ান একটা মূর্তিকে। আসছে তার দিকেই। দেখেই বুকের রক্ত চঞ্চল হল অলিম্পিয়ার। দুনিয়াটা মনে হল যেন

হঠাৎ উলটে গেছে। যা কল্পনা করা যায় না, চোখের সামনে তাই দেখছে।

হনহন করে যে মূর্তি এগিয়ে আসছে তার দিকে সমুদ্রের ধার থেকে, তাকে চেনে অলিম্পিয়া। খুব ভালো করেই চেনে। কিন্তু তার হাঁটার ধরন আজ এরকম কেন? এরকম উচ্ছল ভঙ্গিমায় তো সে অনেকদিন হাঁটেনি?

আরও কাছে এগিয়ে এসেছে সে। না, ভুল হয়নি। পীতাম্বর আসছে। পড়ন্ত আলোয় ক্রমশ সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার মুখচ্ছবি। আনন্দের রোশনাইতে ঝলমল করছে সারা মুখখানা।

বিমূঢ় হয়ে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল অলিম্পিয়া।

হাসতে-হাসতে উল্লাসে ফেটে পড়ল পীতাম্বর তার সামনে এসে। এতদিন যার ছায়া দেখলেই সরে গেছে দূর থেকে, এসে দাঁড়াল এক্কেবারে তার সামনে। দু-হাত রাখল তার দু-কাঁধে। বললে সহর্ষে, 'মুখ তুলে চেয়েছেন ভগবান। এখন থেকে তোমার ভার আমার।'

অলিম্পিয়া হতভম্ব। কিছুক্ষণ শুধু চেয়েই রইল ফ্যালফ্যাল করে পীতাম্বরের আনন্দনিবিড় চোখের তারা দুটোর দিকে। তারপর বলেছিল স্বগতোক্তির সুরে, 'এত আনন্দ কীসের? হঠাৎ এমনভাবে পালটে গেলে কেন পীতাম্বর?'

'কারণ, এইমাত্র শুনলাম অশুভ সংবাদটা। অলিম্পিয়া, আজ আমি সুখী, সত্যিই বড় সুখী!'

মল্লিকভবনের সামনের বাগানে জড়ো হয়েছে সকলেই। বিচিত্র এই রহস্য উপাখ্যানে যাদের কিছু ভূমিকা আছে, তারা যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে তারাও যাদের কোনও ভূমিকাই নেই। সবাই দাঁড়িয়ে আছে দু-পাশে ঝাউবীথি শোভিত পথের ওপর। উদ্দেশ্য একটাই। আইনবিদ মহাশয় এখুনি আনুষ্ঠানিকভাবে করবেন তাঁর কর্তব্যটি। অর্থাৎ পড়ে শোনাবেন স্যার প্রদ্যুম্ন মল্লিকের শেষ ইষ্টিপত্র। সেইসঙ্গে জ্ঞানদানও করবেন। সেটাও তাঁর কর্তব্য। এহেন সঙ্কটাবস্থায় যা-যা করণীয়, আইনজ্ঞ হিসেবে তা তাঁকে বলতেই হবে। ফলে, কী ঘটবে আর কী না ঘটবে, জানবার আগ্রহ প্রত্যেকেরই মনে।

দলিল-দস্তাবেজের ফাইল বগলে দাঁড়িয়ে আছেন সলিসিটর সলিল মুখার্জি। পাশেই দাঁড়িয়ে ইনসপেক্টর রাজীবলোচন। আইনের হাতিয়ার চালিয়ে হত্যাকারীকে কুপোকাত করার জন্যেই উইলের বয়ান শুনতে বড়ই ব্যগ্র সে। পীতাম্বর মহাপ্রভু কিন্তু নির্লজ্জভাবে ব্যস্ত অলিম্পিয়াকে নিয়ে। ভ্রূক্ষেপ নেই কোনওদিকেই। দীর্ঘদেহী ডাক্তারকে দেখে বিস্মিত অনেকেই, তার চাইতেও বেশি অবাক হচ্ছে কুমড়োর মতো বপু যার—সেই ঘনশ্যাম পাদরিকে দেখে। ধর্ম নিয়ে যার কারবার, অধর্মের ব্যাপারে তার আগ্রহটা যেন কেমনতর।

ছোট্ট দলটাকে দেখেই বাড়ির দিক থেকে উল্কার মতো বেগে ধেয়ে এল বিপুল ব্যানার্জি। মানুষ-উল্কাই বটে। খাতির করে সবাইকেই নিয়ে গেল মল্লিকভবনের সামনের সবুজ ঘাসজমিতে। পরমুহূর্তেই পুনরায় উল্কাবেগে অন্তর্হিত হল বাড়ির মধ্যে—অভ্যর্থনার আয়োজন করতে। যাওয়ার সময়ে বলে গেল দ্রুত কণ্ঠে, 'আসছি এখুনি।'

লোকটার সচল ইঞ্জিনের মতো এনার্জি দেখে তাজ্জব হয়েছে প্রত্যেকেই। সেক্রেটারি বটে একখানা প্রাণশক্তিতে ভরপুর। কোনও কাজে ত্রুটি নেই।

প্রথম মন্তব্যটা শোনা গেল পীতাম্বরের কণ্ঠে, 'ক্রিকেটের রান তুলছে মনে হচ্ছে!'

দ্বিতীয় মন্তব্যটা করলেন সলিল মুখার্জি, 'ছোকরা খাপ্পা হয়েছে-আইনের মন্থরগতি দেখে। আইন কেন ওর মতো পড়ে ছুটছে না—অতএব ছুটে মরছে নিজেই। মিস মল্লিক

অবশ্য বোঝেন, এহেন পরিস্থিতিতে আইনবিদরা কখনওই ক্রিকেট রানারের মতো পাঁই-পাঁই করে দৌড়োতে পারে না। এসব ব্যাপারে আইনগত অসুবিধে আছে—তার জন্যে সময় যা লাগবার, তা লাগবেই। আমার ঢিমেতালে কাজ করায় মিস মল্লিক অন্তত অখুশি নন।'

তৃতীয় মন্তব্যটা আচমকা নিক্ষেপ করলেন ডাক্তার, 'বিপুল ব্যানার্জির ছুটোছুটি এখন কিন্তু আমার ভালোই লাগছে। যা করতেই হবে, তা ঝটপট সেরে ফেলাই ভালো।'

ভুরু কুঁচকে বললে পীতাম্বর, 'কথাটার অর্থ? বিপুল ব্যানার্জির তাড়াহুড়োটা এখন আপনার ভালো লাগছে কেন?'

'বিপুল ব্যানার্জির বৈশিষ্ট্য তো ওইখানেই।' হেঁয়ালির সুরে বললেন ডাক্তার, 'কখনও তাড়াহুড়ো করে মরে, কখনও ঢিমেতালে চলে।'

'এটা আবার কীরকম কথা হল?'

'তাড়াহুড়ো করলে যখন আরও মানাতো, তখন কিন্তু ঢিমেতালেই চলেছিল সেক্রেটারি সাহেব।'

'কখন বলুন তো?'

'পুকুরপাড়ে আধখানা রাত ঘুরঘুর না করে কাটালেই পারত। সবুজ-মানুষকে পুকুর থেকে তোলার ব্যবস্থাটা তাড়াহুড়ো করে সারলেই পারত। ইনসপেক্টরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা না হয়ে গেলে বাকি রাতটাও বোধ হয় কেটে যেত পুকুরের পাড়েই। তাই বলছিলাম, বিপুল ব্যানার্জি কখনও কাজ করে স্লো স্পিডে, কখনও হাই স্পিডে। ইন্টারেস্টিং।'

পীতাম্বর বললে, 'তাহলে কী বলতে চান, বিপুল ব্যানার্জি যা বলেছে, তার মধ্যে মিথ্যের ভেজাল আছে?'

ব্যস, আর কথাটি নেই ডাক্তারের মুখে। গূঢ় কৌতুকের হাসি হাসল কেবল সলিসিটর সলিল মুখার্জি। বলল তরল স্বরে, 'ছোকরার বিরুদ্ধে কিন্তু আমি কিছু বলব না। তবে—'

অধীর হল পীতাম্বর, 'তবে আবার কী?'

'আমার কাজ আমি ভালো বুঝি, সে ব্যাপারে আমাকে জ্ঞানদান করার চেষ্টাটা না করলেই ভালো করত।'

'তাই নাকি? আইন শেখাতে গেছিল আপনাকে?'

'খুব প্রশংসনীয়ভাবেই শেখাতে গেছিল এবং তিলমাত্র দেরি না করে। মানে বুঝেছেন? উইলটা পড়ে শোনানো হোক ঝটপট—দেরি করছি কেন?'

এতক্ষণে মুখ খুলল ইনসপেক্টর রাজীবলোচন, 'সে চেষ্টা আমার ওপরেও হয়েছে। আমার চরকায় কীভাবে তেল দিতে হয়, সেটা আমার চাইতে বিপুল ব্যানার্জির বেশি জানা উচিত নয়। মরুকগে, তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ডাক্তার সাহেব কি সন্দেহ করেন বিপুল ব্যানার্জিকে? সেক্ষেত্রে কিন্তু ছোকরাকে এখুনি জেরা করা দরকার।'

'ওই তো আসছে বিপুল ব্যানার্জি।' বললে পীতাম্বর।

দোরগোড়ায় আবার বায়ুবেগে আবির্ভূত হতে দেখা গেল সেক্রেটারিকে।

ঠিক এই সময়ে প্রত্যেককেই অবাক করে ছাড়ল ফাদার ঘনশ্যাম। এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল সবার পেছনে। নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করেনি একেবারেই। আচমকা হনহনিয়ে এল সবার সামনে। বোঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে দু-হাত শূন্যে তুলে দাঁড়িয়ে গেল এমন

ভাবে, যেন আগুয়ান সৈন্যবাহিনীকে আর এক ইঞ্চিও না এগোনোর নির্দেশ দিচ্ছে সেনাপতি।

কুমড়োপটাশ মন্থরগতি ফাদার ঘনশ্যামের পক্ষে এবম্বিধ আচরণ অতীব বিস্ময়কর। বিশেষ করে যারা তাকে চেনে এবং জানে, তাদের চোখ কপালে উঠে যাওয়ার উপক্রম হল স্থূলকায় পাদরির নাটকীয় কাণ্ড দেখে।

'দাঁড়ান! আর এগোবেন না!'

রীতিমত ধমক দিচ্ছে যে পাদরি! ব্যাপারটা কী?

'ফাদার—' পীতাম্বর মুখ খুলেছিল বটে—কিন্তু দাবড়ানি দিয়ে থামিয়ে দেয় ঘনশ্যাম পাদরি ঃ

'আগে আমাকে যেতে দিন। বিপুল ব্যানার্জির সঙ্গে আমাকে আগে কথা বলতে দিন। আমি যা জানি, আমার মুখেই আগে ওকে শুনতে দিন। প্লিজ, আপনারা কেউ যা জানেন না এখনও পর্যন্ত, আমি তা জানি। আপনাদের বলার আগে ওকে তা বলা দরকার। কেন জানেন? একটা মস্ত ভুল বোঝাবুঝির হাত থেকে বেঁচে যাবে অন্তত একজন।'

'কী বলতে চান বলুন তো?' সলিল মুখার্জির ঝাঁঝালো প্রশ্ন।

'অশুভ সংবাদটা শুনিয়ে দিতে চাই।' বললে ফাদার ঘনশ্যাম।

তেড়ে উঠল রাজীবলোচন, 'দেখুন ফাদার—,' পরমুহূর্তেই সামলে নিল নিজেকে ঘনশ্যাম পাদরির কুতকুতে চোখজোড়ার দিকে চেয়ে। এ দৃষ্টি সে আগেও দেখেছে অনেক অদ্ভুত ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তে। সুর পালটে নিয়ে বললে সঙ্গে-সঙ্গে, 'আপনি না হয়ে আর কেউ হলে কিন্তু আমাকে রুখতে পারত না—'

কিন্তু যার উদ্দেশে এ কথা বলা, সেই ফাদার ঘনশ্যাম ততক্ষণে বাঁই-বাঁই করে দৌড়ে পৌঁছে গেছে গাড়িবারান্দায়—হাত-মুখ নেড়ে কথা আরম্ভ করে দিয়েছে বিপুল ব্যানার্জির সঙ্গে। জায়গাটা অন্ধকার বলেই দেখা গেল না নাটকের বাকি অংশটুকু। মিনিট বারো পরে একলাই বেরিয়ে এল ফাদার ঘনশ্যাম।

এবং আর-এক দফা তাজ্জব করে দিল প্রত্যেককেই।

কারণ, বাড়ির মধ্যে ঢোকবার কোনও সদিচ্ছাই দেখাল না ফাদার। ঝুপ করে বসে পড়ল নড়বড়ে বেঞ্চিতে, পকেট থেকে বার করল পাইপ আর তামাক, দেশলাই জ্বেলে অগ্নিসংযোগ করে ফুকফুক করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল তন্ময় চোখে গাছের পাতার দিকে চেয়ে—দু-কান ভরে যেন শুনছে পাখিদের কাকলি। জগতে এর চাইতে মধুর, এর চাইতে প্রিয় যেন আর কিছুই নেই।

বিমূঢ় দলটা অগত্যা ফাদারকে ওই অবস্থায় রেখেই প্রবেশ করল বাড়ির মধ্যে।

কিছুক্ষণ পর।

দড়াম করে খুলে গেল সদরদরজা। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসতে দেখা গেল তিনটি মূর্তিকে। সবার আগে অলিম্পিয়া আর পীতাম্বর। ভারী দেহ নিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ায় পিছিয়ে পড়েছে রাজীবলোচন।

ফাদার কিন্তু তখন ধূম্রজালে আচ্ছন্ন। দুই চোখে স্বপ্নিল চাহনি।

মত্তহস্তীর মতোই বাগান কাঁপিয়ে অবশেষে সামনে এসে দাঁড়াল রাজীবলোচন। ক্রোধে আরক্ত মুখ।

রেগেছে অলিম্পিয়াও, 'ফাদার! ব্যাপার কী বলুন তো? বিপুল ব্যানার্জি কোথায়?'

বোমার মতো ফেটে পড়ল পীতাম্বর, 'পালিয়েছে! সুটকেশ গুছিয়ে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পাঁচিল টপকে পালিয়েছে! ফাদার, কী বলেছিলেন ওকে?'

'কী আবার বলবেন?' বললে অলিম্পিয়া, 'শয়তানিটা ধরিয়ে দিয়েছিলেন—মিথ্যের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন।'

হুঙ্কার ছাড়ল রাজীবলোচন, 'একী করলেন ফাদার? এভাবে কেন ল্যাং মারলেন আমাকে?'

'কী করলাম তাই তো বুঝতে পারছি না।' নিরীহ স্বরে বললে ঘনশ্যাম পাদরি।

'পারছেন না? আর কত ন্যাকা সেজে থাকবেন? খুনিকে পালিয়ে যেতে দিয়েছেন আপনি...হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি! নিরেট গাধা আমি—তাই খুনিকে হুঁশিয়ার করার সুযোগটা আমিই দিয়েছি আপনাকে,' সারা বাগান থরথর করে কাঁপতে লাগল রাজীবলোচনের বজ্রনাদে, 'হেল্প করেছেন—মার্ডারারকে হেল্প করেছেন পালিয়ে যেতে—সেইসঙ্গে বসিয়ে গেছেন আমাকে! আর কি ওকে ধরা যাবে? এতক্ষণে রাস্কেলটা—'

'বেশ কয়েক মাইল দূরে—আপনার নাগালের বাইরে।' রুষ্ঠ কণ্ঠে বললে পীতাম্বর।

হৃষ্টকণ্ঠে বললে ফাদার ঘনশ্যাম, 'খামোকা চেঁচাচ্ছেন। অতীতে অনেক খুনিকে আমি সাহায্য করেছি ঠিকই—কিন্তু খুন করতে সাহায্য করিনি কোনও খুনিকেই।'

'যাই বলুন আর তাই বলুন, গোড়া থেকেই আপনি জানতেন খুনি বিপুল ব্যানার্জি।' অলিম্পিয়াকে এ মূর্তিতে কখনও দেখা যায়নি। রাগে মুখ থমথম করছে। আতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত যেন শিউরে উঠছে, 'ডেডবডি কোথায় পাওয়া গেছে, এই নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই তাই আপনি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারেননি। ডাক্তার ঠিকই বলেছেন। পুকুরপাড়ে অত রাত পর্যন্ত ঘুরঘুর করছিল ওই কারণেই।'

'খটকা আমারও লেগেছিল। তখনি যদি রাস্কেলটাকে পাকড়াও করতাম—' রাজীবলোচন প্রায় নৃত্য করতে থাকে প্রচণ্ড আফশোসে।

'রাস্কেল বলে রাস্কেল!' রণচণ্ডিনী মূর্তি অলিম্পিয়ার, 'এখন তো দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেল বাবাকে খুন করেছে—'

'সলিসিটর সলিল মুখার্জি।' ভারি শান্ত গলায় বললে ফাদার ঘনশ্যাম।

'কে?' যেন হেঁচকি তুলল রাজীবলোচন।' থ হয়ে গেল অলিম্পিয়া। চক্ষু ছানাবড়া করে চেয়ে রইল পীতাম্বর। অকস্মাৎ যেন শ্মশান নৈঃশব্দ্য নেমে এল ঠিক ওইটুকু জায়গায়—আশপাশে অব্যাহত রইল বিহঙ্গ কুজন।

'সলিসিটর সলিল মুখার্জি!' থেমে-থেমে আবার বললে ফাদার ঘনশ্যাম। এমন সুস্পষ্ট উচ্চারণে বললে যেন বাচ্চাদের ক্লাশ নিচ্ছে—নতুন শব্দ শেখাচ্ছে—বোঝার সুবিধের জন্যে ধীরে-সুস্থে পরিষ্কার উচ্চারণ করতে হচ্ছে। 'ওই যে ভদ্রলোক, চুল যার কাঁচাপাকা, উইল বগলে এসেছেন পড়ে শোনানোর জন্যে।'

বলে, পাইপের ছাই ফেলে দিয়ে ফের তামাক ঠাসতে লাগল ফাদার ঘনশ্যাম নিশ্চিন্ত মনে, তিন-তিনটে মূর্তি অবিকল কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল সামনে। তিনজনেরই চোখ গোল-গোল, বিষম বিস্ময়ে তিনজনেরই চোয়াল ঝুলে পড়েছে, কথা গেছে আটকে।

বেশ বার-কয়েক ঢোক গিলে অবশেষে স্বরযন্ত্রকে সরব করল রাজীবলোচন, 'কিন্তু কেন?'

'ঠিক কথা। কেন? কেন সলিল মুখার্জি খুন করতে গেল স্যার প্রদ্যুম্ন মল্লিককে।'

পাইপে তামাক ঠাসা হয়ে গেছিল ফাদার ঘনশ্যামের। এখন তা ধরিয়ে নিয়ে ফুকফুক করে বার-কয়েক টেনে নিয়ে বললে, 'কারণটা বলার সময় এখন হয়েছে। খুবই অন্যায়, বিরাট অপরাধ করেছেন সলিল মুখার্জি—জঘন্য এই ব্যাপারটার মূলে রয়েছে জঘন্যতম সেই অপরাধ এবং—' একটু থেমে, বারকয়েক পাইপ টেনে, 'স্যার প্রদ্যুম্ন মল্লিককে খুন করার চাইতেও কদর্য সেই অপরাধের কোনও ক্ষমা নেই।'

মুখ থেকে পাইপ নামাল পাদরি। সটান চাইল অলিম্পিয়ার মুখের দিকে। মুখভাব সিরিয়াস—কণ্ঠস্বরও তাই।

'অলিম্পিয়া, কথাটা এখনই শোনা দরকার তোমার। আমি জানি, ধাক্কা তুমি সইতে পারবে। সে মনের জোর তোমার আছে বলেই বলছি—নইলে বলতাম না। তুমি প্রায় পথে বসেছ বললেই চলে।'

'পথে?' ছুঁচের ডগার মতো সুর হল অলিম্পিয়ার নয়নতারকা।

'হ্যাঁ। মানে, পীতাম্বরের সঙ্গে তোমার আর বিশেষ তফাত নেই। রাজ-ঐশ্বর্য আর তোমার নেই। ফুঁকে উড়িয়ে দিয়েছে সলিসিটর সলিল মুখার্জি হাজাররকম বিজনেস অ্যাডভেঞ্চারে। পয়লা নম্বর জোচ্চোর, এক নম্বরের প্রতারক সলিল মুখার্জি। টাকার পাহাড় থেকে তোমাকে যে নামিয়ে আনা হয়েছে মাটির ওপর—এই তথ্যটাই কিন্তু এতগুলো রহস্যকে বুঝে ওঠার একমাত্র সূত্র। এই যে ভ্যাবা গঙ্গারামের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে পীতাম্বর, ওকে গিয়ে আমি শুধু সেই খবরটাই দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, রুপোর চামচ মুখে দিয়ে জন্মেও এখন তুমি প্রায় পথের ভিখিরি। শুনেই বাঁই-বাঁই করে দৌড়ে এসেছিল তোমার পাশে দাঁড়াতে, বুক দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে, প্রাণ দিয়ে তোমার প্রাণে আশার আলো জ্বালাতে। অসাধারণ মানুষ এই পীতাম্বর।'

'দূর মশায়! কী ফালতু বকছেন!' রেগেমেগে বললে পীতাম্বর।

প্রশান্ত স্বরে বললে ফাদার ঘনশ্যাম, 'অথবা বলা যায় পীতাম্বর লোকটা প্রাগৈতিহাসিক দৈত্য—প্লেসিওসরাস অথবা ওই জাতীয় দানব। গুহামানবদের হৃদয়ও বোধ হয় এত নির্লিপ্ত, এত নির্দয় এবং এত উদাসীন ছিল না। টাকার পাহাড়ে অসীন স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করতে সে চায়নি। বউয়ের টাকায় দু'বেলা খেয়ে-পরে থাকতে চায়নি। দু-বেলা বউয়ের মুখনাড়া খেয়ে শ্বশুরের ভিটেয় বসে ঘরজামাই হয়ে থাকতে চায়নি। গুহামানবেরও অধম। জঘন্য। বিচিত্র। তাই একেবারেই নির্লিপ্ত, উদাসীন হয়ে গেছিল তোমার ব্যাপারে। তাই অমন কিম্ভূতকিমাকার হয়ে থেকেছিল এতগুলো বছর। তাই তোমার ছায়া দেখলেও দূর থেকে সটকান দিত, পাছে টাকার ছায়ায় গায়ে ফোস্কা পড়ে যায়। কিন্তু যেই আমার মুখে শুনল পথে বসেছ তুমি, তোমার গা থেকে সরে গেছে টাকার ছায়া—অমনি প্রাণবন্ত হল চক্ষের নিমেষে—এতদিন ছিল জ্যান্ত মড়া—হঠাৎ হল জ্যান্ত প্রেমিক—পাঁই-পাঁই করে দৌড়ে এল গতর খাটিয়ে ভাবীবউকে সাহায্য করার আশ্বাসবাণী শোনাতে—সে যে চায় বউ খাবে তারই টাকায়—বউয়ের টাকায় সে খাবে না কোনওদিনই। এমন অদ্ভুত লোককে প্রাগৈতিহাসিক জীব ছাড়া আর কিছু বলা চলে কি? গুহামানবরাও এমন আহাম্মক ছিল কি? জঘন্য! অতি জঘন্য লোক এই পীতাম্বর।'

ফুক...ফুক...ফুক! তাল-তাল ধোঁয়া উড়ে গেল ফাদারের পাইপের গর্ত থেকে। নির্নিমেষে তার নির্বোধ আকৃতির দিকে চেয়ে রয়েছে তিন-তিনটে মূর্তি। নাক সিঁটকে রয়েছে কেবল পীতাম্বর। প্রাগৈতিহাসিক জীব অথবা গুহামানবের চাইতেও অধম বিশেষণ

দুটো বোধহয় মনঃপূত হয়নি।

ফিসফিস করে বললে অলিম্পিয়া, 'ফাদার, পীতাম্বরের চাইতেও জঘন্য লোক আপনি।'

'কেন? কেন? কেন?' যেন বিষম আহত হয়ে পাইপ নামিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে চেয়ে রইল ঘনশ্যাম পাদরি।

'বিপুল ব্যানার্জি পালিয়ে গেল কেন, তা তো বললেন না।'

'পালিয়ে গেল তুমি পথে বসেছ শোনামাত্র। মুখ থেকে কথাটা খসতে-না-খসতেই বেশ কিছুক্ষণ ডাঙায় ওঠা মাছের মতো খাবি খেয়েছিল অবশ্য। বড্ড বেশি স্বপ্ন দেখে ফেলেছিল কিনা—রাজরানি হবে রাজকন্যেকে বিয়ে করে, টাকার আণ্ডিল নিয়ে পৃথিবীটাকে চক্কর দিয়ে বেড়াবে—কত কী প্ল্যানই ঘুরঘুর করছিল মাথার মধ্যে। আকাশ থেকে মাটিতে পড়ায় ঘিলুটিলু দারুণ ঝাঁকুনি খাওয়ায় কিছুক্ষণ কিং...কিং—কী যেন কথাটা?'

'কিংকর্তব্যবিমূঢ়।' বললে অলিম্পিয়া।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপরেই চটপটে ব্রেন চালিয়ে চকিতে কর্তব্য স্থির করে নিলে। এমতাবস্থায় কপর্দকহীন ভাবী বউকে ফেলেই চম্পট দেওয়া বিধেয়। যার টাকা নেই, সেরকম মেয়েকে বিয়ে করার মতো গোমূর্খ অন্তত নয় বিপুল ব্যানার্জি। ভয়ানক স্পিডে তাই ছুটে গেল বাড়ির মধ্যে—তারপর—'

'ভয়ানক স্পিডে পাঁচিল টপকে পালাল এমন জায়গায়, আমার নামও যেখানে পৌঁছবে না।' ভারি মিষ্টি গলায় বললে এবার অলিম্পিয়া, 'কিন্তু বাবাকে খবরটা কে দিয়েছিল শুনি? আপনি?'

'পাগল নাকি! কিন্তু এসব কথা হাওয়ার আগে ছোটে। কপর্দকহীন হয়েছেন, এ খবরটা পেয়েই ফিরে এসেছিলেন স্যার প্রদ্যুম্ন। ভারি রাগী মানুষ তো। রাগে ফুঁসতে-ফুঁসতে যাত্রার পোশাক পরেই চলেছিলেন সলিল মুখার্জির দফারফা করবেন বলে—পোশাক পালটানোর মতো মেজাজও ছিল না। হাবভাব দেখেই পীতাম্বর আঁচ করেছিল, নিশ্চয় বিরাট একটা গন্ডগোল হয়েছে। রাশভারী মনিবকে জিগ্যেস করার সাহসও নেই—অথচ গন্ডগোলটা জান দিয়েও মিটিয়ে ফেলার জন্যে আকুলিবিকুলি করছে বুকের ভেতরটা। কী করা উচিত ভেবে না পেয়ে দোনামোনা মনে ছুটছিল স্যার প্রদ্যুম্নর পেছন-পেছন। দেখে খটকা লেগেছিল বিপুল ব্যানার্জির। দ্বিধাটা কেন, তা আঁচ করতে পারেনি। মনে-মনে হিরো হওয়ার বাসনা থাকে সব মানুষেরই—পীতাম্বরও হিরো হতে চেয়েছিল। সমুদ্রের ধারে ভেবেছিল একলাই রয়েছে —কেউ দেখতে পাবে না। তলোয়ার বার করে বাচ্চাছেলের মতো আস্ফালন জুড়েছিল তোমার বাবার পেছনে—দূর থেকে দেখে বিপুল ব্যানার্জি ভেবেছে, মনিবকেই কচুকাটা করতে চলেছে পীতাম্বর পাগলা—'

'খবরদার! পাগলা বলবেন না!' খ্যাঁক করে ওঠে পীতাম্বর।

মুচকি হাসে অলিম্পিয়া, 'চোপরাও! গুহামানবেরও অধম কোথাকার!—ফাদার, তারপর কী হল?'

'তোমার বাবা থানায় খবর পাঠিয়েছিলেন আগেই। তাই হনহন করে 'সবুজ মানুষ' চায়ের দোকানের দিকে আসছিলেন ইনসপেক্টর রাজীবলোচন—তাই তো?'

'হ্যাঁ।' বললে রাজীবলোচন।

'পীতাম্বর শেষমেশ আস্ফালনই করে গেছে, অগ্নিশর্মা মনিবের পেছন-পেছন আর

যায়নি—গেলে খুনটা আটকানো যেত। গুহামানবদের অধম যারা—'

'তাদের বুদ্ধিও থাকে কম।' পাদপূরণ করল অলিম্পিয়া। 'কিন্তু আপনি জানলেন কী করে খুন করেছে সলিল মুখার্জি?'

'গোড়াতেই একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছিল বলে। রাজীবলোচনবাবু এসে খবর দিলেন, জলে ডুবে মারা গেছেন স্যার প্রদ্যুম্ন মল্লিক। আমরা কিন্তু তখন জানি, উনি বাড়ি ফিরে আসছেন জলপথ যাত্রা স্থগিত রেখে। জলে ডুবে গেছেন—এই কথাটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে যে মৃত্যু-দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তা হল সমুদ্রের জলে ডুবে মৃত্যু। সেই দৃশ্য মনের মধ্যে নিয়েই আমি জিগ্যেস করেছিলাম—কখন? কিন্তু সলিল মুখার্জির মনের মধ্যে ভাসছিল অন্য মৃত্যু-দৃশ্য। উনি ফস করে জিগ্যেস করলেন, 'কোথায়?' অবান্তর প্রশ্নটা শুনেই বোঁ করে মাথাটা ঘুরে গেল আমার। সমুদ্র থেকে ফেরার পথে যে মারা যায়—সে তো সমুদ্রেই ডুবেছে ধরে নিতে হবে। তা সত্ত্বেও উনি প্রশ্ন করলেন, মৃত্যুটা ঘটেছে কোথায়। তার মানে, উনি জানেন মৃত্যুর জায়গাটা—মানে, মৃতদেহটাকে যেখানে রেখে এসেছেন—সেই পুকুরটা—যার দূরত্ব সমুদ্র থেকে বেশি দূরে নয়। একটা জঘন্য খুনির পাশে বসে আছি জেনেই তৎক্ষণাৎ বমি-বমি পাচ্ছিল বলেই অমন ফ্যাকাশে মেরে গিয়েছিলাম। মৃতদেহটাকে সবুজ মানুষ বলে বসেছিলাম। সবুজ শ্যাওলায় সবুজ মৃতদেহটা সমুদ্রের সবুজ শ্যাওলায় সবুজ হয়ে গেলেই বরং ভালো ছিল—এই রকম একটা ইঙ্গিত করেছিলাম। সেই মুহূর্তে জেনে ফেলেছিলাম, স্যার প্রদ্যুম্নর ডেডবডি সবুজ পাঁকের মধ্যেই ঢুকিয়ে দিয়ে এসে ন্যাকা সাজছেন সলিল মুখার্জি। খুন করেছেন যে অস্ত্রটা দিয়ে, জ্ঞানপাপী বলে হাতও দিচ্ছেন না তাতে—

'কোন অস্ত্রটা বলুন তো?' সবিস্ময়ে জিগ্যেস করে রাজীবলোচন।

'যাচ্চলে। তাও দেখেননি? টেবিলে পাশাপাশি ছিল কালি-মাখা ধুলো-মাখা কলম আর চকচকে পরিষ্কার কাগজ-কাটা ছুরি—যা সরু ছোরার মতোই বুকের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে চেপে বসিয়ে দিলেই। সলিল মুখার্জি কলমবাজ মানুষ—কথা বেচে আর কলম চালিয়ে রোজগার করেন—ছুরি চালনা নিশ্চয় তাঁকে মানায় না। কিন্তু কাজের ফাঁকে-ফাঁকে অন্যমনস্ক থাকলে, চকচকে কাগজকাটা ছুরি নিয়ে নাড়াচাড়া করে না, এমন কাউকে দেখাতে পারেন? সলিল মুখার্জি কিন্তু সদ্য পরিষ্কার করা ছুরিটাতে আঙুল না ছুঁইয়ে ধুলো আর কালি-মাখা কলম দিয়েই নাড়াচাড়া করে যাচ্ছিলেন সমানে। ছুরি থেকে রক্তের দাগ ধুয়ে ফেললেও মন থেকে তো ধুতে পারেননি, কাজেই—'

সলিল মুখার্জি সেই দিনই নিজের ব্রেন উড়িয়ে দিয়েছিল রিভলভারের গুলিতে—রাজীবলোচন হাতকড়া হাজির করার আগেই।

ঠিক সেই মুহূর্তেই পুরোনো দিনের মতোই সমুদ্রসৈকতে ছেলেখেলা করতে দেখা গিয়েছিল দুটি মূর্তিকে।

পীতাম্বর আর অলিম্পিয়া।

• *বিদেশি ছায়ায়*

** 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত।*

ইফেল টাওয়ার বিক্রি হয়ে গেল

জোচ্চোরদের জগতে কাউন্ট ভিক্টর লাসটিগ একটা বিস্ময়। একটানা বিশ বছর ধরে সে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে দু-দুটো মহাদেশের বাঘা-বাঘা পুলিশ অফিসারদের। আশ্চর্য তার প্রতিভা। তার বৈষ্ণব-বিনয় দুঁদে রাষ্ট্রদূতকেও লজ্জা দেয়; তার অভিনয় দক্ষতা শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকেও তটস্থ করে। তার বুকের পাটা বনের বাঘকেও হার মানায়।

কাউন্ট ভিকটর লাসটিগ কখনও কারও নকল করেনি। তার মৌলিক কুকীর্তির শ্রেষ্ঠ নজির হল প্যারিসের ইফেল টাওয়ার বিক্রি। এতবড় প্রতারণা জোচ্চুরির ইতিহাসে বিরল।

ইফেল টাওয়ার বিক্রির পুরো ফন্দিটা লাসটিগের মাথায় এসেছিল খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে।

লাসটিগের হাতে তখন কোনও কাজ নেই। সাতদিনও হয়নি নোট-নকলের ম্যাজিক বাক্স বিক্রি করে এক হঠাৎ বড়লোককে পথে বসিয়ে প্যারিসে পালিয়ে এসেছিল লাসটিগ। হাতে মেলাই টাকা। অফুরন্ত সময়। কাজের মধ্যে শুধু ফুটপাতের কাফেতে বসে ভারমুথ খাওয়া আর হাই তুলতে-তুলতে কাগজ পড়া। সঙ্গে রয়েছে পাপকাজের দোসর ড্যাপার ড্যান কলিনস। বাইরের লোকের কাছে তার পরিচয় অবশ্য কাউন্ট ভিকটর লাসটিগের প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে।

লাসটিগের কুঁড়েমি দেখে কলিনস যখন তিতিবিরক্ত, ঠিক তখুনি খবরের কাগজটা ভাঁজ করে এগিয়ে দিল কাউন্ট।

বলল, 'শিকার পাওয়া গেছে। কে টোপ গিলবে, এখুনি তা বলতে পারব না। তবে তার ধান্দা জেনো পুরোনো জং-ধরা লোহা কেনাবেচা। শাঁসালো পার্টি। দু'পয়সা আছে। তক্কেতক্কে রয়েছে নতুন দাঁও পেটবার তালে। নাও, পড়ো।'

বলে, একটা বিশেষ প্রবন্ধ দেখিয়ে দিল লাসটিগ। তাতে লেখা আছে, ইফেল টাওয়ারের যা ঝরঝরে অবস্থা, তাতে শুধু মেরামতি কাজেই হাজার ফ্রাঁ খরচ হবে। তাই গভর্নমেন্ট ভাবছে, খামোকা ঠাট বজায় না রেখে ওটাকে ভেঙে ফেললেই ল্যাটা চুকে যায়। খরচও অনেক কম হয়।

চোখ কপালে তুলে ড্যাপার ড্যান বলল,—'অসম্ভব। এ কাজ আমাদের দ্বারা হবে না। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে?'

'মোটেই অসম্ভব নয়। শক্ত কাজটা খবরের কাগজওয়ালারা আমাদের হয়ে সেরে দিয়েছে। এখন দরকার শুধু সরকারি শিলমোহর আর চিঠির কাগজ। তা নিয়ে ভেবো না। আমার এক বন্ধু আছে, চাইলেই পাঠিয়ে দেবে। এবার গা তোলো, কাজে নামা যাক।'

দিনকয়েক পরে প্যারিসের পাঁচজন কালোয়ারের কাছে সরকারি চিঠি পৌঁছে গেল। চিঠি লিখছেন এমন এক ডেপুটি ডিরেক্টর-জেনারেল ইফেল টাওয়ার যার এখতিয়ারে পড়ে। পাঁচজনকেই তিনি নেমন্তন্ন করেছেন সরকারি চুক্তি সম্পর্কে কথাবার্তা বলার জন্যে। সময় ঃ শুক্রবার। বেলা তিনটে। স্থান ঃ ক্রিলন হোটেলে ডেপুটির স্যুট।

যথাসময়ে এল পাঁচজনে। লাসটিগ বললে, 'মঁসিয়েরা মন দিয়ে শুনুন। প্রধানমন্ত্রী আর প্রেসিডেন্ট ছাড়া এ গোপন খবর আর কেউ জানে না।'

এই পর্যন্ত বলে নাটকীয় ভাবে একটু বিরতি দেওয়া হল। চাট্টিখানি ব্যাপার নয়তো। ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি না করলে কদর পাওয়া যাবে না। সবার কৌতূহল যখন তুঙ্গে, তখন থেমে-থেমে বলল—'গভর্নমেন্ট ঠিক করেছে, ইফেল টাওয়ার ভেঙে ফেলবে।'

আবার থামল লাসটিগ। তারপর বলল, 'মন খারাপ হওয়ার মত খবরই বটে। কিন্তু ভেঙে ফেলা ছাড়া আর পথও নেই। টাওয়ার মেরামতের খরচ তো কম নয়। কাগজে তো দেখেছেনই। ইফেল টাওয়ার তৈরি হয়েছিল ১৮৮৯ সালে প্যারিস প্রদর্শনীর আকর্ষণ হিসেবে। তখন কিন্তু শহরের বুকের ওপর বারো মাস টাওয়ার খাড়া রাখবার কোনও প্ল্যান ছিল না। রুচি যাদের সূক্ষ্ম, তাঁরা তো গোড়া থেকেই রাগারাগি করে এসেছেন টাওয়ারের ছিরিছাঁদ দেখে। প্যারিসের মত শহরে এ টাওয়ার একেবারেই বেমানান। আপনারাই বলুন মানায় কিনা।'

কাউন্টের পাঁচ মক্কেলের অতশত রুচিবোধ না থাকলেও মুনাফা লোভ ছিল বিলক্ষণ। কাজেই পাঁচজনেই একবাক্যে রায় দিল, অবিলম্বে ইফেল টাওয়ারকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া উচিত।

লাসটিগ তখন পাঁচ মক্কেলকে নিয়ে টাওয়ার পরিদর্শনে বেরুল। বুঝিয়ে দিলে, যে টাওয়ার তৈরি করতে সত্তর লক্ষ ফ্রাঁ লাগে, তার ভাঙা লোহা বেচলেও কম মুনাফা হয় না। ভাঙা লোহার মোট ওজন দাঁড়াবে সাত হাজার টন। ঝানু ব্যবসাদারের মত কড়ি বরগার মোট সংখ্যা, প্রতিটির চুলচেরা মাপ, এমনকী ওজন পর্যন্ত বলে গেল গড়গড়িয়ে। সবশেষে বলল, ক্রেতারা যেন আগামী বুধবারের মধ্যে শিলমোহর করা টেন্ডার হোটেলের ঠিকানায় পৌঁছে দেয়। একথাও যেন মনে থাকে, বিষয়টা গভর্নমেন্ট সিক্রেট। অত্যন্ত গোপনীয়। পাঁচকান না হয়।

আসল শিকার কে হবে, সেটা অবশ্য আগেই আঁচ করে নিয়েছিল লাসটিগ। নাম তার আঁদ্রে পয়সন। চাষার ছেলে। সমাজে পাত্তা পায় না। তাই মরিয়া হয়ে পণ করেছে, ঝটপট আরও টাকা কামিয়ে নাক উঁচুদের মুন্ডু ঘুরিয়ে দিয়ে সমাজে গ্যাঁট হয়ে বসতে হবে।

টেন্ডার বুধবারের আগেই এসে গেল। বেস্পতিবার ড্যাপার ড্যান আঁদ্রে পয়সনকে গিয়ে বলে এল, তিনিই সবচাইতে বেশি দাম হেঁকেছেন। সুতরাং এক সপ্তাহের মধ্যেই টাকা জোগাড় করে ফেলল আঁদ্রে পয়সন। আবার গেল ড্যাপার ড্যান। খবর দিল, লাসটিগের হোটেল স্যুটে আর একটা মিটিং হবে এই নিয়ে। ফিরে এসে বলল লাসটিগকে—শিকার ভড়কেছে মনে হচ্ছে। জিগ্যেস করছিল, সরকারি ব্যাপারে দপ্তর ছেড়ে হোটেলে কেন?

শুনে মোটেই ভড়কালো না ফিচেল শিরোমণি লাসটিগ। বলল, 'বেশ তো, আমরা যে সত্যি সত্যিই সরকারি অফিসার, সেটা প্রমাণ করে দিলেই তো মনে আর ধাঁধা থাকে না। সে ভার আমার।'

যথাসময়ে এল শাঁসালো পার্টি। সোল্লাসে বলল লাসটিগ, 'মঁসিয়ে পয়সন, অভিনন্দন নিন। আসুন, আপনার সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সম্মানে আগে এক গেলাস মদ খাওয়া যাক।'

'কনট্র্যাক্টটা আগে সই করলে হয় না?' আমতা-আমতা করল পয়সন।

'তাও তো বটে। আগে কাজ, পরে মদ্যপান,' বলে কলিনস-এর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল লাসটিগ, 'তুমি আপিসে যাও। তিনটের সময়ে আমি আসছি।'

কলিনস চৌকাঠ পেরোতে না পেরোতেই মুখের চেহারা পালটে গেল লাসটিগের। উবে গেল অফিসারি দাপট। কাঁচুমাচু মুখে বলল—'আপনাকে ডেকেছি একটা রফা করার জন্যে। সরকারি অফিসারদের হাঁড়ির হাল কেনা জানে বলুন। ঠাটঠমক বজায় রাখতেই মাইনের টাকা ফুটকড়াই হয়ে যায়। তাই রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে চুক্তি সই করার আগে অফিসারদের—'

'ঘুষ দিতে হয়?' ফস করে বলে ফেলল পয়সন।

'মঁসিয়ে দেখছি দারুণ ঠোঁটকাটা!'

'সেইজন্যেই বুঝি আপিসে না ডেকে বারবার হোটেলে ডাকাচ্ছেন?'

'যা বলেন,' কাষ্ঠহাসি হাসল লাসটিগ।

হঠাৎ নিজেকে 'কী-হনু' মনে হল পয়সনের। ঘুষখোর জাঁদরেল অফিসারের তুলনায় নিজেকে কেউকেটা ঠাউরে নিল। বিজ্ঞের হাসি হেসে বললে, 'দেখুন মঁসিয়ে, আমাকে গেঁইয়া ভাববেন না। এসব কাজে আমি পোক্ত। বলে, এক পকেট থেকে বার করল সার্টিফাই করা একটা চেক। আর এক পকেট থেকে নোটঠাসা মানিব্যাগ। স্মিতমুখে আবার মদের গেলাস এগিয়ে ধরল লাসটিগ। একঘণ্টার মধ্যেই পয়সনের চেক ভাঙিয়ে লাসটিগ কেটে পড়ল অস্ট্রিয়ায়।

মাসখানেক ভিয়েনার সেরা হোটেলে খুব ফুর্তি করল দুই জোচ্চোর—লাসটিগ আর কলিনস। সেইসঙ্গে তন্নতন্ন করে পড়ল প্যারিসের সবকটা দৈনিক। একমাস পর লাসটিগ বলল, 'ওহে কলিনস, বোকাপাঁঠা পয়সন তো দেখছি পুলিশের ছায়াও মাড়াল না। বুঝেছি, কেন। লজ্জা হয়েছে। আহাম্মুকি চেপে যেতে চাইছে, পুলিশকে জানানো মানেই ঢেঁড়া পিটে নিজের বোকামো জাহির করা। এদিকে ইফেল টাওয়ারের দখলও নিল না। তাই ভাবছি, আরেকবার টাওয়ার বেচলে কেমন হয়?'

সত্যি সত্যিই আবার মোটা দামে ইফেল টাওয়ার বেচে দিল লাসটিগ।

তৃতীয়বার বেচবার জন্যে খদ্দের খুঁজছে, এমন সময় দু'নম্বর শিকার এমন হায়-হায় করে উঠল যে পিঠটান দেওয়া ছাড়া পথ রইল না কাউন্ট ভন লাসটিগের।

'মাসিক গোয়েন্দা' পত্রিকায় প্রকাশিত। শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৯।

মূর্তি জালিয়াতির চালিয়াতি

কাহিনিটা ২৫ বছরের পুরোনো। একাদশ শতাব্দীর শিবপুরম নটরাজ মূর্তি স্মাগলড় হয়ে পৌঁছেছিল আমেরিকায়। 'পঞ্চলোহা' মূর্তিটার ওজন পঞ্চাশ কিলোগ্রাম। ১৯৫৬ সালে তাকে উদ্ধার করা হয় মৃত্তিকার তলদেশ থেকে। স্ট্যাচুটি মেজেঘষে ঝকঝকে সুন্দর করে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব দেওয়া হল এক মূর্তি কারিগরকে। ধুরন্ধর কারিগরটি অভিনব উপায়ে প্রতারণা করলেন কর্তৃপক্ষকে—আসল দিলেন বেচে। একটা হুবহু নকল বানিয়ে ফেরত

দিলেন স্ট্যাচু মালিককে।

কিন্তু কারও চোখে ধরা পড়ল না এতবড় জালিয়াতি। পরপর বারোজন ভারতীয়র হাতবদল হল জাল মূর্তি। কারিগর বেচেছিলেন পাঁচ হাজার টাকায়। হাতবদল হতে-হতে সেই মূর্তির দাম গিয়ে দাঁড়াল পাঁচ লক্ষ টাকায়। বিপুল অঙ্কের দামটি পকেট থেকে বার করল এমন এক কারবারি যার বিলক্ষণ সুনাম আছে 'হুন্ট স্ট্যাচু' কেনাবেচায়।

নিউইয়র্কের এক সংগ্রাহক মূর্তিটি হাতে পেয়ে আনন্দে উল্লসিত হয়ে তো বলেই ফেললেন—পাঁচ লক্ষ রুপেয়া এর দামই নয়—হওয়া উচিত নব্বই লক্ষ।'

মূর্তিটি বর্তমানে রয়েছে সাইমন নর্টন ফাউন্ডেশনে। তারা কত দাম দিয়েছিল 'হুন্ট স্ট্যাচু'টির মালিক হওয়ার জন্যে, তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি—কোটির ওপর তো বটেই।

কিন্তু আমেরিকা এক আশ্চর্য দেশ। অন্যদেশের সম্পত্তি চুরি করে এনে হজম করবে দেশের একটা নামী সংস্থা, তা জেনেশুনে চোখ বুজে থাকার পাত্র তারা নয়। প্রতিবাদের ঝড় উঠল দেশময়। ইন্ডিয়া হলে পাবলিকের আপত্তিতে বয়ে যেত যে-কোনও মূর্তি সংগ্রাহকের, কিন্তু সাইমন নর্টন ফাউন্ডেশন শেষপর্যন্ত রাজি হল চোরাই মাল ফিরিয়ে দিতে।

কিন্তু ধুরন্ধর ইন্ডিয়ান কারিগরকে তো আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। আরও চারটে অনুরূপ বিগ্রহ তাকে দেওয়া হয়েছিল মাজাঘষার জন্যে—তাদের কপালে কী জালিয়াতি ঘটেছে, কে এখন সে রহস্যের সমাধান করবে? ডিটেকটিভ কোথায়? ফেলুদা, ব্যোমকেশ, ইন্দ্রনাথ-কিরীটির তলব তো এখনও পড়েনি।

এই একটি ঘটনা থেকেই অ্যান্টিক সামগ্রী দেখলেই এখন সমঝদার ব্যক্তিরা আঁতকে উঠছেন। আসল কি নকল যাচাই করবে কে? মিউজিয়ামে এমনি অ্যান্টিকের তো পাহাড় জমে রয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে কোনটা জাল, কোনটা আসল চীজ—তা কে জানছে? চুরি যেমন ধরা পড়ছে না, জালিয়াতিও তেমনই ধরাছোঁয়ার বাইরে!

আশ্চর্য, নয় কী?

পুরীর জগন্নাথ মহাপ্রভুর হিরের চোখ চুরি হয়ে গেল যখন, তখন ছোটখাট মন্দির দেবালয়ের লুঠতরাজের কাহিনি দেশবাসীর কানে আদৌ কি পৌঁছোচ্ছে? ১৯৭৩ সালের আর্টস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিস অ্যাক্ট-য়ের যথা প্রয়োগ করার লোক কোথায়? তা না হলে চিতোরগড় অস্ত্রাগারে এমার্জেন্সির সময়ে সংরক্ষিত একশোটা মূল্যবান বিগ্রহ হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে কেন? কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল মাত্র গতবছর, যখন বিগ্রহ-মালিক মূর্তিগুলো ঘষামাজার জন্যে চেয়ে পাঠালেন দরখাস্ত মারফৎ।

যাক সে কথা, নটরাজ-জালিয়াত ভদ্রলোক নকল-মূর্তি বানানোর এমন খাসা কায়দাটি নিজেই উদ্ভাবন করেছিলেন, না, ভুবন কাঁপানো ঠিক এই ধরনের আর একজন জালিয়াতকে গুরু বলে মেনে নিয়েছিলেন, সেই আলোচনাই এখন করা যাক—কাগুজে-গোয়েন্দাগিরিও বলতে পারেন।

চলুন, সময়ের সড়কে অতীত ভ্রমণে যাওয়া যাক।

সালটা ১৯২০। রোম শহর। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন (অদৃশ্য অবস্থায় অবশ্য) একটা খুদে স্টুডিওর মধ্যে। কৃষ্ণনগরে মূর্তি কারিগরদের স্টুডিও দেখেছেন? হুবহু সেই রকমই

এই স্টুডিওটি। সমাপ্ত, অর্ধসমাপ্ত মূর্তি এবং বিস্তর পাথরের স্তূপ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ছোট্ট স্টুডিওটিতে।

ছেনি হাতুড়ি নিয়ে তন্ময় হয়ে খটাং-খটাং করে মূর্তি খোদাই করে চলেছেন ওই যে শিল্পীটি, ওঁর নাম অ্যালসিও ডোসেনা। ইটালিয়ান। নামী শিল্পী নন। আসলে উনি পাথর খুদে নতুন-নতুন বাড়ির কার্নিশ তৈরি করে পেট চালাতেন। এখন তাঁর ভাবনাচিন্তা উধাও হয়েছে কয়েক শতাব্দী পেছনে। বাটালির এক-এক কোপে প্রবেশ করছেন ফ্যানট্যাসি দুনিয়ার আরও গভীরে। নিজেকে এখন লিওনার্ডো দ্য ভিন্সির জায়গায় বসিয়েছেন। এরপর অবশ্য হবেন মাইকেল এঞ্জেলো—হবেন গ্রেট রেনেসাঁ যুগের আরও অনেক ভাস্কর—যাঁদের কীর্তি তিনি জানেন এবং ভালোবাসেন।

অস্থিরতার শুরু এই ভাবনাচিন্তা ভালোবাসা থেকেই। কার্নিশ তৈরির কাজ একদিন নিক্ষেপ করলেন—দূর, দূর। এর মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ কোথায়! এক-ডেলা মার্বেল পাথরের ওপর ঝুঁকে পড়লেন বাটালি হাতুড়ি নিয়ে। শুরু হয়ে গেল খোদাই কর্ম। ফ্যানটাসি স্বপ্নে মশগুল থাকায় তখন কিন্তু জানতেনও না যে, অজান্তে যে পথ উনি ধরলেন, সেই পথেই অচিরে তাঁর বরাতে নাচছে বিশ্বব্যাপী কুখ্যাতি।

দীর্ঘ আট বছর ধরে খ্যাতির স্বপ্নজগতে বিচরণ করলেন পাথর রাজমিস্ত্রি। ডজন-ডজন অপরূপ সুন্দর খোদাই বানিয়ে গেলেন খুদে কারখানায়। তারপরেই ১৯২৮ সালের যাচ্ছেতাই এক নভেম্বর দিবসে যেন প্রচণ্ড ভূমিকম্পে নড়ে উঠল শিল্প-দুনিয়া ঃ নিউইয়র্ক, ক্লিভল্যান্ড, বোস্টন, রোম, বার্লিন এবং মিউনিখের কর্তৃপক্ষরা আঁতকে উঠল ভয়াবহ একটা সংবাদে—বহু কষ্টে সংগ্রহ করা তাঁদের অধিকাংশ অমূল্য খোদাই শিল্পই নাকি জাল-কার্নিশ মিস্ত্রীর নির্দোষ সাধনার ফলশ্রুতি অনুপম শিল্প নিদর্শন ঢুকে বসে আছে মিউজিয়ামে মিউজিয়ামে!

বিশ্ববন্দিত গুরুদেবদের মহান শিল্পকর্ম বছরের পর বছর খুঁটিয়ে দেখেছিলেন ডোসেনা। বিশেষ করে একজন আর্টিস্ট তাঁর চিন্তাজগতে আলোড়ন তুলেছিল সবচেয়ে বেশি—নাম তার সাইমন মার্টিনি—চতুর্দশ শতাব্দীর চিত্রশিল্পী।

মার্টিনি কিন্তু পাথর নিয়ে কোনওদিন কাজ করেননি। ডোসেনা মার্টিনির ক্যানভাসে আঁকা শক্তিশালী চিত্রকর্ম দেখতে-দেখতে কল্পনারঙিন চোখে দেখেছিলেন, মার্টিনির হওয়া উচিত ছিল ভাস্কর। চোখ বন্ধ করে ডোসেনা যেন স্পষ্ট দেখতে পেতেন ছ'শো বছর আগে মার্বেল খোদাই করে মার্টিনি সৃষ্টি করছেন সারি-সারি অদ্ভুত সুন্দর মূর্তি।

সৃষ্টির প্রেরণা অথবা আইডিয়ার ঝলক তো এমনি করেই উন্মত্ত করে তুলেছে শিল্পীদের যুগ-যুগ ধরে। ডোসেনাই বা বাদ যান কেন! পরিত্যক্ত পাথর খাদে আর প্রহরাহীন ধ্বংসস্তূপে ঘুরে-ঘুরে ডোসেনা শেষপর্যন্ত সংগ্রহ করলেন শিরাসমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট মার্বেল পাথর—ঘর বোঝাই করে ফেললেন এই পাথরে। রেনেসাঁ যুগের ভাস্কররা যে-পাথর নিয়ে কালজয়ী সৃষ্টি করে গেছেন, এ সেই পাথর। তারপর মার্টিনি যে স্টাইলে পেন্টিং করেছেন, হুবহু সেই স্টাইলের অনুকরণে নিপুণ হাতে খোদাই করলেন অতীব সুন্দর একটা ম্যাডোনা ও শিশুমূর্তি।

এরপর রেনেসাঁ যুগের অন্যান্য যেসব শিল্পীদের মনে-মনে পূজা করেছেন ডোসেনা, তাঁদের বিশেষ কায়দা অনুকরণ করলেন এবং হুবহু সেই স্টাইলে সৃষ্টি করলেন চমকপ্রদ স্ট্যাচুর পর স্ট্যাচু।

নিজের কীর্তি দেখে নিজেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ডোসেনা। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেতেই

সাহসও বাড়ল। সময়-পথে পেছিয়ে গেলেন আরও পেছনে। গ্রিক ধ্বংসস্তূপ ছিল আশেপাশেই। সেখান থেকে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করেছিলেন এমন সব মার্বেল পাথর যা ব্যবহার করা হয়েছে এথেন্সের মতো গৌরবময় যুগে। এইসব মার্বেল খুদে সূক্ষ্ম মূর্তির-পর-মূর্তি বানালেন, যা দেখলেই মনে হবে গ্রিসদেশের স্বর্ণযুগ ফিরে এসেছে—প্রতিটি মূর্তি যেন খোদিত হয়েছিল সেই সময়ে।

পাথর-মিস্ত্রির কারখানা ধীরে-ধীরে মিউজিয়ামের রূপ নিতে লাগল এইভাবেই। কোণে-কোণে খাড়া রইল পঞ্চাদশ শতাব্দীর সমাধি মন্দিরের খোদিত অংশ—কে বলবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে নয়—আসল জিনিসের সঙ্গে তফাত নেই কোথাও; রইল চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মিত প্রদীপের তৈলাধারের নকল আর গ্রীক দেবীমূর্তি।

সৃষ্টির খেয়ালেই বুঁদ হয়েছিলেন ডোসেনা—বিক্রি করার কোনও চেষ্টাই করেননি। কিন্তু একদিন পাথর-মিস্ত্রীর রেনেসাঁ স্ট্যাচু দেখতে এলেন আলফ্রেডো ফাসোলি নামে এক অ্যান্টিক ডিলার। প্রাচীনকালের দুষ্প্রাপ্য ললিতকলার সামগ্রী বেচাকেনাই তাঁর ব্যবসা। কাজেই চেনবার চোখ তাঁর ছিল। নকল মূর্তি দেখে তো তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। কিন্তু মহাধুরন্ধর বলেই উত্তেজনার প্রকাশ ঘটতে দিলেন না চোখেমুখে। বললেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে, 'দূর! দূর! এসব জিনিসের আবার বাজার আছে নাকি! তবে আপনি যদি চান, এখানকার বোঝা খানিকটা কমিয়ে দিতে পারি—সস্তায় যদি দিতে পারেন, তবেই।'

ডোসেনা বেচারি জানবেন কী করে চতুর ফাসোলির মাথার মধ্যে তখন ঘুরছে অন্য প্ল্যান? তাই রাজি হয়ে গেলেন এককথায়। পাথর-মিস্ত্রির একটা খোদাই মূর্তি নিয়ে ফাসোলি গেলেন তাঁরই এক সতীর্থের কাছে। এঁর নাম পালেসি—আন্তর্জাতিক আর্ট মার্কেটে দারুণ নাম—একডাকেই সবাই চেনে। দুই ধুরন্ধর বিহ্বল চোখে অনিমেষে চেয়ে রইলেন অনিন্দ্যসুন্দর স্ট্যাচুটির প্রতিটি খাঁজ, ভাঙাচোরা, ফাটাফুটো, রং জ্বলে যাওয়া অংশের দিকে—সবই যেন আসলের ভাঙচোর এবং বিবর্ণতা! বহু শতাব্দী পরে সব মূর্তিতেই যা দেখা যায়। মূর্তি বেচে লাভের অঙ্কও ভেসে উঠল চোখের সামনে।

রোমের একটা মিউজিয়ামে বিক্রির জন্য হাজির করা হল সেই স্ট্যাচু। মিউজিয়ামের অফিসাররা মূর্তি দেখেই বললেন, 'উঁহু, এ যে জাল মনে হচ্ছে!' বুক ধড়াশ-ধড়াশ করতে লাগল দুই প্রবঞ্চকের। তলব পড়ল মূর্তি বিশেষজ্ঞদের। তারা খুঁটিয়ে দেখে রায় দিল একবাক্যে—'আসলি চিজ!'

আনন্দে নেচে উঠলেন প্রতারক-যুগল। আর্ট এক্সপার্টদের কথার ওপর আর তো কথা বলা যায় না। মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ মোটা দাম মিটিয়ে দিলেন এমন একটা আসলি চিজ সংগ্রহ করে আনার জন্যে।

ডোসেনাকে অবশ্য বলা হল, সস্তার নকলি চিজ হিসেবে বিকিয়ে গেছে মূর্তিটা—দাম পাওয়া গেছে সামান্যই। খানকয়েক নোট জুটল তার বরাতে! সামান্য টাকা পেয়ে আনন্দে আটখানা হয়েই ফাসোলির ফাঁদে পা দিলেন ডোসেনা। ওঁর সমস্ত খোদাইকর্মের একমাত্র বিক্রয়স্বত্ব চাইলেন অসৎ আর্ট ডিলার ফাসোলি। কৃতজ্ঞচিত্তে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন পাথর-মিস্ত্রি। তাঁর এই সামান্য শিল্পকর্মে এত আগ্রহ দেখেই তিনি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছিলেন— অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করার বুদ্ধি হারিয়েছিলেন সেই কারণেই। ফলে রেনেসাঁ আমলের অকৃত্রিম শিল্প নিদর্শন হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হল ডোসেনার আরও অনেক স্ট্যাচু—সারা ইউরোপের মিউজিয়াম আর প্রাইভেট সংগ্রাহকরা কাড়াকাড়ি করে নিয়ে গেল সেগুলো।

প্রতিবারেই সামান্য টাকা গুঁজে দিয়ে গেলেন ফাসোলি পাথর-মিস্ত্রির হাতে, সেই সঙ্গে শুনিয়ে গেলেন হাড় কালি হয়ে যাচ্ছে তাঁর নকলি চিজ বেচতে গিয়ে—নকলের দর কি বেশি পাওয়া যায়? ডোসেনা ঘুণাক্ষরেও কিছু সন্দেহ করলেন না—প্রশ্নও করলেন না! উলটে আরও উৎসাহিত হয়ে একটার পর একটা মাস্টারপিস উৎকীর্ণ করে গেলেন বাটালি-হাতুড়ি দিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

বিশ্বের বহু বিখ্যাত মিউজিয়াম ধোঁকা খেয়ে গেল ডোসেনার গ্রিক আর রেনেসাঁ ললিতকলার নিদর্শন চড়া দামে কিনে। নিউইয়র্ক সিটির মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অফ আর্ট কিনেছিল একটা গ্রীক কুমারীর প্রস্তরমূর্তি—যার বয়স নাকি খ্রিস্টপূর্ব ৫০০! ক্লিভল্যান্ড মিউজিয়াম বর্তে গেল ম্যাডোনা এবং শিশুর একটা দারুণ মূর্তি পেয়ে—এ মূর্তির স্রষ্টা নাকি জিওভানি পিসানো; চতুর্দশ শতাব্দীর প্রাতঃস্মরণীয় এই ভাস্করের পাথরের কাজ এতকাল অনাবিষ্কৃতই ছিল! বোস্টনের মিউজিয়ামে অফ্ ফাইন আর্টস তো উর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করতে বাকি রেখেছিল রেনেসাঁ ভাস্কর মিনো দ্য ফিসোল নির্মিত একটা পাথরের শবাধার পেয়ে! পরে যখন ধোঁকাবাজি ধরা পড়ল, তখনও কিন্তু বোস্টন মিউজিয়ামের এক মুখপাত্র মন্তব্য করেছিলেন—'হোক জালিয়াতি, এমন জিনিস সাজিয়ে রাখতে ইচ্ছে যায়। বড় সুন্দর! বড় সুন্দর! যে-ই করুক না কেন, তাতে কিস্‌সু এসে যায় না।'

এই তো সেদিন ১৯৫৮ সালে, কয়েকজন আর্ট এক্সপার্ট বলে বসলেন, সেন্ট লুই মিউজিয়ামে পরম যত্নে সংরক্ষিত 'ডায়ানা উইথ ফন' প্রস্তরমূর্তিটাও নাকি ডোসেনার স্টুডিওতে তৈরি হয়েছে। কিন্তু তাতেও কি চৈতন্য হয় মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের! সঙ্গে-সঙ্গে একান্ন পৃষ্ঠার ইয়া লম্বা একখানা প্রতিবেদন ছাপিয়ে তাঁরা ছড়িয়ে দিলেন বিশেষজ্ঞ মহলে—জিনিসটা বিলকুল খাঁটি, তার স্বপক্ষে হাজার-হাজার যুক্তি প্রমাণ হাজির করে সযত্নে স্ট্যাচুটাকে সাজিয়ে রাখলেন মিউজিয়ামের স্ফটিক-আধারে!

এ তো বড় তাজ্জব কি বাত! তাবড়-তাবড় শিল্প-বিশেষজ্ঞরা বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম কলকবজার ব্যবহার সত্ত্বেও ডোসেনার শিল্পকর্মে জালিয়াতি ধরতে পারলেন না কেন? কেন বারে বারে ধোঁকা তো খেলেনই, উলটে জাল জিনিসকেই আসল প্রমাণ করার জন্যে কোমর বেঁধে লাগলেন?

কারণ একটাই। তাঁর আগে কোনও জালিয়াত যা কখনও করেননি, উনি তাই করেছেন। প্রতিটি শিল্পকর্মের মধ্যে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন। নিবিড় নিষ্ঠা সহকারে অত্যুৎকৃষ্ট ললিতকলা সৃষ্টি করেছেন—জাল করবেন বলে করেননি, সৃষ্টি করবেন বলেই করেছেন। সৃষ্টির আনন্দে সৃষ্টি বলেই তাঁর সৃষ্টিকে আসল বলে সোচ্চার হয়েছে ধোঁকা খাওয়া মানুষগুলো।

শোনা যায়, ডোসেনা নাকি একটা গুপ্ত রসায়ন আবিষ্কার করেছিলেন। পাথর ফুঁড়ে কেমিক্যালটা প্রবেশ করত ভেতরে এবং পাথরের গায়ে মাটির দাগ ফুটিয়ে তুলত এমন নিখুঁতভাবে যে দেখেই মনে হত যেন মহাকালের নিষ্ঠুর হস্তক্ষেপে কালজীর্ণ হয়েছে মূর্তিগুলো।

আরও একটা কারণ আছে বইকি। খোদাই কর্মগুলোকে যথাবিহিতভাবে যাচাই করেনি বেশিরভাগ মিউজিয়াম।

সবচেয়ে বড় কারণ কিন্তু ওই একটাই। খুঁটিয়ে পরীক্ষা সত্ত্বেও নকলকে নকল বলে চেনা যায়নি কেননা নকল-মাস্টার অ্যালসিও ডোসেনা ছিলেন বাস্তবিকই প্রতিভাধর—জিনিয়াস।

জিনিয়াস হলেও সৃষ্টিকর্মগুলো তো আসল নয়। কাজেই এমন জিনিস ফেরি করতে বেরিয়ে পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে রইলেন ফাসোলি আর তাঁর প্রবঞ্চক সতীর্থ। কোনও স্ট্যাচু সম্বন্ধে কোনও মিউজিয়াম সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেই সঙ্গে-সঙ্গে টাকা ফেরত দিয়েছেন দুজনে। এত সতর্কতা সত্ত্বেও ১৯২৮ সালে জব্বর দুটো ভুল করে ফেললেন ঠগযুগল। চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে ঠকাতে গেলেন ডোসেনাকে এবং নকলি স্ট্যাচুগুলো বিক্রি করতে গেলেন ফ্রিক কালেকশন অফ নিউইয়র্কে।

দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীগুলো দেখে আকৃষ্ট হয়েও কিন্তু হুঁশিয়ার রইলেন মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ। টাকাকড়ি মিটিয়ে দেওয়ার আগে ঠিক করলেন নিজেদের এক্সপার্টদের পাঠাবেন ইটালিতে যাচাই করে নেওয়ার জন্যে। বড় অশুভ লগ্নে এসে পৌঁছল আমেরিকান বিশেষজ্ঞরা। আর একজন সাক্ষাৎপ্রার্থী এসে চমকপ্রদ একটা সমাচার দিয়ে গিয়েছিল ডোসেনাকে—তাঁর শিল্পসামগ্রী নাকি আসল রেনেসাঁ সামগ্রীরূপে প্রদর্শিত হচ্ছে বার্লিন মিউজিয়ামে।

আঁতকে উঠলেন ডোসেনা। সর্বনাশ! তাহলে তো দেখা যাচ্ছে তাঁর সব শিল্পকর্মই অসৎ উদ্দেশ্যে কিনেছে তাঁর এতদিনের দুই উপকারী দোস্ত। তিনি নিজেও তো এই প্রতারণার শরিক হয়ে পড়েছেন নিজের অজান্তেই! ভয়ের চোটে মামলা দায়ের করে বসলেন ডোসেনা।

খবরটা যাতে ফ্রিক প্রতিনিধিদের কানে না পৌঁছয়, সে চেষ্টার কসুর করেননি ফাসোনি আর প্যালেসি। কিন্তু অচিরেই চাঞ্চল্যকর খবরটা ছড়িয়ে পড়ল আটলান্টিকের দুই পারের দুই মহাদেশের সবক'টা খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড়-বড় হেডলাইনের আকারে। হিসেব করে দেখা গেল, ডোসেনার জাল মাল বেচে ফাসোলি, প্যালেসি আর একটি বেনামী আন্তর্জাতিক ললিতকলার কোম্পানি পকেটস্থ করেছে প্রায় এক কোটি আশি লক্ষ টাকা! শুধু একটা খোদাই কর্মই বিক্রি হয়েছে এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকায়।

জোর তদন্ত চালালেন ইটালিয়ান গভর্নমেন্ট। প্রমাণ করে দিলেন তিপ্পান্ন বছর বয়স্ক ডোসেনার কোনও দোষই নেই। প্রবঞ্চক দুজনকে বাধ্য করলেন প্রতারিত ক্রেতাদের অন্তত কিছু টাকা ফিরিয়ে দিতে।

এত কাণ্ড হয়ে যাওয়ার পরেও রেনেসাঁ স্টাইল নিয়ে কাজ চালিয়ে গেলেন ডোসেনা—যা তাঁর প্রাণ, যা তাঁর সাধনা—তা ছাড়েন কী করে? এই সাধনার মধ্যেই ছিলেন তিনি আমৃত্যু—মারা যান সাত বছর পরে— মৃত্যুর পরে কিন্তু একটা শ্লেষাত্মক উপসংহার গজিয়ে উঠল তাঁর কাহিনিতে।

১৯৩৩-এর ৯ই মার্চ নিউইয়র্কের হোটেল প্লাজায় গ্র্যান্ড বলরুমে অ্যালসিও ডোসেনার অনুপম ললিতকলার ৩৯টি সংগ্রহ নিলেম করে বিক্রি করে দেয় ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি। একটির পেছনে সবচেয়ে বেশি দাম ওঠে মাত্র ৬২৭৫ টাকা। পুরো সংগ্রহটি বিক্রি হয় ৮২,১২৫ টাকায়। প্রতি ক্রেতাকে একটা রুচিসুন্দর প্রশংসিকা অর্পণ করেন ইটালিয়ান গভর্নমেন্ট। ভাবগম্ভীর ভাষায় তাতে গ্যারান্টি দিয়েছিলেন সরকার—প্রতিটি শিল্পসামগ্রী 'আসল নকল'!

কে জানে, শিবপুরম নটরাজনের জালিয়াত ভাস্কর ডোসেনাকেই গুরু বলে মেনে নিয়েছিলেন কিনা!

•

* *'ক্রাইম' পত্রিকায় প্রকাশিত।*

সবচেয়ে বড় হিরে

লর্ড ডানসানী শুধু লেখক হিসেবে নয়, সৈনিক, ক্রিকেট-খেলোয়াড় আর শিকারি হিসেবেও ওদেশে সুপরিচিত। হালকা রসিকতা মিশিয়ে আষাঢ়ে গল্প পরিবেশনায় তাঁর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বিলিয়ার্ডস্ ক্লাবের সভ্য জরকেন্স হল তাঁর অননুকরণীয় সৃষ্টি। তাঁরই 'Travel Tales' থেকে 'A Large Diamond' অনুবাদ করা হল। আজ পর্যন্ত জরকেন্সের গল্পের সত্যতা নিয়ে কেউই চ্যালেঞ্জ করার স্পর্ধা দেখায়নি—তবুও শ্রোতাদের অস্বস্তিও কমেনি এক বিন্দুও।

আগুনের সামনে বসেছিলাম আমরা ক'জন। লাঞ্চের পর ক্লাবের এই ঘরটাতেই নিয়মিত জমায়েত হই আমরা। সোফাতে কয়েকজন গা এলিয়েছিল, বাকি সবাই বসেছিল এদিকে ওদিকে ছড়ানো চেয়ারগুলোতে। শীতের ম্যাজমেজে বিকেল, কুয়াশায় ধোঁয়াটে হয়ে এসেছে চারদিক। বিকেল তো নয়—রাত্রিই বলা উচিত। বেলা এগারোটায় যে দিনের শুরু হয়েছিল, তিনটে বাজার আগেই তা মুছে গিয়ে যেন রাতের ঘোমটা টানা শুরু হয়ে গেছে। এহেন অলস অপরাহ্নে না জানি কত মধুর চিন্তাই ভিড় করে আসে মনে, সে বিকেলে কিন্তু কুয়াশায় হাবুডুবু খেয়ে রীতিমত মুষড়ে পড়েছিলাম আমরা। যতদূর মনে পড়ে এইভাবে শুরু হয়েছিল আমাদের কথাবার্তা।

'আশ্চর্য! এ যে মস্ত বড় হে!'

'মস্ত বড়? কোনটা?'

'এই হিরেটা।'

'ওঃ। আমি ভাবলাম তুমি বুঝি মাছটার কথা বলছ।'

'মাছ নয় এটা, হিরে।'

'কিন্তু শুধু ছবি দেখে ওভাবে তো কিছুই বলা সম্ভব নয় তোমার পক্ষে।'

'নিশ্চয়ই সম্ভব।'

'কী করে?'

'হিরের আসল মাপের ছবি এটা।'

'বুঝলে কেমন করে?'

'আরে গেল যা, তা তো লেখাই রয়েছে।'

'তোমার কি মনে হয় সম্পাদক মশাইও সঠিক মাপ জানেন?'

'নিশ্চয় জানেন।'

'কেমন করে?'

'কী মুস্কিল! এরকম একটা দামি পাথরকে পৃথিবীতে চেনে না কে? শুধু কষ্ট করে একে-ওকে জিগ্যেস করা, তার বেশি তো নয়।'

'কিন্তু শুধু একটা ছবি দেখে হিরের আকার বলা যে কী করে সম্ভব, তা তো ভেবে পাচ্ছি না।'

'পাচ্ছ না?'

'না।'

'না পেলেও খুবই বড় হিরেটা।'

'তবে বড়।'

'চমৎকার। আমিও তাই বলছিলাম।'

বাগ্‌বিতণ্ডার এই একঘেয়েমি থেকে শুধু একটি জিনিসই আমাকে রেহাই দিলে। তা হল জরকেন্সের মাথা নাড়া। সেদিন ক্লাবেই ছিল জরকেন্স। গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ছিল সে। মস্তবড় হিরেটার প্রসঙ্গ শুরু হওয়ার সময়ে প্রথমে সে মাথা নাড়ে—তারপর আগাগোড়া কথা কাটাকাটির সময়ে আস্তে-আস্তে মাথা নেড়েই চলল সে। প্রথমে ওকে আমি বিশেষ লক্ষ করিনি; হয়তো করতামই না, যদি না 'মস্তবড় হিরে' এই শব্দ দুটো প্রতিবার শোনার সঙ্গে-সঙ্গে প্রবলতর হয়ে উঠত তার মাথা নাড়ার বেগ। শুধু এইটুকু না থাকলে তার মতানৈক্যের একঘেয়েমি হয়ত আমার দৃষ্টিই আকর্ষণ করতে পারত না। নিশ্চয় কিছু বলবে জরকেন্স, এই আশায় কান খাড়া করে রইলাম—কিন্তু টুঁ শব্দটি এল না ওর দিক থেকে। অথচ বসে-বসে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে সে মাথা নাড়তে লাগল যে আমার মনে হল হিরে সম্বন্ধে এমন কিছু নিশ্চয় ও জানে যা আজ পর্যন্ত আমরা শুনিনি। কিন্তু এতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পাত্র তো সে নয়। শেষপর্যন্ত কৌতূহল চাপতে না পেরে আমিই ওর নীরবতা ভঙ্গ করলাম। নিরেট-মাথা তর্কবাগীশ দুজন কাগজের নক্সা নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা সবে শেষ করেছে। কাগজটার দিকে একঝলক তাকিয়ে নিয়ে সোজা শুধোলাম জরকেন্সকে, 'হিরেটা সত্য-সত্যিই মস্তবড় হে, তাই না?'

'না।' শান্তভাবে বলল জরকেন্স।

'কেন নয়?' বললাম আমি। 'এর চাইতে বড় হিরে কি তুমি দেখেছ?'

'হ্যাঁ। বললে ও।

'কোথায়?'

'যারা এরকম একটা পাথরকে মস্তবড় বলে মনে করে—তারা আমার কাহিনি বিশ্বাসই করবে না।' বললে জরকেন্স।

আমার যতদূর স্মরণ হয়, স্কেচটা কোহিনূরের।

বললাম, 'আমি কিন্তু করব।'

আরও দু-একজন, খুব সম্ভব কুয়াশায় তিতিবিরক্ত হয়ে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'আমরাও।'

শুনে বেশ খুশি হয়ে উঠল জরকেন্স—উৎসাহ পেয়ে কোনওরকম গৌরচন্দ্রিকা না করে তৎক্ষণাৎ শুরু করে দিলে গল্পটা।

'অনেক বছর আগে রাশিয়ার অনেক উত্তরে একটা উল্কা পড়েছিল এস্কিমোদের দেশে। বিরাট সে উল্কা। এক বছর কি তারও পরে খবরটা এসে পৌঁছল ইউরোপে—তাও গুজবের ছদ্মবেশে। গুজবটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে একটা জিনিস বুঝলাম যে উল্কাটা পাহাড়ের মতো বিরাট না হয়ে যায় না। গুজব থেকে আদত খবরটা নিংড়ে বার করা খুব কঠিন ব্যাপার নয়—ঠিক পথ ধরলেই হল। এস্কিমোদের নিছক একটা উপকথার ছদ্মবেশে প্রথম এল গুজবটা। ওরা বললে, লকলকে অগ্নি শিখাময় জ্বলন্ত রথে চড়ে আকাশ থেকে এক দেবতা

নেমে এসেছে তাদের দেশে—রথ হাঁকিয়ে গেছে দক্ষিণের দেশে। সারারাত আকাশ নাকি সিঁদুরের মত লাল হয়েছিল—আর চারদিকের চল্লিশ মাইল পর্যন্ত তুষার নাকি গলে জল হয়ে গেছিল।

'বুঝতেই পারছ, এস্কিমোদের এসব গাল-গল্প বিশ্বাস করিনি আর আমি। কিন্তু জানোই তো সাদাসিধে মানুষগুলো সরল কারণেই গল্পের সৃষ্টি করে—ওদের এ কাহিনিরও উৎস একটা আছে নিশ্চয়। খবরটা সবারই চোখ এড়িয়ে গেল। আমার কিন্তু মনে হল, এ কাহিনির পেছনে একটা কারণই শুধু থাকতে পারে। নিশ্চয় এইরকম একটা কিছু ঘটেছে ওদের দেশে। উল্কাপাত হওয়াই সম্ভব। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে যত উল্কা পড়েছে, তাদের চেয়েও অনেক বড় সে উল্কা। শেষপর্যন্ত এই উল্কার সন্ধানেই বেরিয়ে পড়লাম আমি।

'খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না আমায়। ভৌগোলিক তথ্যগুলো এস্কিমোরাই দিয়ে দিয়েছিল। বেগ পেতে হয়েছিল আসল কারণটুকু খুঁজে বার করতে। উপকূল থেকে পুরো দেড়দিন যেতে না যেতেই meteoric iron-এর একটা পাহাড় দেখলাম—যার সন্ধানে আসা তারই হদিশ পেলাম বলেই মনে হল। ম্যাপে এ পাহাড়ের কোনও উল্লেখই ছিল না—অবশ্য সে সময়ে ওদিককার ম্যাপে উল্লেখ থাকত না কোনও কিছুরই—কাজেই প্রমাণ হল না কিছুই। পাহাড়টার উপাদান কিন্তু ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত, সেইরকম। যেখানে উল্কাটা পড়েছে, তার চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইলের মধ্যেই পড়েছিল পাহাড়টা—তবুও আমার খটকা গেল না। তাই চোখ-কান বুঁজে আবিষ্কারের উল্লাসে আত্মহারা হলাম না। পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক অভিযানে বেরিয়েছিলাম আমি—আর জানোই তো বেখাপ্পা ব্যাপার তালে-গোলে ধামাচাপা দেওয়ার রেওয়াজ বিজ্ঞানে নেই। সেসব দিনে বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে খুব সচেতন থাকতাম আমি। অনেক বৈজ্ঞানিক অভিযানও পরিচালনা করেছিলাম। কয়েকটা হয়তো তোমাদের কাছে বলে থাকতে পারি।'

জরকেন্স অবাক হোক, তা আমি চাইনি। কেননা এবার যদি তা হয়, তাহলে ওকে কায়দা করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।

শুধোলাম, 'কিন্তু পাহাড় দেখে তোমার খটকা লাগল কেন, তা তো কই বললে না?'

'আরে, অত বড় একটা বিশাল জিনিস—আকারে যা আল্পসের চেয়ে কম হবে না—অকল্পনীয় গতিতে মহাশূন্য পথে ধেয়ে এসে ধাবমান পৃথিবীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লে কী হবে বলো তো? বিপুল সংঘর্ষের ফলে জিনিসটা সিধে ঢুকে যাবে পৃথিবীর বুকে, সেঁধিয়ে যাবে ধরিত্রীর জঠরে চিরকালের জন্যে। কিন্তু তা তো হয়নি। চোখের সামনেই সেন্ট গোথার্ডের চূড়ার মতো নাক উঁচু করে পড়ে রয়েছে পাহাড়টা। বল্গা হরিণ-টানা শ্লেজ চালানোর জন্যে জন তিন-চার এস্কিমোকে সঙ্গে এনেছিলাম আমি। ওদেরকে বাধ্য হয়ে জিগ্যেস করলাম। জানোই তো, ইউরোপের এদিকে উল্কা সম্বন্ধে একমাত্র এস্কিমোদের গুজব ছাড়া আর কোনও খবরই আসেনি। আর এই গুজব ছাড়া কাজ শুরু করার মতো বিজ্ঞানসম্মত তথ্য কিছুই ছিল না আমার হাতে। ওদেরকে জিগ্যেস করতে ওরা কিন্তু সেই একই কাহিনি বারবার শোনাতে লাগল আমায়। পেল্লায় রথ চড়ে দেবতা আরও উত্তরে নেমেছে পৃথিবীতে—রথ চালিয়ে ছুটে এসেছে এই দিকেই। যেখানে সে নেমেছে, অগ্নিকাণ্ডটা ঘটেছে সেইখানেই—এদিকে নয়। আর তাই শুনেই বেশ কিছুক্ষণের জন্য মাথা গুলিয়ে গেল আমার। অগ্নিকাণ্ডের

সহজ ব্যাখ্যা শুধু একটাই হওয়া সম্ভব। জ্বলন্ত জঙ্গলে লেলিহান আগুনই দেখেছে এরা দূর থেকে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কী, উত্তরে তো কোনও জঙ্গলই নেই। শুধু তুষার আর বরফ। বছরের মধ্যে শুধু মাসখানেকের জন্যে সে বরফ গলে যায়—সামান্য যা উদ্ভিদ দেখা যায়, তা নিঃশেষ করে দেয় ক'টা বল্গা হরিণেই। এস্কিমো-ভাষার ডজন খানেক শব্দ আমার জানা ছিল—কাজেই ওই সামান্য পুঁজি নিয়ে আর প্রচুর ইশারা-ইঙ্গিত মিশিয়ে অনেক প্রশ্ন করলাম ওদের। বিশাল একটা অগ্নিকাণ্ড যে বহু উত্তরে দেখা গেছে—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই শেষ অবধি রইল না আমার।

'আর তারপরেই বুঝলাম আসল কারণটা। নিশ্চয় খোলা একটা কয়লার স্তর ছিল ওদিকে। জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডটা তার ওপর এসে পড়ায় দপ করে জ্বলে উঠেছে সমস্ত স্তরটা।

'পাহাড়টার ধারেকাছে কিন্তু কোনও কয়লার চিহ্নই দেখতে পেলাম না। বুঝলাম, কয়লার স্তরের ওপর ঠিকরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছিটকে উঠে লাফাতে-লাফাতে উল্কাটা এগিয়ে এসেছে এই দিকেই। আমার এই সিদ্ধান্তই কিন্তু শেষপর্যন্ত সত্য হল। তোমরাও বুঝে দেখো, উল্কাটা তো আর টুপ করে খসে পড়েনি পৃথিবীর বুকে। তার ওপর শুধু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবই ছিল না—তাহলে তো সিধে পথেই আসত সে। কিন্তু তা তো নয়, উল্কার নিজস্ব কক্ষপথ আর নিজস্ব গতিবেগ একটা ছিল ঃ এরই সঙ্গে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এক হওয়ায় ঢালু হয়ে গেল তার গতিপথ। সিধে না এসে তির্যক রেখায় আছড়ে পড়ে লাফাতে-লাফাতে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

'অনেক ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর পর খুবই সহজ হয়ে গেল আমার কাজ। উল্কার গতিপথ অনুসরণ করে প্রথম যেখানে সে আছড়ে পড়েছে, সেখানে যাওয়া এরপর আর মোটেই কঠিন কাজ নয়। কঠিন শুধু থিওরি তৈরি করা—হাতেনাতে কাজ তো যে কেউ করতে পারে। দেখলাম, বেশ কয়েক জায়গায় পাহাড়টা ধাক্কা মেরেছে ভূস্তরকে—এক মাইল অন্তর-অন্তর সেইসব সংঘর্ষস্থানগুলোয় সৃষ্টি হয়েছে জলশূন্য হ্রদের মতো অগভীর গর্তের। আরও কিছুদূর যাওয়ার পর ব্যবধান বেড়ে যেতে লাগল—সেইসঙ্গে গভীর হয়ে উঠতে লাগল গর্তগুলো, বেশিরভাগ গর্তেই হ্রদের মতো জল জমেছিল। তুষার খুব তাড়াতাড়ি গলে যাচ্ছিল বলে পাহাড়টার কাছে বল্গা হরিণগুলোকে রেখে আসতে হয়েছিল আমায়। বছরের যে মাসে বরফ গলে যায়, সেই মাসেই শুরু করেছিলাম আমার অভিযান—তাই জমি দেখতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না।'

'ভালো কথা,' ফস করে প্রশ্ন করে একজন, 'রাশিয়ায় কি হিরে আছে?'

'রাশিয়ায় কি হিরে আছে?' অনুকম্পা মিশিয়ে প্রতিধ্বনি করল জরকেন্স।

'কিন্তু হিরের গল্পই তো বলছ, তাই নয় কি?'

'শুনতেই পাবে তা, শুনতেই পাবে,' বলে জরকেন্স। তারপর শুধোয়, 'হিরে জিনিসটা আদতে কী তা নিশ্চয় জানো আশা করি?'

'ইয়ে, তা জানি বইকী।' দু-একজন আমতা-আমতা করে ওঠে, স্পষ্ট বুঝলাম কেউই জানে না আসল উত্তরটা কী। একজন শুধু জানত। সে-ই বললে, 'দানা বেঁধে যাওয়া কার্বন।'

আবার গল্প শুরু করল জরকেন্স।

'তুষার সমস্তই গলে গেছিল। এইভাবে আগে থেকেই সময় হিসেব করে যাত্রা শুরু করেছিলাম। তিনটে গাধা নিয়ে এগিয়ে চললাম সামনের দিকে—সঙ্গে রইল শুধু তিনজন

এস্কিমো। গাধা তিনটে কিনেছিলাম গ্রামের মতো একটা জায়গা থেকে; অবশ্য ক'টা কুঁড়েঘরকে তোমরা গ্রাম নিশ্চয় বলবে না। আজ যেখানে দেখবে সেগুলো—পরের বছর এসে তাদের আর কোনও পাত্তাই পাবে না সেখানে। কিটব্যাগগুলো গাধার পিঠে চাপিয়ে হেঁটে চললাম আমরা।

'মস্ত একটা গহ্বরের কাছে এসে পৌঁছলাম সবাই—জল জমে বরফ হয়ে গেছে সেখানে। বিশাল একটা হ্রদ—নলখাগড়ার চিহ্ন ছিল না আশেপাশে—কোনও বুনোপাখিও সন্ধান পায়নি হ্রদের। নিঃসীম শূন্যতায় ধু-ধু করছিল চারদিক। কনকনে ঠান্ডা আর মরা দীপ্তির ঝিকিমিকিতে সে নির্জনতা যেন আরও অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বরফ গলে প্যাচপেচে হয়ে এসেছিল চারদিক। এরপর পঁচিশ মাইলের মধ্যে আর কোনও গহ্বর নেই। এইটাই তাহলে পৃথিবীর সঙ্গে পাহাড়টার শেষ সংঘাত, অথবা প্রথমও হতে পারে, কেননা আমি তো হাঁটছিলাম বিপরীত দিকে। বিশাল হ্রদটার দশ মাইল উত্তরে তাঁবু ফেললাম আমরা। পরের দিন তাঁবুটাবু গুটিয়ে নিয়ে পাড়ি দিলাম আরও পনেরো মাইল। পথের শেষে এসে পৌঁছলাম উল্কা যেখানে সর্বপ্রথম পৃথিবীর বুকে ঠিকরে পড়ে ছিটকে উঠেছিল, সেইখানে। মাধ্যাকর্ষণের টানে নিজের গতিপথ ছেড়ে এইখানেই আছড়ে পড়ে উল্কাটা—তারপর ছিটকে উঠে লাফাতে-লাফাতে এগিয়ে গেছে যেদিক থেকে এসেছি, সেইদিকে।

প্রথম সংঘাত যে এইখানেই, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই আর রইল না আমার। প্রথমত কয়লা সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত তার প্রমাণ পেলাম মাইলখানেক পরে শুধু অঙ্গার দেখে—যদ্দূর মনে হল খুব পুরু একটা কয়লার স্তরের একেবারে নীচ পর্যন্ত জ্বলে গেছে। তারপরই এসে পড়লাম বিশাল একটা মসৃণ সমতলভূমির ওপর—বহু দূরে দিগরেখায় গিয়ে মিশেছিল চ্যাটালো জমিটা। আর কী দারুণ ঠান্ডা। সর্বত্র তুষার গলে গেছে—কিন্তু এ জমি তখনও ঢাকা রয়েছে সাদা তুষারে। পরের দিন সকালে এই ধু-ধু ফাঁকা জমিটার ওধারে আরও কয়েক মাইল যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, তাই রাতের মতো সেইখানেই তাঁবু ফেলতে বললাম, কিন্তু রাজি হল না এস্কিমোরা। কারণ জিগ্যেস করলাম। ওরা বললে, খারাপ বরফ। তুষারের মধ্য দিয়ে খোঁচা দিয়ে দেখলাম, বাস্তবিক ইস্পাতের মতো কঠিন সে বরফ। ওরা কিন্তু বারবার বলতে লাগল, 'খারাপ বরফ।' তাতে ক্ষতি কী?' ওদের ভাষা যতটা পারলাম বললাম।

'দারুণ ঠান্ডা। খুব খারাপ বরফ।' বললে ওরা।

'বরফ ঠান্ডা হলে বুঝি খুশি হও না তোমরা?' জিগ্যেস করার চেষ্টা করি আমি। কিন্তু দেশি লোকদের সঙ্গে এ শ্লেষের কোনও মানেই হয় না—বিশেষ করে ইঙ্গিত দিয়ে তো শ্লেষ ফোটানো যায় না।

ওরা শুধু বললে, 'না। খুব ঠান্ডা।'

'ধুত্তোর,' বলে শেষ অবধি তাঁবু সমেত একটা গাধা নিয়েই রওনা দিলাম তুষারের মধ্য দিয়ে। খুঁটি পুঁতে গাধাটাকে বাঁধবার কোনও ব্যবস্থা করতে পারলাম না—কাজেই একটু জিরিয়ে নিয়ে সেই রাতেই সরে পড়ল সে; আমি কিন্তু কোনওরকমে তাঁবু খাটিয়ে হাড়-কাঁপানো নিদারুণ ঠান্ডা সত্ত্বেও একটু ঘুমের চেষ্টা করলাম। সেই আশ্চর্য নিথর নৈঃশব্দ্যকে কোনও ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়; বরফ ভাঙার ক্ষীণ শব্দও নেই, নেই জলের কুলকুল ধ্বনি। বরফের মধ্যে দিয়ে গুড়িয়ে ওঠে কত হাজারও রকমের বিচিত্র শব্দ, কিন্তু শুধু গাধাটার

শ্বাসপ্রশ্বাসের ফোঁস-ফোঁস শব্দ ছাড়া পেলাম না কোনও প্রাণের সাড়া, ফিসফিসানি অথবা মর্মরধ্বনি; সব কিছুকেই টুঁটি টিপে কেউ যেন বোবা করে দিয়েছে। শেষপর্যন্ত গাধাটাও চলে গেল, পাঁচ মাইল পর্যন্ত শুনলাম ওর যাওয়ার শব্দ—সে শব্দ ছাড়া চারপাশের দিগন্ত জোড়া ধু-ধু শূন্যতার মাঝে ছিল না আর কোনও শব্দ। তাই পাঁচ মাইল পেরিয়ে অপর পারে পৌঁছনো না পর্যন্ত স্পষ্ট শুনতে পেলাম তার পায়ের শব্দ। কনকনে ঠান্ডার মধ্যে সেই অস্বাভাবিক নিঝুম নিস্তব্ধতা অনেকক্ষণ পর্যন্ত জাগিয়ে রাখলে আমায়। ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে স্কেট পরে নিলাম; কিন্তু তার আগেই বুঝেছিলাম, একটা কিছু গলতি আছে এখানে, এস্কিমোদের কথাই ঠিক। স্কেট পরে নিলাম, কেননা তুষার একেবারে গলে গেছিল—কোনও চিহ্নই আর দেখলাম না তার। হার্ড টেনিস কোর্টের ওপর তুষার গলে গেলে যেমন দেখায়, সেইরকমই দেখাচ্ছিল চারদিক। বল্গা হরিণের গাড়িতে ফেলে এসেছিলাম তুষার জুতো, তাই রাত্রে বুট পরে হাঁটতে হয়েছিল। কিন্তু এখন স্কেট পরে নিয়ে মনেমনেই হিসেব করে দেখলাম ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাব অপর পারে। কিন্তু আশ্চর্য একটা জিনিস লক্ষ করলাম। বরফের এরকম জৌলুস এর আগে কখনও দেখিনি। অচিরেই পায়ের তলার বরফের আর একটা বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করলাম। ইস্পাতের চেয়েও অনেক কঠিন সে বরফ। আমার স্কেটজোড়া তো কিছুতেই আঁকড়ে ধরতে পারল না তার মসৃণ গা—বারবার হড়কে গিয়ে আর আছাড় খেয়ে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল আমার। উল্কার সঙ্গে সংঘর্ষে কী এমন পরিবর্তন আসতে পারে এখানকার বরফে—তাই ভাছিলাম। আর তখনই আচমকা বুঝলাম ব্যাপারটা। বরফের চেয়ে কঠিন যদি হয়—তবে এ বরফ নয়। চার হাত পায়ে ভর দিয়ে নীচু হয়ে বরফের দীপ্তির গভীরতায় তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বুঝলাম আসল ব্যাপারটা। পকেট-ছুরিটা বার করে আঁচড় কাটবার চেষ্টা করলাম। কোনও দাগই পড়ল না। যেসব জিনিসের ওপর ইস্পাতেরও কোনও দাগ পড়ে না, তাদের সংখ্যা পৃথিবীতে খুব বেশি নয়—এ জিনিসটাও তাদেরই অন্যতম। সে সময়ে একটা আংটি পরতাম আমি; আংটিটার সোনার মাঝে গাঁথা ছিল একটা পাথর। পাথরটা আসলে একটা পাথুরে কৃস্টাল। না, না, এখন যেটা দেখছ আঙুলে, এটা নয়—সেটা আসল পাথর ছিল। লোকে ভাবত হিরে—যদিও সে উদ্দেশ্যে কিনিনি পাথরটা। কী কারণে কিনেছিলাম তাও মনে নেই—বোধহয় নিছক খেয়ালের বশে অথবা দেখতে ভালো লেগেছিল বলেই। সে যাই হোক, পাথর সমেত আংটিটা আঙুলেই ছিল তখন। খুলে নিয়ে ঠান্ডা ঝকঝকে জিনিসটার ওপর বেশ করে ঘষলাম সেটা—কোনও আঁচড়ই পড়ল না। দুটোই যদি পাথুরে কৃস্টাল হত, তাহলে আঁচড় নিশ্চয় পড়ত। কাজেই সম্ভাব্য জিনিসগুলোর সংখ্যা আরও কমে এল। ভিজে পাথরটার ওপর বসে খুলে ফেললাম স্কেট। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ানক দীপ্তি থেকে চোখ আড়াল করে ভাবতে লাগলাম। এ বিশাল সমতল জমিটা যে বরফ—সে কথা ভেবে আর লাভ নেই। অবিজ্ঞানীরাই এ ধরনের আজেবাজে চিন্তায় সময় নষ্ট করত। কিন্তু ইস্পাত ছুঁইয়ে তো প্রমাণ হয়ে গেছে বস্তুটা আদতে কী। কাজেই নতুন থিওরি চিন্তা করতে হল আমায়। খুব সহজেই শেষ হল আমার চিন্তা। ধরো, তুমি নিজেই একজন বিজ্ঞানবিৎ; তাহলে যে-কোনও একটা পাথর দেখলে প্রথমেই কী করো তুমি? কোন স্তরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সেইটাই লক্ষ কর, কেমন? একথা ভাবামাত্রই দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু। আমি দাঁড়িয়েছিলাম কয়লার ওপর; কিনারার চারধারে পোড়া অঙ্গার আমি দেখে এসেছি। আর জানোই তো

কয়লা কী।'

'কার্বন।' শেষ যে কথা বলেছিল, সে-ই আবার উত্তর দিলে।

'কিন্তু...', আর একজন শুরু করে। শান্তভাবে জরকেন্স তাকেই শুধোয়, 'আচ্ছা, কার্বন বা ওই জাতীয় কিছুকে দানা বাঁধাতে কী দরকার তা জানো নিশ্চয়?'

'চাপ, তাই না?' বলে অপরজন।

'কল্পনা করতে পারি না এমনই চাপ, আর আজ পর্যন্ত যত আগুন আমরা জ্বালাতে পেরেছি, তার চাইতে কল্পনাতীত বেশি উত্তাপ।' বললে জরকেন্স। 'অবশ্য ক্ষমতাতীত নয়, কেননা, ল্যাবরেটরিতে একটা হীরা আমরা তৈরি করতে পেরেছি। কিন্তু তার আকার এতই ছোট্ট আর প্রয়োজনীয় চাপ এমনই ব্যয়বহুল যে আমার তো মনে হয় না সে চেষ্টা আর কেউ করেছে বলে। কিন্তু কল্পনা করো তো উত্তাপে সাদা একটা পাহাড় মিনিটে হাজার মাইল বেগে ধেয়ে চলেছে; সেই সঙ্গে যোগ দাও আমাদের পৃথিবীর গতিবেগ—তাও প্রায় মিনিটে হাজার মাইল, বরং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য আরও কিছু বেশি। তারপর সমস্ত জিনিসটাকে সিধে আছড়ে ফ্যালো কার্বনের একটা জমির ওপর। ফলাফল জানার জন্যে কষ্ট করে এতদূর না হলেও চলত আমার। কিন্তু এসেই যখন পড়েছি, তখন স্থির করলাম ওদিক পর্যন্ত গিয়ে সবটুকু দেখতে হবে আমায়। কিন্তু কী কষ্টে যে এই পথ চলেছিলাম, তা বোঝাতে পারব না। ভয়ংকর কঠিনতা, নিদারুণ ঠান্ডা আর মারাত্মক জৌলুস, শ্রান্ত পা, মাথা আর মন। আসলে আমি খুঁজছিলাম সামান্য একটু খাঁজ কি চিড়-যার ফাঁকে আমার ছুরির ফলাটা বা স্কেট ঢুকিয়ে বেশ বড় একটা চাঁই খসিয়ে আনতে পারি। কিন্তু—জানি না বিশ্বাস করবে কিনা—সমস্ত পথ হেঁটেও এতটুকু ফাটল দেখতে পেলাম না কোথাও।

'সাঙ্ঘাতিক জ্বলজ্বলে ওই দীপ্তিতে মাথা ধরে গেছিল আমার—যতই এগোতে লাগলাম, ততই তা বাড়তে লাগল। ওদিককার অক্ষাংশে জুন মাসের শেষে এমন কোনও রাতের আবির্ভাবের সম্ভাবনা ছিল না যাতে আমি একটু আরাম পেতে পারি। শ্রান্ত পা দুটো টেনে-টেনে চলতে লাগলাম আমি—হিরে দেখে এরকম ক্লান্ত আর কখনও হইনি আমি। লেডি ক্লাশনের ইভনিং পার্টিতে আমার না যাওয়ার এইটাই আসল কারণ—যাকে খুশি এখন তা বলতে পারো। যাক, চললাম তো চললামই। তারপর অনেকক্ষণ পরে, অন্য দেশে যখন সন্ধ্যা, এসে পৌঁছলাম অপর পারে। পোড়া অঙ্গার ছাড়া সেখানে আর কিছুই দেখার ছিল না। ছাই আর ধুলোর মধ্যে হাঁটা খুবই কষ্টকর সন্দেহ নেই, কিন্তু তবুও হিরেটা আবার এড়োএড়ি পেরোবার চেষ্টা না করে সমস্ত পথটা ছাই মাড়িয়েই এলাম। সলোম পশুচামড়ার পোশাক পরেছিলাম—তাই ঘুমোতে পেরেছিলাম পথেই। দিনভোর বিশ্রাম নিয়ে রওনা দিলেও একদমে সমস্ত পথটা পেরোবার ক্ষমতা আমার ছিল না। হিরের পার বরাবর ছাই মাড়িয়ে দীর্ঘপথ পেরিয়ে ফিরে এলাম যাত্রা শুরুর জায়গাটিতে।

'এস্কিমোগুলোকে দেখলাম বটে, কিন্তু কোনও প্রলোভনেই ওরা হিরেটার কাছে যেতে রাজি হল না। দেবতা বিদায় নেওয়ার পর শয়তান এসে আড্ডা গেড়েছে ওখানে—জাদুমন্ত্রে সমস্ত জায়গাটুকু ঠান্ডায় আর জ্বলজ্বলে দীপ্তিতে ভরিয়ে তুলেছে। ওদের ভাষা তো বেশি বুঝি না, তাই বুঝলাম না, শয়তান মহাপ্রভু দেবতার পিছুপিছু পৃথিবীতে এসেছিল, না দেবতার অন্তর্ধানের পর বেদখল করেছে জমিটুকু। সে যাই হোক, সব কিছুরই সহজ একটা ব্যাখ্যা

থাকে; ওরা গেল ধর্মের ব্যাখ্যায় আর আমি এলাম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায়।

'উপকূলে এসে অনেক পরিশ্রম আর বেশকিছু প্রচারকার্য চালিয়ে হয়তো খানিকটা ডিনামাইট সংগ্রহ করে ফিরে এসে Rue de la Paix-এর ভাঁড়ার ভরাবার মতো বেশকিছু টুকরো হিরে নিয়ে যেতে পারতাম। প্যারীর নাম শুনেছ তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেইখানেই। কিন্তু আমার স্বপ্ন ছিল তার চাইতেও অনেক বড়। পৃথিবীর সবক'টা বাড়ি আমি সুন্দর করে তুলতে চেয়েছিলাম। এমন একটা কোম্পানি গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম, যারা মধ্যবিত্তের হাতের মুঠোয় এনে দিত আশ্চর্য সুন্দর হিরের বেলওয়ারী ঝাড়। জমকালো ফুলদানির পরিকল্পনাও ছিল। আরও রকমারি রোজকারের ব্যবহারের জিনিসপত্র তৈরির পরিকল্পনা এসেছিল আমার মাথায়।

'কিন্তু শেষপর্যন্ত হল কী? ঠিক যেদিন আমি লন্ডনে পৌঁছলাম, সেদিনই রাস্তায় পোস্টার দেখলাম—'বিরাট ভূমিকম্প...' শুধু এইটুকু দেখেই ছুটলাম খবরের কাগজওয়ালাদের দোকানে। একটা কাগজ ছিনিয়ে নিয়ে দেখলাম, হ্যাঁ তাই বটে। রাশিয়াতেই হয়েছে ভূমিকম্পটা।

'আমি জানতাম। পৃথিবী যে কী প্রচণ্ড ঘা খেয়েছে, তা আমি জানতাম। জানতাম, ওই ভীষণ সংঘর্ষে পৃথিবীর বুক থেকে বহু মাইল ভেতর পর্যন্ত টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে, ফেটে-ফুটে গেছে সমস্ত স্তরগুলো। ধরো, তোমার কোনও বন্ধুর গোড়ালি বা হাঁটু জখম হয়েছে, তারপরেই হঠাৎ একদিন কাগজে তার নাম দেখলে। তৎক্ষণাৎ তুমি বুঝে নেবে আদতে হয়েছে কী। জখম হাঁটু আর গোড়ালি যে বন্ধুটির দেহভার বইতে পারেনি, পড়ে গিয়ে বেশ আহত হয়েছে সে, তা বুঝতে তোমার এক লহমাও লাগে না। প্রবীণা ধরিত্রীর বেলাও ঘটেছে তাই। কী প্রচণ্ড আঘাত যে সে বুক পেতে নিয়েছে, তা আমি জানতাম। তাই যে মুহূর্তে 'ভূমিকম্প' শব্দটা দেখলাম, বুঝলাম সব কিছুই। ওরা সিসমোগ্রাফ দেখে উৎপত্তিস্থান বার করেছে—আমি কিন্তু কিছু না দেখেই ঠিক আসল কেন্দ্রটি বলে দিতে পারতাম।

'তৎক্ষণাৎ ফিরে গেলাম আমি সবকিছুই নিজের চোখে দেখতে। স্বচক্ষে না দেখে তো আর কোম্পানি গঠন করা চলে না। পরের বোটেই গেলাম। যে ভয় করেছিলাম, অবস্থা দেখি তার চাইতেও অনেক খারাপ। সাঙ্ঘাতিক ভূমিকম্প। আশ্চর্য হলাম না মোটে—আঘাতটা তো আর সামান্য নয়। বরং ওই আঘাত সয়ে এতদিন ধরে দাঁড়িয়ে থাকাটাই তো আশ্চর্য। অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে উঠেছে। সামান্য একটু ঢালু অবস্থায় দেখে গেছিলাম হিরেটাকে। ও অবস্থায় না থেকে যদি সমতল অবস্থায় থাকত, তাহলে কখনই এভাবে বেমালুম চোখের আড়াল হত না। কিন্তু এতটা আশা করাও যায় না। কল্পনাতীত একটা রেল দুর্ঘটনার পর সেতুর খিলানগুলো যেরকম টুকরো-টুকরো হয়ে যায়, সেইভাবেই গুঁড়িয়ে গেছিল ভূ-স্তরগুলো। কাজেই দীর্ঘদিন কোনওরকমে খাড়া থাকলেও এক সময়ে আর ভার সইতে না পেরে স্রেফ টুপ টুপ করে ভূগর্ভে ধ্বসে পড়েছে স্তরগুলো। যেভাবেই হোক না কেন অদৃশ্য হয়ে গেছে হিরেটা। এমনকী অঙ্গারগুলোরও কোনও হদিশ পেলাম না। হিরের ধার বরাবর সাগরের বেলাভূমির মতো পড়েছিল অঙ্গারের রাশ। সব চিহ্ন সমেত তলিয়ে গেছে হিরে আর সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে ধরিত্রীর মুখ। এই হয়তো ভালো। হিরে রইল না বটে কিন্তু তাতে মানবসমাজের মঙ্গল বই

অমঙ্গল কিছু হল না। কিন্তু কস্মিনকালেও দার্শনিক নই আমি, তা তো জানো। হিরেটার আকারও তুচ্ছ নয়—যে ক্ষতি আমার হল, তাও বলবার নয়। তবুও মুখ বুজেই থাকি। কিন্তু বড় হিরেটিরে নিয়ে কেউ যদি বড়-বড় কথা বলে, তাহলেই মেজাজ যায় বিগড়ে। কী করব বলো, সামলাতে পারি না নিজেকে।'

'কিন্তু মাটি খুঁড়ে কি উদ্ধার করা যেত না!' হঠাৎ রাগেদুঃখে যেন কী বলবে ভেবে পায় না জরকেন্স।

'মাটি খুঁড়ে কি উদ্ধার করা যেত না! নিশ্চয় যেত। কিন্তু শুরুতেই লাগত হাজার দুয়েক লোক। ঠিকমত আটঘাট বেঁধে কাজ করতে গেলে হাজার পঞ্চাশের কমে অবশ্য সম্ভব নয়—মজুরিও তো খুব সস্তা ওখানে—হপ্তায় দশ শিলিংই যথেষ্ট ওদের পক্ষে। তাহলে গিয়ে প্রতি হপ্তায় যাচ্ছে পঁচিশ হাজার পাউন্ড। দশ হপ্তায় যদিও কাজ শেষ হত না—তবুও ফলাফলের মুখ দেখতে পেতাম খানিকটা। তাহলে শুধু মজুরিই যেত আড়াই লক্ষ পাউন্ড। সেই অনুপাতে টাকা লাগত ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে—আর প্রায় তত টাকাই যেত গাড়ির আয়োজনে। তারপর ছিল বাড়ি ঘর-দোর তৈরির খরচ; স্রেফ আদিম প্রথার কুঁড়ে বানালেই কাজ চলে যেত আমাদের। মোটমাট দশ লক্ষ পেলেই কাজ শুরু করা যেত। লন্ডন শহরে দশ লক্ষ পাউন্ড কি সোজা কথা হল? সবরকম চেষ্টাই করেছি আমি; বকবক করেছি একনাগাড়ে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা, যত পেরেছি মদ গিলিয়েছি। কিন্তু কেউই রাজি হল না দশ লক্ষ ঢালতে। হায়রে, লাভের হিসেবটা একবার ভাব তো! তুচ্ছ ওই দশ লক্ষ পাউন্ডের লাভ দাঁড়াত, শতকরা কোটি-কোটি পাউন্ড। কিন্তু রাজি হল না কেউই। শেষপর্যন্ত ওরা যে আসলে কী, তা ওদের মুখের ওপর বলে দিয়ে ছেড়ে দিলাম সব প্রচেষ্টা।'

'ওয়েটার!' হাঁক দিল জরকেন্স। 'খু-ব ছোট্ট একটা হুইস্কি এনে দাও—আর সামান্য একটু সোডা ছিটিয়ে দিও তাতে।'

আমাদের ক্লাবে খু-ব ছোট্ট হুইস্কি পাওয়া যায় না। ছোট্ট হুইস্কি অবশ্য আছে—কিন্তু সব ওয়েটারই জানে জরকেন্সের কাছে ছোট্ট হুইস্কি কখনও না চলে না।

'মাসিক রোমাঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত। (কার্তিক, ১৩৬৬।)
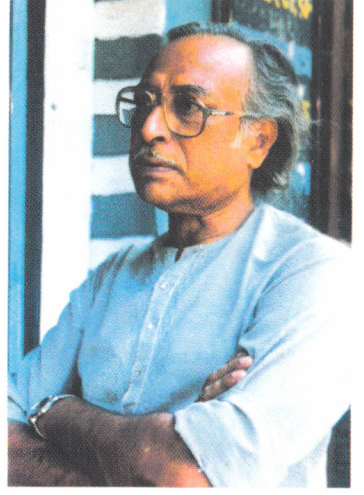
জন্ম ঃ ১ ডিসেম্বর ১৯৩২। কলকাতায়। একটি প্রাচীন শিক্ষাব্রতী পরিবারে। ছোট থেকেই অজানার দিকে দুর্নিবার আকর্ষণ। অ্যাডভেঞ্চারের টান জীবনে, চাকরিতে, ব্যবসায়, সাহিত্যে। নামী একটি প্রতিষ্ঠানের পারচেজ ম্যানেজার পদে ইস্তফা দিয়ে পুরোপুরি চলে আসেন লেখার জগতে। গোয়েন্দা-সাহিত্যে একনিষ্ঠ থেকে বাংলায় সায়েন্স-ফিকশনকে ত্রিমুখী পন্থায় জনপ্রিয় করতে শুরু করেন ১৯৬৩ সাল থেকে। ভারতের প্রথম কল্পবিজ্ঞান-পত্রিকা 'আশ্চর্য!'র ছদ্মনামী সম্পাদক। এখন সম্পাদনা করেন 'ফ্যানট্যাস্টিক'। ইন্দ্রনাথ রুদ্র, ফাদার ঘনশ্যাম, প্রফেসর নাট বল্টু চক্র প্রমুখ চরিত্রের স্রষ্টা।
পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার। দীনেশচন্দ্র স্মৃতি, মৌমাছি স্মৃতি, রণজিৎ স্মৃতি ও পরপর দু-বছর 'দক্ষিণীবার্তা'র শ্রেষ্ঠ গল্প পুরস্কার। অনুবাদের ক্ষেত্রে 'সুধীন্দ্রনাথ রাহা' পুরস্কার।
ভালোবাসেন লিখতে, পড়তে ও বেড়াতে।

সাসপেন্স! রহস্য! থ্রিলার!

রাতের আতঙ্ক, ব্ল্যাকমেল,
প্রেতিনী কন্যার কাহিনি, সবুজ মানুষ

এইরকম অসহ্য সাসপেন্সের কাহিনি এই বইয়ের পাতায়-পাতায়। সঙ্গে রহস্য, রোমাঞ্চ, শিহরন আর ভয়।

হৃদযন্ত্র যাদের দুর্বল এই বই তাদের জন্য নয়।

9 788183 740418
www.bookspatrabharati.com